মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি

অনিরুদ্ধ রায়
রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

পরম বন্ধুবর

হিতেশরঞ্জন সান্যালের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

অনিরুদ্ধ রায়

রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অভাব আমরা বহুদিন ধরে অনুভব করছি। ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনায় এই প্রয়োজন আরও স্পষ্ট হয়। প্রধানত এই অভাব পূরণের দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা এই সংকলনের প্রচেষ্টা করি, যেখানে গতানুগতিক বাঁধাধরা ছকে সীমিত না থেকে আমরা বিভিন্ন গবেষকের চিন্তা একজায়গায় জড়ো করতে পারি। আশা করছি এতে আমাদের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও ইতিহাসে উৎসাহী বৃহত্তর পাঠক-মণ্ডলী চিন্তার রসদ পাবেন।

বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিভিন্ন দিক আলোচনার ইচ্ছা থাকলেও বহু বিষয়ে আমরা উপযুক্ত লেখা পাই নি বলে বাদ পড়ে গেছে। আমাদের আশা আছে, এই সব বিষয়ের গবেষণার ফসল আমরা আরও একটি সংকলনে প্রকাশ করতে পারব। কালানুক্রমিক ইতিহাসের প্রেক্ষায় সামাজিক জীবনের বিবর্তন, পরিবার, নারী, গোষ্ঠীজীবন – এগুলি কিছুই এই সংকলনে স্থান পায় নি। আমরা বহু চেষ্টা করেও এখনও এই সব বিষয়ে আধুনিক গবেষণার কোন ইঙ্গিত পাই নি। তাই আমরা আশা করে আছি শুধু এই আহৃত প্রবন্ধগুলি থেকে নয়, যে ফাঁকগুলি রয়ে গেল তাও ইতিহাসের পাঠকদের কৌতূহল উদ্রেক করবে। এর ফলেই আরও নতুন গবেষণার বিষয় চিহ্নিত হবে।

রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টায় যিনি আমাদের উৎসাহ দেন, এবং যাঁর সাহায্যে আমরা সংকলনের কাজটি শুরু করি, আমাদের পরম বন্ধু শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল আজ আর নেই। তাঁর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে এই সংকলনটি তাঁকে উৎসর্গ করে আমরা চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।

বাংলাদেশের খ্যাতনামা অধ্যাপক জনাব আহমদ শরীফ সাহেব আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা দাবি করেন: অত্যন্ত অল্পসময়ের মধ্যে তিনি আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। প্রাক্তন অধ্যাপক ও পরম বন্ধুবর বি. আর. গ্রোভার তাঁর অপ্রকাশিত একটি লেখা অনুবাদ করে ছাপানোর অনুমতি দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। হিতেশরঞ্জন সান্যালের লেখাটি ঢাকার 'ইতিহাস' পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে শ্রীগৌতম ভদ্র আমাদের বিশেষ সাহায্য করেছেন। সেই লেখাটি এখানে পুনর্মুদ্রণ করা হলো। শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রায়ের লেখাটি ১৯৭১

সালে ইংরাজিতে প্রথম প্রকাশিত হয়, সেটি এখানে অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অন্য লেখক-লেখিকাদের আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য। পরিশেষে আমরা প্রকাশক কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানীকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই, কারণ বহু কাজের মধ্যেও তাঁরা এই বইটি প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়েছেন। এসত্ত্বেও যেসব ত্রুটি রয়ে গেল তার জন্য আমরা মার্জনা ভিক্ষা করছি।

অনিরুদ্ধ রায়
রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়

এই সংকলনে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদক বা প্রকাশক দায়ী নন।

মধ্যযুগে বাংলার রাজনৈতিক গতিধারা

অতুলচন্দ্র রায়

ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় মুসলমানদের বাংলা বিজয় কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই বাংলা অভিযান ছিল দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে মধ্য-এশিয়ায় উদ্ভূত ঘুজ, খালজী, খালাজী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত মুসলিম উপজাতিদের ভারত সীমান্তের দিকে ভাগ্যান্বেষী অভিযানের অংশবিশেষ। ভারতের বাইরে বিভিন্ন মুসলিম গোষ্ঠীর ও গজনীতে তুর্কী ঘোর বংশের অভ্যুত্থান ভারতের অংশবিশেষে ম্রিয়মাণ ইসলামী শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে। ভারতের অভ্যন্তরে তুর্কীদের এই অগ্রগতির প্রথম পর্ব সম্পন্ন হয় মহম্মদ বখতিয়ার খালজী নামে এক ভাগ্যান্বেষীর নদীয়া অভিযানে (১২০২-৩)। মহম্মদ বখতিয়ারের সহজ সাফল্য সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের ইঙ্গিত দেয়। উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল যখন তুর্কীদের করতলগত, গাঙ্গেয় উপত্যকা ও বিহার অঞ্চলে তখন সম্পূর্ণ নৈরাজ্য এবং বাংলার সেনরাষ্ট্র ও সমাজ ভেদবুদ্ধি দ্বারা আচ্ছন্ন। বর্ণভেদবুদ্ধি বাঙালী সমাজ ও সেনরাষ্ট্রকে অন্তস্তল থেকেই দুর্বল ও ভঙ্গুর করে ফেলেছিল। সেনরাষ্ট্রের পরিধি যতই সংকুচিত হয়ে এসেছিল, আমলাতন্ত্র ততই স্ফীত হয়ে উঠছিল এবং সেই সঙ্গে সামন্ততন্ত্র ছিল যথেষ্ট সক্রিয়। আমলাতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রই বাংলায় বিচ্ছিন্নতাবাদের উন্মেষ ঘটায়।

স্বাধীন ভাগ্যান্বেষী সেনানায়ক বখতিয়ার খালজীর নদীয়া অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ইতিহাসের মধ্যযুগের সূচনা হয়। বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেন নদীয়া থেকে পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন এবং এই অঞ্চলেই সেনরাজ্য কোনো রকমে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলে আরও প্রায় পঞ্চাশ বছর। নদীয়া অভিযানের মূলে বখতিয়ার খালজীর প্রধান লক্ষ্য ছিল লুণ্ঠন। পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা ও জয়লাভের অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে তিনি পলাতক রাজার পশ্চাদ্ধাবন করা থেকে বিরত থাকেন। লুণ্ঠনের প্রলোভনেই তিনি বাংলার রাজধানী গৌড়-লক্ষ্মণাবতীর দিকে ধাবিত হন। গৌড়-লক্ষ্মণাবতীর সহজ বিজয় বখতিয়ারকে রাজ্য স্থাপনে উৎসাহিত করে। উচ্চাভিলাষী, ভাগ্যান্বেষী ও লোভী অনুচররাও বখতিয়ারকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। লুণ্ঠনের দিক থেকে গৌড়-বিজয় ফলপ্রসূ না হলেও, রাজনীতির দিক থেকে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। একদিকে রাজার পলায়ন ও অন্যদিকে রাজধানীর সহজ পতন সেনরাষ্ট্রের শেষ

মর্যাদাটুকু বিলীন করে দেয়। গৌড় বিজয়ের পর বখতিয়ার খালজী কর্তৃক এক স্বাধীন রাজ্যের অধীশ্বর হন এবং আরও উত্তরে অগ্রসর হয়ে নিরাপদ স্থান হিসাবে দেবকোটে (দিনাজপুর জেলা) তাঁর কার্যালয় স্থাপন করেন।

বখতিয়ার পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের কিছু অঞ্চল দখল করেছিলেন। বিক্রমপুরকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গে সেনবংশ বেশ কিছু সময় অস্তিত্ব রাখে। সেনরাজ্য ছাড়াও পূর্ববঙ্গে দেব বংশ ও পট্টিকেরা রাজ্যের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। দেব বংশের প্রতিষ্ঠাতা দামোদর ১২৩১ থেকে ১২৪৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করে যান। ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবত বিশ্বরূপ সেনের মৃত্যুর পর সেন-শক্তির অবক্ষয়ের সুযোগে দামোদর স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ত্রিপুরার পট্টিকেরা রাজ্যটি ছিল সেন শাসনাধীনে এক সামন্ত রাজ্য। সেন বংশের অবক্ষয়ের সুযোগে পট্টিকেরার সামন্ত রাজা হরিকালদেব স্বাধীন হয়ে যান। সুতরাং সেই সময় বাংলার কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বখতিয়ার খালজীকে 'বঙ্গ-বিজেতা' বলা যায় না। তবে তিনি পশ্চিম ও উত্তর বাংলার কিছু এলাকা দখল করে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন এবং এটিই তাঁর অন্যতম কীর্তি। প্রকৃতপক্ষে ত্রয়োদশ শতকে রচিত ফার্সী গ্রন্থেও বখতিয়ারকে 'বঙ্গ-বিজেতা' বলা হয় নি। এইসব গ্রন্থে বখতিয়ার ও তাঁর উত্তরসূরীদের অধিকৃত অঞ্চলকে 'লখনৌতির রাজ্য' বলা হয়েছে। বখতিয়ার মহম্মদ ঘোরীর ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি কুতব-উদ্দিনের প্রাধান্য স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু প্রভুত্ব কখনই নয়। বিহারে বখতিয়ারের সাফল্যে চমৎকৃত হয়ে, কুতব-উদ্দিন 'ইসলামের এই উদিত সূর্য'কে খিলাৎ ও প্রশংসাসূচক পত্র পাঠিয়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন মাত্র। সম্পূর্ণ নিজের শক্তি ও দক্ষতার বলেই বখতিয়ার বাংলায় মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বখতিয়ার সুলতান অভিধা গ্রহণ করেছিলেন কিনা, কিংবা নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন ও খোতবা পাঠের নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা, তা সমকালীন ফার্সী গ্রন্থ থেকে জানা যায় না। সম্ভবত, প্রথমদিকে ফার্সী গ্রন্থকাররা বখতিয়ার কর্তৃক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন সুনজরে দেখেন নি। সুলতান অভিধা গ্রহণ না করলেও, বখতিয়ার যে সুলতানোচিত অধিকার ও ক্ষমতা উপভোগ করেছিলেন—তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি বাংলায় স্বাধীন মুসলিম রাজ্যের যে ঐতিহ্য রেখে যান, তা পরবর্তীকালে বিস্তারলাভ করে গৌরবময় গৌড়-সালতানতে পরিণত হয়।

বখতিয়ার বিজিত রাজ্যে গোষ্ঠীগত সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে নিজের ভাগ্যান্বেষী ও উচ্চাভিলাষী অনুচরদের সন্তুষ্ট করেন। বিজিত

ভূখণ্ডের সীমান্ত এলাকায় সর্বক্ষমতাসম্পন্ন সমর-অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। গোষ্ঠীতন্ত্র ও মালিকানা শাসনই ছিল তাঁর শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে সামন্ততন্ত্রের প্রবর্তন করে বখতিয়ার খালজীদের মধ্যে অন্তর্বিবাদের সম্ভাবনা দূর করতেই প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে ইসলাম প্রচারকে উদ্দেশ্য বা 'আদর্শ' বলে গ্রহণ না করলেও, বখতিয়ার সে যুগের মুসলিম আক্রমণকারীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কিছু বৌদ্ধমঠ ও হিন্দু-মন্দির ধ্বংস করতে দ্বিধা করেন নি। সেই সঙ্গে ইসলাম ধর্ম-সংস্কৃতির প্রসারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। একজন সৈনিক হয়েও বখতিয়ার উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুসলমান সমাজের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত সদ্য-প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্র শুধু সামরিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল হতে পারে না। এ-থেকেই তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি কতটা স্পষ্ট ছিল তা অনুধাবন করা যায়।

প্রয়োজনীয় সময়ের অভাবে, বখতিয়ার কেন্দ্রীয় শক্তি বা সংগঠন গড়ে তুলতে পারেন নি। সামন্ততন্ত্রের প্রবর্তন করে, তিনি খালজী মালিক ও আমীরদের স্বাতন্ত্র্য এক রকম স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে (১২০৬) প্রভুত্বের প্রশ্নে খালজীদের মধ্যে এক তীব্র অন্তর্বিরোধ বেধে যায়। বখতিয়ারের হত্যাকারী আলি মর্দান খালজীকে পরাভূত করে নজরবন্দী করে রাখা হয় এবং বখতিয়ারের অন্যতম সহচর শিরাণ খালজীকে নেতৃপদে নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু শুরু থেকেই খালজী আমীরদের উন্নাসিকতা ও আত্মাভিমান শিরাণ খালজীর হাত দুর্বল করে রাখে। প্রতিটি খালজী আমীর অন্যের তুলনায় নিজেকে অধিকতর দক্ষ ও উপযুক্ত বলে মনে করতেন। দ্বিতীয়ত, বখতিয়ারের তিব্বত অভিযানের ব্যর্থতা ও বহু মুসলিম নেতার প্রাণনাশ লখনৌতির মুসলিম সমাজের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তৃতীয়ত, আলি মর্দানের অনুগামীরাও ছিল অ-দমিত। চতুর্থত, লখনৌতি রাজ্যের এই অন্তর্বিরোধ-জনিত বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগে দিল্লীর হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাও শিরাণ খালজীকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল। লখনৌতির মুসলিম রাজ্যের এই সংকটকালে যদি বাংলা তথা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হিন্দু রাজ্যগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে আক্রমণ চালাত, তাহলে বাংলার ইতিহাসের গতিধারা ভিন্নরূপ নিত। দুর্ভাগ্যবশত সে রকম কিছু ঘটল না—কারণ বিক্রমপুরের সেনবংশ, নোয়াখালি চট্টগ্রামের দেববংশ, ত্রিপুরার পট্টিকেরা-বংশ এবং উত্তর বিহারে মিথিলার কর্ণাটকবংশ নিজেদের মধ্যে সংগ্রামে বৃত্ত থেকে নিজেদের শক্তি অপচয় করে। শিরাণ খালজী নিজে আমীরদের সঙ্গে বোঝাপড়া করেও আলি মর্দানের অনুচরদের প্রতি দমনমূলক নীতি গ্রহণ না করে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। অন্যদিকে সুলতান অভিধা গ্রহণ

না করে দিল্লীকে নিরস্ত রাখেন, যদিও তিনি স্বাধীনভাবেই শাসন চালিয়ে যান। সেই সময় উত্তর-ভারত থেকে উৎখাত হয়ে গাড়ওয়ার ও পরমার রাজপুতদের এক বিশাল জনগোষ্ঠী নিরাপত্তার জন্য পূর্ব-ভারতের দিকে অগ্রসর হয়ে বিহারে জমায়েত হন এবং বিহারের মুসলমান জনগোষ্ঠী কোণঠাসা হয়ে পড়ে। সম্ভবত, বিহারের কিছু অংশ নীরবে দিল্লীর দখলে চলে যায়। বাংলার পশ্চিম সীমান্তে এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তন লখনৌতির মুসলিম রাজ্যের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। শিরাণ খালজী যখন রাজ্যে শান্তি ও সংহতি আনতে ব্যস্ত, সেই সময় আলি মর্দান খালজী নজরবন্দী থেকে পলায়ন করে সোজা দিল্লীতে সুলতান কুতুব-উদ্দিনের শরণাপন্ন হন। লখনৌতির মুসলমান রাজ্যের তথা স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার এটাই হলো প্রথম দৃষ্টান্ত। আলি মর্দান কুতুব-উদ্দিনকে লখনৌতি আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করেন। দিল্লীর সাহায্য ও অনুমোদন ব্যতিরেকে বাংলার লখনৌতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা স্বভাবতই কুতুব-উদ্দিনের মনঃপূত ছিল না। পূর্ব-ভারতে বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি বাংলার উপর দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। দিল্লীর দরবারে আলি মর্দানের পলায়ন কুতুব-উদ্দিনকে সেই সুযোগ এনে দেয়। তাঁর আদেশে অযোধ্যার সিপাহশালার কায়েম রুমী এক সেনাবাহিনী নিয়ে বাংলার দিকে অগ্রসর হন। লখনৌতির খালজীদের তরফ থেকে বাধা দেওয়ার কোনো চেষ্টা হলো না। বরং বখতিয়ারের আর-এক ঘনিষ্ঠ অনুচর ও গঙ্গাতরীর শাসনকর্তা আইয়াজ খালজী বিহারের সীমান্তে রুমীকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। লখনৌতির এক অন্যতম আমীরের এই বিশ্বাসঘাতকতায় লখনৌতির ভাগ্যাকাশ আবার মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় শিরাণ খালজী দেবকোট পরিত্যাগ করে সসৈন্যে পুনর্ভবা নদীর পূর্ব তীরে নিঃশব্দে চলে যান। দিল্লীর নিযুক্ত সেনাপতি ও সেনাবাহিনীর এই প্রথম বাংলার মুসলিম রাজধানীতে প্রবেশ। পুরস্কার হিসাবে আইয়াজ খালজীকে দিল্লীর মনোনীত শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। রুমী খালজী রাজ্যের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত করে ফিরে যান।

দিল্লীর হস্তক্ষেপে লখনৌতির খালজীদের অন্তর্কলহের সাময়িক নিরসন হয় বটে, কিন্তু রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। অনতিকাল মধ্যে কুতুব-উদ্দিন আলি মর্দানকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১২১০ খ্রীস্টাব্দে আলি মর্দান একসাথে সেনাবাহিনী নিয়ে বাংলার উপর দ্বিতীয় অভিযানের নেতা হিসাবে দেবকোটে প্রবেশ করেন। সদ্য-নিযুক্ত লখনৌতির সামন্ত শাসক আইয়াজ খালজী আলি মর্দানকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে তাঁকে স্বাগত জানান এবং নিজে ভবিষ্যৎ সুযোগের অপেক্ষায় রাজনীতি থেকে সরে

দাঁড়ান। দুই বছর (১২১০-১২) ধরে আলি মর্দান স্বৈরতন্ত্রী শাসন চালিয়ে যান। তিনি খালজী আমীর ও হিন্দু প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করেন। এই ব্যাপারে তাঁর প্রধান সহায় ছিল দিল্লী থেকে সদ্য-আনীত তুর্কী বাহিনী। লখনৌতি রাজ্যের রাজনীতিতে এই প্রথম বিদেশী তুর্কীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা হয়, খালজীদের প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী হিসাবে।

১২১০ খ্রীস্টাব্দে সুলতান কুতুব-উদ্দিনের মৃত্যু হলে উত্তর-ভারতের মতো বাংলায় তার প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়। মিনহাজ-এর কথায় হিন্দুস্থানের তুর্কী সাম্রাজ্য চারটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং বাংলার খালজীরা স্বাধীন হয়ে যায়। বখতিয়ার খালজী ও শিরাণ খালজী রাজকীয় অভিধা গ্রহণ না করেও বাস্তবে স্বাধীন ছিলেন। লখনৌতির মুসলিম শাসকদের মধ্যে আলি মর্দান খালজীই সর্বপ্রথম সুলতান অভিধা গ্রহণ করেন। মিনহাজ বলেন যে, নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলার জন্য মর্দান খালজী নির্বিচারে খালজী আমীরদের ধ্বংস করতে প্রয়াসী হন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হিন্দু প্রধানরা খাজনা ও উপঢৌকন পাঠিয়ে আলি মর্দানকে সন্তুষ্ট রাখতে সচেষ্ট হন। কিন্তু মর্দান খালজীর অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেলে, লখনৌতির খালজী আমীররা ও নবাগত তুর্কী আমীররা সংঘবদ্ধ হয়ে আলি মর্দানকে হত্যা করে।

আলি মর্দান খালজীর আমল পর্যন্ত বাংলার এক সামান্য অঞ্চলেই মুসলিম রাজ্য সীমিত ছিল। মুসলিম রাজনীতি ও প্রশাসন তখন পর্যন্ত শক্ত-পোক্ত হয়ে গড়ে উঠতে পারে নি এবং চারপাশের হিন্দুশক্তিও অক্ষুন্ন ছিল। বাংলায় মুসলিম শক্তির সম্প্রসারণের প্রধান অন্তরায় ছিল খালজীদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই ও তাদের শাসন-সংক্রান্ত অনভিজ্ঞতা। তারা ছিল প্রধানত অসি-জীবী ও নিরক্ষর। মুসলিম বিজয়ের প্রশাসনিক প্রেরণা ছিল লুণ্ঠন, পরোক্ষ প্রেরণা ছিল ধর্মপ্রচার। কিন্তু মুসলিম কৃষ্টি বা সংস্কৃতি প্রচারের ব্যাপারে তাদের তেমন উৎসাহ ছিল না বলেই মনে হয়। এই কারণেই বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রাথমিক যুগে মুসলিম সংস্কৃতি ও ভাষা বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত হয় নি। কুতুব-উদ্দিন আইবেকের রাজত্বকাল এবং ইলতুৎমিসের রাজত্ব-কালের অধিকাংশ সময় উত্তর ভারত ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের নানা সমস্যায় বিব্রত থাকায় বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের দিকে নজর দেওয়া দিল্লীর পক্ষে সম্ভব হয় নি এবং বাংলার ব্যাপারে দিল্লীর সুলতানরা এক রকম নির্লিপ্তই থাকেন।

আলি মর্দানের নিধনের পর (১২১৩) বাংলার আমীর-ওমরাহরা হুসান-উদ্দিন আইয়াজ খালজীকে নেতা নির্বাচন করেন। তিনি 'সুলতান' অভিধা গ্রহণ করেন এবং 'সুলতান-উল-মুয়াজ্জম', 'সুলতান-উল-নাজম' প্রভৃতি বিভিন্ন

নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচার করেন। আইয়াজ খালজী সর্বপ্রথম সার্বভৌমত্বের দাবি করেন। কেউ কেউ মনে করেন যে, নিজের ক্ষমতা আইনানুগ ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার জন্য ও দিল্লীর আক্রমণ থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য আইয়াজ খালজী প্রচুর উপঢৌকনের বিনিময়ে বাগদাদের খলিফা তথা মুসলিম জগতের ধর্মগুরুর সনদ লাভ করেন। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে মুসলিম জগতের ধর্মগুরুর অনুমোদন লাভ করে শাসনক্ষমতা সর্বজনগ্রাহ্য করার এটাই হলো প্রথম দৃষ্টান্ত। একই উদ্দেশ্যে ইলতুৎমিস ও মহম্মদ-বিন-তুঘলক খলিফার অনুমোদন লাভে প্রয়াসী হয়েছিলেন। যাই হোক, আইয়াজ খালজী বাগদাদের খলিফার সনদ পেয়েই হোক অথবা না পেয়েই হোক, নিজ মুদ্রায় খলিফা অল-নাসির-এর নাম খোদাই করেন। ভারতে মুসলিম শাসনকালে খলিফার নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলনের এটাই হলো প্রথম দৃষ্টান্ত।

সুলতান আইয়াজ খালজীর শাসনকালেই (১২১৩-২৭) বাংলায় প্রকৃত স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। অবশ্য তিনি আলি মর্দানের উত্তরাধিকার সূত্রেই স্বাধীনতা লাভ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম রাজ্যের ভিৎ সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে সুষ্ঠু শাসনপ্রণালী গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। প্রথমেই তিনি রাজধানী দেবকোট থেকে মুসলিম-বিজিত রাজ্যের কেন্দ্রস্থল গৌড় লখনৌতিতে স্থানান্তর করেন। গৌড় ছিল বাংলা ও বিহারে বিজিত এলাকার কেন্দ্রস্থল এবং জলপথে সব এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পক্ষেও অধিক উপযোগী। রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য তিনি নৌ-বহরের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং এক নৌ-বাহিনীও গড়ে তোলেন। সেনা চলাচল ও পাল্কি চলাচলের জন্য তিনি রাজধানী লখনৌতির ৭৫ মাইল উত্তর-পূর্বস্থিত দেবকোট এবং ৮৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ লাখনোরকে (বীরভূম) একটি প্রশস্ত রাজপথ দ্বারা সংযুক্ত করেন। সামরিক ও রাজনৈতিক কারণে আইয়াজ বেসামরিক জনগণের কাছ থেকে সেনাবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন রাখেন এবং রাজধানী নগরীর বাইরে বসনকোট নামক স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করেন। নূতন রাজধানীতে সুলতানের আসার সঙ্গে সঙ্গে আমীর-ওমরাহ ও গণ্যমান্য ব্যক্তি-রাও আসেন। তাঁরা বহু সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করে রাজধানীকে সুসজ্জিত করেন। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মুসলিম শাসন অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আইয়াজ সুষ্ঠু মুসলিম সমাজ গঠনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। সেই সময় মোগলদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে মধ্য-এশিয়ার বহু জ্ঞানী-গুণী ও সুফী-সন্তরা বাংলায় আসেন। আইয়াজ তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং উপযুক্ত ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন। এই নবাগত মুসলিমদের আগমন বাংলার

মুসলিম সমাজকে যথেষ্ট প্রাণবন্ত করে তোলে এবং মুসলিম রাষ্ট্রের ভিৎ মজবুত হয়।

সুদৃঢ় ভিত্তির উপর লখনৌতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় আইয়াজ খালজী যখন ব্যস্ত, সেই সময় উড়িষ্যার গঙ্গ-বংশীয় রাজার পরাক্রান্ত মন্ত্রী বিষ্ণু রাঢ় অঞ্চল আক্রমণ ও দক্ষিণ রাঢ়ের কিছু এলাকা দখল করে নেন। সেই ভাগ্য বিপর্যয়ে বাংলার মুসলমানরা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। বিধর্মীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ও ইসলামের মর্যাদা রক্ষায় মুসলিম সেনাবাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার ব্যাপারে আইয়াজ খালজীকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। কারণ উড়িষ্যার হিন্দু শক্তি মুসলিম সেনাদের মনে প্রচন্ড সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। এই অবস্থায় জালাল-উদ্দিন নামে এক 'ইমামজাদা' মুসলিম সেনাদের উদ্দেশ্যে একটি 'তজকীর' বা ভাষণ দেন। এই ভাষণ তাদের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার করে। নবোৎসাহিত সেনাবাহিনী নিয়ে আইয়াজ লখনোর অভিমুখে যাত্রা করেন। বেশ কিছুদিন যুদ্ধ চলার পর উড়িষ্যা বাহিনী স্বরাজ্যে ফিরে যায়। আইয়াজ পুনর্বিজিত অঞ্চলে বহু আমীরকে জায়গীর দিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন এবং সেনাশিবির স্থাপন করেন। মুসলিম শাসনের প্রথম যুগে বাংলার উপরে এটাই হলো প্রথম বিদেশী হিন্দু রাজ্যের আক্রমণ। এই সাফল্যের ফলে মুসলিম রাজ্যের সীমা অজয় নদ থেকে আরও দক্ষিণে দামোদর ও বিষ্ণুপুর সীমানা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়।

আইয়াজ খালজীর সময় পূর্ববঙ্গে সেনবংশীয় রাজারা রাজত্ব করেছিলেন। তাঁরা সদা-সর্বদাই মুসলিম আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতেন। সমসাময়িক সংস্কৃত গ্রন্থ হরিমিশ্রের 'কারিকা' থেকে জানা যায় যে লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন 'যবন ভয়ে ভীত হয়ে' গৌড় পরিত্যাগ করেন এবং ব্রাহ্মণরাও সেখানে বসবাস করতে সাহস পেতেন না। কেশবসেনের পর বিশ্বরূপসেন ছিলেন শক্তিশালী। তিনি নিজেকে 'গৌড়েশ্বর' বলে অভিহিত করতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম, চন্দ্রদ্বীপ এবং দক্ষিণ রাঢ় বা নদীয়া অঞ্চলে ছিলেন অপ্রতিহত, তবে তিনি কখনও লখনৌতি রাজ্যের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন কিনা জানা যায় নি।

বাগদাদের খলিফার স্বীকৃতি লাভ করলেও, আইয়াজ খালজী ইলতুৎমিসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পান নি। ১২২৪ খ্রীস্টাব্দে ইলতুৎমিস হিন্দু সামন্তদের হাত থেকে বাদাউন, কনৌজ ও অযোধ্যা পুনরুদ্ধার করেন এবং আইয়াজের হাত থেকে বিহার পুনরুদ্ধার করার জন্য এক সেনাবাহিনীকে পাঠান এবং নিজেই বাংলার দিকে অগ্রসর হন। দিল্লী সুলতানকে বাধা দেওয়ার জন্য আইয়াজ খালজী সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। দিল্লী-বাংলার এই সংঘর্ষ সম্বন্ধে সমসাময়িক

ইতিহাস নীরব। মিনহাজের মতে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয় এবং আইয়াজ ইলতুৎমিসের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং দিল্লীর সুলতানের নামে কোলমা পাঠ করতে ও সুলতানের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচার করতে রাজি হন। সুতরাং সাময়িকভাবে লখনৌতি রাজ্যের স্বাধীন সত্তার বিলুপ্তি হয় বলা যায়। দিল্লীর সামন্ত হিসেবে আইয়াজ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন এবং বিহারের এক নতুন শাসনকর্তা নিযুক্ত করে ইলতুৎমিস ফিরে যান। কিন্তু ইলতুৎমিসের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইয়াজ সন্ধি ভঙ্গ করে বিহার থেকে দিল্লীর নব-নিযুক্ত শাসনকর্তাকে বিতাড়িত করেন ও বিহার পুনরুদ্ধার করেন। বাংলার মুসলিম রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দিল্লীর সঙ্গে সন্ধি ভঙ্গ করার পেছনে আইয়াজ খালজীর প্রতি বাংলার আমীর-ওমরাহ তথা প্রজাবর্গের সমর্থনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, অর্থাৎ শাসক হিসাবে আইয়াজের জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাংলার সংঘবদ্ধ মুসলিম সমাজের বিরোধিতার বিরুদ্ধে ও সম্মুখ লড়াইয়ে আইয়াজকে পরাস্ত করা যে সুকঠিন তা ইলতুৎমিস অনুধাবন করেন এবং এই কারণে তাঁকে সুযোগের অপেক্ষায় এক-দুই বছর এই অপমান সহ্য করে যেতে হয়। সেই সুযোগও আসে। অযোধ্যায় এক প্রবল হিন্দু বিদ্রোহ দিল্লীর সুলতানকে বিব্রত রাখে। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ইলতুৎমিস জ্যেষ্ঠপুত্র নাসির-উদ্দিনকে অযোধ্যায় পাঠান এবং তাঁকে বাংলার উপর নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। অযোধ্যায় দিল্লীর বাহিনীকে ব্যাপৃত দেখে আইয়াজ খালজী পূর্ববঙ্গে সেন রাজাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। রাজধানী এক রকম অরক্ষিত অবস্থায় থাকে। আইয়াজের অনুপস্থিতির সুযোগে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে যুবরাজ নাসির-উদ্দিন লখনৌতি আক্রমণ করে তা দখল করে নেন। এই দুঃসংবাদে আইয়াজ অল্প সংখ্যক সেনা নিয়ে লখনৌতির দিকে ছুটে আসেন। আইয়াজ পরাস্ত হন এবং তাঁকে হত্যা করা হয়।

বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আইয়াজ খালজীর রাজত্ব-কালের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। সে সময় দুর্ধর্ষ তুর্কী ও খালজী আমীর-ওমরাহরা স্বেচ্ছায় বা বিনাযুদ্ধে অন্যের প্রভুত্ব স্বীকার করত না। আইয়াজ খালজী সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা, কূটবুদ্ধি ও অমায়িক আচরণের দ্বারা তাঁর অনুচর ও সহকর্মীদের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘ ১৪ বছরের শাসনকালে কোনো অন্তর্বিপ্লব বা বিদ্রোহ লখনৌতির শান্তি বিঘ্নিত করে নি। তিনি যে শুধু বখতিয়ার খালজী বা আলি মর্দানের স্বাধীনতার ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছিলেন তাই নয়, তাঁর আমলে মুসলিম রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল এবং মুসলিম শক্তি গতিশীল হয়। তাঁর

আমলে লখনৌতি ইসলামী সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে যা দিল্লীর সংস্কৃতির তুলনায় কোনো অংশেই কম গৌরবের ছিল না। তাঁর বদান্যতায় আকৃষ্ট হয়ে বহু মুসলিম জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি ও সাধু-সন্ত লখনৌতি রাজ্যে আসেন এবং তাঁরা বাংলার মুসলিম রাজশক্তিকে শক্তিশালী ও ইসলামী সংস্কৃতিকে পুষ্ট করতে সাহায্য করেন। এমনকি দিল্লীর দরবারী ঐতিহাসিক মিনহাজ ও আইয়াজের প্রতিদ্বন্দ্বী সুলতান ইলতুৎমিস পর্যন্ত বাংলায় ইসলামী রাজশক্তি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আইয়াজের অবদানের কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন।

১২২৭ ও ১২৮৭ খ্রীস্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালের অধিকাংশ সময় লখনৌতি রাজ্য দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই সময়ের মধ্যে দিল্লীর অধীনে প্রায় পঞ্চাশ জন শাসনকর্তা লখনৌতিতে শাসন করেন। এদের মধ্যে দশ জনই ছিলেন দিল্লীর সুলতানদের ক্রীতদাস বা 'মামলুক'। এই মামলুকরা ছিল মধ্য-এশিয়ায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীভুক্ত। এঁদের অনেকে দিল্লীর সুলতানদের সামান্য ভৃত্য হিসাবে জীবন শুরু করে পরে নিজগুণে আমীর, মালিক, খান প্রভৃতি মর্যাদাপূর্ণ পদ লাভ করেন, আবার কেউ কেউ প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদেও নিযুক্ত হন। প্রভুদের অনুরূপ এইসব মামলুক সামন্তরাও বহু সংখ্যক ক্রীতদাস পোষণ করতেন এবং এরাই ছিল প্রভুদের শক্তির আধার।

তুর্কী মামলুকদের শাসনাধীনে লখনৌতির রাজদরবার ঐশ্বর্যে ও আড়ম্বরে দিল্লীর দ্বিতীয় সংস্করণে পরিণত হয়। বাংলায় তাঁদের প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা সুলতানী শাসনপ্রণালীর অনুরূপ। ইলতুৎমিসের উত্তরসূরীদের আমলে বাংলায় বি-কেন্দ্রিক সামন্ততন্ত্রেরই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

লখনৌতিতে মামলুক যুগের ইতিহাস হলো ক্ষমতা লাভের জন্য আমীর-ওমরাহদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও হত্যাকাণ্ডের কাহিনী মাত্র। ইলতুৎমিসের দুর্বল উত্তরসূরীরা লখনৌতি রাজ্যের এই অরাজকতার অবস্থার অবসান ঘটিয়ে দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। লখনৌতির শাসনক্ষমতা যিনিই জোর করে দখল করতেন, তিনি দিল্লীর সুলতানদের উপঢৌকন পাঠিয়ে তা অনুমোদন করিয়ে নিতেন। দিল্লী সন্তুষ্ট হয়ে যেত। দিল্লীর দুর্বলতা ও বাংলা সম্বন্ধে নির্লিপ্তভাবের সুযোগে লখনৌতির সিংহাসন বা শাসনক্ষমতা লাভ করার জন্য বিহার, কারা-মানিকপুর, অযোধ্যা, কনৌজ প্রভৃতি প্রদেশের শাসনকর্তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। এর মূল কারণ হলো এই যে, স্বাধীনতা বিলুপ্ত হলেও, বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-সত্তার মর্যাদা অম্লান থাকে এবং বাংলার শাসনকর্তাই একমাত্র 'মালিক-উল-শার্ক' (Lord of

the East)-নামে গৌরবময় অভিধা গ্রহণের একমাত্র অধিকারী হতেন। যেমন, প্রাচীন যুগে 'গৌড়েশ্বর' অভিধার মাহাত্ম্য ভারতীয় রাজাদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও লোভনীয় ছিল। ইলতুৎমিস তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নাসির-উদ্দিনকে মালিক-উল-শার্ক অভিধায় ভূষিত করেছিলেন। তুর্কী-মামলুক যুগে বাংলায় একটি সাধারণ রাজনৈতিক রীতি বা ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটে। লখনৌতির শাসনরত শাসককে কেউ পরাস্ত বা শাসনচ্যুত করতে পারলেই, তিনি অবি-সংবাদিভাবে 'সারা বাংলার শাসনকর্তা'-র মর্যাদা লাভ করতেন এবং আমলা, সেনা ও প্রজাদের স্বীকৃতি পেতেন। এই যুগে বাংলার সাধারণ মানুষ (হিন্দু বা মুসলমান) কেউই শাসকের জয়-পরাজয় সম্বন্ধে খুব উৎসাহী থাকত না। 'তখত'-এ যিনিই উপবিষ্ট হোন না কেন, বাংলার প্রজাবর্গ তাঁর প্রতি আনুগত্য দেখাত ও সাংবিধানিক রীতি মেনে চলত। শাসকের ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিও তারা থাকত উদাসীন। বাংলার আমলা ও প্রজাদের মতো, লখনৌতির মামলুক শাসকরাও দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি এই একই মনোভাব গ্রহণ করতেন। অর্থাৎ ইলতুৎমিসের উত্তরাধিকারীদের যে কেউ সিংহাসনে উপবিষ্ট হলে, বাংলার মামলুক শাসকরাও তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতেন, তাঁকে উপঢৌকন পাঠাতেন এবং তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচার করতেন। দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি এর অতিরিক্ত দায়দায়িত্ব বাংলার এই যুগের শাসকরা স্বীকার করতেন না। এই যুগে দিল্লীর সরাসরি শাসনাধীন কোনো অঞ্চলেই বাংলার মতো রাজনৈতিক তথা সাংবিধানিক রীতি-নীতির বিবর্তন দেখা যায় না। বাংলার ইতিহাসের এটাই হলো সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সুযোগ পেলেই বাংলার মামলুক শাসকরা বিদ্রোহী হয়ে দিল্লীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে দ্বিধা করতেন না। এই কারণে দিল্লীর সুলতান ও অভিজাতরা লখনৌতির নামকরণ করেছিলেন 'বুলঘকপুর'।

মামলুক যুগের বাংলার ইতিহাসের আর-এক বৈশিষ্ট্য হলো মুসলিম শাসক ও হিন্দু শাসিতের মধ্যে সহযোগিতার সূত্রপাত। মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্বে উত্তর-ভারত থেকে উৎখাত হয়ে অগণিত হিন্দু পূর্ব-ভারত তথা বাংলায় আসে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। সেই সময় স্বাভাবিকভাবেই নবাগত হিন্দুদের সঙ্গে বাংলার মুসলিমদের সংঘর্ষ বেধে যেত। কিন্তু এই যুগে বাইরে থেকে বাংলায় হিন্দুদের অনুপ্রবেশের ঢেউ স্তিমিত হয়ে পড়লে সেই সংঘর্ষের আর কোনো অবকাশ ছিল না। এই যুগেই বাংলার মুসলিম রাজধানীতে অনেক হিন্দুকে সম্মানিত বসবাসকারীরূপে দেখা যায়। এমনকি বাংলার উপর উড়িষ্যার আক্রমণের সময়েও বরেন্দ্রভূমির হিন্দুরা মুসলিম শাসকগোষ্ঠীকে কখনও বিব্রত করত বলে দেখা যায় না। ইতিপূর্বে লখনৌতির খালজীবংশীয়

ওমরাহদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে উচ্চবর্ণের অনেক হিন্দু মুসলিম-প্রভাবিত অঞ্চল পরিত্যাগ করে মিথিলা, নেপাল, কামরূপ প্রভৃতি নিরাপদ হিন্দু-অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু মামলুকদের আমলে বাংলায় শান্তি ফিরে আসলে হিন্দুদের মানসিক শংকা অনেকটা দূর হয়। উড়িষ্যারাজ বারংবার রাঢ় অঞ্চলে আক্রমণ চালালে বরেন্দ্রভূমির হিন্দুরা সধর্মী আক্রমণকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মুসলিম শাসকদের বিব্রত করে নি, কিন্তু এর দ্বারা বাংলার হিন্দুর জড়তা প্রমাণিত হয় কি-না তা বলা কঠিন। যাই হোক, এই যুগে মুসলমান শাসকদের হিন্দু-বিদ্বেষ কিছুটা প্রশমিত দেখা যায় এবং হিন্দুদের জমিদারি ও মর্যাদাপূর্ণ অভিধায় ভূষিত করার প্রমাণও পাওয়া যায়। অন্যদিকে হিন্দু পণ্ডিতরাও সুলতানদের বন্দনা করেছেন।

মামলুক যুগে কামরূপ ও উড়িষ্যার হিন্দুশক্তির তুলনায় লখনৌতির মুসলিম শক্তি বেশ দুর্বল অবস্থায় দেখা যায়। মোঙ্গল জাতিগোষ্ঠীভুক্ত নানা উপজাতি কামরূপের প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের উচ্ছেদ করে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এরা নব-হিন্দুধর্মের প্রভাবে ক্ষাত্রিয়ের ভূমিকা গ্রহণ করে এবং করোতোয়া ও সুবর্ণশ্রী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে মুসলিম সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রাচীরের সৃষ্টি করে। আরও পূর্বে উচ্চ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় 'তাই' গোষ্ঠীভুক্ত অহোমরা এক পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের এই রাজ্যটি এই অঞ্চলে মুসলিম সম্প্রসারণের দ্বিতীয় প্রতিরোধ রচনা করে। সেই সময় পূর্ব বাংলায় সেনবংশ ছিল পতনোন্মুখ। সেন রাজারা রাষ্ট্রশক্তি পুনরুজ্জীবিত করার পরিবর্তে নূতন ব্রাহ্মণ অভিবাসীদের প্রভাবে সমাজে কৌলীন্য ও আচার-বিচারের সংস্কার নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। এই যুগে সেন রাজবংশের দুর্বলতার সুযোগে দনুজমাধব দেব নামে এক নায়কের নেতৃত্বে চন্দ্রদ্বীপে (বর্তমান বরিশাল) এক পরাক্রান্ত কায়স্থ রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। মুসলমান আক্রমণের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের এই দুই হিন্দু রাজবংশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্ত ছিল না। কিন্তু বাংলার মামলুক শাসকরা সেই অপূর্ব সুযোগ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন। বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমে লখনৌতির মুসলিম শক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল উড়িষ্যার গঙ্গবংশ। সুতরাং চারিদিকে হিন্দুশক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় মুসলিম রাজ্যের সম্প্রসারণের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। অবশ্য কয়েকজন মামলুক শাসক উত্তর-পূর্বে সম্প্রসারণের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হন। তুর্কী-মামলুক যুগে বাংলার রাজনৈতিক গতিধারা স্থিতিশীল হওয়ার সুযোগ পায় নি, রাজনৈতিক ডামাডোলের অবসান হয় নি এবং লখনৌতির উপর দিল্লীর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বও দীর্ঘকাল বজায় থাকে নি।

ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর প্রায় ৩০ বছর দিল্লীতে এক অরাজক অবস্থা চলে। এই দীর্ঘ ৩০ বছর দিল্লীর মনোনীত ও অনেকক্ষেত্রে অনুমোদিত লখনৌতির শাসকরা ইচ্ছামতো শাসন করতেন এবং সুযোগমতো বিদ্রোহী হতেন। এ-যুগের বাংলার রাজনীতি প্রসঙ্গে বারণী মন্তব্য করেছেন যে, বাংলার আবহাওয়াই ছিল বিদ্রোহী হওয়ার অনুকূল। এখানকার মুসলিম শাসকরা অমাত্য ও অনুচরদের চাপে অনেক সময় বিদ্রোহী হতে বাধ্য হতেন। গিয়াস-উদ্দিন বলবন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিশ্ট হয়ে বাংলার শাসনকর্তাদের উপর কড়া নজর রাখার জন্য সর্বপ্রথম সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং এই পদে সুলতানের অত্যন্ত প্রিয় ও বিশ্বস্ত অনুচর মুখিস-উদ্দিন তুঘরাল-কে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু বলবনের এই রীতিও কার্যকর হয় নি। মুখিস-উদ্দিন তুঘরাল ছিলেন অত্যন্ত লোভী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও অদম্য সাহসের অধিকারী। তিনি লখনৌতির শাসনকর্তাকে নিষ্ক্রিয় রেখে নিজেই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন এবং নিজের এক প্রভাবিত অঞ্চল গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। বারণীর 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তুঘরাল 'অনেক অসমসাহসিক কঠিন কর্ম" করেছিলেন। 'তারিখ-ই-মুবারকশাহী' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তুঘরাল সোনারগাঁওয়ের নিকটে একটি বিরাট দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন যা 'কিলা-ই-তুঘরাল' নামে পরিচিত ছিল। তুঘরালের উদ্দেশ্য ছিল—একদিকে এই দুর্গে নিজ পরিবার ও রাজকোষ নিরাপদে রাখা এবং অন্যদিকে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের উপর চাপ সৃষ্টি করা। ইতিপূর্বে বিক্রমপুরে সেনবংশের পতন হয় এবং চন্দ্রদ্বীপে দশরথ দনুজমাধব বা দনুজমাধব দেব এক শক্তিশালী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ফার্সী গ্রন্থে এঁকে 'দনুজরাই' বলা হয়েছে। মনে হয় সেনরাজ্যের অধিকাংশ এলাকা দনুজরাই-এর দখলে চলে যায়। দনুজরাইকে পরাস্ত করা খুব সহজ নয় ভেবে, তুঘরাল উড়িষ্যা আক্রমণে বৃত্ত হন। উড়িষ্যা থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ ও বেশ কিছু সংখ্যক হাতি নিয়ে তুঘরাল ফিরে আসেন ও দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করতে শুরু করেন। উড়িষ্যায় তাঁর অভাবনীয় সাফল্য তাঁকে স্বাধীন হওয়ার সংকল্পে বিভোর করে তোলে। তিনি প্রথমেই প্রথাগত রীতি ভঙ্গ করে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ দিল্লীতে না পাঠিয়ে নিজেই তা আত্মসাৎ করেন। লখনৌতির শাসনকর্তা এর প্রতিবাদ করলে, তুঘরাল তাঁকে বিতাড়িত করেন। এদিকে লাহোরে বলবনের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হলে তুঘরালের অনুচরেরা তাঁকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করে। তুঘরাল এই যুক্তি দেখান যে, ব্যক্তিগতভাবে বলবনেরপ্রতি তাঁরআনুগত্য, দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি নয়। এই যুক্তি দেখিয়ে তুঘরাল স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচার করেন। লখনৌতি আবার দিল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

স্বাধীন হয়ে যায়। বারণীর মতে মুখিস-উদ্দিন তুঘরাল প্রচুর ধনরত্ন সেনা ও লখনৌতির অধিবাসীদের মধ্যে বিতরণ করে তাদের সমর্থন লাভ করেন। বারণী আরও বলেন যে, তুঘরাল লখনৌতির দরবেশদের মধ্যে এক সময় পাঁচ মণ সোনা বিতরণ করে তাঁদের তাঁর দলে ভিড়িয়ে নেন এবং দিল্লীতেও তিনি প্রচুর অর্থ পাঠিয়ে অনেক আমীর-ওমরাহকে হাত করেছিলেন। তাঁর অকাতরে দান করার ফলেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, পরবর্তী ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে লখনৌতির সব শ্রেণীর মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। এই জনপ্রিয়তার মূলে ছিল তুঘরালের রাজোচিত গুণাবলী। বলবনের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় লখনৌতির মানুষ তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে এবং কেউ ইচ্ছে করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে নি। যে দুইবার তুঘরাল দিল্লীর বাহিনীকে পরাস্ত করতে পেরেছিলেন, তার মূলে ছিল সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন। তুঘরালের মতো এমন এক প্রিয় ও একনিষ্ঠ সেবকের বিদ্রোহ বলবনের কাছে মর্মান্তিক হয়। ব্যক্তিগত ক্ষোভ ছাড়াও, দিল্লী সুলতানীর অখণ্ডতার প্রশ্নও বলবনকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে। বারণী বলেন যে, তুঘরালের বিদ্রোহের সংবাদ 'বলবনের আহার ও নিদ্রা কেড়ে নিয়েছিল'। পরপর দুইবার অযোধ্যার শাসনকর্তাকে তুঘরালের বিদ্রোহ দমন করার জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু দুইবারই তা ব্যর্থ হলে বলবনের পক্ষে সসৈন্যে বাংলার বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া ছাড়া অন্য পথ ছিল না। বলবনকে শুধু যে একজন বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান চালাতে হয়েছিল তাই নয়, তাঁকে তা চালাতে হয়েছিল এক বিদ্রোহী প্রদেশের বিরুদ্ধে। আনুমানিক ১২৭৯ খ্রীস্টাব্দে বলবন এক বিশাল সেনা ও অশ্ব-বাহিনী নিয়ে লখনৌতি অভিযানে অগ্রসর হন। তুঘরাল তাঁর সেনা, পরিবারবর্গ ও রাজধানীর গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে পলাতক হন ও আত্মগোপন করেন। বলবন শূন্য রাজধানী দখল করেন ও কতকগুলি প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি তুঘরালের খোঁজে সারা বাংলার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে পরিক্রমা শুরু করেন। কিন্তু তুঘরালের কোনো হদিশ পাওয়া গেল না। তুঘরাল যাতে নদীপথে বাংলার বাইরে পালিয়ে যেতে না পারেন, সেজন্য বলবন চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি দনুজমাধবের সঙ্গে এক চুক্তি করেন। এ থেকে মনে হয় দনুজমাধব ছিলেন এক স্বাধীন নরপতি এবং দিল্লীর সুলতান তা মেনে নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত বহু চেষ্টার পর তুঘরালকে দমন করা হয় এবং তাঁর পরিবারবর্গ সমেত প্রায় দশহাজার অনুচরকে লখনৌতিতে এনে হত্যা করা হয়। লখনৌতিতে অবস্থানকারী দিল্লীর যে সব কর্মচারী তুঘরালের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তাদের উপযুক্ত শাস্তির জন্য

দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়। এইভাবে লখনৌতি পুনরধিকৃত হয় এবং বলবন কনিষ্ঠপুত্র বখরা খাঁকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, কারণ নিজের কোনো অনুচরের প্রতি বৃদ্ধ সুলতানের আর আস্থা ছিল না। নিজ পুত্রের কর্মদক্ষতা সম্বন্ধেও বলবনের খুব বেশি আস্থা ছিল না। এই কারণে বখরা খাঁকে শাসনকার্যে সাহায্য করার জন্য দুই জন পরামর্শক নিযুক্ত করা হয়। সেই সঙ্গে বলবন বখরা খাঁকে 'ইকলিম-ই-বাঙ্গালা' (সোনারগাঁও অঞ্চল) দখল করার পরামর্শও দিয়ে যান। বলবনের উদ্দেশ্য ছিল, বাংলার আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়ে সারা বাংলার উপর দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

বলবনী বংশের অধীনে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই বংশ ১২৮৭ থেকে ১৩২৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় রাজত্ব করেন। বলবনের মৃত্যুর পর (১২৮৭) বখরা খাঁ দিল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলায় স্বাধীন সুলতানী যুগের সূচনা হয়। এই যুগে দিল্লীর খালজী ও তুঘলক সুলতানরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোগল সেনা ও আঞ্চলিক বিদ্রোহ নিয়ে এতই বিব্রত ছিলেন যে, বাংলার দিকে চোখ দেওয়ার মতো অবকাশ বা ইচ্ছা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ১৩২৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দিল্লীর সংস্পর্শ ও সংঘাত থেকে মুক্ত ছিল।

১৩২৮ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে লখনৌতির ইতিহাস ক্রমেই বাংলার ইতিহাসে রূপান্তরিত হতে থাকে। এই যুগে বাংলা চারটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল—লখনৌতি, সাতগাঁও, সোনারগাঁও, চট্টগ্রাম। ভারতবিদ্ স্টেপলটন (Stapleton) মন্তব্য করেছেন, এই যুগ ছিল বাংলায় ও বাংলার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দ্রুত ও স্থায়ী মুসলিম অধিকারের সম্প্রসারণের যুগ। এই সম্প্রসারণের মূলে কয়েকটি কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন। তুর্কীরা ছিল অত্যন্ত স্বাতন্ত্র্যবিলাসী ও আভিজাত্যাভিমানী। অন্য কোনো মুসলিম গোষ্ঠীর প্রাধান্য বা আধিপত্য সহ্য করা তাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। প্রায় একশো বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে তারা সর্বোচ্চ ক্ষমতা, প্রাধান্য ও সম্মান ভোগ করে এসেছিল। কিন্তু দিল্লীতে খালজীদের অভ্যুত্থান তুর্কীদের মনঃপূত হয় নি। তুর্কীরা খালজীদের ঘৃণার চোখে দেখত। এই কারণে বলবনী তুর্কীরা খালজীদের সংস্পর্শ ত্যাগ করে বাংলায় অবস্থান করাই শ্রেয়তর মনে করে এবং এই উদ্দেশ্যে বহু তুর্কী বাংলায় চলে আসে এবং লখনৌতির মুসলমান শক্তির নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করে। দ্বিতীয়ত, বাংলার খালজীরা বহুদিন পর্যন্ত খালজী ও তুঘলক আগ্রাসন থেকে মুক্ত ছিলেন। ১৩২৪ খ্রীস্টাব্দে গিয়াস-উদ্দিন তুঘলক লখনৌতির রাজপরিবারে অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে বাংলা আক্রমণ করেছিলেন

বটে কিন্তু বাংলার রাজনীতির উপর তার প্রভাব বিশেষ পড়ে নি। তৃতীয়ত, দিল্লীর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য বাংলার বলবনীরা বাংলার পশ্চিমে রাজ্য সম্প্রসারণের চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু লখনৌতির জন্য দিকে দিকে হিন্দু শক্তিকে পরাভূত করার উদ্দেশ্যে তারা সর্বশক্তি নিয়োজিত করে। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় বাংলার উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণের হিন্দু রাজ্যগুলি মুসলমান রাজ্যের নিরাপত্তার পক্ষে ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। চতুর্থত, বলবনী তুর্কীদের বাংলায় আসার সঙ্গে সঙ্গে বহু মুসলিম সাধু-সন্ত, পীর, আউলিয়া দলে দলে বাংলায় আসেন — যাঁরা বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সাধু-সন্তরা নগরের পরিবর্তে গ্রাম বাংলার প্রত্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং বিধ্বস্ত হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ মঠগুলির সংলগ্ন স্থানে দরগাহ, থানকা ও বিস্মৃত পীরদের সমাধি তৈরি করে ধর্ম-প্রচারে বৃত্ত হন। মুসলিম গাজী ও সুফী-সন্তদের পবিত্র জীবন-ধারণ প্রণালী ও সহজ সরল ভাষায় ধর্মের প্রচার গ্রামাঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীর নিপীড়িত ও দরিদ্র হিন্দুদের আকৃষ্ট করে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে দলে দলে ইসলামী সাধু-সন্তদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এই নবদীক্ষিত মুসলমানরা বাংলায় ইসলামের তথা মুসলিম শক্তি বৃদ্ধির সাহায্য করে। কালের গতিতে মুসলিম বিজয়ের প্রারম্ভ যুগের বিদ্বেষ ও বিরোধের তীব্রতা ক্রমেই হ্রাস পায় এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সংহতি ও সম্প্রীতির যুগ শুরু হয়। এর ফলে হিন্দুরা নিজেদের রাজনৈতিক ভাগ্য সম্বন্ধে ক্রমেই উদাসীন হয়ে পড়ে। হিন্দুদের প্রতিরোধের গতি ম্লান হয়ে পড়ায় বাংলায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসে এবং ইসলামী শক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে। গাজী, আউলিয়া ও ফকির-রা বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এই প্রসঙ্গে ইসমাইল গাজীর সামরিক তৎপরতা, গাজীদের সাহায্যে শ্রীহট্টের হিন্দু রাজা গৌর গোবিন্দের উপর মুসলিম আক্রমণ, সুলতান ফিরোজ তুঘলকের অনুকূলে কালান্দার ফকির গোষ্ঠী কর্তৃক ইলিয়াস শাহকে ভ্রান্তপথে প্ররোচিত করা প্রভৃতি ঘটনাগুলির উল্লেখ করা যায়।

বাংলার রাজপরিবারে মাঝে মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটেছিল যা বাংলার রাজনীতির উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। বাংলার শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ বলবনীর রাজপরিবারে পিতা-পুত্রের মধ্যে সংঘর্ষ এবং ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব দিল্লীর সুলতান গিয়াস-উদ্দিন তুঘলককে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দেয়। দ্বন্দ্বরত এক ভ্রাতার আমন্ত্রণে গিয়াস-উদ্দিন তুঘলক বাংলা আক্রমণ করেন এবং লখনৌতি, সোনারগাঁও ও সাতগাঁও-এ নিজের মনোনীত শাসনকর্তা

নিযুক্ত করেন এবং ফিরোজ শাহ বলবনীর বিদ্রোহী পুত্র বাহাদুর শাহকে বন্দী করে দিল্লী ফিরে যান। বাংলাকে সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু করে রাখার উদ্দেশ্যে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক গিয়াস-উদ্দিন তুঘলক-কৃত ব্যবস্থা বহাল রাখেন। এই ব্যবস্থা বাংলায় কিছুদিন শান্তি বজায় রাখে। কিন্তু লখনৌতি ও সোনারগাঁও-এর দুই শাসনকর্তার মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হলে, দারুণ গোলযোগের সূত্রপাত হয়। বাংলার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আবার বিঘ্নিত হয়, এবং অর্ধ-দমিত কিছু জমিদার সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং নিজ নিজ এলাকা সম্প্রসারণে প্রয়াসী হয়। দিল্লীর শাসকগোষ্ঠী বাংলার ব্যাপারে নির্লিপ্ত রহেন।

বাংলার রাজনীতির এই ডামাডোলের সময় হাজী ইলিয়াস শাহের আবির্ভাব ঘটে। দিল্লী থেকে বাংলায় এসে হাজী শামসুদ্দিন ইলিয়াস প্রথমে দক্ষিণ বাংলার কোথাও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন ও এক সেনাদল গঠন করেন। অনতি-কাল মধ্যে তিনি লখনৌতি দখল করে ইলিয়াস শাহ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন (১৩৪২)। তাঁর প্রতি স্থানীয় বিরোধিতার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। ইলিয়াস শাহ-ই সর্বপ্রথম বাংলার বিভিন্ন মহলকে সংঘবদ্ধ করে সারা বাংলার একচ্ছত্র স্বাধীন ও সার্বভৌম সুলতান হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তাঁর আমলেই লখনৌতির রাজ 'বাঙ্গলার রাজ্যে' রূপান্তরিত হয়। হাজী ইলিয়াস এমন এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে যান, যারা প্রায় দেড়শত বছর বাংলায় গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করেন। এই বংশের আমলে বাংলার বাইরে কিছু এলাকা বিজিত হয়। পরপর দুইবার দিল্লীর আক্রমণ প্রতিহত করা হয় এবং প্রকারান্তরে দিল্লী বাংলার স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তা স্বীকার করে নেয়। এই আমলেই রাষ্ট্রীয় ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ঐক্য সুদৃঢ় হয়, ইলিয়াস শাহী সুলতানরা এমন এক উদার শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন যা বাঙালী হিন্দুদের সম্পর্ক ও সহযোগিতা আকর্ষিত করে। যোগ্যতা ও গুণানুযায়ী বাঙালী হিন্দুরা সামরিক ও বে-সামরিক ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। বাংলার উপর দিল্লী ও জৌনপুর রাজ্যের আগ্রাসী অভিসন্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এ-যুগের বাংলার শাসকগণকে স্থানীয় শক্তির উপরেই নির্ভরশীল হতে হয় এবং এই কারণে মোটামুটিভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় নীতি গ্রহণ করতে হয়। এই প্রসঙ্গে ইলিয়াস শাহের সমর্থনে ও সহযোগিতায় দিল্লীর সুলতানের আক্রমণের বিরুদ্ধে বাঙালী হিন্দুদের ভূমিকা উল্লেখ্য। পঞ্চদশ শতকে বাংলার প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হিন্দু কর্মচারীরা বাংলায় ভূমি-ভিত্তিক অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে। এই হিন্দু অভিজাত গোষ্ঠী দরবারী রাজনীতি ও প্রশাসনে উত্তরোত্তর নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করে চলে যার চরম পরিণতি হলো

রাজা গণেশের অভ্যুত্থান ও একটি নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা। এই সময় বাংলার হিন্দু অভিজাত তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমেই শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। আজম শাহের আমলে হিন্দুরা উচ্চপদে, এমনকি উজীর পদেও নিযুক্ত হন। এই প্রসঙ্গে রাজা গণেশের নাম উল্লেখ্য। তিনি ছিলেন উত্তরবঙ্গের এক বিশাল জমিদারীর মালিক ও তাঁর নিজের সেনাও ছিল। তিনি আজম শাহের আমলে দরবারী অমাত্যদের অন্যতম হয়ে ওঠেন। সুতরাং বলা যায় যে, ইলিয়াস শাহী আমলে রাষ্ট্রনীতি অনেকটা উদার হয়ে উঠেছিল এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় থাকার ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাহিত্য ও ভাষা চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

ইলিয়াস শাহীদের রাজত্বের শেষের দিকে বাংলার আমীর-ওমরাহদের মধ্যে গোষ্ঠী-কোন্দল চরম আকার ধারণ করে। এই পরিস্থিতিতে রাজা গণেশ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইলিয়াস শাহী সুলতান আজম শাহের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতা ও রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে রাজা গণেশ পরাক্রান্ত হয়ে নৃপতি-স্রষ্টার ভূমিকা নেন। উলেমা ও মুসলিম প্রশাসকদের মধ্যে স্ব-বিরোধিতা রাজা গণেশ তথা হিন্দু অমাত্যদের অভ্যুত্থানের পথ রচনা করে। সুলতানী আমলে দিল্লীতে মুসলিম অভিজাত ও উলেমাদের মধ্যে যে ধরনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়েছিল, বাংলায় তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। রাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলিম সাধু-সন্তদের নিয়ত হস্তক্ষেপের অনেক নজির আছে। এই প্রসঙ্গে সুলতান আজম শাহকে চিঠিপত্রের মাধ্যমে বিহারের বিখ্যাত সুফী মুজফ্ফর শাহ বলখীর রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়ার উল্লেখ আছে। তিনি আজম শাহকে প্রশাসনের কোনো বিভাগে বিধর্মীদের নিয়োগ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। শাসন-ব্যাপারে বলখী আজম শাহকে যে উপদেশ দেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'মহান আল্লাহ্ বলেছেন, বিশ্বাসীগণ। তোমাদের শ্রেণীর বাইরে কারও সঙ্গে মিত্রতা কোরো না। তফসীর ও অভিধানে বলা হয়েছে যে বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসী এবং অপরিচিত মানুষদের বিশ্বস্ত কর্মচারী বা উজির নিয়োগ করবে না। আল্লাহ্ বলেছেন যে অবিশ্বাসীরা তোমাকে বিপক্ষে চালিত করতে ব্যর্থ হবে না এবং তারা তোমার কাজে গোলযোগ সৃষ্টি করতে ইতস্তত করবে না।' একথা অনস্বীকার্য যে ইলিয়াস শাহের আমল থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমান-দের মধ্যে যে সহযোগিতার ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল, আজম শাহের আমলে তা কিছুটা বিঘ্নিত হয় এবং রাজনীতিতে সুফী-সন্তদের প্রভাব কিছুটা বেড়ে যায়। সম্ভবত এই কারণে হিন্দু সামন্ত, জমিদার ও অমাত্যদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে এবং রাজা গণেশের অভ্যুত্থান সহজ হয়। প্রায় দুশো

বছর নিরবিচ্ছিন্ন মুসলিম শাসনের পর এক হিন্দু বংশের অভ্যুত্থান আশ্চর্য মনে হলেও তা অবাস্তব ছিল না।

রাজা গণেশ বাংলার সিংহাসন দখল করলে (১৪১৪) সুফী-সন্তরা তাঁর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হন এবং মোল্লা ও উলেমারা যারপরনাই বিচলিত হন। কারণ আজম শাহের আমল থেকেই তাঁরা প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠেছিলেন এবং রাজদরবারেও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বাংলার মুসলিম সাধু-সন্তদের নেতা নুর-কুতব-উল আলম জৌনপুরের বিখ্যাত সুফী আসরাফ-উল সিমনানির সাহায্যপ্রার্থী হন এবং বাংলার মুসলমানদের গণেশের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য জৌনপুরে শর্কি সুলতানকে বাংলা আক্রমণে প্ররোচিত করতে প্রয়াসী হন। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় মুসলিম শক্তির এই বিপর্যয়ে মুসলিম সাধু-সন্তরাই অগ্রণী ভূমিকা নেন। সিমনানির অনুরোধে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কি বাংলায় আসেন। রাজা গণেশ বিনা যুদ্ধেই ইব্রাহিম শর্কির কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এ দেখে বোঝা যায় যে, মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দুদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধলেও, মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘর্ষে যাওয়ার মতো ক্ষমতা তাদের ছিল না। ইব্রাহিম শর্কি বাংলা আক্রমণ করলে, গণেশের পুত্র যদু বা যদুসেন পিতার বিরুদ্ধাচারণ করে মুসলিম শিবিরে যোগ দেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে মোল্লারা তাঁকে সিংহাসনে বসান। যদু জালাল-উদ্দিন নাম গ্রহণ করেন। বাংলায় ইসলামী শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। রাজা গণেশের বংশের শেষ সুলতান ছিলেন আজম শাহ। তাঁর আমলে রাজধানী গৌড়ে রাজনৈতিক দলাদলি চরমে উঠে এবং তিনি এই দলাদলির শিকার হন। তাঁর দুই ক্রীতদাস সাদী খান ও নাসির খান ষড়যন্ত্র করে আহমদ শাহকে হত্যা করেন। পরে ক্ষমতার দখল নিয়ে এই দুই ক্রীতদাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সাদী খান নাসির খানকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই সিংহাসন দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু নাসির খান সাদী খানের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে সাদী খানকে হত্যা করেন এবং সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু রাজ্যের আমীর-ওমরাহরা ক্রীতদাসের রাজত্ব মেনে নিতে না পেরে নাসির খানকে হত্যা করেন এবং ইলিয়াস শাহের এক বংশধরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৪৪২)। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, গৌড়ে আমীর-ওমরাহরা কি পরিমাণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু পুনর্বাসিত ইলিয়াস শাহীদের দুর্বলতা, আত্মকলহ ও দরবারী ষড়যন্ত্রের ফলে প্রশাসনযন্ত্র প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের ক্রীতদাস ও অমাত্যদের উপর নির্ভর করতে না পেরে তাঁরা প্রায় দশহাজার হাবসী (আবেসিনিয়) ক্রীতদাস আমদানি করেন এবং দেহরক্ষী

ও রাজপ্রাসাদের রক্ষী হিসাবে নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই নীতি রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়। সুলতান বরবক শাহ-ই সর্বপ্রথম হাবসী খোজাদের আমদানি করেন। তিনি বোধহয় মনে করেছিলেন যে, হাবসী খোজার দল প্রাধান্য পেলে স্থানীয় প্রভাবশালী আমীর-ওমরাহরা সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অবকাশ পাবেন না এবং তাঁর অনিষ্টও করতে পারবেন না। কিন্তু ফল হয় বিপরীত। তুর্কী ক্রীতদাসদের ('জানিজারি') হাতে আব্বাসীয় খলিফাদের যে-হাল হয়েছিল, হাবসী ক্রীতদাসদের হাতে ইলিয়াস শাহীদেরও প্রায় একই হাল হয়। রাজঅন্তঃপুরে ও বাইরে হাবসী ক্রীতদাস ও হাবসী সেনারা অত্যন্ত পরাক্রান্ত হয়ে উঠে। রাজানুগ্রহে পুষ্ট হয়ে তারা অত্যাচারীও হয়ে উঠে। হাবসীদের ক্ষমতা ও ঔদ্ধত্য খর্ব করার জন্য এই বংশের শেষ সুলতান জালাল-উদ্দিন ফতে শাহ প্রয়াসী হলে, তিনি হাবসীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হন এবং হাবসীরা সিংহাসন দখল করে (১৪৮৭)। ব্লকম্যান-এর ভাষায় 'from protectors of the dynasty, the Abyssinians became masters of the kingdom'। পুনর্বাসিত ইলিয়াস শাহদের হাবসী-প্রীতি এত দূর পেঁছেছিল যে পূর্বতন অভিজাত ও অমাত্যরা প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছিল এবং সুলতানের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো ক্ষমতাও তাদের ছিল না। সেই সঙ্গে প্রজাশক্তিও হীনবল হয়ে পড়েছিল।

স্থানীয় অমাত্য ও আমীরদের দূরে সরিয়ে রেখে ও অশিক্ষিত ও বর্বর হাবসী খোজাদের (বাংলার সঙ্গে যাদের নাড়ীর কোনো যোগ ছিল না) উপর নির্ভর করার ফলশ্রুতি হলো ইলিয়াস শাহী বংশের এই বিপর্যয়।

হাবসীরা ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। হাবসীদের শেষ সুলতান মুজফ্ফর শাহ স্থানীয় আমীর-ওমরাহদের ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সর্বাগ্রে বিনাশ করেন, হিন্দু-মুসলিম জমিদার ও অভিজাতদের নির্বিচারে হত্যা করতে থাকেন, চড়া হারে রাজস্ব আদায় করতে থাকেন এবং সেনাবাহিনীর বেতন কমিয়ে দেন। ফলে আমীর-ওমরাহ, সেনাবাহিনী ও সাধারণ প্রজা—সবাই বিদ্রোহী হয়। বাংলায় শাসকের বিরুদ্ধে সব শ্রেণীর মানুষের সংঘবদ্ধ বিদ্রোহের এটাই হলো প্রথম দৃষ্টান্ত। এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন মুজফ্ফর শাহের উজীর হুসেন শাহ।

মুজফ্ফর শাহ নিহত হলে হুসেন শাহ সরাসরি সিংহাসন দখল করেন নি। তাঁকে অভিজাত ও হিন্দু পাইকদের উপর নির্ভর করতে হয় এবং তাদের সমর্থনেই তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে এক নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন (১৪৯৪)। এই বংশ ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করেন। হুসেন শাহীরা ছিলেন ধর্মে মুসলমান, সংস্কৃতিতে বাঙালী। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক

দিক থেকে হুসেন শাহ বংশ কৃতিত্বে ও গৌরবে সমুজ্জ্বল। পূর্ববর্তী আমলে যে বিশৃংখলা ও অরাজকতার উদ্ভব হয়েছিল, হুসেন শাহ সর্বাগ্রে তা দূর করেন ; হাবসীদের তল্পি-তল্পা সমেত বহিষ্কার করেন এবং উদ্ধত হিন্দু পাইক-বাহিনী ভেঙে দিয়ে এক নতুন সেনাবাহিনী গঠন করেন। হাবসীদের বিতাড়িত করে হিন্দু ও মুসলিম অভিজাত ও অমাত্যদের সগৌরবে পুনর্বাসিত করা হয়, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল সামরিক ও বে-সামরিক পদে গুণানুযায়ী হিন্দুদের নিয়োগ করা হয় এবং হিন্দু কবি ও সাহিত্যাচার্যদের দরবারে স্থান দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে ইলিয়াস শাহীরা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যে উদারনীতি গ্রহণ করেছিলেন, তার ঐতিহ্য হুসেন শাহী আমলেও অব্যাহত থাকে। প্রাদেশিক শাসনকর্তারাও হিন্দু মনীষার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। প্রাক্-হুসেন শাহী শাসকরা 'ইসলাম ও মুসলমানের সাহায্যকারী'-অভিধা গ্রহণ করতেন। অর্থাৎ তাঁরা সাধারণভাবে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু হুসেন শাহীরা এই ঐতিহ্য থেকে নিজেদের মুক্ত রাখেন। উত্তর-ভারতে হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপনের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু বাংলায়, বিশেষ করে হুসেন শাহী আমলে এর কোন নজীর নাই। প্রকৃতপক্ষে হুসেন শাহীরা মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেন। এর মূলে ছিল এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে শাসকগোষ্ঠীর অবস্থান। গৌড় রাজ্য ছিল শত্রু রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভারতের রাজনীতির মঞ্চ থেকে লোদীদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের আবির্ভাব ঘটে যা বাংলার নিরাপত্তার পক্ষেও বিপজ্জনক হয়ে দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে বাংলায় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সব শ্রেণীর মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতার উপর হুসেন শাহীদের নির্ভর করতে হয়। হুসেন শাহীদের মনে কোনো বহির্ভারতীয় প্রেম বা আনুগত্য ছিল না। তাঁরা বাংলাকে ভালবেসেছিলেন, বাংলার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছিলেন এবং বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষার মর্যাদা দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উদার রাষ্ট্রীয় নীতির ফলে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার সম্ভব হয়েছিল এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিৎ গঠিত হয়েছিল। এককথায় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলায় নবজাগরণের সূচনা হয় যা ইউরোপীয় রেনেসাঁর সঙ্গে ন্যূনাধিক তুলনীয়। এই যুগেই হিন্দু ও মুসলিম মনীষার অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে এবং দুই সম্প্রদায়ের যৌথ প্রচেষ্টায় বাংলার সংস্কৃতি এক বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। সমকালীন ভারতে বাংলার সংস্কৃতি এক স্বতন্ত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

হুসেন শাহী আমলে বাংলার গৌরব যেমন উত্তর ভারতে প্রসারলাভ করেছিল, তেমনি এই আমলেই স্বাধীন বাংলার অস্তিত্ব চিরতরে বিদায় নেয়,

যদিও খুবই সাময়িকভাবে আফগান বংশীয় কররানীদের আমলে বাংলার স্বাধীনতার পুনরভ্যুদয় ঘটেছিল।

হুসেন শাহের উত্তরাধিকারী নসরৎ শাহের আমল থেকে হুসেন শাহী বংশের পতনের সূচনা হয়। তাঁর আমলে বাবরের নেতৃত্বে ভারতে মোগল শক্তির প্রতিষ্ঠা হয় এবং বাবর উত্তর-ভারত থেকে বিজয়াভিযান চালিয়ে বিহারের সীমানা পর্যন্ত অগ্রসর হন। বিহারে আফগানরা মোগলদের বিরুদ্ধে এক শক্তি-জোট গড়ে তোলে। এই শক্তি-জোটের নেতারা ছিলেন লোহানী রাজ্যের (জৌনপুর ও পাটনার মধ্যবর্তী অঞ্চল) জালাল খাঁ লোহানী (পরে তাঁর পুত্র বাহার খাঁ লোহানী), শের খাঁ শূর ও মাসুদ লোদী। পূর্ব ভারতে মোগলদের বিরুদ্ধে আফগানদের ভরসাস্থল ছিলেন বাংলার সুলতান নসরৎ শাহ। কিন্তু আফগান বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে নসরৎ-এর ভালো ধারণা ছিল না। এই কারণে তিনি সরাসরি আফগানদের দলে না ভিড়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোগলরা বিহারের কিছু এলাকা দখল করে নিলে নসরৎ শাহের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য হয়। ঘর্ঘরা নদীর তীরে নসরৎ মোগলদের বাধা দেন। বাবর জয়লাভ করলেও বাংলার দিকে অগ্রসর না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বাংলা রক্ষা পায়। বাবরের মৃত্যুর পর বাংলার দিকে হুমায়ুনের অগ্রগতির জনরব প্রচারিত হলে বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। নসরৎ শাহ মোগলদের পরম শত্রু গুজরাটের বাহাদুর শাহের কাছে দূত পাঠিয়ে মৈত্রী-বন্ধনের প্রস্তাব দেন। বাহাদুর শাহ প্রস্তাবে সম্মত হন কিন্তু এই মৈত্রী স্থাপিত হওয়ায় মুহূর্তে নসরৎ শাহের মৃত্যু হয়।

নসরৎ শাহের মৃত্যুকালে হুসেন শাহী শাসনের দ্রুত অবক্ষয় শুরু হয়ে যায় এবং চরম পরিণতি ঘটে গিয়াস-উদ্দিন মামুদ শাহের আমলে। নসরৎ শাহ মৃত্যুকালে কনিষ্ঠ ভ্রাতা মামুদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান (১৫৩২)। উত্তরাধিকারের পরে বাংলার জমিদাররা দুটি গোষ্ঠীকে ভাগ হয়ে যায়। শক্তি-শালী গোষ্ঠীর সমর্থনে নসরৎ শাহের পুত্র ফিরোজ সিংহাসন লাভ করেন। এই ঘটনা এই ইঙ্গিতই দেয় যে, সব সময় পুত্র পিতার উত্তরাধিকারী হচ্ছেন বা জ্যেষ্ঠ পুত্রই তা হবেন এসব রীতি বাংলায় প্রচলিত ছিল না। মোগল সিংহাসনেও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোনো নির্দিষ্ট আইন ছিল না। এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই অসিশক্তি বা অভিজাতদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এই প্রশ্নের নিরসন করত। ফিরোজের সিংহাসনলাভ পিতৃব্য মামুদ হৃষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। ফলে রাজপরিবারে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা হয় এবং শেষ পর্যন্ত ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজকে হত্যা করে গিয়াস-উদ্দিন মামুদ সিংহাসন দখল করেন। হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহ অমাত্য ও আমীর-ওমরাহদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলেন।

কিন্তু রাজপরিবারে ক্ষমতার লড়াইয়ের সুযোগে তাঁরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেন। রাজকর্মচারীরাও দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যান এবং সীমান্তের শাসনকর্তারা স্বাধীন আচরণ শুরু করেন। দক্ষিণ-পূর্বে কর্ণফুলি ও আরাকান পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যবর্তী এলাকায় বাংলার শাসনকর্তা খুদা বক্স্ একরকম স্বাধীন হয়ে যান। এই এলাকার কর্তৃত্ব নিয়ে বাংলা ও ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্ভব হয়। উত্তর-পশ্চিমে হাজীপুরের শাসনকর্তা মকদুম আলম বিরোধী হয়ে আফগান নেতা শের খাঁ শুরের দলে যোগ দেন। বিহারে শের খাঁর নেতৃত্বে বাংলার পক্ষে বিপজ্জনক এক শক্তি-জোটের উদ্ভব হয়। শের খাঁ প্রথমবার বাংলা আক্রমণ করলে (১৫৩৬) মামুদ গৌড়ে বন্দী পর্তুগীজদের মুক্ত করে তাদের সাহায্যে শের খাঁকে বাধা দেন। এবং গোয়া থেকে সাহায্য না আসা পর্যন্ত তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত মামুদ প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিয়ে শের খাঁর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন এবং শের খাঁ ফিরে যান।

এই সময় বাংলায় পর্তুগীজ শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে যা বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের রূপান্তর ঘটায়। হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহ সম্ভবত পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৬১৭ খ্রীস্টাব্দে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের পর তারা চট্টগ্রামে প্রবেশ করার অনুমতি পায়। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে অসদ্ উপায় অবলম্বন করায় বাংলার সুলতান মামুদের আদেশে তাদের বন্দী করা হয় ও গৌড়ে পাঠানো হয়। শের খাঁর আক্রমণের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে মামুদ পর্তুগীজ বন্দীদের মুক্তি দেন। মামুদকে সামরিক সাহায্য দেওয়ার বিনিময়ে পর্তুগীজরা চট্টগ্রাম ও সাতগাঁও বন্দরে ব্যবসা-বাণিজ্য করার ও কুঠি নির্মাণ করবার অনুমতি পায় (১৩৫৭)। এইভাবে বাংলায় ইউরোপীয় জাতির প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। পর্তুগীজরা চট্টগ্রাম ও সাতগাঁও-এ স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করা ছাড়াও স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে কর আদায়েরও ক্ষমতা পায় যা তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়। ক্যাম্পস-এর কথায়, একই সঙ্গে চট্টগ্রামে ও সাতগাঁও-এ পর্তুগীজদের প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিপন্ন হয়। এযাবৎ হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহ বাংলার অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন, মামুদ শাহের নির্বুদ্ধিতায় তা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করে। পর্তুগীজদের সামরিক শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, বাংলার জমিদাররাও তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং অনেকে তাঁদের সেনাবাহিনীতে, বিশেষ করে নৌ-বাহিনীতে পর্তুগীজ নাবিক ও গোলন্দাজদের নিয়োগ করেন। বাংলার রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটে। বিদেশী ও ইউরোপীয় শক্তির উপর বাংলার

শাসকগোষ্ঠীর নির্ভরতার সূচনা এইভাবে হয়, যার শেষ পরিণতি হলো পলাশীর যুদ্ধ। পর্তুগীজদের সহযোগিতা সত্ত্বেও মামুদ শাহ শের খাঁ-র কাছে পরাস্ত হয়ে বিতাড়িত হন। শের খাঁ বাংলা দখল করেন (১৫৩৮)। বাংলায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তার বিলুপ্তি ঘটে, বাংলার ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের অবসান হয় এবং সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত রাজনৈতিক অরাজকতা ও অনিশ্চয়তার যুগের সূচনা হয়।

এই অরাজকতা ও অনিশ্চয়তার যুগে বাংলায় আফগান বংশীয় কররানী বংশের প্রতিষ্ঠা হয় (১৫৬৪)। অন্যদিকে এই সময় মোগলরা দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করে পূর্ব-ভারতের দিকে বিজয়াভিযানে বৃত্ত হয়। কররানী বংশের প্রথম দুই শাসক মোগলদের প্রতি আনুগত্যের ভাণ বজায় রেখে স্বাধীন-ভাবেই রাজ্য শাসন করেন। কিন্তু এই বংশের শেষ সুলতান দাউদ খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করে নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন করলে মোগলদের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে যায়। সম্রাট আকবরের আদেশে মোগল সেনাপতি মুনিম খাঁ পাটনা দখল করে দাউদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। দাউদ খাঁ পরাস্ত হয়ে উড়িষ্যায় আশ্রয় নেন (১৫৭৫)। রাজা টোডরমলকে সঙ্গে নিয়ে মুনিম খাঁ বাংলার রাজধানী তান্ডায় প্রবেশ করেন। বাংলায় মোগলদের এটাই হলো প্রথম পদার্পণ।

বাংলার ভৌগোলিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে মোগলদের অজ্ঞানতা, কররানী বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কেন্দ্রীয় শক্তির পতন এবং ক্ষমতা-চ্যুত ও দিশেহারা আফগানদের বাংলার প্রত্যন্তরে গোপন ঘাঁটি স্থাপন ও অরাজকতা সৃষ্টি প্রভৃতি কারণে বাংলায় এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। কররানীদের উপর মোগল বিজয়ের ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলার রাজধানী ও সংলগ্ন কিছু এলাকা মোগলদের দখলে এসেছিল। অন্যত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিই প্রবল হয়ে উঠেছিল। মোগলরা যখন চারিদিকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত ও বিদ্রোহী আফগান হামলাকারীদের অতর্কিত আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত, সেই সময় মুনিম খাঁ-র মৃত্যু হয়। এর ফলে বাংলায় মোগলরা নেতৃহীন হয়ে পড়ে এবং মোগল শিবিরে গভীর আতঙ্ক ও নৈরাশ্যের ছায়া নেমে আসে। প্রাণভয়ে উৎকণ্ঠিত মোগল সেনাবাহিনী বিদ্রোহী হয় ও বাংলা পরিত্যাগ করে দিল্লীর পথে অগ্রসর হয়। মোগলদের এই অসহায় পরিস্থিতির সুযোগে অদমিত দাউদ কর-রানী উড়িষ্যায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং অনতিকাল মধ্যে বাংলা পুনর্দখল করেন। বাংলা পুনর্দখল করার উদ্দেশে এক নূতন মোগলবাহিনী, সেনাপতি ও রাজপ্রতিনিধি বাংলার দিকে অগ্রসর হয়। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খাঁ সম্পূর্ণ পরাস্ত হন ও তাঁকে হত্যা করা হয়। মোগলরা দ্বিতীয়বার

বাংলা জয় করে। কিন্তু ১৫৭৬ থেকে ১৫৯৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে মোগল-আফগান সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। কখনও মোগলরা এগিয়ে যায়, আবার কখনও পিছিয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ের মধ্যে একটা একঘেঁয়েমি ও অমীমাংসিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে যার ফলে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। উত্তর-ভারত বিজয় সম্পন্ন করতে মোগলদের সময় লেগেছিল ২৫ বৎসর। কিন্তু একমাত্র বাংলা বিজয় করতে ও তা সংহত করতে মোগলদের সময় লাগে ৩৫ বৎসর। এই বিলম্বের কারণ ছিল প্রথমে বিদ্রোহী আফগানদের প্রচণ্ড বিরোধিতা, বাংলায় কর্মরত মোগল কর্মচারী ও সেনাদের দুর্নীতি এবং 'ভুঁইয়া' নামে প্রতিষ্ঠিত বাংলার স্বাধীন জমিদার শ্রেণী—অর্থাৎ এককথায় বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি বিরোধিতা। সেই সঙ্গে মোগলদের নৌ-শক্তির অভাব, কারণ নদ-নদী-বিধৌত বাংলায় বছরের ছয়মাস অশ্ববাহিনীর চলাচলের সুবিধা ছিল অত্যন্ত সীমিত। এই পরিস্থিতিতে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রজাবর্গ তথা হিন্দু জমিদারদের আফগান বিদ্রোহীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার উদ্দেশ্যে আকবর রাজা মানসিংহকে বাংলার গভর্নর ও মোগল সেনাপতি নিযুক্ত করেন। মোগলদের এই কূটনীতি কিছুটা ফলপ্রসূ হয়। মানসিংহ পশ্চিম বাংলার হিন্দু জমিদারদের সমর্থন লাভ করেন। ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি রাজমহলে বাংলার রাজধানী স্থাপন করে 'ভাটি' বা পূর্ব বাংলা অভিযানে বৃত্ত হন। এই সময় সোনারগাঁও-এর মসনদ-ই-বাংলা ইশা খাঁ ছিলেন অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও বিদ্রোহী আফগানদের সর্ববাদীসম্মত নেতা। অক্লান্ত পরিশ্রম ও কূটনীতির সাহায্যে মানসিংহ পূর্ব বাংলার বিদ্রোহী আফগানদের এবং বিক্রমপুর ও শ্রীপুরের অধিপতি রাজা কেদার রায়কে পর্যুদস্ত করেন। ইশা খাঁ মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করলেন।

ইতিমধ্যে ১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দে আকবর সারা মোগল-বিজিত ভারতে 'সুবা' শাসনপ্রণালী প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু ১৬১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই শাসনপ্রণালী প্রবর্তনের মোটেই অনুকূল ছিল না। কারণ আফগান বিদ্রোহীরা দমিত হলেও জাহাঙ্গীরের আমলে মোগল-বিরোধী অপর শক্তি ছিল 'দ্বাদশ-ভুঁইয়া' নামে পরিচিত স্বাধীন জমিদার গোষ্ঠী ও মগ-ফিরিঙ্গী জলদস্যুর দল।

তথাকথিত দ্বাদশ বা বারো ভুঁইয়াদের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও একথা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কররানী বংশের পতন ও বাংলায় মোগল-দের প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তীকালে বাংলার বহু হিন্দু-মুসলিম জমিদার নিজেদের স্ব-শাসিত এলাকা গড়ে তোলেন ও সেই সঙ্গে নিজেদের সেনাবাহিনীও গড়ে তোলেন। বাইরের কোনো শক্তিকে তাঁরা স্বীকার করতেন না এবং কাউকে কর

দিতেন না। প্রকৃতপক্ষে সেই যুগে বাংলাদেশ ভুঁইয়াদের দেশ বলেই পরিচিত ছিল। আবুল ফজল ও ইউরোপীয় পর্যটকরা তাই বলে গেছেন। বাংলা ও বিহারের কয়েকটি নগর ও সামরিক ঘাঁটির মধ্যে মোগলদের কর্তৃত্ব সীমিত ছিল। তার বাইরে সারা বাংলাদেশ জুড়ে ছিল ভুঁইয়াদের রাজ্য। জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের সময় এই ছিল বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

জাহাঙ্গীরের সময়ে ভুঁইয়াদের সম্পর্কে এক সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা হয়। এই নীতির লক্ষ্য ছিল ভয় ও প্রলোভন দেখিয়ে ভুঁইয়াদের শ্রেণীগত ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে পযুর্দস্ত করা, ছোটো-বড় নির্বিশেষে তাদের রাজ্য মোগল সাম্রাজ্য-ভুক্ত করা এবং সারা বাংলায় 'সুবা' শাসনপ্রণালী প্রবর্তন করা। মোগল শাসনকর্তা ইসলাম খাঁ-র শাসনকালে (১৬০৮-১৩) মানসিংহের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণতা লাভ করে। পশ্চিম বাংলায় মোগল শক্তি সংহত করার পর ইসলাম খাঁ সুপরিকল্পিতভাবে পূর্ব বাংলার ভুঁইয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান শুরু করেন। ভুষণার জমিদার সত্রাজিৎ ও সুসং-এর জমিদার রাজা রঘুনাথ বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে মোগলদের চাকুরি ও জায়গীর লাভ করেন। ১৬১১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সোনারগাঁও-এর মুশা খাঁ ও তাঁর 'দ্বাদশ ভুঁইয়া' অনুগামীরা বিভিন্ন রণাঙ্গনে পরাস্ত হয়ে অনুচর সমেত আত্মসমর্পণ করেন। জমিদারী কেড়ে নিয়ে তাঁদের জায়গীর দেওয়া হয় এবং মোগলদের চাকরি গ্রহণে বাধ্য করা হয়। ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে বাংলার অন্যতম ঐশ্বর্যশালী ও সামরিক শক্তিসম্পন্ন যশোহর-খুলনার ভুঁইয়া রাজা প্রতাপাদিত্য তুমুল যুদ্ধ করে পরাস্ত হন। তাঁকে বন্দী করা হয় এবং তাঁর জমিদারী মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। বাংলার ভুঁইয়াদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন বোকাইনগরের (ময়মনসিংহ) খাজা উসমান। শৌর্য-বীর্যে, সাহসিকতায় ও সর্বোপরি স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ খাজা উসমান সমকালীন ভুঁইয়াদের ছাপিয়ে যান। জায়গীরের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু স্বাধীনচেতা উসমান তা প্রত্যাখ্যান করলে তাঁর বিরুদ্ধে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়। 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'-তে একমাত্র উসমানের সঙ্গে যুদ্ধকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উসমানের পতনের সংবাদে জাহাঙ্গীর 'হাঁফ ছেড়ে বাঁচা'র আনন্দ প্রকাশ করে-ছিলেন। উসমানের জমিদারী মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। এর পরে শ্রীহট্টের ভুঁইয়া বায়াজিদের পতন ঘটলে বাংলার ভুঁইয়াদের প্রতিরোধ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ভুঁইয়াদের সঙ্গে পরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তারিত করা হয়। ভুঁইয়াদের পতনের পরেই বাংলায় মোগলদের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, বাংলায় সুবা-শাসন প্রবর্তিত হয় এবং একটানা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও তজ্জনিত দুঃখ-কষ্ট থেকে জনসাধারণ মুক্তি পায়।

ভুঁইয়াদের পতনের পর মগ-ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের দৌরাত্ম্য শুরু হয়। 'মগ' নামে পরিচিত আরাকান রাজ্যের অধিবাসীরা ও ফিরিঙ্গী (পর্তুগীজ) জলদস্যুরা চট্টগ্রাম দখল করে সারা দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে গভীর বিভীষিকার সূচনা করে। পরবর্তীকালে পশ্চিম বাংলার 'বর্গী' হানাদারদের মতো, এই যুগে (সপ্তদশ শতক) দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় মগ-ফিরিঙ্গীদের নিয়মিত হানা-লুঠপাট এবং নারী-পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে অপহরণ গভীর সংকটের সৃষ্টি করে। উপকূলবর্তী এলাকার গ্রামের পর গ্রাম ছারখার হয়ে যায় এবং অগণিত মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে অন্যত্র চলে যায়। বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের উপর এর প্রতিক্রিয়া গভীর হয়। নৌ-শক্তিতে হীনবল মোগলরা এই উৎপাতের প্রতিকার করতে তখন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে ১৬২৪ খ্রীস্টাব্দে যুবরাজ শাহজাহান দাক্ষিণাত্যে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে সাময়িকভাবে বাংলা দখল করে নেন। মোগলদের শত্রু মগ ও ফিরিঙ্গী এবং বাংলায় কর্মরত অতৃপ্ত মোগল কর্মচারী ও ভূতপূর্ব আমীর-ওমরাহরা সহজেই শাহজাহানের দলে যোগ দেয়। বাংলা অন্তর্বিপ্লবের কেন্দ্রে পরিণত হয়। মোগল প্রশাসন ভেঙে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী যুবরাজ বাংলা ছেড়ে চলে গেলে পরিস্থিতির উন্নতি হয়, মোগল শাসন পুনঃপ্রবর্তিত হয় এবং বাংলা থেকে দিল্লিতে এক নির্দিষ্ট অঙ্কের রাজস্ব পাঠাবার রীতি সর্বপ্রথম চালু হয়। বাংলার রাজনৈতিক শান্তি ফিরে আসে ও সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাও আসে। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল এক যুগান্তকারী যুগ। সাম্রাজ্যের অন্যান্য সুবার মতো বাংলায় যে প্রশাসনিক ঐতিহ্য গড়ে উঠে তা মোটামুটি অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে। সম্রাটের সঙ্গে বাংলার মোগল কর্মচারীদের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়—যার ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণ আইন (Law of Escheat)-ও সম্রাট ও কর্মচারীদের মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র। প্রায় দেবতা-জ্ঞানে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য কেন্দ্রীকরণ নীতি জোরদার করে। অবশ্য সেই সঙ্গে সম্রাট তথা কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতা যে একেবারে বিলুপ্ত হয়েছিল—এমন কথাও বলা যায় না। তবে সাধারণ প্রজাদের সঙ্গে সম্রাটের সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ ও অপ্রত্যক্ষ। যাই হোক, বাংলার স্বাতন্ত্র্যের যুগ বিলুপ্ত হয় এবং এক নূতন যুগের সূচনা হয়। বাংলার ইতিহাস মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসেরই এক অংশে পরিণত হয়।

জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে মোগল সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের যে সূচনা হয়, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত সেই প্রয়াস অব্যাহত থাকে। সে সময় সারা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় তিনটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য ছিল—

কুচবিহার, কামরূপ ও অহোম। আকবরের আমলে পরস্পরের প্রয়োজনেই সম-মর্যাদার ভিত্তিতে মোগল সাম্রাজ্য ও কুচবিহার রাজ্যের মধ্যে সর্বপ্রথম মিত্রতা স্থাপিত হয়। এই মৈত্রী-বন্ধনের মূলে রাজা মানসিংহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এইভাবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার রাজনীতিতে মোগলদের অনুপ্রবেশ ঘটে। এই এলাকার ওপর সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে কুচবিহারকে করদ-মিত্র রাজ্যে পরিণত করা হয়, কামরূপ রাজ্য সরাসরি মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয় এবং উচ্চ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উপর মোগলদের নিয়ত আক্রমণ শুরু হয়। মীরজুমলার শাসনকালে অহোম রাজ্যে মোগলদের ব্যর্থতা ও বিপর্যয় বাংলার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংহতি গভীরভাবে ক্ষুণ্ণ করে। মোগল প্রশাসন ভেঙে পড়ে। এবং কিছুদিন একটানা নৈরাজ্য চলে। শাহাবুদ্দিন তালিশের গ্রন্থে ('ফতেইয়া') এই সময়ের বাংলার জনগণের অভাব-অভিযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি ও নিয়ন্ত্রণহীন মোগল কর্মচারীদের সীমাহীন অত্যাচারের এক মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায়। জনগণের আর্থিক দুরবস্থা প্রসঙ্গে তালিশ লিখেছেন, 'Life appeared to be cheaper than bread and bread was not to be found'। পরবর্তী সুবাদার সায়েস্তা খাঁ এই নৈরাজ্য থেকে বাংলাকে উদ্ধার করেন। শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের চলাচল আবার শুরু হয়। সায়েস্তা খাঁ-র সর্বাধিক কৃতিত্ব হলো চট্টগ্রাম বিজয় যার ফলে মগ-ফিরিঙ্গীদের জলদস্যুতার অবসান ঘটে এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় শান্তি ফিরে আসে। বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বিজয় এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঔরঙ্গজেবের আদেশে চট্টগ্রামের নামকরণ হয় ইসলামাবাদ।

শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের আমলে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো হুগলীর পর্তুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধ। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিহারের আফগান নেতা শের খাঁ-র বিরুদ্ধে বাংলার সুলতান মামুদ শাহ পর্তুগীজদের সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। এই সাহায্যের বিনিময়ে পর্তুগীজ বণিকদের চট্টগ্রাম ও সাতগাঁও-এ বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। পরে পর্তুগীজরা হুগলীতে বাণিজ্যিক তৎপরতা শুরু করে। আকবর পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক তৎপরতায় সন্তুষ্ট হয়ে হুগলীতে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের ও স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের ও গীর্জা নির্মাণের অনুমতি দেন (১৫৭৯)। মোগল সম্রাটের প্রতি 'নুগত থাকার ও মোগল আইন-কানুন মেনে চলার অঙ্গীকারে পর্তুগীজরা হুগলীতে একরকম স্বাধীনতাই ভোগ করেন। কিন্তু রাজনৈতিক, সামরিক ও ধর্মীয় কারণে শাহজাহান পর্তুগীজদের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হন। তাদের আধুনিক সমরাস্ত্র ও নৌশক্তিতে শাহজাহানের

মনে এই আশঙ্কার সৃষ্টি হয় যে এক সময় পর্তুগীজরা 'সাম্রাজ্যের মধ্যে সাম্রাজ্য' গড়ে তুলতে প্রয়াসী হবে। সুতরাং তাঁর আদেশে হুগলীর উপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁদের বিতাড়িত করা হয়। এবং বহু পর্তুগীজ বন্দীকে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয় (১৬৩২)। বাংলায় পর্তুগীজ শক্তির পতন ঘটে।

ঔরঙ্গজেবের আমলে আর-এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো বাংলায় ইংরাজ কোম্পানির সঙ্গে মোগলদের প্রথম সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের মূলে ছিল শুল্ক-সংক্রান্ত বিরোধ ও কোম্পানীর বাণিজ্যে নিয়ত হস্তক্ষেপ। দুর্নীতিপরায়ণ মোগল কর্মচারীদের উৎপীড়ন থেকে নিজেদের ব্যবসা রক্ষা করার জন্য বাংলার ইংরাজী কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ইংল্যান্ডে ডাইরেক্টর সভার অনুমতি ও সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংল্যান্ডের রাজা (দ্বিতীয় জেমস্)-এর অনুমতিক্রমে সেনাসমেত এক নৌ-বহর হুগলী নদীতে প্রবেশ করলে (১৬৮৬) মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে ও ইংরাজরা পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেবের আদেশে সায়েস্তা খাঁ-র পরবর্তী সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ ইংরাজদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন। মাদ্রাজ কাউন্সিল জব চার্নক-কে বাংলায় ইংরাজ কোম্পানীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করে পাঠান। ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৪ আগস্ট জব চার্নক সুতানটিতে এসে পৌঁছান। কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা হলো। সেই সঙ্গে ইংরাজ কোম্পানী কলিকাতা সমেত পার্শ্ববর্তী এলাকার জমিদারী লাভ করল। বাণিজ্যের সঙ্গে শাসন যুক্ত হলো। ইতিমধ্যে ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দেই ফরাসী বণিকরা চন্দননগরে বাণিজ্য কুঠির প্রতিষ্ঠা করে। ১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে ওলন্দাজ বণিকরা চুঁচুড়ায় বাণিজ্য কুঠির প্রতিষ্ঠা করে এবং শোভা সিংহের বিদ্রোহের সময় সুবাদারের অনুমতিক্রমে চুঁচুড়ায় গুস্তাভাস দুর্গের প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে সপ্তদশ শতকের অবসানের পূর্বেই ইউরোপীয় জাতিগুলি বাংলায় নিজেদের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয় তাদের শাসন।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ পর্বে বাংলা সুবার প্রশাসনের কিরূপ অবনতি হয়েছিল তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চিতুয়া বর্দার জমিদার শোভাসিংহ ও তাঁর সহযোগী উড়িষ্যার আফগান সর্দার রহিম খাঁ-র বিদ্রোহে (১৬৯৫-৯৬)। এই বিদ্রোহকে 'ভূম্যধিকারী বিদ্রোহ' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। স্বল্পমেয়াদী হওয়া সত্ত্বেও এই বিদ্রোহের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শোভাসিংহ ও রহিম খাঁ-র বিদ্রোহ শুধু যে বাংলার মোগল শক্তিকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয়েছিল তাই নয়, ইউরোপীয় শক্তি প্রসারের জন্য এই বিদ্রোহ সর্বপ্রথম ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল বলেও মনে করা হয়। মুকসুদাবাদ, ঢাকা, কাশিমবাজার, নদীয়া, রাজমহল প্রভৃতি এলাকায় এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে

পড়েছিল এবং বিদ্রোহীর সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসাবে নিজেদের মুদ্রাও প্রচার করেছিল। ফলে কিছুদিন সুবা বাংলায় দুটি সার্বভৌম শাসনব্যবস্থা পাশাপাশি চলতে থাকে। এই বিদ্রোহকে উপলক্ষ্য করে ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকরা নিজেদের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিকে সুরক্ষিত করার সুযোগ পায় এবং প্রকৃতপক্ষে এই ঘোর অরাজকতার দিনে বিদেশী কুঠিগুলিই বাঙালীর নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল হয়। বাংলার ভবিষ্যৎ ইতিহাসে এর প্রভাব গুরুতর হয়েছিল।

বাংলার ইতিহাসে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ এক যুগান্তরের সূচনা করে। এই যুগে গভীর রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে যা ভবিষ্যতের অনেক তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব ঘটায়। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে বাংলার মসনদে আলিবর্দী খাঁ উপবিষ্ট হলে বাংলায় প্রকৃত স্বাধীন নবাবী আমলের সূচনা হয়, কারণ এই সময়ের মধ্যে দিল্লীর সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবক্ষয়ের ফলশ্রুতি হিসাবে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা বাংলার স্বাধীন শাসকদের অধীনে প্রগতিমূলক অগ্রগতির সব প্রত্যাশা বিলীন করে দেয়। সেই সুযোগে বাংলায় বর্গীদের (মারাঠা অশ্ববাহিনী) নিয়মিত হানা ও লুঠতরাজ এক প্রবল বিভীষিকা ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে মারাঠা আক্রমণের ফলে উড়িষ্যা থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল কিছুদিনের জন্য বাংলার নবাবের হাতছাড়া হয়ে যায়। বাংলার এই দুর্দিনে ইংরাজ ও ফরাসীরা নিজেদের দুর্গ শক্তিশালী করতে প্রয়াসী হয়। পশ্চিম বাংলার বহু সম্প্রদায় ও নানা পেশাদারী মানুষ নিজেদের ধন-সম্পদ নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে কলিকাতায় আসে। ইংরাজদের বদান্যতায় এই নূতন অভিসারীরা মুগ্ধ হয়েছিল—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই সঙ্গে ইংরাজদের রাজনৈতিক ও নৈতিক শক্তিও বেড়ে যায়। মারাঠাদের আক্রমণপ্রসূত বিপর্যয়ের কিছুদিনের মধ্যে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার ভাগ্য এক নূতন মোড় নেয়।

তথ্যনির্দেশ :

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), 'হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম খণ্ড, ১৯৪৩।

২. যদুনাথ সরকার, 'হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৪৮।

৩. অতুলচন্দ্র রায়, 'হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল' (তুর্ক-আফগান যুগ), নিউ দিল্লী, ১৯৮৬।

৪. অতুলচন্দ্র রায়, 'হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল' (মুঘল যুগ), কলিকাতা, ১৯৬৮।

৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)', কলিকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।

৬. সুশীলা মণ্ডল, 'বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ-প্রথম পর্ব)', কলিকাতা, ১৯৬৩।
৭. মিনহাজ-আস-সিরাজ, 'তুবাকৎ-ই-নাসিরী' (এলিয়ট ও ডাউসন, ২য় খণ্ড)।
৮ জিয়াউদ্দীন বারাণী, 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী', ঐ।
৯. সামশউদ্দীন সিরাজ আফিফ, 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী', ঐ।
১০. গোলাম হোসেন, 'রিয়াজ উস-সালাতিন', এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, (অনুবাদ : আবদুস সামাদ), ১৯০৪।
১১. এ. এস বেভারিজ (সম্পাদিত), 'বাবরনামা', (অনুবাদ), লন্ডন, ১৯২২, দুই খণ্ড (পুনঃপ্রকাশিত ১৯৭৭)।
১২. আবুল ফজল, 'আকবরনামা' (বেভারিজ অনুদিত), কলিকাতা, ১৯২৮, তিন খণ্ড।
১৩ গোলাম হোসেন তাবাতাবাই, 'সিয়ার উল-মুতাক্ষরিণ', (ব্রিসম অনুদিত), দিল্লী মুদ্রণ, ১৯৭৩।
১৪. এম. আই. বোরা (সম্পাদিত), 'মীর্জানাথান : বাহারিস্তান ই-খায়েবী', গৌহাটি, ১৯৩৬, দুই খণ্ড।
১৫. মাহাবুদ্দীন তালিশ, 'ফতেইয়া-ই-ইব্রিয়া' (যদুনাথ সরকার অনুদিত), 'জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি', ১৯০৬. ১৯০৭।
১৬. সলিমুল্লাহ, 'তারিখ-ই-বাংলা' (গ্ল্যাডউইন অনুদিত), কলিকাতা, ১৭৮৮, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৯১৮।
১৭. জে. জে ক্যাম্পস, 'হিস্ট্রি অফ দ্য পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল', কলিকাতা, ১৯১৯।
১৮. তপন রায়চৌধুরী, 'বেঙ্গল আন্ডার আকবর এ্যান্ড জাহাঙ্গীর', কলিকাতা, ১৯৫৩।
১৯. অঞ্জলি চ্যাটার্জী, 'বেঙ্গল ইন দ্য রেন অফ আওরংজেব, ১৬৫৭-১৭০৭', কলিকাতা, ১৯৬৭।
২০. যদুনাথ সরকার, 'হিস্ট্রি অফ আওরংজেব', কলিকাতা, ১৯৫২ পাঁচ খণ্ড।
২১. অনিরুদ্ধ রায়, ''সপ্তদশ শতাব্দীর সুবা বাংলার শেষ বিদ্রোহ : নূতন মূল্যায়ন'' ('ইতিহাস', ঢাকা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, চতুর্থ বর্ষ, পৃ. ১০৪-১৩২, পুনঃপ্রকাশ, 'কৌশিকী', ১৩৮২, পৌষ-আশ্বিন, পৃ. ১-১১ ও কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩, পৃ. ৩৩-৪২)।
২২. মমতাজুর রহমান তরফদার, 'হোসেন শাহী বেঙ্গল, ১৪৯৪-১৫৩৮', ঢাকা, ১৯৬৫।
২৩. সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'বাংলা ইতিহাসের দুশ বছর', কলিকাতা, ১৯৬২।
২৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', প্রথম ও তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা।
২৫. কে.কে. দত্ত, 'স্টাডিজ ইন দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল সুবা, '১৭৪০—১৭৭০',কলিকাতা, ১৯৩৬।
২৬. কে. কে. দত্ত, 'আলিবর্দী এ্যান্ড হিজ টাইমস', কলিকাতা, ১৯৩৯।
২৭. যদুনাথ সরকার, 'বেঙ্গল নবাবস', এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা।
২৮. জগদীশ নারায়ণ সরকার, 'দ্য লাইফ অফ মীরজুমলা', কলিকাতা, ১৯৫১।

মধ্যযুগে বাংলায় নগরবিন্যাসের ধারা
(সুলতানী আমল)

রীণা ভাদুড়ী

প্রবন্ধটির মূলে উদ্দেশ্য মধ্যযুগে বাংলার নগরবিকাশ ও নগরায়ণের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা। প্রবন্ধটি চারভাগে ভাগ করা হয়েছে :

১. নগরতত্ত্ব বা নগরবিদ্যাচর্চার আধুনিক মূলধারা ও সমস্যা বিষয়ে আলোচনা ; ২. ১৩শ শতক থেকে ১৬শ শতকের মধ্যে বাংলায় নগরায়ণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধি লাভ করার রাজনীতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক কারণ বিচার ; ৩. আলোচ্য আমলের বিখ্যাত নগরকেন্দ্রগুলি, গৌড়, পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও, চাটগাঁও, সাতগাঁও ইত্যাদি, এবং অন্যান্য নগরগঠনের উপাদানসমূহের সঙ্গে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করা ; ৪. নগর জনতত্ত্ব ও নগরায়ণ বৃদ্ধির ফলে নগরবাসীদের শ্রেণীবিন্যাসে পরিবর্তন, নগরকেন্দ্রগুলির বৈশিষ্ট্য বিচার এবং পতনের কারণ অনুসন্ধান করা। এক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক কাঠামোর মধ্যে এক বিশেষ ধারা, অর্থাৎ বাংলার নগরকেন্দ্র ও নগরজীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১

আধুনিক যুগে নগরবিদ্যাচর্চার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য একটি ভিন্নতর-বিদ্যাক্ষেত্র প্রস্তুত ও সংযোজন করেছে। নগরের জন্ম ও বিকাশ, গঠন ও বিন্যাস, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য, ধারা ও ধারণা, উন্নতি ও অবনতি—এই সব বিষয়সমূহের আনুপূর্বিক অনুসন্ধান, তথ্যসংগ্রহ, বিচার-বিশ্লেষণের ফলে নগরবিদ্যা ও নগরতত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে। এই বিশেষ বিদ্যাক্ষেত্রটি যেমন ব্যাপকতা ও গভীরতায় একদিকে 'মাল্টিডিসিপ্লিনারি', অপরদিকে 'ইন্টারডিসিপ্লিনারি'। নগরভিত্তিক জীবনচর্চার ও জীবনাদর্শের উৎস ভৌগোলিক, রাজনীতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক অবস্থা ও ধর্মীয় অবস্থান, যা বিভিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, দল ও ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। একটি দেশ বা ভূখণ্ডের এক বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমি ও অভিন্ন অভিজ্ঞতাপ্রসূত জীবনচর্চা ও জীবনাদর্শ সেই দেশের নগরজীবনের চরিত্র ও নগরায়ণের ধারাকে এক নির্দিষ্ট রূপদান করে। সুতরাং ভিন্নতর নগরসভ্যতার ধারণা করা অপেক্ষা সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতায় নগরের স্থান বিচার করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে

নগর উৎপত্তি (urban origin), নগর বিন্যাস (urban forms), নগর ব্যবস্থা (urban system), নগর শাসন (urban organisation), নগর জনতত্ত্ব (urban demography), নগরবাদ (urbanism) ও নগরায়ণ (urbanisation) সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক। সুতরাং সার্বিকভাবে নগরবিদ্যা-চর্চা করতে ইতিহাসবিদ্, ভূগোলবিদ্, অর্থনীতিবিদ্, সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, পুরাতাত্ত্বিক, স্থাপত্যরীতিবিদ্ প্রমুখ সর্বপ্রকার বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন।

এই জটিল এবং ব্যাপক বিদ্যাক্ষেত্রে পদ্ধতিগত নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে সর্বপ্রধান হলো পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক বিবর্তনবাদ (westcentric evolutionism)। এই ধারণার দ্বারা পরিচালিত হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা-বহির্ভূত সমাজ ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যার জন্য পাশ্চাত্য পরিভাষার ব্যবহার হয়। পাশ্চাত্য ধারণা ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতি ও অনগ্রগতির বিচারের ফলে কোনো স্থান, দেশ, বা ভূখণ্ডের মানবকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা, যা গড়ে উঠেছে সেই বিশেষ জায়গার অবস্থান, পটভূমি ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, তার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহার করা হয় ধার-করা ধারণা, পদ্ধতি ও ভাষা। ভিত্তি-পরিকাঠামো সমস্যাটি (base-superstructure problem), যেখানে প্রশ্ন থাকে কোন্ বিশেষ আধারের ওপর নগরজীবনের ভিত্তি, যেমন আর্থনীতিক, রাজনীতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি, অত্যন্ত জটিল। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা বিচারের বিকল্প কি আর্থনীতিক, রাজনীতিক, সামাজিক আদর্শের বিমূর্ত ধারণার ও সংগঠন-প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতির ব্যাখ্যা করা? নগরকে জীবন-যাত্রার অন্যান্য রীতি ও পদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। সুতরাং নগরকে তার আশেপাশের পরিবেশ থেকে আলাদা করা যায় না। নগর ও সংশ্লিষ্ট ধারণা সুস্পষ্ট করতে গেলে কেন্দ্রের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের (core-periphery problem) তুলনামূলক বিচার প্রয়োজন। এই প্রধান সমস্যাগুলি ছাড়াও আরও অন্যান্য সমস্যাও বর্তমান। এই সব তথ্যগত ও পদ্ধতিগত সমস্যার ক্ষেত্রে একটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়—একটি সামগ্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব। নগরের উৎপত্তির কারণ, গঠন, বিকাশ, বিন্যাস, ও নগরায়ণের ধারা বিশেষ স্থান বা দেশের পরম্পরা সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতির বৃহত্তর পটভূমিতে বিবেচ্য। এখানে সংস্কৃতির ভাবগত অর্থ ধরতে হবে বিভিন্ন জাতীয়, ধর্মীয়, ভাষাভাষী সামাজিক গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, দল ও ব্যক্তির জীবনচর্চা, জীবনাদর্শ, মূল্যবোধ—এককথায় জীবনধারার সামগ্রিক অভিজ্ঞতা। সমকালীন বিশেষজ্ঞরা তাই নগরবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যবস্থা, উদ্বৃত্ত ও তার ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও তার প্রভাব, শাসনক্ষমতার

আধার ও চরিত্র, ধর্মীয় দল, আচার-অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য, ইত্যাদি বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার ও কার্যকারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে এই আধুনিক বিদ্যাক্ষেত্রটিকে একটি সামগ্রিক রূপদান করার জন্য সচেষ্ট আছেন।

২

ত্রয়োদশ শতকের প্রথম থেকে বাংলার জনজীবনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলমান আক্রমণের ফলে সেন রাজবংশের পতন ঘটে। মুসলিম রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা ও আধিপত্য বিস্তারের ফলে একটি প্রাচীন সমাজ ও সংস্কৃতির সমান্তরালে বিদেশাগত অন্য একটি সমাজ ও ধর্ম-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর প্রথমাবধি নগরবাসের প্রবণতা থাকাই ছিল স্বাভাবিক — ১. অজানা, অচেনা পরিবেশে প্রাক্-আক্রমণকালের নগরকেন্দ্রগুলি অধিকার ও আশ্রয় গ্রহণ; সামরিক দল, সামন্ত, বণিক, রাজকর্মচারী, ভাগ্যান্বেষী, বৃত্তিভোগী, সুফী গোষ্ঠী — এদের পক্ষে উৎপাদনে অংশ গ্রহণ সম্ভব বা প্রয়োজন ছিল না; সুতরাং অচিরে নগরবাসী এক শাসককুল ও তৎসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর উদ্ভব হলো; ৩. সামরিক কারণ ও নিরাপত্তাবোধও ছিল নগরবাসের অন্যতম হেতু। মুসলমান আক্রমণের সঙ্গে যে নগরায়ণ প্রক্রিয়া বিশেষ শক্তিলাভ করে তা তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন মুহম্মদ হাবিব, নিজামী প্রমুখ ইতিহাসবিদরা।[১] ইরফান হাবিবের মতে, নগরায়ণ প্রক্রিয়া এযুগে অগ্রগতি লাভ করেছিল কিনা তা তিন ভাবে বিচার করা যেতে পারে: ১. তৎকালীন নগরগুলির আয়তন ও সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি; ২. নগরজীবনের সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কারিগরি শিল্পের প্রসার; ৩. উন্নতমানের বাণিজ্যিক অর্থনীতির উপস্থিতি।[২] এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, তিনি নগরজীবনের বিকাশের জন্য আর্থনীতিক কারণকে রাজনৈতিক কারণ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৩শ শতক থেকে ১৬শ শতকের মধ্যে বাংলায় নগরবিন্যাস ও নগরায়ণের ধারাকে বিচার করা যেতে পারে। মুসলমান রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বাংলায় যে সুদূরপ্রসারী

১. মহম্মদ হাবিব, 'পলিটিকস এ্যান্ড সোসাইটি ইন দ্য আর্লি মিডিয়াভাল পিরিয়ড'। রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (কে. এ. নিজামী সম্পাদিত), নিউ দিল্লী, ১৯৭৪; কে. এ. নিজামী, 'রিলিজিয়ন এ্যান্ড পলিটিকস ইন ইন্ডিয়া ডিউরিং দ্য থার্টিন্থ সেঞ্চুরী', আলিগড়, ১৯৬১।

২. ইরফান হাবিব, "ইকনমিক ইনটারপ্রিটেশন অফ দ্য দিল্লী সুলতানেত ইত্যাদি" "ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রিভিউ', চতুর্থ খণ্ড, নং ২, ১৯৭৭-৭৮।

পরিবর্তনের সূচনা হয় তার প্রধান প্রকাশ হলো অধিক সংখ্যায় নগরকেন্দ্র স্থাপন, পূর্বতন কেন্দ্রগুলির প্রসারণ ও উন্নয়ন এবং জনজীবনে নগরায়ণ বৃদ্ধি পাওয়া।

মুসলমান শাসনামলে পূর্বতন যুগের তুলনায় নগরায়ণের অনুকূল অর্থনীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। খ্রীস্টীয় ৮ম শতক থেকে ১২শ শতক পর্যন্ত, বাংলার বাণিজ্যিক পরিস্থিতির সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এই সময়ে ধাতুমুদ্রার প্রচলন হ্রাস পায় এবং সেন আমলের শেষকালের কোনো ধাতুমুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নি। অনুমিত হয়, বিনিময়-মাধ্যমের অভাবের কারণ সামুদ্রিক বাণিজ্যের অবনতি ও পতন। অবশ্য দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার শাসকেরা ১১শ শতক পর্যন্ত মুদ্রাঙ্কন করেছিলেন। ময়নামতীর কুটিলা-মুরার খননকার্যের তৃতীয় পর্যায়ের ওপরের স্তরে খলিফা মাস্তাসিম-বিল্লার (১২৪২-১২৫৮) একটি স্বর্ণমুদ্রাসহ যে কয়টি আব্বাসি রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে তা এই অঞ্চলের সঙ্গে আরবদের বাণিজ্য সম্পর্কের ইঙ্গিতবহ।[৩] যদিও এখনও পর্যন্ত কোনো দেশী মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নি, তা সত্ত্বেও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বাণিজ্যিক প্রবহমানতার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কথা স্মরণে রেখে চট্টগ্রাম ও সংশ্লিষ্ট এলাকার বন্দর-নগরীগুলি প্রসঙ্গ আলোচ্য। ৮ম থেকে ১৩শ শতক পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে যখন কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য চলছিল, তখন উত্তর-পশ্চিম বাংলায় নগরকেন্দ্রগুলি বাণিজ্যিক গুরুত্ব হারিয়ে, গ্রামীণ অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। ৭ম শতকে হিউয়েন সাঙ ও ইৎ সিং যে তাম্রলিপ্ত বন্দরের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন, ৮ম শতক থেকে সেই তাম্রলিপ্তির বন্দর বা জনপদ হিসাবে আর উল্লেখ পাওয়া যায় না। গাঙ্গেয় বন্দরও আর নৌ-চলাচলের পক্ষে উপযোগী ছিল না ; বিদেশী বণিকদের আকর্ষণ করার মতো কোনো পণ্যদ্রব্য এই বাণিজ্যকেন্দ্র-দুটির পশ্চাদ্ভূমিতে হয়তো উৎপন্ন বা তৈরি হতো না। মুসলমান আগমনের প্রাক্কালে দেবীকোট, লক্ষ্মণাবতী, সোমপুর, কর্ণসুবর্ণ, সুবর্ণগ্রাম, বর্ধমান, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি ছিল ক্ষীয়মাণ নগরকেন্দ্র।[৪] উত্তরবঙ্গে করতোয়ার বামতীরে ত্রিশ বর্গমাইল ব্যাপী এলাকা জুড়ে মহাস্থানের খননকার্যে যে-বিস্তৃত নগরভিত্তিক অঞ্চলের অবস্থিতির প্রমাণ মেলে, মুসলমান বিজয়ের সময়ে তার কোনো অস্তিত্ব

৩. এফ. এ. খান, 'ময়নামতী', করাচী, ১৯৬৩, পৃ. ২৫-২৭ ; 'বাংলাদেশ ললিতকলা', ১, নং ১, ৫৮, পার্ট ২৪, বি।

৪. সরসীকুমার সরস্বতী, "ফরগটেন সিটিজ অফ বেঙ্গল", 'জিওগ্রাফিকাল রিভিউ', কলিকাতা, ১৯৩৬।

ছিল না।[৫] প্রাক্-মুসলমান সমাজেও এই বাণিজ্যিক অবক্ষয় ও পতনের প্রতি-ফলন দেখা যায়, যেখানে বণিক ও কারিগর শ্রেণী কর্মাভাবে ভূমির উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আবিষ্কৃত ভূমিদান-জনিত ও অন্যান্য তাম্রশাসনগুলিতে যে সমাজ-বিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে বণিক-ব্যবসায়ী, কারিগর-বৃত্তিজীবীদের প্রতিপত্তির কোনো লক্ষণ নেই। কিংবদন্তী-সাহিত্যে পাওয়া যায় যে রাজা বল্লালসেন সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়কে পঙ্‌ক্তিচ্যুত করে নিম্নতর জাতিতে পরিণত করেছিলেন। নগরজীবনের অবক্ষয়ের এক প্রধান কারণ ছিল বর্ণভেদ ও জাতিবৈষম্য, নিম্নবর্গের মানুষদের নগরবাস নিষিদ্ধ ছিল। পাল ও সেন রাজাদের তাম্রশাসনগুলিতে ভূমির চাহিদা বৃদ্ধির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।[৬] তবে ব্যারি মরিসন দেখিয়েছেন, অন্যান্য এলাকার তুলনায় সমতটের প্রতিষ্ঠানগুলিকে বৃহদায়তন ভূমিদান, রৌপ্যমুদ্রার কিছু চলন ও বড়ো বড়ো ইমারতের অবস্থিতি ভূমি-হস্তান্তর রীতির পার্থক্য ও আর্থনীতিক অবস্থার প্রভেদ প্রমাণ করে।[৭] আঞ্চলিক আর্থনীতিক পার্থক্যের কথা স্মরণে রেখেও বলা যায়, প্রাক্-মুসলমান যুগে বাংলায় সার্বিক-ভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অত্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু, প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছিল। মূল্যমান হিসাবে ব্যাপকভাবে কড়ির প্রচলন ও ধাতুমুদ্রার অভাব প্রমাণ করে যে, সামুদ্রিক বাণিজ্য কড়িকে বিনিময়-মাধ্যম করে চলা সম্ভব ছিল না।

৮ম শতক থেকে নবজাগ্রত আরবজাতি অপ্রতিহত বেগে পশ্চিম থেকে পূর্ব-জলসীমান্ত পর্যন্ত অভিযান চালায়। ভূমধ্যসাগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য রোমক ও মিশরীয় বণিকদের করতলগত ছিল, সেই সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য আরব বণিকগোষ্ঠীর অধিকারভুক্ত হয়। ভারত মহাসাগরের এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-অধিকার পরিবর্তন বাংলার বাণিজ্যকেও আঘাত করে। অপরদিকে করমণ্ডল ও জাভার বাণিজ্যশক্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের প্রতিযোগিতা করার মতো বাণিজ্যশক্তি ছিল না। ড. তরফদারের মতে, প্রাক্-মুসলমান বাংলার বাণিজ্যিক অবনতির প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে বন্যার ফলে পলিমাটি জমায় নদীর গতিপথ পরিবর্তনই প্রধান; নদীপথের নাব্যতাহানি হবার জন্য নগরকেন্দ্রগুলির পারস্পরিক যোগাযোগ

৫. ঐ।
৬. মমতাজুর রহমান তরফদার, "ট্রেড এ্যান্ড সোসাইটি ইন আর্লি মিডিয়াভাল বেঙ্গল" ('ইন্ডিয়ান হিস্টরিকাল রিভিউ', খণ্ড চার, নং ২, ১৯৭৮)।
৭. বি. এম. মরিসন, 'পলিটিকাল সেন্টারস এ্যান্ড কালচারাল রিজিয়নস ইন আর্লি বেঙ্গল', টুসকান, ১৯৭০।

বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, পণ্য-দ্রব্যাদি চলাচলে বাধাসৃষ্টি হতো এবং বাণিজ্যিক অস্তিত্ব বিপন্ন হতো।[৮] উপরোক্ত বিভিন্ন কারণে বাণিজ্যে অবনতি ঘটে। আর বাংলার অর্থনীতি প্রধানত ভূমি-নির্ভর হয়ে পড়ে ও নগরায়ণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে পূর্বদিকে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের ফলে এশিয়ার সামুদ্রিক বাণিজ্যে নবজীবনের জোয়ার লাগে। বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন সমুদ্রপথে ইসলাম ধর্ম প্রচারের একটি সুদূরপ্রসারী ফল। আরবগণসহ বিভিন্ন জাতীয় মুসলমান বণিকগোষ্ঠীগুলি চীন, জাভা ও সুমাত্রায় উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। সেই সময়ে বাংলাও আলেকজান্দ্রিয়া-কুশ-এডেন-ক্যাম্বে হয়ে মালাবার-করমণ্ডল দিয়ে মালাক্কা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পুনরায় বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন করে। বাংলার বাণিজ্যিক পুনরুজ্জীবনের জন্য ইওরোপে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মশলার চাহিদা ও উপমহাদেশের উপকূল অঞ্চলে রপ্তানিযোগ্য শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন-বৃদ্ধিই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছিল। নগরায়ণ প্রক্রিয়ার গতিলাভ, শিল্পবস্তু উৎপাদনে উন্নতি এবং মুদ্রা-ভিত্তিক অর্থনীতির সূচনা এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরস্পর-নির্ভরশীল উপাদানবিশেষ। এই স্থিতিশীল বাণিজ্যনির্ভর আর্থনীতিক পরিবেশ নগরায়ণ প্রক্রিয়ার গতিশীলতার প্রধান কারণ—বিদ্যমান গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে রূপান্তর এই প্রক্রিয়ার বিশিষ্ট উদাহরণ।

এই যুগে নগর গঠনের উপাদানসমূহের বিশ্লেষণ করলে অর্থনীতির বিশিষ্ট রূপ ও রাজনীতিক পটপরিবর্তনের প্রভাব সুস্পষ্ট হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবৃদ্ধি ও নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য ছিল একটি উন্নত-মানের মুদ্রাব্যবস্থা। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে যে-ধাতুমুদ্রার ব্যাপক ব্যবহার আলোচ্যযুগে দেখা যায়, তা ছিল পরিবর্তিত ও উন্নতশীল অর্থনীতির দ্যোতক। বাংলায় পাল আমলে স্বর্ণমুদ্রা ও সেন আমলে ধাতুমুদ্রা প্রচলিত ছিল না। মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ বলেছেন, মুসলমানরা অধিকারের প্রারম্ভিক পর্যায়ে বাংলায় ধাতুমুদ্রার প্রচলন দেখেন নি, কড়িই ছিল একমাত্র বিনিময়-মাধ্যম।[৯] দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের অর্থনীতির আঞ্চলিক ব্যতিক্রমের কথা

৮. তরফদার, "বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য ও যুগ বিভাগ সমস্যা" ('ইতিহাস', ষষ্ঠ বর্ষ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, নং ৩, পৌষ-চৈত্র)।

৯. মিনহাজ-আস সিরাজ, 'তবাকৎ-ই-নাসিরি' (র‍্যাভেটি অনূদিত), লণ্ডন, ১৮৮১, পৃ. ৫৪৫।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। কপর্দক-পুরাণ, কার্ষাপন, চূর্ণী ইত্যাদিকে বিনিময়-মাধ্যম হিসাবে বিচার করে ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে বিদগ্ধ আলোচনা করেছেন।[১০] সাধারণভাবে অনুমিত হয়, বৈদেশিক বাণিজ্য বিলুপ্তির ফলে স্বর্ণরৌপ্য-নির্ধারিত মুদ্রামানের আবশ্যকতা নিঃশেষিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণতন্ত্রী শাসনব্যবস্থায় সেন যুগে ব্যক্তিগত অধিকারে ও দেবালয়ে প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্য মজুত থাকত। সে-যুগের সংস্কৃত সাহিত্যে নগরবাসিনী বরবর্ণিনীদের বহুমূল্য অলংকারের অনুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, সমাজে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ধনের অভাব ছিল না, কিন্তু মুদ্রাব্যবস্থা মারফৎ তার অর্থনৈতিক ব্যবহার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ত্রয়োদশ শতকে, বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের প্রস্তুতিপর্বে, ধাতু-মুদ্রার প্রচলনের সূচনা দেখা যায়। চতুর্দশ শতকে যখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-জগতের সঙ্গে বাংলার যোগসূত্র পুনরায় স্থাপিত হলো, তখন থেকে সোনা-রুপার ও সীমিতভাবে তাম্রমুদ্রার বিনিময়-মাধ্যম হিসাবে ব্যাপক ব্যবহারের প্রমাণ মেলে এবং দুইশত বৎসরকাল ব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই আমলে নগরগুলির গঠনরীতি বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে, টাঁকশালগুলি নগরবিন্যাসের একটি প্রধান উপাদান ছিল। ইসলামী রীতি অনুযায়ী শাসকের অধিকার আইনসঙ্গত করার জন্য নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন সে-যুগে অবশ্য-পালনীয় রাজনৈতিক কর্তব্য বিবেচিত হতো। এই মুদ্রাব্যবস্থা শুধু মুসলমান শাসকদের সার্বভৌমত্বের প্রতীক ছিল না, সে-যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে বিনিময়-মাধ্যম হিসাবেও ধাতুমুদ্রার ব্যবহার অপরিহার্য ছিল। মুসলমান শাসনের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে মুদ্রার সংখ্যা ও ওজন এবং মূল্যমান অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল। মা হুয়ান[১১] লক্ষ্য করেন সর্বপ্রকার কেনাবেচার জন্য মূল্যমান টঙ্কার দ্বারা নির্ধারিত হতো। সুতরাং এই মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতিতে টাঁকশালগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় ও নগর-বিন্যাসের ক্ষেত্রে সেগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।[১২] বিভিন্ন শাসকদের মুদ্রা থেকে টাঁকশাল-নগরীগুলির নাম, সুলতানদের রাজ্যসীমা, ক্ষমতার বিস্তার

১০ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, "কমার্স এ্যান্ড মানি ইন দ্য ওয়েস্টার্ন এ্যান্ড সেন্ট্রাল সেক্টরস অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ৭৫০-১২০০ খ্রীস্টাব্দ" ('ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বুলেটিন', নং ১২, ১৯৮২)।

১১. "মা হুয়ান'স বেঙ্গল" ('বিশ্বভারতী এ্যানালস', পার্ট ১, ১৯৪৫)।

১২. মীর জাহান, "মিন্ট টাউনস অফ মিডিয়াভাল বেঙ্গল" ('প্রসিডিংস অফ পাকিস্তান হিস্ট্রি কনফারেন্স', ১৯৫৩, পৃ. ২২৪ এফ)।

ও মুদ্রানীতির ব্যাপকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। গৌড় ছিল বৃহত্তম ও কেন্দ্রীয় টাঁকশাল-নগরী। বেশ কিছু হুসেনশাহী মুদ্রায় 'খাজানাহ্' শব্দটির ব্যবহারে বোঝা যায় গৌড়ে কেন্দ্রীয় টাঁকশাল ও কোষাগার ছিল। ফিরুজাবাদ, ফতেহাবাদ, খিলাফতাবাদ, বরবকাবাদ, সোনারগাঁও, সাতগাঁও প্রভৃতি শহরেও টাঁকশাল ছিল। টমাস সাতটি টাঁকশাল-শহরের নাম দিয়েছেন, যার মধ্যে দুটি নাম নূতন : শহর-ই-নও ও ঘিয়াসপুর।[১৩] ব্লকম্যান তিনটি নাম টমাসের ফিরিস্তিতে যোগ করেছেন—ফতেহাবাদ, খিলাফতাবাদ ও হুসেনাবাদ। এইসব নাম থেকে বোঝা যায় সব প্রধান নগরকেন্দ্রেই টাঁকশাল ছিল। শাসনব্যবস্থায় 'দারোগা-ই-টাঁকশাল' নামক বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র পদটি টাঁকশালগুলির গুরুত্ব নির্দেশ করে।[১৪]

মধ্যযুগীয় নগরবিন্যাসে সর্বত্রই ধর্মীয় সৌধগুলির প্রাধান্য দেখা যায়। এযুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ধর্মীয় তত্ত্ব, শুধু ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে নয়, রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রই ছিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালকশক্তি, যা যুক্ত করা হয়েছিল জনকল্যাণমূলক ধারণার সঙ্গে। সুতরাং নগর গঠনের অপরিহার্য উপাদান ছিল মসজিদ ও সংশ্লিষ্ট মক্তব-মাদ্রাসা, লঙ্গরখানা-ইয়েতিমখানা ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি। ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানগুলি ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের ও প্রসারের প্রধান সহায়ক ছিল। মসজিদ ছিল মধ্যযুগে ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির মুখ্য স্তম্ভস্বরূপ। রাজ্যজয় করা মাত্র মুসলমান বিজেতারা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে বিজয় ঘোষণা করতেন। প্রভাবশালী সুফীদের ও শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত উলেমাগোষ্ঠীকে তোষণ-পোষণ করার জন্যও মসজিদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হতো। আলোচ্যযুগের মসজিদ সংলগ্ন অসংখ্য শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয় সুলতান, আমীর-মালিকদের অর্থানুকূল্যে বড়ো বড়ো শহরগুলিতে জামী মসজিদ নির্মিত হতো, এগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকত বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিদের উপর। বহুক্ষেত্রে পূর্বতন নগরগুলির মন্দির, দেবায়তন, চৈত্য, বিহার ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ থেকে, ধ্বংস করে বা পরিবর্তিত করে মসজিদ নির্মাণ করা হতো। বৌদ্ধ বিহার ও গর্ভগৃহগুলি সুলতান ও পীরদের সমাধিতে পরিণত করা হতো। কালে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হতো ও স্থান-মাহাত্ম্যের সুযোগে তীর্থ-নগরী গড়ে উঠত। ধর্মীয় মানসিকতা ও দৃষ্টি-

১৩ ই. টমাস, 'ক্রনিকলস অফ পাঠান কিংস অফ দিল্লী', লন্ডন, ১৮৭১, পৃ. ১৫১।
১৪ এইচ. ব্লকম্যান, 'কন্ট্রিবিউশনস টু দ্য জিওগ্রাফী এ্যান্ড হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল' (এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৯৬৮, পৃ. ৬)।

ভঙ্গি নগরায়ণের ধারাকে ও নগরজীবনকে সে-যুগে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করত ; মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করে রাষ্ট্র ধর্মীয় গোষ্ঠী মারফৎ জন-জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত। মধ্যযুগে ইসলামী স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি পাওয়া যায় দুটি রাজধানী-নগরী —গৌড় ও পাণ্ডুয়ায়। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, একলাখী মসজিদ, গৌড়ের গুণমন্ত, দরসবাড়ি, তাঁতিপাড়া, বড়সোনা ও ছোটসোনা, লত্তন, কদমরসুল, বাগেরহাটের সাডগম্বুজ, ছোটো পাণ্ডুয়ার বার দোয়ারী, ত্রিবেণীর জাফরখান ইত্যাদি মসজিদগুলিকে উপরোক্ত আলোচনার সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থিত করা যায়।[১৫]

মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যা ছিল সর্বদাই সামরিক শক্তির ভিত্তিতে স্থাপিত, সেখানে দুর্গ ছিল অপরিহার্য। মুসলমান শাসনকালে 'শহর' ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র, দুর্গ-নগরীকে বলা হতো 'খিট্টা', অরক্ষিত ছোট শহরকে বলা হতো 'কসবাহ্' ; এ ছাড়াও ছিল 'গঞ্জ', 'কাটরা' প্রভৃতি বাণিজ্যিক লেন-দেনের স্থান। দুর্গের গঠনপ্রণালী ছিল দুর্গ, প্রাকার, পরিখা, পরিদর্শন স্তম্ভ, কাটরা বা বাজার ইত্যাদি। এই সুরক্ষিত স্থানগুলিকে কেন্দ্র করে হতো নগরবিন্যাস। বহুক্ষেত্রে দুর্গগুলি হতো রাজধানীর অবিচ্ছেদ্য অংশ-বিশেষ। বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময়ে বা অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত অবস্থায় শাসকরা নিরাপত্তার জন্য রাজধানীর প্রাসাদ ত্যাগ করে দুর্গনগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। ইলিয়াস শাহ, ফিরুজ তুঘলকের প্রথমবার বাংলা আক্রমণকালে (১৩৫৪), একডালার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফিরুজ দ্বিতীয়বার বাংলা আক্রমণ করলে (১৩৫৮) সিকান্দার শাহ একই পথ অবলম্বন করেন।[১৬] গড় মান্দারণ, চন্দ্রকেতুগড়, বাণগড় ইত্যাদি ছিল প্রাক্-মুসলিম যুগের দুর্গসমূহ। বখ্‌তিয়ার খলজী দেবকোটে তাঁর প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন, কারণ ইতি-মধ্যেই সেখানে বাণগড় অবস্থিত ছিল।[১৭] মিনহাজ বলেছেন, লখনৌতি দেশটি দুভাগে ভাগ করা ছিল, দেবকোট ছিল তার পূর্বভাগে বা বরেন্দ্রে।[১৮] বুকানন দিনাজপুরের দক্ষিণে পুনর্নভার বামতীরে দমদমার নিকটবর্তী

১৫. এস. এম. চক্রবর্তী, "প্রি-মুঘল মসকস অফ বেঙ্গল" ('জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল', খণ্ড, ১৯১০, পৃ. ২৯-৩৮)।

১৬. জিয়াউদ্দীন বারানী. 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' (মহম্মদ শহীদুল্লাহ অনূদিত, এর মধ্যে ; এন. কে. ভট্টশালী, 'কয়নস অ্যান্ড ক্রনলজী অফ দ্য আর্লি সুলতানস অফ বেঙ্গল', কেমব্রিজ, ১৯২২, পৃ. ১৫৫)।

১৭ মিনহাজ, 'তবাকৎ', উদ্ধৃত, পৃ. ৫৬২।

১৮ ঐ।

পুরাতন দুর্গকে দেবকোটের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন।[১৯] ব্লকম্যান বলেছেন, গঙ্গারামপুরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের নিকট ছিল দেবকোট, যে-স্থানে পাওয়া গিয়েছে প্রাচীনতম মুসলিম অভিলেখ।[২০] লখনৌতির নিকট বিষণকোট দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হুসামুদ্দিন আইওয়াজ খলজী।[২১] একডালা দুর্গের অবস্থান সম্পর্কে মতান্তর আছে। অনেকে মনে করেন এই দুর্গের অবস্থিতি ছিল গৌড়ের ৪২ মাইল ও পান্ডুয়ার ২৩ মাইল উত্তরে, ঘোড়াঘাট থেকে ১৫ মাইল পশ্চিমে টাঙ্গন নদীর অন্যতীরে। এই দুর্গ-নগরীর কোনো ধ্বংসাবশেষ এখনও পাওয়া যায় নি।[২২] গৌড় দুর্গের বর্ণনা দিতে গিয়ে কানিংহাম বলেছেন, লখনৌতি শহরের এই দুর্গ ছিল পুরাতন গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত। তাঁর বিবরণে জানা যায়, বিশাল উচ্চ রক্ষাপ্রাচীর, যার প্রতিকোণে একটি করে গোলাকার বুরুজ ও তোরণ এবং চারদিক ঘিরে গভীর পরিখার কথাও। তাঁর মতে, মেহমুদশাহী সুলতানরা পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই দুর্গ নির্মাণ করান।[২৩] কালের নির্মম হস্তক্ষেপ অগ্রাহ্য করে এর প্রধান তোরণ দাখিল দরওয়াজা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তেলিয়াগড় বা তেলিয়াগড়হি যদিও বাংলার পশ্চিম দিকের প্রবেশদ্বার স্বরূপ ছিল, তবুও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মিনহাজ ও বারানী দুজনের একজনও এই দুর্গের উল্লেখ করেন নি। গড় জরীপা ছিল অধুনা ময়মনসিংহ জেলার শেরপুরে অবস্থিত। উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, দুর্গ নগর-গঠনের একটি প্রধান উপাদান ছিল এবং সামরিক প্রয়োজন ছাড়াও নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবেও থাকত।

আলোচ্য যুগে স্থানীয় দরবারী ইতিহাস ও সরকারি নথিপত্র না থাকায় শাসনতান্ত্রিক নগরবিন্যাস বিষয়ে তথ্যের যথেষ্ট অভাব আছে। প্রাক্-মুঘল যুগের রাজস্বভিত্তিক শাসনতান্ত্রিক বিভাগগুলিকে বিভিন্ন সময়ে ইক্তা, ইক্লীম, আর্সাহ্, তক্সিম্, শিক্, মুলক্ ইত্যাদি বলা হতো। মুঘল যুগে আবুল ফজল-এর 'আইন-ই-আকবরি'তে টোডরমল-এর রাজস্ব ব্যবস্থায় জমার হিসাব (১৫৮২) পূর্ববর্তী রাজস্ব-বিভাগগুলির ভিত্তিতে তৈরি করা হয়।

১৯. ব্লকম্যান, উদ্ধৃত, পৃ. ১৪৭।

২০. ঐ।

২১. মিনহাজ, 'তবাকৎ', (বাংলা অনুবাদ, এম জ্যাকেরিয়া, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৪২, পাদটীকা, ৫)।

২২. এফ. এম. আবিদ আলী, 'মেময়ার্স অফ গৌর এ্যান্ড পান্ডুয়া' (বাংলা অনুবাদ, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৪৫)।

২৩. পরমাত্মা সরণ, "বেঙ্গল ইন দ্য আইন" ('প্রসিডিংস অফ বাংলাদেশ হিস্ট্রি কনফারেন্স', তৃতীয় অধিবেশন, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১৩৫)।

'আইন'-এ প্রত্যেক রাজস্ব-বিভাগের নাম ও টঙ্কার হিসাবে যে জমার পরিমাণ দেওয়া আছে তাতে জানা যায় যে, সে-যুগে বাংলায় ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি মহাল ছিল, ১৯টি সরকারের মধ্যে ৮টির এবং ৬৮২টি মহালের মধ্যে ২০৮টির মুসলিম নাম এবং বাকিগুলি হিন্দু নাম-যুক্ত ছিল। প্রত্যেক রাজস্ব-বিভাগের সদর দপ্তর ছিল একটি বন্দর বা নগর, যেগুলি আবার ছিল স্থানীয় শাসনকেন্দ্র। মুসলিম অধিকারের প্রাথমিক পর্যায়ের (১৩শ থেকে ১৪শ শতক) মুদ্রায় ও শিলালিপিতে প্রাপ্ত পূর্বতন হিন্দু নাম-যুক্ত শহরগুলি ক্রমশ মুসলিম নামে পরিবর্তিত হয়েছিল। টোডরমলের জমার হিসাবে প্রদত্ত অধিকাংশ সরকারের নাম টাঁকশাল-নগরীগুলির নামের সঙ্গে অভিন্ন। আবার শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, জামী মসজিদগুলি ঐসব শহরেই অবস্থিত ছিল। উনিশটি সরকার ও কুড়িটি টাঁকশালের নামের মধ্যে অন্তত ছ'টির নাম প্রাক্-মুসলমান যুগের বন্দর / নগরের, যেগুলি আলোচ্য যুগে পুনর্গঠিত বা উন্নীত হয়েছিল। রাজধানী ছিল শাসনতান্ত্রিক নগরীগুলির মধ্যমণি ও রাষ্ট্রীয় শক্তির কেন্দ্রবিন্দু। মুসলমান শাসকরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে রাজধানী পরিবর্তন করতেন—প্রথমে দেবকোট, পরে লখনৌতি, পাণ্ডুয়া, আবার গৌড়। মোঘল যুগে তান্ডায়, শেষে ঢাকায় ও মুর্শিদাবাদে। সুলতানী আমলে গৌড়ের অধিকার শক্তিশালী ও স্থায়ী রাজশক্তি সূচিত করত। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় রাজধানী পরিবর্তনের ফল শাপে ও বরে মিশ্রিত ছিল, একদিকে সেই জায়গায় মর্যাদা ও গুরুত্ব হানি হতো, অন্যদিকে একাধিক জায়গায় রাজধানী স্থাপনের ফলে নগরায়ণ প্রক্রিয়া শক্তি সঞ্চয় করত। এই সব নগরের শাসনক্ষমতার নিয়ন্ত্রক, নীতিনির্ধারক, শাসনযন্ত্রের কাঠামো, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক ও জনতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

যে বিশেষ অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল সেখানে বন্দরের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। সুলতানী শাসনকালে বাংলার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির ফলস্বরূপ নদী ও সামুদ্রিক বন্দরসমূহ আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সমকালীন গুজরাট ও বিজয়নগরের ইতিহাসে যে-সব বাণিজ্যিক ও সার্বিক পর্যায়ের আর্থনীতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, বাংলার বন্দর-নগরীগুলির ক্ষেত্রে সমান্তরাল ও তুলনীয় পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই শহরগুলি একই বাণিজ্যপথের উপরে এবং একই ধরনের বাণিজ্যরীতির মধ্যে অবস্থিত ছিল। সোনারগাঁও, চাটগাঁও ও সাতগাঁওয়ের উন্নতি ও সমৃদ্ধির পিছনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সক্রিয় ছিল একথা মনে করার সঙ্গত কারণও আছে। এই বন্দরগুলি মাধ্যমে বাংলার রেশম ও সুতিবস্ত্র রপ্তানি হতো 'through all Turkey,

through all Syria, through Persia, through Arabia Felix, through Ethiopia, and through all India'। ষোলো শতকের প্রথমভাগে ভারথেমা একথা বলেছেন।[২৪] আন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী এক প্রভাবশালী বণিক সম্প্রদায় এই বন্দর-নগরীগুলির অধিবাসী ছিল। সমকালীন বিদেশী ভ্রমণকারীদের লেখায় বিদেশী বণিকদের এবং বাংলা সাহিত্যে দেশী বণিক-চরিত্রের খোঁজ মেলে। হিন্দু বণিকেরা ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম থেকে শুরু করে সিংহল হয়েগুজরাট চলে যেতেন। বন্দর-নগরীর শ্রেণীবিন্যাসে বাণিজ্য-সমৃদ্ধির প্রভাব পড়েছিল। মা হুয়ান (১৫ শতক) বলেছেন, 'Wealthy individuals who build ships and go to various foreign countries are quite numerous…'। তিনি আরও বলেছেন যে, সুলতানগণ ব্যবসার জন্য জাহাজ বোঝাই করে বিদেশে পণ্য রপ্তানি করতেন।[২৫] তরফদারের মতে, সে-যুগে বৈদেশিক বাণিজ্য রাজতন্ত্র ও বণিকতন্ত্রকে এক অবিচ্ছিন্ন স্বার্থের সূত্রে বেঁধে দিয়েছিল।[২৬] নগরায়ণের আর্থনীতিক দিকটির বিচারে লক্ষণীয় যে, বন্দরগুলিই সর্বপ্রধান ভূমিকা পালন করে।

এযুগে নগরায়ণের স্তর সম্পর্কে অনুপুঙ্খ আলোচনা করার মতো যথেষ্ট তথ্যাদি হাতে না থাকলেও এ বিষয়ের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কী স্তরের নগরায়ণ হয়েছিল তার ওপর নগরের আয়তন, সংখ্যা ইত্যাদি নির্ভর-শীল। নগরের সংখ্যাবৃদ্ধি, আয়তনের বিস্তার, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি উন্নতমানের ও উচ্চস্তরের নগরায়ণের পরিচায়ক। সুলতানী আমলে বাংলায় মুসলিম নামযুক্ত নগরকেন্দ্রগুলির কোনগুলি নবপ্রতিষ্ঠিত, কোনগুলি পুন-র্গঠিত বা উন্নীত তা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। মুসলমান অধিকারের প্রাথমিক পর্যায়ে শহরগুলির নাম থেকে মনে হয় যে, সেগুলি প্রাক্-মুসলমান যুগের কেন্দ্র, যেমন, লখনৌতি / গৌড়, সোনারগাঁও, সাতগাঁও, পাণ্ডুয়া, দেবকোট ইত্যাদি। কিন্তু সুলতানী আমলে পুরাতন নগর-বন্দরগুলির নাম মুসলিম নামে পরিবর্তিত করা হয়েছিল। গৌড়কেই সর্বাধিক সংখ্যক নাম দেওয়া হয়; বিভিন্ন সময়ে শাসকেরা গৌড়ের একাধিক নামকরণ করেছিলেন, যেমন, মুহম্মদাবাদ, হুসেনাবাদ, জন্নতাবাদ ইত্যাদি। পাণ্ডুয়া হয়েছিল ফিরুজাবাদ, বাগেরহাট খিলাফতাবাদ। এছাড়াও অন্যান্য শহরের নামও পরিবর্তন করা হয়।

২৪. লুদভিকো দি ভারথেমা, 'দ্য ট্রাভেলস' (জোনস এ্যান্ড বাজার, লন্ডন, ১৮৬৩, পৃ. ২১২)।

২৫ মা হুয়ান, 'ফিলিপস (ভট্টশালী : 'কয়েনস', উদ্ধৃত, পৃ. ১৬৯-৭০, 'বিশ্বভারতী এ্যানালস', প্রথম খণ্ড, ১৯৪৪, পৃ. ১১৭, ১২৩-১২৫)।

২৬. তরফদার, "বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য", উদ্ধৃত।

অবশ্য সোনারগাঁও, সাতগাঁও, চাটগাঁওয়ের ক্ষেত্রে পূর্বের নামই বহাল রাখা হয়, এমনকি বিদেশী পর্যটকদের বিবরণেও। উপরের আলোচনা থেকে মনে হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাক্-মুসলমান যুগের নগর ও বন্দরগুলি এ যুগে উন্নীত ও পুনর্গঠিত হয়ে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে।

এখানে তিনটি ব্যতিক্রমধর্মী শহরের অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করাটা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না — শহর-ই-নও, হবঙ্ক ও বেঙ্গালা। প্রথম দুটির ক্ষেত্রে তথ্যের অভাবে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই ; কিন্তু 'বেঙ্গালা' সমস্যা সুলতানী আমলের বহুবিতর্কিত ও অমীমাংসিত প্রশ্ন। প্রাক্-মুসলিম যুগে এই তিনটি শহরের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। সিকান্দার শাহের সময়ের মুদ্রাসাক্ষ্য থেকে মনে হয় শহর-ই-নও/নবনগরী কেন্দ্রটির ইলিয়াসশাহী আমলের প্রারম্ভে পত্তন হয়। সিকান্দার শাহের একটি স্বর্ণমুদ্রায় এই নামটি খোদিত আছে (১৩৭৯)।[২৭] পরবর্তীকালে এই শহরের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় নিকোলো কন্তির ভ্রমণবৃত্তান্তে ; ইউল বলেছেন, নিকোলো কন্তির 'সেরনাভ'-ই শহর-ই-নও।[২৮] নাম থেকে মনে হয়, শহরটি মুসলমান আমলে প্রতিষ্ঠিত। ড. এনামুল হক মিরাম-ই-মাদারির সূত্র থেকে বলেছেন যে, তৎকালীন সমৃদ্ধিশালিনী গৌড়কেই শহর-ই-নও বলা হতো।[২৯] কিন্তু কেন গৌড়ের মতো একটি প্রাচীন শহরকে নবনগরী বলা হতো তা তিনি ব্যাখ্যা করেন নি। অনেকে আবার মনে করেন, এই শহর পাণ্ডুয়া-ফিরুজাবাদের সঙ্গে অভিন্ন। বোধহয় এই নগরকেন্দ্রটি উন্নতমানের আভ্যন্তরীণ বন্দর ছিল। কারণ ভারথেমা (১৫০৩-৮) গৌড়ে থাকতে সেরনাভ থেকে আগত খ্রীস্টান বণিকদের সাক্ষাৎলাভ করেছিলেন।[৩০] এই শহরের অবস্থিতি কোথায় ছিল তা স্থির করা যায় নি।

সুবিখ্যাত মরক্কো দেশীয় পর্যটক ইবন বতুতা (১৩৪৬) 'হবঙ্ক' নামে একটি শহরের চিত্রময় বর্ণনা রেখে গিয়েছেন।[৩১] ওই নামের কোনো শহরের উল্লেখ তৎকালীন কোনো মুদ্রা বা অভিলেখে পাওয়া যায় নি। ইবন বতুতার বিবরণ অনুযায়ী এই অতিচমকপ্রদ সুন্দরী নগরীর অবস্থান ছিল নীলনদী বা নহর-ই-

২৭. এ. টমাস, "ইনিসিয়াল কয়নেজ" ('জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' (ওল্ড সিরিজ), ১৮৬৭, পৃ. ৬৬)।
২৮. ইউলের মন্তব্য (ব্লকম্যান, উদ্ধৃত, পৃ. ৪)।
২৯. এমানুল হক, 'সুফিজম ইন বেঙ্গল', ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ১৫১।
৩০. ভারথেমা, উদ্ধৃত, পৃ. ২৭২।
৩১. ইবন বতুতা, 'ট্রাভেলস' (অনুবাদ এস. বোস ; ভট্টশালী, 'কয়েনস', উদ্ধৃত, পৃ. ১৫৪)।

অজরকের তীরে ; সেই নদী নেমে এসেছিল কামরূ পর্বতমালার মধ্য দিয়ে। নহর-ই-অজরক ধরে লখনৌতি দেশে চলে যাওয়া যেত—তার দুই তীর বরাবর দেখা যেত কত গ্রাম, বাগ-বাগিচা, জলচক্র, যেমনটি চোখে পড়ত মিশরের নীলনদের তীরে। এই সুন্দর জনপদেরও স্থান নির্ণয় করা যায় নি। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী দুটি সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন—এক, বরাক নদীর দুটি শাখা, সুর্মা নদ ও কাশিয়ারার মধ্যবর্তী স্থলে 'ভাঙ্গা' নামে একটি টিলা পাওয়া যায় ; দুই, সিলেট শহর থেকে ছ'মাইল উত্তর-পশ্চিমে 'হবঙ্গ' নামের একটা জায়গা। সুর্মা ও নীলনদ এক ও অভিন্ন, যার গতিপথ ধরে সোনারগাঁও হয়ে গৌড় পৌঁছানো যেত।[৩২] ইবন বতুতার বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অতীতের এই নগরীর অবস্থান ছিল কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে। এক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের আর্থনীতিক সম্পর্ক বা যোগাযোগ সম্বন্ধে কিছু না জানতে পারলেও, হবঙ্কের পারিপার্শ্বিকের বিবরণ থেকে অনুমিত হয়, এ ধরনের নগর-কেন্দ্র প্রধানত কৃষিজ উদ্বৃত্তের উপরই নির্ভরশীল ছিল।

বেঙ্গালা-র স্থান নির্ণয় ও পরিচিতি সর্বাধিক কঠিন সমস্যা। মুসলিম অধিকারভুক্ত এক বিশাল অঞ্চলকে 'বাঙ্গলাহ্' বলা হতো। সমস্যা হলো, 'বেঙ্গালা' নামে শহরের-বন্দরের উল্লেখ শুধু পর্যটকদের বিবরণে পাওয়া যাচ্ছে, মুদ্রা, অভিলেখ বা অন্যান্য দেশীয় সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে না। ইটালীয় পর্যটক ভারথেমা (১৫০৩-০৮) টেনাসেরিম থেকে বেঙ্গালা শহরে এসে পৌঁছান ; এই স্থান ছিল সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ও সুতি কাপড় ও রেশম রপ্তানির জন্য বিখ্যাত।[৩৩] পর্তুগীজ পর্যটক দুয়ার্তো বারবোসা ১৫১৮ সালে বেঙ্গালার সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, শহরের অধিবাসীরা অধিকাংশই মুসলমান এবং তাঁরা ছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্যে তৎপর ও তাঁদের বড় বড় জাহাজ ছিল। দুজনেই উল্লেখ করেছেন, এ শহরে নানাবিধ দামী পণ্যদ্রব্য পাওয়া যেত এবং সে-সব জিনিস এশিয়ার বিভিন্ন বন্দরে রপ্তানি করা হতো।[৩৪] ভারথেমার মতে এই বেঙ্গালাতেই 'here there are the richest merchants I ever met'।[৩৫] পর্তুগীজ লেখক টোম পিরেসও বেঙ্গালা শহরের উল্লেখ করেছেন, বাঙালীর প্রধান শহর বলে। বেঙ্গালা থেকে দেশের নাম হয়েছিল 'বাঙ্গালা' ; বন্দরটিতে

৩২. ঐ।
৩৩. ভারথেমা, উদ্ধৃত, পৃ. ২১২।
৩৪. দুয়ার্তো বারবোসা. 'দ্য বুক', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪৫-১৫৬ (হাকলুট সোসাইটি, লন্ডন, ১৯২১)।
৩৫. ৩৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

নিশ্চয়ই চল্লিশ হাজার লোকের বাস ছিল।[৩৬] এই সব বিবরণ থেকে বেঙ্গালা বন্দরের আন্তর্জাতিক রূপটি নিশ্চিত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উপরোক্ত তিনজন পর্যটকের পর সিজার ফ্রেডরিক (১৫৬৩) ও র‍্যালফ্ ফিচের (১৫৮৫-৮৬) বর্ণনায় বেঙ্গালার কোনো উল্লেখ নেই, তাঁরা চাটগাঁও, সাতগাঁও ও হুগলী বন্দরের নাম করেছেন। ড. যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে, আরব ভৌগোলিক অল ইদ্রিসি, খুরদাদ্‌বিহ্ প্রমুখের সরন্দর, চট্টগ্রাম ও বেঙ্গালা এক ও অভিন্ন।[৩৭] আবার অনেকে মনে করেন, বেঙ্গালার অবস্থিতি ছিল গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের সংগমস্থলের নিকটবর্তী এবং পরবর্তীকালে এই বন্দর জলমগ্ন হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[৩৮] নির্ভরযোগ্য উপাদান বা উপকরণের অভাবে এ বিষয়ে এখনও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় নি। পূর্বোক্ত সুলতানী আমলের পূর্বে অপরিচিত এই তিনটি শহরের সম্পর্কে বলা যায় যে, এগুলি সম্ভবত মুসলমান শাসনকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই নগরগুলি তিন ধরনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত—প্রথমটি আভ্যন্তরীণ নদী-বন্দর, দ্বিতীয়টি কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চলের অন্তর্বর্তী শহর ও তৃতীয়টি বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দর। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তিনটিই পূর্ব / দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে অবস্থিত ছিল। বিদেশী পর্যটকদের বিবরণে পাওয়া নামগুলির বিশেষ সমস্যা হচ্ছে বিভিন্ন ভাষায় এগুলির উচ্চারণ-বিকৃতি।

৩

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যলব্ধ ধনসম্পদ গৌড়, পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও, চাটগাঁও ও সাতগাঁওয়ের আর্থনীতিক সমৃদ্ধির কারণ ও উন্নত মানের নগর-সভ্যতার দ্যোতক। এই পাঁচটি জায়গা ছিল তৎকালীন বাংলার প্রধানতম নগরকেন্দ্র। স্বাভাবিক কারণেই অধিকাংশ বিদেশী পর্যটক গৌড়, পাণ্ডুয়া, চাটগাঁও, সাতগাঁও, সোনারগাঁওয়ে আসতেন, তাই তাঁদের বিবরণে এই জায়গাগুলির প্রচুর বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রায় সব বিদেশী বণিক পর্যটক চাটগাঁও বন্দর দিয়ে প্রবেশ করে সোনারগাঁও হয়ে গৌড়-পাণ্ডুয়া যেতেন। এই পাঁচটি শহরের আর্থনীতিক ভিত্তি, দৈহিক গঠনপ্রণালী, শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বাংলার মুসলিম শাসনের সংগে সার্বিকভাবে যুক্ত। এই পাঁচটি নগর প্রাক্-মুসলিম যুগেও বর্তমান ছিল, কিন্তু মুসলিম শাসনকালে তাদের আর্থনীতিক পুনরুজ্জীবন ঘটে।

৩৬. টোমে পিরেস, 'সুমা ওরিয়েন্টাল', কর্টেসাও, উদ্ধৃত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩।
৩৭. মুখার্জী, 'কয়েনস', উদ্ধৃত।
৩৮. আবদুল করিম, 'বাংলার ইতিহাস—সুলতানী আমল', ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৪৪।

এগুলির ক্ষেত্রে বাংলার নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় একটি পারম্পর্য ও প্রবহমানতা রক্ষিত হয়েছে।

গৌড় থেকে বিশ মাইল উত্তর-পূর্বে পাণ্ডুয়া শহর অবস্থিত। হুগলী জেলার ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়া-র সঙ্গে প্রভেদ বোঝাবার জন্য ও মুসলমানদের পুণ্য-স্থান বিবেচনায় মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ার পূর্বে 'হজরত' শব্দ ব্যবহার করা হয়। 'রিয়াজ-উস-সালাতিন'-এ আছে যে, আলাউদ্দীন আলি শাহকে হত্যা করে শামস-উদ্দীন ইলিয়াস শাহ যখন হজরত পাণ্ডুয়ায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন, তখনই মুসলিম ইতিহাসে সর্বপ্রথম পাণ্ডুয়ার নাম উল্লেখিত হয়।[৩৯] কিন্তু তারও ত্রিশ বছর আগে শামস-উদ্দীন ফিরুজশাহের সময়ে (১৩০১-২২) এই শহর বাংলার রাজধানী ছিল। আলাউদ্দীন আলি শাহের সময়েও পাণ্ডুয়ার নাম ছিল ফিরুজাবাদ। ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গকে আপৎকালে বসবাসের জন্য ব্যবহার করলেও, পাণ্ডুয়াতেই তাঁর রাজধানী ছিল; কারণ ইলিয়াস শাহের সব মুদ্রা ফিরুজাবাদ টাঁকশাল থেকে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। নাসিরুদ্দীন মেহমুদ শাহের রাজত্বকাল পর্যন্ত পাণ্ডুয়াই ছিল মুসলিম বাংলার রাজধানী। গঙ্গার পূর্বতন ধারা ও মহানন্দার সংযোগস্থলের নিকটবর্তী এই শহরের অবস্থান প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখান থেকে সহজেই উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে ও বিহারে যাতায়াত করা যেত। পাণ্ডুয়ার পাশে পুরাতন মালদায় একটি কাটরা বা বণিকদের সরাইখানা ছিল। 'রিয়াজ'-এ আছে, যখন ফিরুজশাহ তুঘলক ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে বাংলা আক্রমণ করেন, তখন তিনি কাটরায় শিবির স্থাপন করেন।[৪০] মূল্যবান পণ্যসামগ্রী প্রথমে এই কাটরায় আমদানি ও মজুত করে পরে রাজধানী পাণ্ডুয়ায় পাঠানো হতো। এই সব তথ্য বাণিজ্যিক পণ্যের ব্যবহারকারী পাণ্ডুয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব নির্দেশ করে।

রাজা গণেশের বংশের রাজত্বকালে এই অনুপম রাজধানী-নগরীর জীবনযাত্রা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে বহু তথ্য মেলে চীনা সূত্র থেকে। পাণ্ডুয়ার ঐশ্বর্যপূর্ণ বিলাসবহুল জীবনযাত্রা সম্পর্কে লিখেছেন ফেই শিন (১৪৩৬)—এই শহরের প্রাচীর ছিল সুউচ্চ, বাজার অত্যন্ত সুব্যবস্থাসম্পন্ন, সারিবদ্ধ স্তম্ভের নিচে থরে থরে পণ্যদ্রব্য সাজানো পাশাপাশি সব দোকান। হুয়াং শিং সেং (১৫২০) ও ইয়েন স' অং কিয়েন (১৫৭৪) পর্যন্ত চীনা লেখকদের বিবরণে পাণ্ডুয়ার

৩৯. গোলাম হোসেন সলীম, 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' (এ. সালাম অনূদিত॰ কলিকাতা, ১৯১০, পৃ. ৯৮)।

৪০. ঐ।

সংবাদ মেলে।[৪১] নাসিরুদ্দীন মেহমুদ গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তর করা সত্ত্বেও পাণ্ডুয়ার গুরুত্ব একেবারে হ্রাস পায় নি বা সার্বিক পতনও ঘটে নি। মুসলিম শাসনামলে পাণ্ডুয়াকে তীর্থনগরীর নিদর্শন ধরা যেতে পারে।[৪২] মখদুম শাহ জালালের দরগা, শেখ আলাউল-হকের মাজার, হজরত নূর কুতুব আলমের দরগা, একলাখী সমাধিসৌধ, কুতুবশাহী মসজিদ ও ভারতের বৃহত্তম প্রার্থনা-গৃহ, আদিনা মসজিদ যুগে যুগে এই শহরের স্থানমাহাত্ম্য বজায় রেখেছে। রাজধানী স্থানান্তরের কারণে রাজনৈতিক গুরুত্ব কমে যাওয়া সত্ত্বেও তীর্থস্থানের মহিমায় পাণ্ডুয়ায় প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র যাত্রী সমাবেশ হতো; স্বয়ং আলাউদ্দীন হুসেন শাহ একডালা থেকে পদযাত্রা করে পাণ্ডুয়ায় নূর কুতুব আলমের দরগায় জিয়ারত করতে আসতেন। শাহ জালালের, কুতুব শাহের দরগায় ও মসজিদের প্রচুর ভূসম্পত্তি ওয়াকফ পাওনা হয় এবং শেখ নূর কুতুবের বংশধরেরা ইনাম জমির ভূ-স্বত্বভোগী হন। এইদিক থেকে বিচার করলে পাণ্ডুয়া তীর্থনগরীর সম্মান অর্জনের ফলে সার্বিক পতনের হাত থেকে রক্ষা পায়।

শুধুমাত্র বাংলায় নয়, সুলতানী আমলে গৌড়/লখনৌতি সারা হিন্দুস্তানের মধ্যে একটি প্রধান শহর বিবেচিত হতো। দিল্লী ব্যতীত তৎকালীন ভারতে গৌড়ের সমকক্ষ কোনো শহর ছিল না। গৌড়ের সৌন্দর্যে, ঐশ্বর্যে, বহু বিজেতা ও পর্যটক বিমোহিত ও আশ্চর্য হয়েছেন। পুরাতন গঙ্গানদী ও মহানন্দার সঙ্গমস্থলে এই শহর অবস্থিত ছিল। প্রাক্-মুসলমান যুগ থেকে কনৌজ, দিল্লী এবং গৌড়ের রাজধানী-নগরীরূপে প্রাচীন পরম্পরা ছিল। বাংলার হিন্দুরাজারা গৌড় অধিকারের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন, সফল হলে 'গৌড়েশ্বর' পদবী গ্রহণ করতেন। মুসলিম শাসনকালে হিন্দু কবিরা গৌড়ের পূর্বমর্যাদা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করে সুলতানদের 'গৌড়েশ্বর' আখ্যায় ভূষিত করতেন। হিন্দু শাসনকালে পঞ্চ গৌড় অর্থে রাঢ়, বরেন্দ্র, পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও বঙ্গ বোঝাত। সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহকে চৈতন্যজীবনীকার 'কাল যবন রাজা পঞ্চগৌড়েশ্বর' বলেছেন।[৪৩] এই পঞ্চগৌড় অঞ্চলকে মুসলমানরা 'বাঙ্গালাহ্' নামে পরিবর্তিত করেন। সুলতানরা মুদ্রায় ও শিলালিপিতে গৌড়ের স্থানে লখনৌতি/লক্ষ্মণাবতী নামটিই ব্যবহার করেছেন। তার একটি কারণ হতে পারে যে, বিজয়কালে তাঁরা 'লক্ষ্মণাবতী' নামের অধিক

৪১. 'বিশ্বভারতী এ্যানালস', প্রথম খণ্ড, উদ্ধৃত, পৃ. ১২১, ১২৬, ১২৭, ১৩০।

৪২. সলীম, 'রিয়াজ', উদ্ধৃত, পৃ. ১৫৪; হিন্দুশাহ আশাবাদী, 'তারিখ ই-ফিরোজ-শাহ', দ্বিতীয় খণ্ড (জে. ব্রিগস, কলিকাতা, ১৯০৯, পৃ. ৩৪২)।

৪৩. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, 'চৈতন্য চরিতামৃত' (সুকুমার সেন সম্পাদিত, ১৯৭৭)।

প্রচলন দেখেছিলেন এবং উচ্চারণের ও উৎকীর্ণ করার সুবিধার্থে লখনৌতি নামে পরিবর্তিত করেন।

মেহমুদ শাহী সুলতানদের আমল থেকে গৌড়কে স্থায়ী রাজধানী করা হয়। জলপথে ও স্থলপথে দেশের সকল অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সুবিধা রাজধানী পরিবর্তনের একটি প্রধান কারণ ছিল। সে-যুগে গঙ্গানদী গৌড়ের পাশ দিয়ে প্রবহমান ছিল, ফলে প্রচুর পরিমাণ পণ্যদ্রব্য-পরিপূর্ণ নৌকা বিভিন্ন স্থান থেকে আসা-যাওয়া করত। কৃষিজ উদ্বৃত্ত ও বাণিজ্যলব্ধ ধন এই নগরটিকে সমৃদ্ধি দান করে। গৌড় ছিল শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এই নগরী অবস্থিত ছিল এবং সমৃদ্ধির কারণে এর জনসংখ্যা ছিল বিপুল। বিদেশী লেখকদের উচ্ছ্বসিত বর্ণনায় উল্লেখিত সুবিশাল রাজপ্রাসাদ, দুর্গ, রাজপথ, মসজিদ, তোরণ, আমোদ-প্রমোদ, পানাভ্যাস, ভোজসভা ইত্যাদি, বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ও শাসকদের সাহিত্য ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতা উন্নতমানের নগর-সভ্যতার পরিচয় বহন করে। জাহাজ ও দালান-ইমারত নির্মাণ, বাণিজ্যিক, সামরিক, শাসনতান্ত্রিক কাজকর্ম পরিচালনা, মুদ্রাঙ্কন ও অন্যান্য শিল্প ও কারিগরিবিদ্যা বিশিষ্ট প্রকৌশল-নিযুক্তির প্রমাণ দেয়। গৌড় শহরের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তার আন্তর্জাতিক চরিত্র—বিদেশী বণিক পর্যটক, আরব, ইরানী, আবিসিনীয়, পতুর্গীজ ব্যবসায়ীরা, সারা হিন্দুস্তান থেকে বণিক, দাস-ব্যবসায়ী, হার্মাদ, হাবশি, সবাই যেত গৌড়ে—ইবন বতুতার ভাষায় 'দোজখ-পুর-ই-নিয়ামত'।[৪৪] এই রাজধানী-নগরীর আয়তন সম্পর্কে বিদেশীপর্যটকদের মধ্যে মতভেদ আছে। জোয়াও দ্য বারোস বলেছেন, গৌড়ের জনসংখ্যা ছিল দু-লক্ষ, রাস্তাগুলি সর্বদা এত জনাকীর্ণ থাকত যে পরস্পরকে অতিক্রম করে যাতায়াত ছিল দুঃসাধ্য।[৪৫] ফারিয়া ই সুজা বলেছেন, সুরক্ষিত এই শহরের আয়তন ছিল লম্বায় ৯ মাইল আর এখানে বারো লক্ষ পরিবার বসবাস করত। এই শহরের জনসংখ্যা এত বেশি ছিল যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মিছিলের সময়ে ভিড়ের চাপে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতো।[৪৬] হুসেন শাহ গৌড়ের থেকে দুর্গনগরী একডালার তাঁর রাজধানী স্থানান্তর করেন। তার কারণ ছিল সম্ভবত নগরীর পূর্বদিকে বহমান ছুটিয়াপাটিয়া নদীর ঋতুকালীন জলস্ফীতি ও গঙ্গার গতিপথ

৪৪. ইবন বতুতা, 'ট্রাভেলস' (ভট্টশালী, উদ্ধৃত, এ্যাপেনডিক্স ১, পৃ. ১০৫)।
৪৫. জোয়াও দ্য বারোস, 'দ্য এশিয়া' (বারবোসা, উদ্ধৃত, পৃ. ২৪১)।
৪৬. ফারিয়া ই সুজা, 'দ্য পর্তুগীজ এশিয়া', প্রথম খণ্ড (স্টিভেনস-এর ইংরাজি অনুবাদ), লন্ডন, ১৬৯৫, পৃ. ৪১৬-৪১৭)।

পরিবর্তন যার ফলে রাজধানীর যাতায়াতের পথ ও বাণিজ্যিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছিল এবং বিশেষ করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। গৌড়ের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক চরিত্র, ইসলামী গঠনরীতি, বিপুল জনসংখ্যা, বিশাল আয়তন মুসলিম শাসনকালে বাংলার শ্রেষ্ঠ মহানগরী আখ্যা লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। এটি ছিল শাসনতান্ত্রিক নগরী বা রাজধানী-নগরীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

মুসলিম অধিকারের প্রারম্ভিক পর্যায়ে (১২০৬-১৩৩৮) অধিকৃত বাংলা তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল—লখনৌতি, সোনারগাঁও ও সাতগাঁও। এই যুগে সোনারগাঁও ছিল পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর ও ফকরুদ্দীন মুবারক শাহের রাজধানী। চোদ্দো শতকের মধ্যভাগে ফকরুদ্দীন মুবারক শাহের বংশের পতনের পর সোনারগাঁও পূর্ববঙ্গের রাজধানীর মর্যাদাচ্যুত হয়। ১৩৪৬ সনে ইবন বতুতার নিকট সোনারগাঁও দুরধিগম্য বলে মনে হয়েছিল কারণ কোনো বিদেশী পর্যটকের পক্ষে সেই জলাভূমি পার হওয়া ছিল খুবই দুরূহ কর্ম।[৪৭] অবশ্য যে-সময়ে তিনি বাংলা ভ্রমণ করছিলেন, গৌড়ের অধিকার নিয়ে তখন সোনারগাঁওয়ের ফকরুদ্দীন মুবারক শাহ ও আলাউদ্দীন আলি শাহের মধ্যে ক্ষমতা-দ্বন্দ্ব চলছে। সম্ভবত যুদ্ধকালীন নিরাপত্তার জন্য সে-সময় সোনারগাঁওকে সুরক্ষিত রাখা হয়। এই ঘটনার বহু পরেও সোনারগাঁওকে 'হজরত জালাল' (মহা-সম্মানিত) অভিধায় উল্লেখ করা হতো। তার কারণ সোনারগাঁওয়ে সুফীদের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল। ফকরুদ্দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী দরবেশ শায়দা সোনারগাঁওয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শেখ আলাউল হককে সিকান্দার শাহ ঐ শহরে নির্বাসিত করেন। হজরত নুর কুতুবের শিষ্য ও পৌত্র রাজা গণেশের অত্যাচারে সোনারগাঁওয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তেরো শতকের শেষভাগে শেখ আবুতওয়ামা সেখানে একটি সুফী কেন্দ্র স্থাপন করেন যেখানে ভারতের নানা প্রান্ত থেকে দরবেশরা শিক্ষানবিশী করতে আসতেন।

সুলতানী আমলে সোনারগাঁও একটি সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল এবং পূর্ব বাংলার প্রধান শহর ও টাঁকশাল-নগরী রূপে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিদেশী বণিক ও পর্যটকেরা চাটগাঁও বন্দরে অবতরণ করে সোনারগাঁও হয়ে গৌড়-পাণ্ডুয়া পেঁছাতেন। মা হুয়ান সুমাত্রা থেকে যাত্রা করে একুশ দিন ধরে জাহাজে এসে চাটগাঁওয়ে নামেন, তারপর ক্ষুদ্র একটি নৌকায় করে 'সোনা-উরহ-কং' যান।[৪৮] রাজধানী পাণ্ডুয়া থেকে (উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত) সোনারগাঁওয়ের

৪৭. বতুতা, উদ্ধৃত, পৃ. ১৩৮।

৪৮. মা হুয়ান, উদ্ধৃত, এ্যাপেনডিক্স ৩।

দূরত্ব ছিল ২৫০ মাইল। এই শহরটির অর্থনীতি চাল ও সুতিবস্ত্র রপ্তানির উপর প্রধানত নির্ভরশীল ছিল। ফেই সিন বলেছেন, 'সুওনা-উল-কিয়াং-শহর দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ; এখানে দীঘি, রাস্তাঘাট ও বাজার আছে, সেখানে সবরকম পণ্যদ্রব্যের কেনাবেচা চলে।'[৪৯] সোনারগাঁও সম্পর্কে বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বেশি কিছু জানা যায় না, তার একটি কারণ তাঁরা চাটগাঁও থেকে গৌড়-পাণ্ডুয়া যাবার পথে এই শহরে অল্প সময়ের জন্য মধ্যবর্তী স্থান হিসাবে ব্যবহার করতেন এবং এখানে যাবার জন্য জলাভূমি পার হওয়া যাতায়াতের পক্ষে অনুকূল ছিল না। ১৬০৮ সনে ঢাকায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে পূর্ব-বঙ্গের প্রধান শহর হিসাবে সোনারগাঁওয়ের মর্যাদাহানি ঘটে ও তার পতন হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের বাণিজ্যিক প্রবহমানতার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। চাটগাঁও ছিল সে-যুগে বাংলার জলপথে প্রথম প্রবেশদ্বার ও প্রধান বন্দর। প্রাক্-মুসলমান যুগে এই বন্দর-নগরী বাণিজ্যিক লেনদেনের অভাবে পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে। মুসলমান শাসনকালে চোদ্দো শতকের মধ্যেই এই শহরটির পুনরুজ্জীবন ঘটে। পাল যুগে চট্টগ্রাম অঞ্চলে (প্রাচীন হরিকেলা, অধুনা বাংলাদেশে) সমন্দর নামে এক বন্দর ছিল। এই বন্দরের সঙ্গে দক্ষিণ-ভারত, সিংহল, পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। বারো শতকের পর্যটক অল্-ইদ্রিস বলেছেন, সমন্দর একটি বৃহৎ শহর, পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী, এখানে লাভজনক ব্যবসার সম্ভাবনা আছে। তিনি এই বন্দরের একটি বিস্তৃত পশ্চাদ্‌ভূমির (করিম-সমন্দর=চট্টগ্রাম) ইঙ্গিত দেন ও বলেন, এই শহর থেকে একদিনের পথ অতিক্রম করলে একটি বিশাল দ্বীপে পেঁছানো যেত, সেখানে ঘন জনবসতি ছিল ও বিভিন্নদেশের বণিকদের দেখা পাওয়া যেত। অনুমিত হয়, এই দ্বীপ চট্টগ্রামের অদূরে ঐ অঞ্চলে অবস্থিত সন্দ্বীপ। আবার অনেকে মনে করেন, মিনহাজের 'বরমপুত্র' ও সমন্দর অভিন্ন ছিল।[৫০] ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে সমন্দর, চাটগাঁও ও বেঙ্গালা এক ও অভিন্ন।[৫১] আবদুল করিম বলেছেন, সমসাময়িক পর্তুগীজ মানচিত্রের এবং ভারথেমা ও বারবোসার বর্ণিত 'বেঙ্গালা'কে চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে তুলনা করা যায়, কিন্তু কেন তৎকালীন বহুলপ্রচলিত নাম চট্টগ্রাম (চাটগাঁও)-কে বেঙ্গালা বলা হয়েছে, তার কোনো

৪৯. 'বিশ্বভারতী এ্যানালস', খণ্ড ১, ১৯৪৫, পৃ. ১২৩।
৫০. আবদুল করিম, "সমান্দার অফ দ্য আরব জিওগ্রাফারস" ('জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'), ১৯৬৭। দ্বিতীয় খণ্ড, পার্ট ১, পৃ. ১৭।
৫১. মুখার্জী, "কমার্স এন্ড মানি", উদ্ধৃত।

যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা মেলে না। চোদ্দো শতকের মধ্যভাগে ইবন বতুতার 'সাদকাওয়ান'কে চাটগাঁওয়ের সঙ্গে অভিন্ন প্রমাণ করে নলিনীকান্ত ভট্টশালী তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ সমাধান করেছেন।[৫২] ইবন বতুতা বলেছেন, বাংলায় এসে সমুদ্রতীরে এই বৃহৎ বন্দরটিতে তিনি প্রথম পদার্পণ করেন। বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনের প্রতীকস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় চট্টগ্রাম। পর্তুগীজরা যখন বাংলায় আসেন তখন চাটগাঁও (চিটাগাং) রাজধানী গোড়ে পৌঁছাবার প্রথম দ্বারপথ, বৃহত্তম বন্দর-নগরী—'পোর্তো গ্রাঁদ'। মেঘনার মোহনায় অবস্থিত এই বন্দর নাব্যতার দিক দিয়ে অত্যন্ত সুবিধাজনক ছিল। পর্তুগীজদের কাছে বাংলায় যাওয়ার অর্থ ছিল চাটগাঁও যাওয়া।[৫৩] ষোলো শতকের প্রথম থেকে চট্টগ্রামের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক অধিকারের জন্য বাংলা, ত্রিপুরা ও আরাকানের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। এসব সত্ত্বেও বাংলার তৎকালীন সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ ত্রিপুরার পণ্যদ্রব্য চট্টগ্রাম বন্দর মারফৎ চলাচল করতে অনুমতি দেন; সম্ভবত এই সব পণ্যদ্রব্যের ওপর প্রচুর বন্দর-শুল্ক ধার্য করা হতো। ১৫১৩ খ্রীস্টাব্দে ত্রিপুরা-রাজ ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম অধিকার করলে ক্ষমতাদ্বন্দ্ব আরও ঘনীভূত হয়।[৫৪] 'তারিখ-ই-হামাদী'-তে আছে, চট্টগ্রামের বাণিজ্যে পশ্চিম এশিয়ার বণিক-সম্প্রদায়ের এমনই স্বার্থ বিজড়িত ছিল যে একজন বাগদাদী বণিক নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহকে চট্টগ্রাম নিজ অধিকারে রাখার জন্য ক্রমান্বয়ে উত্তেজিত করতে থাকেন।[৫৫] ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দে নসরৎ শাহ আরাকান রাজের কাছ থেকে চট্টগ্রাম পুনরায় অধিকার করেন। হুসেনশাহী বংশের অন্তিম পর্যায়ে তৃতীয় মেহমুদ শাহ পর্তুগীজদের হাতে বাণিজ্যিক শুল্ক আদায়ের অধিকার তুলে দেবার পর থেকে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামের গুরুত্বহানি হয়। তবুও 'লবণাম্বু সন্নিকট / কর্ণফুলী-নদীতট' এই নগরী 'মনোভব মনোরম / অমরাবতী সম' ছিল।

সপ্তগ্রামের ধর্মীয় ঐতিহ্য প্রাচীনতা দাবি করে। এর কাছাকাছি ত্রিবেণীতে ভাগীরথী তিন ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল—সরস্বতী সাতগাঁর পাশ দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে, যমুনা দক্ষিণ-পূর্বে ও ভাগীরথীর মূলধারা দক্ষিণে হুগলী নদী নামে প্রবাহিত হতো। পনেরো শতকের কবি বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের লেখায় সপ্তগ্রাম

৫২. ভট্টশালী, 'কয়েনস এ্যান্ড ক্রনোলজী', উদ্ধৃত, পৃ. ১৪৫-৪৭।
৫৩. জে জে. এ. স্যাম্পস, 'দ্য পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল' (পুনঃপ্রকাশ), পাটনা, ১৯৭৯, প্রয়োজনীয় অংশ।
৫৪. করিম, বাংলার ইতিহাস', উদ্ধৃত—ত্রিপুরা রাজমালা, উদ্ধৃত, পৃ. ৩০৩-৩০৮।
৫৫. 'তারিখ-ই-হামাদী', ব্লখম্যান-এর ইংরাজী অনুবাদ ('জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল', ১৮৭২, খণ্ড ৪১, পৃ. ৩৩৬-৩৭)।

এক মুক্ত বন্দর রূপে উদয় হয়, যেখানে 'গঙ্গা আর সরস্বতী / যমুনা বিশাল অতি', 'গঙ্গা সরস্বতী / যমুনা বড় বড় নদী' বয়ে যায়।[৫৬] গৌড়ের মহানগরী হিসেবে উত্থান ও সপ্তগ্রামের বাণিজ্যিক পুনরুজ্জীবন ঘটে একই কারণে। চোদ্দো শতক থেকেই লক্ষণীয়, সপ্তগ্রাম দক্ষিণ বাংলার রাজধানী, গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ, সমৃদ্ধিশালী পশ্চাদ্‌ভূমি ভাগীরথীর কূল বরাবর ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। গঙ্গ-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণী/মুক্তবেণী সঙ্গমে সপ্তগ্রাম, শুধু বন্দর-নগরী হিসেবে নয়, স্থান-মাহাত্ম্যে পরিণত হয়েছিল হিন্দুদের পুণ্যতীর্থে, ঐতিহাসিক ও কিংবদন্তী-নায়ক জাফর খান গাজীর সমাধি ও মসজিদ আকর্ষণ করত বিশ্বাসী মুসলমানকে। এই বন্দর থেকে রপ্তানি দ্রব্য ছিল প্রধানত চাল, চিনি, মশলা ও বস্ত্র-সম্ভার। ষোলো শতকের প্রথমভাগে গোবর্ধন ও হিরণ্য মজুমদার—ইজারাদার ভ্রাতৃদ্বয়—সাতগাঁ এলাকা থেকে ২০ লক্ষ টংকা রাজস্ব আদায় করতেন, সেই সঙ্গে বাণিজ্য-শুল্কেও আদায় হতো। চৈতন্য ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামের ধনী ও প্রভাবশালী বণিক সম্প্রদায়ের অকুণ্ঠ সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন—'বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার / সপ্তগ্রামে নিরবধি করেন বিহার', ইত্যাদি।[৫৭] সপ্তগ্রামের এক বাঙালী বণিকের স্বচ্ছলতা বর্ণনায় কবি জয়ানন্দ পট্টবস্ত্র ও দুর্মূল্য রত্নাদির বিবরণ দিয়েছিলেন। এমনকি ষোলো শতকের শেষভাগেও কবিকঙ্কণ বলতে পেরেছিলেন, 'সাতগ্রামের বেণে কোথাও না যায় / ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানাবিধ পায়'।[৫৮]

সপ্তগ্রাম পর্তুগীজদের পোর্তো পিকেনো। এই বন্দরে আরব, ভারতীয়, পর্তুগীজ কত বিদেশী বণিকদের যাতায়াত। সীজার ফ্রেডরিক ১৬৬৭ লক্ষ্য করেছিলেন, 'In the port of Satigan every yeere they lade thirtie & five or thirtie ships, great and small, with rice, cloth of Bombast of diverse sorts, lacca, great abundance of sugar, Mirabolans dried and preserved, long pepper & oyle of Zerzeline, and many other sorts of merchandise' রপ্তানি করা হচ্ছে।[৫৯] ক্রমশ

৫৬. বিপ্রদাস, 'মনসাবিজয়' (সুকুমার সেন সম্পাদিত), এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৬৩।
৫৭. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, 'চৈতন্য চরিতামৃত'।
৫৮. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, চণ্ডীমঙ্গল (সুকুমার সেন সম্পাদিত), সাহিত্য একাদেমী সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃ. ২০৮।
৫৯. স্যামুয়েল পারচাজ : 'হিস পিলগ্রীমেজেস' ১০, গ্লাসগো, ১৯০৫, পৃ. ১৮২।

সরস্বতীর মজে-যাওয়া রূপটি প্রকাশ পেতে থাকে। ষোলো শতকের মাঝামাঝি জোয়াও দ্য বারোস বলেন, বেঙ্গালা রাজত্বে 'সাতিগান' শহরটি 'not so convenient for the entry and departure of ships'।[৬০] গৌড়ের পতনের সঙ্গে সপ্তগ্রামের অবনতি জড়িত হয়। ষোলো শতকের মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ হলো বাংলার সুলতানদের সঙ্গে আফগান, মুঘল, পর্তুগীজদের নিরবচ্ছিন্ন হানাহানির ইতিহাস। হুসেনশাহী বংশের তৃতীয় মেহমুদ পর্তুগীজদের সপ্তগ্রাম অঞ্চলের রাজস্ব ও শুল্ক সংগ্রহের ইজারা দেবার সঙ্গে বাংলার সুলতানের থেকে এই বন্দরের আর্থনীতিক অধিকারের হস্তান্তর হয়। ইসলাম শাহ সুরের সময়ে ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দে মুহম্মদ শাহ গাজী সপ্তগ্রাম অধিকার করেন; সাতগাঁ টাঁকশাল থেকে শেষ মুদ্রা পাওয়া যায় ১৫৫০ সালে।[৬১] ভাগীরথীর কূলে নূতন বন্দর হুগলীর অভ্যুত্থানের সঙ্গে সপ্তগ্রাম একটি ক্ষীয়মাণ নগরকেন্দ্রে পরিণত হয়।

৪

তথ্যের অভাবে আলোচ্য যুগে নগরকেন্দ্রগুলির জনগোষ্ঠীর বিশ্লেষণ এক দুরূহ সমস্যা। সেন-বর্মণ আমলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অবনতির ফলে বণিক, ব্যবসায়ী, কারিগরদের প্রতিপত্তি নাশ ও ব্রাহ্মণ ও করণ-কায়স্থদের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। সেই সমাজে সামাজিক ধনভোগের অধিকারী ছিল শুধু উচ্চবর্ণের মানুষের, ভূমিহীন ও সমাজ-শ্রমিকরা ছিল সর্ব অধিকার বঞ্চিত। চর্যাপদের চামার-চণ্ডাল, নিষাদ-পুলিন্দ, ডোম-ডোম্বনী, শবর-শবরী, যোগী-কাপালিক, 'নগরবাহিরি কুটিরবাসী'।[৬২] আল বীরুনীর দেখা ধোপা, মুচি, যাদুকর, নাবিক, জেলে, তাঁতী, ব্যাধ এরা সবাই হীন জাতি, শহরের প্রাচীরের মধ্যে বসবাসের অযোগ্য।[৬৩] মুসলিম শাসনকালে ধর্মান্তরণের পর ইসলামের সামাজিক সাম্যবাদে উপরোক্ত শ্রেণীর নগরজীবনে অংশ মিলেছিল কিনা তা প্রমাণ-সাপেক্ষ। তবে বাণিজ্যের মাধ্যমে নগর-অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ও

৬০. জোয়াও দা ব্যারোস, 'দ্য এশিয়া (বারবোসার 'দ্য বুক'-এ উদ্ধৃত), এম. আর. ডেমস সম্পাদিত, এ্যাপেনডিক্স ১।

৬১. করিম, 'বাংলার ইতিহাস', উদ্ধৃত, প্রথম অধ্যায়।

৬২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'বৌদ্ধ গান ও দোহা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৬।

৬৩. আল বেরুনী, 'কিতাব উল-হিন্দ' (ই. সি. স্যাচাও-এর অনুবাদ) লণ্ডন, ১৯০১, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১০১-১০২)।

ক্রম-বর্ধমান নগরায়ণ প্রক্রিয়ার ফলে শহরে-বন্দরে, গঞ্জে-কসবায় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সমাবেশ হতে থাকে ও শহরগুলির জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়। এ ক্ষেত্রে পর্তুগীজ পর্যটকদের বর্ণিত গৌড় ও বেঙ্গালা শহরের বিপুল জন-সংখ্যা স্মরণীয়। শহরগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধির আর-একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো শহরতলীর বিস্তার—বিদেশী পর্যটকদের লেখায় গৌড় ও পাণ্ডুয়ার বর্ধিষ্ণু শহরতলীর সংবাদ মেলে। মুসলিম শাসনকালে সাধারণভাবে নগরের দ্বার সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকত।

শাসককুলের আনুকূল্যভোগী দরবারী ইতিহাসবিদদের ইতিহাসে, সুফী-পীরদের বা তাঁদের সম্পর্কে লেখায়, বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্তে নগর-জীবনের যে-আলেখ্য মেলে তা আংশিক এবং তাতে স্বাভাবিক কারণেই সাধারণ মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁরা শুধু নগরের উচ্চকোটির মানুষদের সংস্পর্শে আসতেন—তাঁদের বর্ণনায় প্রধানত সুলতান, আমীর-মালিক, রাজ-কর্মচারী, সামরিক অফিসার ও ধর্মজীবী সম্প্রদায় স্থান পেয়েছে। মা হুয়ানের বর্ণনায় শুধু রাজপ্রাসাদের কর্তব্যরত প্রহরী, রাজপুরুষ ও সৈন্যদের কথাই বলা হয়েছে, যারা আবার সবাই মুসলমান। অবশ্য তিনি বলেছেন, তৎকালীন বাংলায় অনেক দক্ষ কাজের লোক ছিল, যেমন, চিকিৎসক, ভূমিবিদ্যালিখনের অধ্যাপক, জ্যোতিষী, হুনরী ও কারিগর। ফেই সিনের ভোজসভার বিবরণে নগরবাসী ধনীদের বিলাসবহুল ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রার চিত্র পাওয়া যায়। এই আমলে রাজধানী ও বন্দর-নগরীগুলিতে আন্তর্জাতিক ও দেশী ধনী বণিক-গোষ্ঠীর উপস্থিতির প্রমাণ মেলে।[৬৪] বারবোসা, ভারথেমা, জোয়াও দ্য বারোস প্রমুখের লেখায় এইসব বণিকদের সন্ধান পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস ওঝা ও বৃহস্পতি মিশ্রের বর্ণনায় দেখা যায়, সুলতানের উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারী ও সভাসদেরা রাজধানীতে বসবাস করতেন। বৃন্দাবন দাসের নবদ্বীপনগরী প্রখ্যাত বিদ্যাকেন্দ্র, বহু অধ্যাপক-শিক্ষকের বাস সেখানে। মুসলমান ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির বহু সম্মানিত কেন্দ্র ছিল হজরত পাণ্ডুয়া ও হজরত জালাল সোনারগাঁও।

উভয় সম্প্রদায়ের বিত্তশালী ও প্রতিপত্তিশালী নগরবাসীদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার প্রয়োজনে নিশ্চয়ই সমাজ-শ্রমিকেরা অপরিহার্য ছিল। ইবন বতুতার ভ্রমণকাহিনী ও অন্যান্য সূত্রে ক্রীতদাস প্রথা সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়; ক্রীতদাসরা নগরজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। লক্ষণীয় যে, এই

৬৪. মা হুয়ান ও ফেই সিন, 'বিশ্বভারতী এ্যানালস', খণ্ড ১, ১৯৪৫।

যুগে ক্রীতদাসদের—ভূমিদাস নয়—প্রধানত ধনীশ্রেণীর গৃহদাসরূপে পাওয়া যায়। একটি দক্ষ ক্রীতদাস নিম্নশ্রেণীর ঘোড়ার থেকেও কম দামে, একটি দুগ্ধবতী গাভী বা মহিষের সমান দামে পাওয়া যেত। ইবন বতুতা নামমাত্র দামে (এক দীনার) উপপত্নী হবার যোগ্য একটি সুন্দরী যুবতী বিক্রি হতে দেখেন এবং স্বয়ং অসুরা নামে এক অপূর্ব সুন্দরী ক্রীতদাসী ও তাঁর বন্ধু লুলু নামে একটি ক্রীতদাসকে মাত্র এক দীনার করে দাম দিয়ে কেনেন।[৬৫] শাসকশ্রেণীর আরামপ্রদ জীবনযাত্রায় সাহায্যের জন্য ক্রীতদাসরা কারিগরি দক্ষতা অর্জন করতে পারলে প্রভুর নিকট 'মুক্তি' ক্রয় করতে পারত। মুসলিম বিজেতা কর্তৃক আমদানীকৃত প্রকৌশল/প্রযুক্তি অ-মুসলিম বৃত্তিজীবী জাতিগুলি ক্রমশ আয়ত্ত করে নেয়। সমসাময়িক বাংলায় যথেষ্ট সংখ্যায় স্থানীয় দক্ষ কারিগর ও স্থপতি সুলভ ছিল মনে হয়। আবিসীনিয় সুলতান সৈফুদ্দীন ফিরুজ শাহ অহঙ্কারের শাস্তিস্বরূপ তাঁর প্রধান স্থপতিকে ফিরুজা মিনার নির্মাণের কালে মৃত্যুদণ্ড দেন। অসমাপ্ত মিনারটি শেষ করার জন্য স্বল্পায়াসে নিকটবর্তী শেরগাঁও থেকে দক্ষ কারিগর ও স্থপতিরা গৌড়ে এসে উপস্থিত হলেন।[৬৬] বাংলার সুলতানরা ছিলেন বিশেষ স্থাপত্যপ্রিয়। এই সময় থেকে কাষ্ঠনির্মিত ইমারতের স্থানে পোড়ামটির ইঁট ও অলংকরণের ব্যাপক ব্যাবহার শুরু হয়। পর্যটকদের বিবরণ অনুযায়ী জাহাজ-নির্মাণ কারখানার শ্রমিক ও কারিগররা ছিলেন নগরবাসী। মা হুয়ান দক্ষ বৃত্তিজীবীদের সঙ্গে ধনীদের মনোরঞ্জক সানাইবাদক, ভাঁড় ও বাজীকরদের উল্লেখ করেছেন। যাতায়াত ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ নৌ-শিল্পের কারিগররাও হয়ত স্থান পেয়েছিলেন। বিত্তশালীদের প্রয়োজনে স্থপতি, তক্ষণশিল্পী, স্বর্ণকার, মণিকার প্রমুখ ছিলেন নগরবাসী। মা হুয়ান, নানাপ্রকার কার্পাসবস্ত্রের সঙ্গে জরির টুপি, রেশমী রুমাল, রঙীন পাত্রাদি, ছুরি, কাঁচি ও উৎকৃষ্ট কাগজের উল্লেখ করেছেন; হয়ত এই সব কারিগররাও শহরে বাস করতেন।[৬৭] বৃন্দাবন দাস-বর্ণিত নবদ্বীপে শিক্ষিত বর্ণ-হিন্দুরা ছাড়াও তন্তুবায়, গোয়ালা, স্বর্ণবণিক, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, তাম্বুলি, মালাকর, প্রমুখ নানা জাতি ও পেশার লোকের বাস ছিল। এঁরা ছাড়াও বেকার, ভিখারী, বিব্রত উদ্বাস্তু, বিতাড়িত শেখ-দরবেশ নগরগুলিতে ভিড় জমাত। শাসককুল, বণিক-

৬৫ ইবন বতুতা, উদ্ধৃত, পৃ. ১৪৫-১৪৭।
৬৬. রজনীকান্ত চক্রবর্তী, 'গৌড়ের ইতিহাস', কলিকাতা, ১৯০৯, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৭।
৬৭. ৬৪ নং টীকায় উদ্ধৃত।

সম্প্রদায় ও অন্যান্য ধনীদের জীবনযাত্রার বিলাসিতা, আড়ম্বর, প্রাচুর্য বজায় রাখবার জন্য দরিদ্র মজুর, কারিগর ও ক্রীতদাসদের কঠিন শ্রমসাধ্য কর্ম করতে বাধ্য করা হতো।

সেন যুগের বিভিন্ন সূত্র থেকে নগরজীবনের যে আলেখ্য পাওয়া যায় তার সঙ্গে মুসলিম শাসনকালে নগরজীবনের গুণগত ও আকারগত প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। প্রাক্-মুসলিম যুগে নগর-অর্থনীতির ভিত্তি ছিল কেবলমাত্র কৃষিজ উৎপাদনের উদ্বৃত্ত, আর মুসলিম শাসনাধীনে কৃষিজ উদ্বৃত্তের উপর বাণিজ্যলব্ধ ধনই ছিল নগর-অর্থনীতির প্রধান উপাদান। নগরগঠনের উপাদান সমূহ, স্থাপত্যরীতি, শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, জনগোষ্ঠী, শ্রেণীবিন্যাস—সব স্তরের উপর এই অর্থনীতিক পরিবর্তন সাক্ষ্য রেখেছে। বিদেশাগত নগরবাসী, মুসলিম শাসককুল, আমলাতন্ত্র, সামন্ত প্রভুদের দল, ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির জীবনযাত্রার সঙ্গে দেশের কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র তৈরি হতে অনেক সময় লেগেছিল। মুসলিম শাসককুল ও অভিজাত সম্প্রদায় মধ্যপ্রাচ্যের ও মধ্য-এশিয়ার স্থাপত্যরীতির অনুকরণে 'ইসলামী' নগর পরিকল্পনা করতেন।[৬৮] 'ইসলামী' শব্দটির ব্যবহার এখানে কোনো বিশেষ সম্প্রদায় নির্দেশের জন্য নয়। মধ্যযুগে রাজধর্ম সর্বদাই শাসনতন্ত্রের ভাবগত কাঠামো নির্দিষ্ট করত, আর নগরায়ণের রাজনৈতিক কাঠামো ছিল সেই রাজতন্ত্রভিত্তিক। সুতরাং এ-যুগে 'ইসলামী' নগরগুলির উদ্ভব শুধু আকারগত বৈশিষ্ট্যে নয়, ভাবগত চরিত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে। গৌড়-পাণ্ডুয়াকে এই রীতির সার্থক উদাহরণ ধরা যেতে পারে—জামী মসজিদ, টাঁকশাল, দুর্গ-প্রাসাদ, পরিখা, পরিদর্শন-স্তম্ভ, তোরণ-দ্বার, মাদ্রাসা-মক্তব, হামাম-সরাইখানা, বাগ-বাগিচা, কাটরা-বাজার, প্রশস্ত রাজপথ, চৌরাস্তার মোড়—এ সবকে ঘিরে সুউচ্চ প্রাচীর। বহুজাতিক সংস্কৃতির সংযোগস্থল ছিল এই রাজধানী নগরী-দুটি। চাটগাঁও, সাতগাঁও সোনারগাঁও, কম বেশি এই ছকই অনুসরণ করেছিল—বন্দর-নগরীগুলির আশেপাশে থাকত গঞ্জ ও কুতঘাট-গুলি। এই সময়ে বাকলা, সন্দ্বীপ ও শ্রীপুরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। দক্ষিণবঙ্গের মান্দারাণ ও পূর্ববঙ্গে ফেণী সামরিক কারণে উন্নতিলাভ করে।

৬৮. আহমদ হাসান দানী, 'মুসলিম আর্কিটেকচার ইন বেঙ্গল', ঢাকা, ১৯৬১, পৃ. ৪৬, ১৩১, ২৭৮। সরসীকুমার সরস্বতী, 'ইসলামিক আর্কিটেকচার ইন বেঙ্গল' ('জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট', ২৬, পৃ. ৩০, ৩৮)।

উত্তরবঙ্গে মালদা, দেবকোট, রাজমহল, তাণ্ডা প্রভৃতি স্থান প্রাচীর, তোরণ, টাঁকশাল, দরগা-মাদ্রাসা, সরাইখানা নিয়ে মহানগরীগুলির অনুকরণে গঠিত, তবে তাদের আর্থনীতিক ভিত্তি ছিল কিছুটা অন্য রকমের। তথাকথিত 'হিন্দু' শহরগুলির যেন গ্রামের সঙ্গে আকারগত ও ভাবগত যোগাযোগটা বেশি—জনপথ, দীঘি, পুষ্করিণী, খালকূপ, উন্মুক্ত মাঠ ও গোচারণ ভূমি, মন্দির ও স্নানের ঘাট, যা ছিল জন-সমাবেশ ও আদান-প্রদানের স্থান। নবদ্বীপের বিন্যাস ও ধারা বিশ্লেষণ করে সমকালীন গৌড়-পাণ্ডুয়ার সঙ্গে তুলনা করলে প্রভেদটি স্পষ্ট হয়। এই ধরনের গ্রাম-শহরের মাঝামাঝি কেন্দ্র শান্তিপুর, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, ত্রিবেণী, পাণিহাটি, খড়দহ—যে-সব স্থানে নিত্যানন্দ-বীরভদ্রের মতো প্রচারকরা সফলতা লাভ করেছিলেন, জমিদার শ্রেণীর নয়, বণিক সম্প্রদায়ের সমর্থন অর্জন করে। ষোড়শ শতকের শেষভাগে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের জলা-ভূমিতে আর এক ধরনের ছোট শহরের উদ্ভব দেখা যায়, যাদের আর্থনীতিক ও রাজনীতিক নিয়ন্ত্রণ ছিল ভিন্নতর। হুগলী থেকে মেঘনা অবধি বিস্তৃত এই জলাভূমিকে মুসলিম ঐতিহাসিকরা 'ভাটি' এলাকা বলেছেন। এই ধরনের নগরকেন্দ্রগুলিকে 'deltic town' বলা হয়, এদের উদ্ভব ও অগ্রগতির ইতিহাস পরের যুগের রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল।[৬৯] প্রাকৃতিক পরিবেশ, সুলভ ইমারতী মালমশলা, স্থানীয় কারিগর ও শিল্পীদের দক্ষতায় এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের প্রভাবে কালে ইন্দো-মুসলিম যুগ্ম স্থাপত্যরীতির প্রচলন দেখা যায়।[৭০]

আলোচ্য যুগে নগরকেন্দ্রগুলির গুরুত্বহানি, অবনতি ও পতনের কারণ ছিল বিভিন্ন প্রকার। এক, সুলতানী আমলের শেষ পর্যায়ে বাংলার সুলতান, আফগান ও মুঘলদের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে থাকে ও পরিণতিতে স্বাধীন সুলতানদের পতন ঘটে। এই রাজনৈতিক বিপর্যয় সুলতানী আমলের শহরগুলির মর্যাদা ও সমৃদ্ধিতে প্রচণ্ড আঘাত হানে। দুই, ষোলো শতকের মধ্যভাগ থেকে অবশ্যম্ভাবী আর্থনীতিক বিপর্যয়ও দেখা দেয়; পর্তুগীজদের অভ্যুত্থানের ফলে সামুদ্রিক বাণিজ্য-অধিকারের হস্তান্তর ঘটে—এই কারণে সাতগাঁওয়ের পতনের সঙ্গে সঙ্গে হুগলী বন্দরের পত্তন ও উন্নতির পথ উন্মুক্ত

৬৯. 'ইতিহাস অনুসন্ধান', কলিকাতা, ১৯৮৬ (অনিরুদ্ধ রায়, "ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার নগরবিন্যাস ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি", পৃ. ২০-৩৮।

৭০. পার্সি ব্রাউন, 'ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার: ইসলামিক পিরিয়ড', ৭ম অধ্যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, বোম্বাই, পৃ. ৩৬-৪২।

হয়। তিন, ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য বন্দরগুলির পশ্চাদ্‌ভূমিতে নিরাপত্তার অভাব ঘটে ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পণ্য সরবরাহ ব্যাহত হতে থাকে। চার, সামরিক কৌশল, শাসনতান্ত্রিক সুবিধা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের অভাব, ইত্যাদি কারণে বারবার রাজধানী পরিবর্তন পূর্বতন নগরীগুলির প্রাধান্য হানি করত। পাঁচ, নদীর গতিপথ পরিবর্তন বাংলার নগরায়ণের ইতিহাসে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে অনেক শহর ও বন্দরের উত্থান ও পতন হয়েছে এবং রাজনৈতিক ইতিহাসেও প্রভাব বিস্তার করেছে। এই আমলে গঙ্গানদীর গতিপথ একাধিকবার পরিবর্তিত হয়ে ক্রমে দক্ষিণ দিকে সরে যায়। পলিমাটি জমে নাব্যতাহানি, বন্যা, নদী মজে যাওয়ায় জলকষ্ট, স্বাস্থ্যহানি ইত্যাদি নগরকেন্দ্রগুলির পতনের প্রাকৃতিক কারণ।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অনুকূল আর্থনীতিক পরিবেশ, বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথে অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি কারণে আলোচ্য যুগে যে নগরায়ণ প্রক্রিয়া শক্তিশালী হয়েছিল, নগরবিকাশ, উন্নয়ন, সংখ্যাবৃদ্ধি, নাগরিক জনগোষ্ঠীর আধিক্য ইত্যাদির দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, নগরায়ণের ফলে নগরজীবনে শ্রেণীবিন্যাসে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছিল। উপসংহারে প্রশ্ন জাগে : কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাংলার সমাজব্যবস্থায় কী পরিবর্তন সাধিত হয়? সমাজে এই বিশেষ প্রক্রিয়ার প্রভাব আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রবহমান কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি বা জীবনযাত্রার ধারার বিশেষ কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় নি। সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনৈতিক, কাঠামোর এমন কোনো গুণগত পরিবর্তন সংঘটিত হয় নি যার দ্বারা বৃহত্তর সমাজের জীবনচর্চার সার্বিক পরিবর্তন আসতে পারে। যুগে যুগে কৃষি উদ্বৃত্তের উপর নগরজীবন নির্ভরশীল। তাই নগরায়ণের প্রক্রিয়া পারিপার্শ্বিক গ্রাম এলাকার উদ্বৃত্ত শস্য ও পণ্যদ্রব্যের উপর ভিত্তি করে সচল থাকে। যে-এলাকার গ্রামাঞ্চল শহরের প্রয়োজনে উদ্বৃত্ত সরবরাহে যত সক্ষম সেই অঞ্চলে নগরায়ণের তত দ্রুত প্রসার ঘটে। বন্দর-নগরী সর্বদাই পশ্চাদ্‌ভূমির উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। আলোচ্য যুগেও শহরগুলি গ্রামের কৃষিজ উদ্বৃত্ত শোষণ করে পুষ্ট হতো। ভূমিব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে প্রমাণ মেলে যে, এযুগেও কৃষকের এবং অন্যান্য উৎপাদকের সঙ্গে শাসকদের, সামন্ত প্রভুদের, রাজসেবীদের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না; অথচ তাঁরা সকলেই ছিলেন প্রধানত ভূমিরাজস্বের উপর নির্ভরশীল, নগরবাসী হলেও গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা রাজস্ব শহরে বসে ব্যবহার করতেন। গ্রাম ও গঞ্জকে শোষণ করে নগরজীবন সমৃদ্ধি

লাভ করলেও অর্থনীতিতে এমন কোনো উপাদান ছিল না যার দ্বারা গ্রামজীবন কিছু ফিরে পেতে পারে। তাই দেখা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে যে সামাজিক গতিশীলতা আসার কথা, তা শুধু দু-চারটি নগর-কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ। বৃহত্তর জীবনে তার কোনো ছাপ নেই। সুতরাং জীবন-বোধ ও ভাবাদর্শে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির প্রভাব এবং মূল্যবোধে সামন্ত-তান্ত্রিক প্রবণতা প্রবহমান থাকে।

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশে নগরবিন্যাস ও সামাজিক পরিবর্তন

অনিরুদ্ধ রায়

১

ভাগীরথীর কূল ধরে ও পূর্ববাংলায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষে নগর-বিন্যাসের প্রকৃতি কী ছিল তার আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। সাধারণভাবে গৌড়ের পতন (১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দ) থেকে ঢাকা নগরীর পত্তন (১৬০৮ খ্রীস্টাব্দ) পর্যন্ত এই আলোচনার সীমা। এই চার দশকের কিছু আগে এবং পরে আমরা ভাগীরথী থেকে পূর্ববঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গ থেকে ভাগীরথীর তীরে লোকজনের স্থানান্তরকরণ দেখতে পাই। এর ফলে প্রথমদিকে যেমন ভাগীরথীর তীরে, নগর জনশূন্য হতে থাকে, তেমনি পূর্ববঙ্গে একটা জনবসতি প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। নূতন নগর স্থাপন ও তার সঙ্গে সমাজের কতটা যোগ ছিল এটাও দেখা আমাদের কাজ। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, পূর্ববঙ্গের নগর-বিন্যাসের সঙ্গে প্রবাদপুরুষ 'বারভূঁইয়া'-রা জড়িয়ে আছে। উল্লেখ্যযোগ্য যে, এরা প্রায় সকলেই পূর্ববঙ্গের। সমকালীন ফারসী, ফরাসী, বাংলা ও জেসুইট পাদরীদের লেখা থেকে আমরা ঐ সময়ের ছবিটা দেখতে চেষ্টা করব। মোগল আক্রমণের সঙ্গে বারভূঁইয়াদের উত্থান—এটা আকস্মিক ঘটনা কি-না সেটাও আলোচনা করার বিষয়।

গৌড়ের নাম অন্তত অষ্টম শতাব্দী থেকে পাওয়া যায় ও এক সময়ে লক্ষ্মণাবতী[১] নামে পরিচিত ছিল। বক্তিয়ার খলজীর ঘোড়সওয়ার পদধ্বনির সঙ্গে এর আরেকবার বিস্ময়কর উত্থান ঘটে। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রাজধানী গৌড় থেকে সরে পাণ্ডুয়ায় আসে গৌড়ের বিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। এটাই ধরে নেয়া হয় যে, এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ হচ্ছে গৌড় শহর থেকে নদী দূরে সরে যাওয়া। নদী কতটা দূরে সরে গিয়েছিল বা সরে গেলেই রাজধানীর পরিবর্তন হয় কি-না এটা ভাবা দরকার।

১. গৌড়ের ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য: এ. এফ. আবিদ আলি খান, 'মেময়ার্স অফ গৌড় এ্যান্ড পাণ্ডুয়া', কলিকাতা, ১৯৩১ (পুনঃপ্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯৮৬, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)।

ঐ সময়ে প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ইবন বতুতা[২] বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশের গৃহযুদ্ধের যে পরিষ্কার ছবি তিনি দিয়েছেন তার থেকে নদী সরে যাওয়ার ব্যাপারটা গৌণ হয়ে যায়। বতুতা সপ্তগ্রামকে বড়ো শহর বলেছেন। গৌড় থেকে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত সমগ্র জায়গাটাই জনপদসমৃদ্ধ। এর থেকে নদী সরে যাওয়াই যে পাণ্ডুয়ায় রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাবার প্রধান কারণ এটা প্রমাণ করা শক্ত।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে গৌড়ে আবার রাজধানী ফিরে আসে। এবারও ধরা হয় যে, নদী কাছে চলে আসাই এর কারণ। ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে সুলেমান কাররানী গৌড় থেকে তাণ্ডায় রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। নদী সরে যাওয়াই এর কারণ বলে ধরা হয়, যদিও তার দশ বছর পরে মোগল সেনাধ্যক্ষ আবার গৌড়ে রাজধানী ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। ঐ বছর মহামারীতে মুনীম খান মারা যান এবং রাজধানী আবার তাণ্ডায় সরানো হয়। রাজা মানসিংহ—বাংলার সুবাদার, রাজমহলে রাজধানী সরান। যেখান থেকে ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে ইসলাম খান ঢাকায় রাজধানী সরিয়ে আনেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে অবশ্য আর একবার রাজমহল রাজধানী হবার সৌভাগ্য অর্জন করে। সুতরাং এতসব টানাপাড়েনের মধ্যে নদী সরে যাওয়াই একমাত্র কারণ কি-না ভাবা দরকার।

তুর্কীরা বাংলাদেশে আসার ফলে বাংলার নগরবিন্যাসের কোনো পরিবর্তন হয়েছিল কি-না সেটা এখানকার বিচার্য বিষয় নয়। কিন্তু গৌড়ের নাম দিল্লী অবধি পৌঁছেছিল এরকম প্রমাণের অভাব নেই। বারানী ও আফিফ দুজনেই গৌড়ের কথা বলেছেন। ভেঙে পড়া প্রাসাদ, পাঁচিল, সিংহদরজা, হামাম গৌড়ের সমৃদ্ধির ইতিহাস ধরে রেখেছে।

টোমে পিরেস[৩] ও দুয়ার্ট বারবোসার[৪] সমসাময়িক (ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমদিক) রচনায় পরিষ্কার হয়ে আসে যে, গৌড়ই ছিল বাংলার প্রধান শহর। আনুমানিক চল্লিশ হাজার শহরবাসীর মধ্যে অধিকাংশই কুঁড়েঘরে বাস করত। বাঙালী বণিকরা মালাক্কা পর্যন্ত তাদের পসরা নিয়ে যেত। অনেকেই ওসব দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিল এরকম কথাও পাওয়া যায়। বণিকদের অবশ্য প্রধান পসরা ছিল তাঁতের কাপড় যার থেকে প্রচুর পরিমাণে লাভ হতো। কিন্তু গৌড় যে সমুদ্রবাহী জাহাজের বন্দর ছিল এ-রকম কোনো প্রমাণ পাওয়া

২. এইচ. এ. আর. গিব (সম্পাদিত), 'ইবন বতুতা: ট্রাভেলস ইন এশিয়া এ্যান্ড আফ্রিকা', ১৩২৫-৫৪, লন্ডন, ১৯২৯, পৃ. ২৬৭ ইত্যাদি।

৩. টোমে পিরেস, 'সুমা ওরিয়েন্টাল', ১৬৪৪, দুই খণ্ড, প্রথম, পৃ. ৮৮-৯১।

৪. দুয়ার্ট বারবোসা, 'দ্য বুক', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৩৫-১৪৮।

যায় না। এর থেকে এটা মনে করা অন্যায় নয় যে, কাছাকাছি অন্য কোনো বন্দর গৌড়ের চাহিদার যোগান দিচ্ছে।

ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে পর্তুগীজদের বাংলায় আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা গৌড়ের ছবি পাই। বাংলার সবথেকে বড়ো শহরে ২,০০,০০০ শহরবাসী ছিল বলা হয়েছে, যদিও সপ্তদশ শতকের শেষে সুরাট শহরে আমরা এর কাছাকাছি একটা সংখ্যা পাই। তার থেকে মনে হয় যে, গৌড়ের জনসংখ্যা নিতান্তই আনুমানিক। গৌড়ের প্রশস্ত রাজপথ সোজা, দুপাশে সাজানো দোকান, বহু লোক পথে ভিড় করছে। দুপাশে বড়ো বড়ো প্রাসাদের মতো বাড়ি—শহরের মধ্যেকার বড়োলোকের জীবনযাত্রার চেহারা ফুটে উঠে[৫]।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আমরা ফরাসী পরিব্রাজক ল্যা ব্ল্যাঁ-এর লেখায় গৌড়ের বর্ণনা পাই, যা সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে তুলনায় মনোগ্রাহী। গৌড়ে প্রচুর বিদেশী বণিক ছিল, যাদের মধ্যে তিনি রুশ, চীনা, জর্জিয়ান ইত্যাদির কথা বলেছেন এবং যারা স্থলপথে ব্যবসা করত। ভাগীরথী নদী দিয়ে প্রায় বিশ মাইল মালপত্র নিয়ে আসা হতো সমুদ্র থেকে গৌড়ে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, গৌড় সামুদ্রিক বন্দর ছিল না। ভাটার সময় ঐ নদী দিয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য ছিল এবং পূর্ণিমায় যে গৌড়ে জল ঢুকত তার প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব নয়। ল্যা ব্ল্যাঁ বলেছেন, গৌড়ে চল্লিশ হাজার পরিবার বাস করত। চার কি পাঁচ জনকে নিয়ে পরিবার—যদিও ঐ সময় আরো বেশি লোক সমেত পরিবার থাকার কথা—ধরলেও পর্তুগীজ সংখ্যার কাছাকাছি চলে আসে। এটা হতে পারে যে, ল্যা ব্ল্যাঁ পর্তুগীজদের কাছ থেকেই সংখ্যাটি পেয়েছিলেন। তাহলেও গড়পড়তা পরিবার সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয়ে আসবে। অবশ্য এটা উল্লেখযোগ্য যে, ব্ল্যাঁ কালিকট বা খাম্বাজ দেখে যতটা উৎসাহিত হয়েছিলেন, গৌড় দেখে ততটা হন নি।[৬] স্পষ্টত গৌড় তখন অবসাদগ্রস্ত—কিন্তু মহামারী তখনও দেখা দেয় নি।

এখনও কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক গৌড়ের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করতে আসেন নি। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ইংরাজ ভ্রমণকারীদের রচনা থেকে গৌড়ের নগরবিন্যাসের একটা ছবি পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে, সমকালীন

৫. দ্য ব্যারোস ; 'দা এশিয়া' (অনুবাদ) ; আবিদ আলি, দ্রষ্টব্য, পৃ. ৪৩। এছাড়া ম্যানুয়েল দ্য ফেরিয়া দ্য সুসা, 'দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ডিসকভারী এ্যান্ড কংকোয়েস্ট অফ ইন্ডিয়া বাই দ্য পর্টু'গীজ' (অনুবাদ), প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪১৬-৪১৮।
৬. ভ্যানসেন্ট ল্যা ব্ল্যাঁ, 'লে ভইয়াজ ফামোস', পারিস, ১৬৪৮, পৃ. ১২৫-১২৬।

ল্য ব্রঁ কেন গৌড়কে স্বাভাবিক "মুরিশ" শহর বলে আখ্যা দিয়েছেন, যার সঙ্গে বোধহয় উত্তর ভারতের নগরবিন্যাসের সাদৃশ্য আছে।

মেজর রেনেল[৭] বা ক্রেটনের[৮] লেখা থেকে গৌড়ের সমৃদ্ধির ধারণা পাওয়া যায়। প্রায় দশ মাইল বা পনেরো মাইল লম্বা ভাগীরথীর ধার ধরে ঐ ধ্বংস-স্তুপ চলে গিয়েছে—চওড়ায় মাত্র দু-তিন মাইল। সুতরাং সব পথই হয় সমান্তরাল, নয়তো আড়াআড়িভাবে কেটে গেছে। নদীর ধারে ইঁট দিয়ে গাঁথা উঁচু বাঁধ—বলা বাহুল্য, পূর্ণিমার জোয়ারকে ঠেকানোর জন্য। উদ্বৃত্ত জল ধরে রাখবার জন্য প্রচুর খাল এবং ছোটো পুষ্করিণীর ব্যবহার করা হয়েছে যার ওপর দিয়ে পুল ছিল (ক্রেটনের বইতে বা র‍্যাভেনস-এর বইতে ছবি পাওয়া যায়)। অবশ্য ততদিনে নদী অনেক দূরে সরে গেছে। সারা শহরে নানাধরনের দরজা মহল্লার অস্তিত্বের নিদর্শন দেয়। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হামাম জীবনযাত্রার সাক্ষী। এছাড়া বহু মসজিদ ও সরাইখানার কথা পাওয়া যায়—যা থেকে ইসলামীয় ঢঙ-এর শহরের নমুনা পরিষ্কার।

গৌড়ের পতন কেবলমাত্র একটা বড়ো শহরের পতন ধরলে বোধহয় ভুল করা হবে। গৌড়ের ওপর নির্ভরশীল ও কাছাকাছি বহু ছোটো শহর ও জনপদ-মালার সমষ্টি ছিল—তাদেরও পতন এগিয়ে আসে। এটা উল্লেখযোগ্য যে, গৌড়ের পরিবর্তে অন্য কোনো শহর তার জায়গা নেয় নি—যদিও বারবার রাজধানী পাল্টানোর প্রচেষ্টায় ঐ ধরনের কোনো শহরে সে রকম কোনো উত্থান লক্ষ্য করা যায় না। গৌড়ের পতন কেবলমাত্র নদী দূরে সরে যাওয়ার ব্যাপার নয়। এটার মধ্যে নিহিত আছে শহর-পশ্চাদ্ভূমির নিবিড়তা ও পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক। এর সঙ্গে সমস্ত অঞ্চলের বাঁচা-মরা নির্ভর করে আছে—সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো যে বিশেষ দিকে দৃষ্টি রেখে চলেছিল, সে-পথ অনেকখানি অবরুদ্ধ হয়ে আসে। তার জন্য কোনো একটা নদীর যাত্রাপথকে দায়ী করলে আমাদের দৃষ্টি আসল কারণ থেকে অনেকখানি সরে যাবে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ঐ সময় সপ্তগ্রামের পতন হয়—কাকতলীয় যোগ বলা যায় না। পরপর তিনটে ঘটনার দিকে আমাদের তাকানো উচিত, যেগুলো সমসাময়িক এবং দেখা উচিত তাদের মধ্যে কতটা যোগ ছিল। গৌড়ের

৭. জেমস রেনেল, 'মেময়ার অফ এ ম্যাপ অফ হিন্দুস্তান', ১৯৭৬, ভারতীয় প্রকাশ (প্রথম প্রকাশ ১৭৮৮), পৃ. ১৪৬-৪৮।

৮. এইচ. ক্রেইটন, 'দ্য রুইনস অফ গৌড়', লন্ডন, ১৮১৭, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১-২, এছাড়া সপ্তদশ শতাব্দীর বর্ণনা পাওয়া যাবে হেজেস, 'দ্য ডায়েরী, ১৬৮১-৮৭' (ইউল সম্পাদিত), লন্ডন, ১৮৮৭, তিন খণ্ড, প্রথম, পৃ. ৮৮-৮৯।

পতন, সপ্তগ্রামের ক্রমাবনতি ও হুগলীর উত্থান—এই ঘটনাগুলি আকস্মিক নয় বা আলাদাভাবে ঘটেছিল এরকমও নয়। এই ঘটনার সঙ্গে আমরা দেখি যে জাহাঙ্গীরের নবনিযুক্ত বাংলার শাসনকর্তা ইসলাম খান ভাগীরথীর তীর ধরে না-গিয়ে সোজা পূর্ববাংলার চলে গেলেন ও সোনারগাঁর কাছে নূতন জায়গায় রাজধানী করলেন।[৯] সপ্তগ্রাম, হুগলী নেবার চেষ্টা না করে সোজা পূর্ববাংলায় চলে যাওয়া বিস্ময়কর—কিন্তু সমকালীন ইতিহাস আর একটু খতিয়ে দেখলে এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হবে।

সমকালীন ক্ষুদ্র শহরগুলির মধ্যে আমরা কয়েকটি নগরবিন্যাসের ছবি পাই যার সঙ্গে গৌড়ের চরিত্রের মিল ও অমিল দুই-ই আছে। গৌড়ের কাছে পাণ্ডুয়া একসময় রাজধানী ছিল। পরবর্তীকালের পরিব্রাজক বুখানন হ্যামিলটন একে বড়ো শহর বলেছেন। পাঁচিলে ঘেরা পাণ্ডুয়ার পুরোনো প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ তিনি দেখেছিলেন।[১০] পাণ্ডুয়ার সাত মাইল দূরে পুরোনো মালদহ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরাজ কোম্পানির কুঠি হিসাবে এর উত্থান শুরু হয়। আগে অবশ্য এর সমৃদ্ধি ছিল গৌড়- ও পাণ্ডুয়া-নির্ভর। পুরোনো শহরের চেহারা আর খুঁজে পাওয়া যায় না—হোসেন আলির রাজত্বের আগেই এর অবলুপ্তি ঘটেছে।[১১] তাণ্ডায় একটা টাঁকশাল ছিল বলে কিছু খ্যাতিলাভ করেছিল।[১২] উত্তর সীমান্তে দেবকোট শহর প্রাক্-মোগল যুগে বড়ো শহর ছিল। 'তবাকত-ই নাসিরী'র লেখক একে লক্ষ্মণাবতীর পরেই স্থান দিয়েছেন।[১৩] সম্ভবত হিমালয়াশ্রিত বাণিজ্যের দরজা হিসাবে এর খ্যাতি ছিল। পুরোনো শহরকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুতরাং বড়ো একটা সময় ধরেই শহরগুলোর ভাঙা-গড়া চলেছে এবং মোগলরা আসার আগেই কোনো কোনো শহরের বিলুপ্তি ঘটেছে। কিন্তু আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য হচ্ছে যে, গৌড়ই শুধু একমাত্র শহর নয়—তার চারপাশে ভাগীরথীর তীর বহু ছোটোবড়ো শহর মিলিয়ে জনপদমালার সৃষ্টি করেছে যারা গৌড়ের সঙ্গে যুক্ত। ভাগীরথীর উত্তরাংশের এই জনপদমালা অনেক বেশি ইসলামীয় ঢঙ-এ তৈরি শহর—পাঁচিল, সিংহদরজা, হামাম, মসজিদ, সরাইখানা—

৯. মীর্জা নাথান, 'বাহারিস্তান-ই ঘায়েবী' (অনুবাদ), গৌহাটি, ১৯৩৬।
১০. আবিদ আলি দ্রষ্টব্য, পৃ. ১৪১-৪২।
১১. ঐ, পৃ. ১৪৬ ইত্যাদি। পৃ. ১৪৮-এ পুরোনো সরাইখানার ছবি।
১২. অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যেত (রেনেল, পৃ. ১৪৮)।
১৩. মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর এখানেই মৃত্যু হয় বলে ধরা হয়। আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: মিনহাজ-আস সিরাজ, 'তবাকত-ই নাসিরী' (বাংলা অনুবাদ: এ. কে. এম. জ্যাকেরিয়া, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৪১-৪৩)।

সবই একটা বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগের ইঙ্গিত দেয়। ভাগীরথীর দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ সমুদ্রের মোহনার কাছে এই ঢঙ অনেকখানি কমে আসছে। ভাটিতে অর্থাৎ পূর্ববাংলায় এই বিন্যাস বিরল। সুতরাং বাংলার নগরবিন্যাসের চরিত্র একরকম এটা বলা যাবে না—এই বিন্যাস নির্ভর করছে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ওপর, যেগুলো আমরা দেখব।

২

পুরোনো সপ্তগ্রামের চিহ্ন এখন পাওয়া শক্ত, ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন শহর বলে তার নাম আছে।[১৪] রাঢ় অঞ্চল (আধুনিক বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, নদীয়া এবং ২৪ পরগণা)-এর মধ্যে এটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শহর। আবুল ফজলের[১৫] সময় এটি একটি 'সরকার' হিসাবে ছিল (শহর সুদ্ধ) এবং তার মধ্যে ছিল নদীয়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা। মহম্মদ বিন তুঘলক-এর সময়ে এটি ছিল একটি টাঁকশাল শহর এবং এর শেষ মুদ্রা ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দের (৯৫৭ আ হিঃ) অবধি পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী[১৬] রাঢ় অঞ্চলকে ভালো না বললেও সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে ভালো কথা বলেছেন।[১৭] ঐ সময়ে সপ্তগ্রামের বেণে-'কোথাও না যায়', ঘরে বসেই তারা 'সর্বসুখ' পায়।[১৮] কবির মানস-বণিক ধনপতি সওদাগর সপ্তগ্রাম থেকে জিনিস কিনে তার সপ্তডিঙ্গা সাজায় এবং সমুদ্রের মোহনায় পৌঁছায় সরস্বতী নদী বেয়ে।[১৯] সুতরাং সরস্বতী একেবারে মজে গিয়েছিল এটা বলা শক্ত। মুকুন্দরামের লেখা থেকে মনে হয়, সপ্তগ্রামের পরে মোহনার মুখ পর্যন্ত আর কোনো বন্দর নেই। সুতরাং সপ্তগ্রাম-ই যে গৌড়ে প্রধান সামুদ্রিক বন্দর হিসাবে কাজ করছিল তাতে সন্দেহ নেই।

১৪. ডি. এ. ক্রফোর্ড, "সাতগাঁও বা ত্রিবেণী" ('বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেসেন্ট', ১৯০৮, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ১৮-২৬)।

১৫. আবুল ফজল, 'আইন-ই আকবরী' (অনুবাদ : জ্যারেট ও সরকার, নিউ দিল্লী, ১৯৪৮, পৃ. ১৫৪)।

১৬. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী', এলাহাবাদ, ১৯২১। এর বিভিন্ন পুঁথি নিয়ে মতদ্বৈত আছে। দ্রষ্টব্য: সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম', কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ১৫২-৬৪; এ. গুপ্ত, "কবিকঙ্কণ ও তাহার চণ্ডীকাব্য" ('সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', ১৩১৩, পৃ. ১১৫-১২৭)।

১৭. মুকুন্দরাম, পৃ. ৭২ ও ১০১।

১৮. ঐ।

১৯. ঐ, পৃ. ২০৫।

সপ্তগ্রামের উত্থান ও সমৃদ্ধি নিয়ে ভালো আলোচনা এখনো হয় নি। এখানে তার অবকাশ নেই, কারণ আমরা এর অবনতি ও পতনের কালক্রমের আলোচনা করছি। আমরা জানি যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে দুজন বাঙালী হিন্দু সপ্তগ্রামের ইজারাদার ছিল। তারা বারো লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিশ লক্ষ টাকা আয় করত।[২০] এই বিশ লক্ষ টাকা অবশ্যই শুধু সপ্তগ্রাম বন্দরের খাজনা নয়—এর মধ্যে চারপাশের গ্রাম ও জমি আছে। এই অঙ্ক যদি ঠিক বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সুরাট বন্দরের সঙ্গে এর তুলনা করা যাবে।[২১] এটা তুলনীয় কিনা সেটা এখানে অবশ্য বিচার করা যাবে না। পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে কবি বিপ্রদাস সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি বর্ণনা করেছেন, যদিও বিপ্রদাসের লেখা কতটা প্রক্ষিপ্ত সেটাই বিচার্য।[২২] অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় ঐ সময় থেকেই সরস্বতী মজে আসছিল—এটা বলেছেন।[২৩]

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে, আবুল ফজল[২৪] আর্শাদটুলি ও সপ্তগ্রামের খাজনা ধরেছেন ৫৮৭২ টাকার কাছাকাছি। ঐ সঙ্গে তিনি বলেছেন যে, সপ্তগ্রাম মোগলদের কোনো খাজনা দেয় না এবং ওটা ফিরিঙ্গীদের দখলে। সমস্ত সপ্তগ্রাম সরকারের খাজনা আবুল ফজল ধরেছেন ৪১৮১১৮ টাকা। এই অঙ্ক অবশ্যই টোডরমল্লর 'বন্দোবস্ত'-এর উপর ভিত্তি করে করা এবং বলা বাহুল্য এর পুরো ভিত্তিটাই আফগান আমলের। সমকালীন সাহিত্যে অবশ্য ঐ জায়গার প্রায় সবটাই জনবহুল ছিল বলে বলা হয়। সমকালীন কবি কৃষ্ণরামের বর্ণনায় মনে হয় যে তিনধারার সংমিশ্রণের ত্রিবেণী শহর ছাড়িয়ে সপ্তগ্রাম আরো বিস্তৃত ছিল।[২৫]

১৫৩০ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজরা সপ্তগ্রামকে একটি সমৃদ্ধিশালী শহর বর্ণনা করেছে। ততদিনে অবশ্য সপ্তগ্রামের মূল কাঠামোর পরিবর্তন আসছে।

২০. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত', বসুমতী প্রকাশন, ১৩২৬, পৃ. ২৮৮-৮৯, এছাড়া, এ. গুপ্ত, 'হুগলী', কলিকাতা. ১৩২১, পৃ. ৬২-৬৩।

২১. অনিরুদ্ধ রায়, "দ্য গ্রোথ অফ দ্য সিটি অফ সুরাট, ১৬১০-১৬৭১" ('জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ', ১৯৮১, পৃ. ৯৫-১০৭)।

২২. বিপ্রদাস, 'মনসাবিজয়' (সুকুমার সেন সম্পাদিত), দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, পৃ. ১৪১-৪৩। ১৪৯৬ খ্রীস্টাব্দে এটি লেখা হয়েছিল কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে কারণ কবি-উদ্ধৃত তামাকের ব্যবহার সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে ছাড়া পাওয়া যায় না। হুগলী অবশ্য তখন থাকবার কথা নয়।

২৩. নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', কলিকাতা, ১৯৪৮ (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫১, পৃ. ৯৭)।

২৪. আবুল ফজল, 'আইন'।

২৫. এ. গুপ্ততে উদ্ধৃত, পৃ. ৬১।

পর্তুগীজদের বড়ো জাহাজ আর সপ্তগ্রামে যেতে পারছে না। সরস্বতী মজে আসছে—বেতোড়ে বড়ো জাহাজ নোঙর করে ছোটো ছোটো নৌকায় মাল পাঠানো হচ্ছে সপ্তগ্রামে।[২৬] অবশ্য এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়—যে-কোনো ভালো বন্দরই সমুদ্রের থেকে ভেতরে। সুরাট ও খাম্বাজ দুই-ই খাঁড়ির ভিতরে এবং ছোটো নৌকো করে মাল নিয়ে যাতায়াত করতে হতো। ঐ কারণে ঐ দুই বন্দরের পতন হয়েছে বা অবনতি হয়েছে এটা বলা যায় না।

বেতোড়ে মাল খালাসের পর্ব শুরু হবার সময়ে ভারতীয় বণিককুলের শেঠ ও বসাকদের বর্তমান কলকাতার কাছাকাছি অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।[২৭] বেতোড়ের কথা পর্তুগীজ লেখক দ্য ব্যারোস, সমসাময়িক বিভিন্ন বাঙালী কবি এবং ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের পরিব্রাজক সিজার ফেডারিকের লেখায় পাওয়া যায়। বেতোড় কখনোই সপ্তগ্রামের পরিপূরক হবার চেষ্টা করে নি—সাহায্য করেছে মাত্র। অর্থাৎ গৌড়ের পশ্চাদ্‌ভূমির সামুদ্রিক সম্পর্ক তখনো অবসন্ন সপ্তগ্রাম রক্ষা করে যাচ্ছে বেতোড়ের সাহায্য নিয়ে। কলকাতার উত্থান, সপ্তগ্রামের পতন ও হুগলীর আবির্ভাব বাংলার ছিন্নমূল সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাসের মধ্যে নিহিত। এটাই এবার আমরা দেখব। রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের গতি-পরিবর্তনের মধ্যে সপ্তগ্রামের পতন নিহিত আছে—কোনো নদীর গতি-পরিবর্তন বা অকালমৃত্যু শুধু কালকে হ্রস্ব করে আনে।

৩

এই ইতিহাসের গতি-পরিবর্তন গৌড় ও সপ্তগ্রামের পশ্চাদ্‌ভূমি দখল করার লড়াই দিয়ে শুরু। ১৫৩৬ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয় মহম্মদ শাহ শের খানের কাছে পরাজিত হলে, বাংলা উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক আবর্তের সঙ্গে যুক্ত হয়। শের শাহ স্থানীয় ভূস্বামী ও রাজাদের কিছু স্বাধীনতা দিলেও তাঁর ছেলে ইসলাম শাহ সেটুকু দিতেও অস্বীকার করেন। ১৫৫২ সালে তাঁর মৃত্যু হলে মহম্মদ শাহ ক্ষমতা দখল করতে প্রয়াসী হন। পরের সত্তর বছর চলে অবিশ্রাম

২৬. চক্রবর্তী ও ওম্যালী, 'বেঙ্গল ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার : হুগলী' কলিকাতা, ১৯১৩। সিজার ফ্রেডারিক এই অবস্থার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন ('পারচাজ', পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪১০-৪১১)।

২৭. সি. আর. উইলসন, "নোট অন দ্য টপোগ্রাফি অফ দ্য রিভার ইন দ্য সিক্সটিন্‌থ সেঞ্চুরী ফ্রম হুগলী টু দ্য সি এজ রিপ্রেসেনটেড ইন দ্য 'দা এশিয়া' অফ ডি. সি. ব্যারোজ" ('জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি', ১৮৯২, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১০-১১১)।

লড়াই। সুলেমান কাররানী ক্ষমতা দখল করলে উড়িষ্যার গজপতি রাজারা ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম অধিকার করে। সুলেমান বাধ্য হয়ে উড়িষ্যা অভিযান করেন। ১৫৭৫ সালে স্বল্পস্থায়ী আফগান দখল শেষ হয়ে যায়। সুলেমানের ছেলে দায়ুদ মোগলদের কাছে পরাজিত হন, যদিও বিভিন্ন আফগান নেতারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে মোগলদের সঙ্গে লড়তে থাকেন সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত।[২৮] এটা উল্লেখযোগ্য যে ঐ সময়ই সম্রাট আকবর পর্তুগীজদের হুগলীতে বাণিজ্য করার জন্য ফার্মান দেন। ফার্মান বৃথা যায় নি। আফগান নেতা কতলু খানের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা মীর্জা রায়াত খান হুগলীর পর্তুগীজদের কাছে পালিয়ে আশ্রয় নেন। বলা বাহুল্য যে আকবরের ঐ সময় ফার্মান দেবার তাৎপর্য ছিল—পর্তুগীজদের তিনি আফগানদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর কথা ভেবেছিলেন।

এই অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে ছিল বর্ধমান ও মেদিনীপুর। ১৫৯০ সালে রাজা মানসিংহ বর্ধমানের মধ্য দিয়ে জাহানাবাদ পর্যন্ত এগোন। ১৫৯২ সালে তিনি আফগানদের হাত থেকে উড়িষ্যা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আজমীর রওনা হওয়া মাত্রই আফগানরা আবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মানসিংহ ফিরে এসে বীরভূমের কাছে শেরপুর আত্রাই-এর যুদ্ধে আফগানদের হারালেও সমস্যার সমাধান হয় নি। আবুল ফজলের দেওয়া নাম 'কুলাগখানা' (বিদ্রোহীদের বাসা) সময়োচিত হয়েছিল।[২৯]

এই মোগল-আফগান যুদ্ধের ফলে ভাগীরথীর তীর বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়েছিল। এর ফলে ভাগীরথীর পশ্চাদ্ভূমির ওপর চাপ পড়তে থাকে ও যে-নিবিড়তা ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য ছিল ভাগীরথী ও তার পশ্চাদ্ভূমির মধ্যে, সেটা অনেকখানি হারিয়ে যায়। ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে মালপত্র যাতায়াত করানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে এবং কোনো শাসনব্যবস্থা না থাকায় সাধারণ লোকদের ও বণিকদের দুর্দশা বাড়তে থাকে। মুকুন্দরাম তাঁর পুরোনো 'ভিটেমাটি' ছেড়ে চলে যান। তাঁর বর্ণনায় ডিহিদার মাহমুদ শরিফের জোর করে জমি জরীপ করা ও খাজনা আদায় করা দেখতে পাওয়া যায়। এটা অবশ্য হতে পারে যে ডিহিদার শরিফ টোডরমল্লের বন্দোবস্ত অনুসারে 'জাবতি' প্রথা চালানোর চেষ্টা করছিলেন। এ প্রচেষ্টা তখনকার মতো কার্যকরী না-হলে পরে ইসলাম খানের শাসনের সময়ে দেখতে পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম বীরভূমের হিন্দু জমিদারের কাছে আশ্রয়

২৮. আবুল ফজল, 'আকবরনামা' (অনুবাদ: বেভারিজ), দিল্লী সংস্করণ, ১৯৭৩, পৃ. ৯৬।
২৯. ঐ, পৃ. ৪২৫।

পেলেও, ওঁর বর্ণনায় সমকালীন অস্থিরতার চিত্র পাওয়া যায়। প্রজারা পালাতে চাইছে কিন্তু পারছে না, টাকার মূল্য কমে আসছে—এ চিত্র ঐ সময়ের অস্বাভাবিক অবস্থার লক্ষণ।[৩০]

সুতরাং গৌড় ও সপ্তগ্রামের পতন আকস্মিক ও নদীপথ পরিবর্তনের ব্যাপার শুধু নয়। গৌড়ের মহামারী বা সরস্বতীর মজে যাওয়া ঐ পতনকে ত্বরান্বিত করেছে। কিন্তু সত্তর বছরের উপর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামই এর প্রধান কারণ বলে বলা যেতে পারে।[৩১] ঐ অস্থিরতা ও দীর্ঘ সংগ্রাম পর্তুগীজদের উত্থানকে সাহায্য করেছে। হুগলীতে তারা দুর্গ বানিয়েছিল অতি সহজেই। কিন্তু ইংরাজ ও ফরাসীদের প্রায় ১১৫ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল ঐ আদেশ পাবার জন্য। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বাংলায় স্বাভাবিকতা ও মোগলশক্তি ফিরে আসার এক দশকের মধ্যেই মোগলরা হুগলী দখল করে পর্তুগীজ শক্তির প্রাধান্য বাংলা-দেশ থেকে কমিয়ে দেয়।

১৫৭৫ থেকে অর্থাৎ গৌড়ের পতনের সময় থেকে প্রায় ১৬০৮ পর্যন্ত অর্থাৎ ঢাকা শহরের পত্তনের সময় পর্যন্ত বাংলায় কোনো বড়ো শহর ছিল না। এর একটা কারণ হয়তো হতে পারে যে, ঐ অস্থিরতার সময়ে বাংলার অধিবাসীরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। হুগলী তখনো পর্যন্ত বড়ো হয়ে ওঠে নি—মুকুন্দরামের লেখায় হুগলীর কোনো উল্লেখ নেই ; যদিও তিনি অপরপারে গরিফা (গৌরীপুর) ও হালিশহর[৩২]-এর উল্লেখ করেছেন। এই অস্থিরতা, দীর্ঘকালব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, কোনো কেন্দ্রীয় শক্তির অভাব—এ সবের ফলে পূর্ববাংলায় এক নূতন ধরনের শহরের পত্তন হয়, যেগুলো গৌড় বা সপ্তগ্রামের বিন্যাসের থেকে পৃথক। বলা যেতে পারে যে, ভাটি[৩৩] অঞ্চলের দিকে লোক বসতি শুরু হয়।

৪

চৈতন্য-পরবর্তীকালের সাহিত্যে নবদ্বীপ বা শান্তিপুরের কথা পাওয়া যায়। এই নবদ্বীপ বা শান্তিপুরের বিন্যাস গৌড় বা সপ্তগ্রামের থেকে আলাদা।

৩০. মুকুন্দরাম, পৃ. ৪-৫।

৩১. রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, "সপ্তগ্রাম অর সাতগাঁও" ('জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল', ১৯০৯, পঞ্চম খণ্ড, প্রথম পর্ব, নং ৭, পৃ. ২৪৫-২৫৮)।

৩২. মুকুন্দরাম, পৃ. ২০১।

৩৩. আবদুল করীম আবুল ফজলের ও মীর্জা নাথানের সমকালীন ভাটির সীমানা নির্দিষ্ট করেছেন ("ভাটি এজ মেনশনড বাই আবুল ফজল এ্যান্ড মীর্জা নাথান", 'এন. কে. ভট্টশালী কমেমরেশন ভল্যুম', ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ. ৩১১-৩২২)।

কোনো বৈষ্ণব কবিই নবদ্বীপকে সামুদ্রিক বন্দর বলেন নি, যদিও নবদ্বীপের বণিকদের ঘরে বারাণসী, উড়িষ্যা, তিব্বত এমনকি কাশ্মীরের[৩৪] জিনিসও পাওয়া যায়। মনে হয় অধিকাংশই স্থলপথে নবদ্বীপে এসেছে। এগুলো সংখ্যায় অল্প, ছোটো শহরের কয়েকটি ধনীর জন্য ঘুরে ঘুরে বিক্রি করার জিনিস।[৩৫] গৌড় বা সপ্তগ্রামের মতো এগুলো রাজপথের দুপাশে সাজানো দোকানে বিক্রি হয় না। বৈষ্ণব কবিরাও শান্তিপুরকে শহর পর্যন্ত বলেন নি। এসব শহর বা কসবা-য় চারপাশের পাঁচিল নেই, সুরক্ষিত সরাইখানা নেই, যদিও কোনো কোনো ধনীর বাড়ির সিংহদরজা ও পাঁচিল আছে।[৩৬] শহরের শ্রেণী-বিভাগ খুব স্পষ্ট—জিনিসপত্রের ব্যবহারে বা বাড়ির চেহারায়। এই দৌলত নির্ভর করছে ঐ মাল আমদানি-রপ্তানির ওপর, চারপাশের জমির উৎপাদনের ওপর—যেগুলোর বিনিময় ও বিক্রির ওপর লভ্যাংশই ধনীর কাজ।

এই সব শহরের কোনো জমিদার বা রাজার নাম আজ বাংলা সাহিত্য বা ইতিহাসে অমর হয়ে নেই—তাদের নিয়ে পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী সাহিত্য তৈরি হয় নি। চৈতন্য-র সঙ্গে স্থানীয় কাজীদের গোলমাল হয়েছিল কিন্তু ভাটি অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করলে ভাগীরথীর তীরের কসবা বা শহরের ওপর অধিকার অত দৃঢ় নয়। আমাদের মনে রাখা দরকার যে চৈতন্য-র পদসঞ্চার গ্রাম বা বড়ো শহরে হয় নি—যেটুকু ছিল তা নিতান্তই তাৎক্ষণিক। তিনি এইসব মিশ্র শহর—অর্থাৎ গ্রাম ও শহর-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অনেকদিন কাটিয়েছেন। খড়দহ, কাটোয়া, শান্তিপুর চৈতন্যের জোয়ারে ভেসে যাবার কারণ এখনো অনুসন্ধান করা হয় নি।

এই সব মিশ্র শহরের কোনো পাঁচিল নেই গ্রাম ও শহরের তফাৎ করতে। তার ফলে গ্রামীণ ও শহর সভ্যতার মিশ্রিত সংস্কৃতি এখানে দেখা যায়। দুগ্ধজাত খাবার, নিরামিষ খাবার, নানা ধরনের গুড় ও চিনির তৈরি মিষ্টি এই সব শহরে পাওয়া যেত, যার বর্ণনা বৈষ্ণব কবিরা দিয়ে গিয়েছেন—যেগুলো গ্রামীণ খাবারের থেকে বেশি পৃথক নয়। যে-সময়ে চিনির দাম খুব বেশি, সে-সময়ে এত ধরনের মিষ্টি একটা প্রাচুর্যের ইঙ্গিত বহন করে।[৩৭] আমাদের

৩৪. সবথেকে ভালো বর্ণনা পাওয়া যায়, জয়ানন্দ : 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ (বিমানবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ. ১১-১৩। লেখা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে)।

৩৫. ঐ, পৃ. ১২, সোনা বা রুপো কম পাওয়া যায়, অধিকাংশই তামার।

৩৬. ঐ।

৩৭. ঐ, পৃ. ৬৪-৬৫। মুকুন্দরাম, পৃ. ১৬১।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই যখন দেখি বৈষ্ণব সাহিত্যে বারবার বণিক ও ব্যাপারী ফিরে আসছে—সেখানে কৃষক ও জমিদার উপেক্ষিত। ভাগীরথীর তীর ধরে যে বাণিজ্যিক সংস্কৃতি এই সব মিশ্র শহরগুলোতে গড়ে উঠেছিল তা ভাটির সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের থেকে আলাদা। কিন্তু এই আবহাওয়া বেশিদিন থাকে নি—রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে অনেকখানিই ভেঙে যায়। উড়িষ্যার গজপতি রাজাদের আক্রমণ, আফগান ও মোগলদের সংঘাত—সব মিলিয়ে রাজনৈতিক পটভূমি এমন অবস্থায় চলে যায় যে অধিবাসীরা অন্যত্র যাবার চেষ্টা করে। মুকুন্দরামের রচনা থেকে এরকম ছবি পাওয়া যায়।[৩৮]

৫

সপ্তগ্রাম এলাকা, যেটা দক্ষিণ রাঢ় নামে পরিচিত, ক্রমশ জনশূন্য হতে থাকে। তার কথা আমরা মুকুন্দরামের লেখা থেকে উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু মোগলরা খুব দক্ষতার সঙ্গে এই সময়ে এগোয় নি। ১৫৯৫ সালে আবুল ফজলের লেখা থেকে জানা যায় যে কৃষকরা বছরে দুবার খাজনা দিত—সোনা বা রুপোর টাকায়।[৩৯] এ থেকে ব্যবসার অর্থনৈতিক ভিত্তি অনেক বেশি কাঁচা টাকার ওপর নির্ভরশীল ছিল এমন অনুমান করা অসম্ভব হবে না। সুতরাং মুকুন্দরামের গ্রামের মহাজন-পোদ্দার নেহাৎই কবিকল্পনা নয়। কিন্তু সমকালীন বাঙালী সাহিত্যে কড়ির প্রচলন বেশি ছিল এটা পরিষ্কার।[৪০] সুতরাং দুই ধরনের মুদ্রামান—সোনা ও কড়ি বা রুপো ও কড়ি—ঐ সময়ে ছিল। বাংলার জিনিসপত্রের দরদাম উত্তর বা পশ্চিম ভারতের তুলনায় কম ছিল বলে এই দুই ধরনের মুদ্রামানের নিরিখ পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম এক জায়গায় বলেছেন, খাজনা ছিল হালপিছু একতংকা বছরে এবং জমি জরীপ বা বাড়ি চিহ্নিত করা হতো না।[৪১] তিনিও বাজারদর কিছু কিছু কড়িতে দিয়েছেন। অর্থাৎ ভাগীরথীর তীরের শাসনব্যবস্থা অনেকখানি আলগা ছিল—জমিদার বা ডিহিদার অর্থাৎ

৩৮. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, "এ স্টাডি অফ দ্য মঙ্গল কাব্য পোয়েটস" (সেন্টার অফ স্টাডিস ইন সোসাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটা, অকেসনাল পেপার, নং ৫২, নভেম্বর ১৯৮২)।

৩৯ আবুল ফজল, 'আইন', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৩৪।

৪০. মুকুন্দরাম, পৃ. ১৬৯ ; বিয়েতে রুপোর টাকা দেওয়া, দ্রষ্টব্য জয়ানন্দ, পৃ. ৬৩ ; বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : তপন রায়চৌধুরী, 'বেঙ্গল আন্ডার আকবর অ্যান্ড জাহাঙ্গীর', মনোহরলাল, ১৯৬৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩২-৩৩।

৪১. মুকুন্দরাম, পৃ. ৮৫।

মধ্যবর্তী কোনো কর্তা তার কৃষকদের কাছ থেকে হাল অনুযায়ী খাজনা পেলেই সন্তুষ্ট। আবুল ফজলের লেখা খুব পরিষ্কার নয়—কিন্তু এটাও হয়তো মনে করা যেতে পারে যে কৃষকরা সরাসরি খাজনা দিচ্ছে—যেটা মেনে নেওয়া শক্ত। কিন্তু ভাগীরথীর তীরে এ ছবিটা একেবারে ঐতিহাসিক হয়তো হবে না। এটাও হতে পারে যে, এখানে জমিদারীর ভূমিকা গৌণ।

কিন্তু জমিদার সব সময়ই শয়তান নয়—বিশেষত যেখানে মানুষ-জমির সম্পর্ক মানুষের দিকে আছে। ভাগীরথীর অপরপারে যেখানে আবাদ হচ্ছে—অর্থাৎ জমিদার নূতন প্রজাস্বত্ব করছে—সেখানে জমিদার বহু ধরনের ভূমিকা পালন করে। নূতন প্রজাদের পাট্টা দিচ্ছে—অর্থাৎ তার অধিকার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়াও জমিদার তাকাভি ঋণ, বীজ, গরু বেঁধে নিয়ে যাবার দড়ি দিচ্ছে, অর্থাৎ মহাজন-জমিদার মিশ্রিত ভূমিকা দেখা যায়।[৪২] মুকুন্দ-রামের কল্পিত গুজরাট নগর পত্তন শুধু কল্পনা নয়—পত্তন যে হচ্ছে এই সময় এটা তার দলিল। সেখানে কৃষকরা পর্যন্ত শিক্ষিত কায়স্থদের নিজেদের জমিতে বসাচ্ছে,[৪৩] জমিদার-কৃষক জোতদার-জমিদার বা 'পাহীকাস্থ'[৪৪] রূপে আত্মপ্রকাশ করছে এটা পরিষ্কার। এই অবস্থা কিন্তু দক্ষিণ রাঢ় থেকে পৃথক—সেখানে ডিহিদার মামুদ শরিফ বলপ্রয়োগ করে প্রজা রাখছে। দুই অবস্থার পরিবর্তনে দুই মধ্যস্বত্বভোগী কর্তার চেহারা আলাদা।

এই টালমাটাল অবস্থায় বা আবাদী জমির পত্তনীর মধ্যে প্রজার অংশ—অর্থাৎ ফসলের কতটা অংশ রাখবে সেটা বলা দুষ্কর। হালপিছু একতঙ্কা আমরা দেখেছি একমাত্র এক জায়গায় যেখানে পত্তনী হচ্ছে। কিন্তু তাতেও কিছু বেরোয় না, কারণ প্রজাপিছু কত হাল ছিল সেটা জানা নেই। অর্থাৎ কতটা জমি প্রজাপিছু ছিল এটা না জানা গেলে বাকি অঙ্কটা করা যাবে না। এতেও সবটা পরিষ্কার হবে না। জমিদার বা তার লোকেরা 'ভোলা'[৪৫] আদায় করছে এটা পাওয়া যায়। এছাড়া নানারকম কর তো আছেই—যার ফলে আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে, প্রজার জীবনযাত্রা কোনোরকমেই বলা যায় না যে সুখের ছিল। পত্তনীর সময় অবশ্য এ-ছবিটা বদলে যায়—এখানে কৃষককে তিন বছর খাজনা দিতে হবে না—যদিও অন্যান্য কর দিতে হবে কিনা বলা

৪২ ঐ। এ সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ : তপন রায়চৌধুরী, "রেভেনিউ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ বেঙ্গল ইন দ্য আর্লি ডেস অফ মুঘল রুল" ('জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল', কলিকাতা, সপ্তদশ খণ্ড, নং ১, ১৯৫১, পৃ. ৫১-৬১)।

৪৩. মুকুন্দরাম, পৃ ৮৫।

৪৪. এস. নুরুল হাসান, 'থটস অন এগ্রারিয়ান রিলেশনস', নিউ দিল্লী, ১৯৭৩ দ্রষ্টব্য।

৪৫. মুকুন্দরাম, পৃ. ৮৫।

নেই। যাই হোক না কেন, সমস্ত উৎসাহ ও প্রজার জীবনযাত্রার মান, এমনকি ঐ অঞ্চলের সমৃদ্ধি নির্ভর করছে জমিদারের ওপর এবং তার আধা-স্বাধীনতার ওপর।

আমাদের অবশ্য এটা ভাবা উচিত নয় যে, সপ্তগ্রাম এলাকা সম্পূর্ণ জনশূন্য হয়ে পড়েছিল বা সপ্তগ্রাম জনবিরল হয়ে পড়েছিল। ১৫৬৫ সালে সিজার ফ্রেডারিক একে মোটামুটি ভালো শহর (মুর-দের শহর যে রকম হওয়া উচিত) বলেছেন। এখানে সব কিছুই পাওয়া যায়। প্রতি বছর সপ্তগ্রামে তিরিশ বা পঁয়ত্রিশটি ছোটো-বড়ো জাহাজ আসে চাল, কাপড়, চিনি ও অন্যান্য দ্রব্য নিয়ে।[৪৬] তখনও অবশ্য গৌড় রয়েছে। প্রায় এক দশক পরে ফরাসী পরিব্রাজক ল্য ব্ল্যঁ সপ্তগ্রামকে শহর বলেছেন। এখানে পর্তুগীজদের দুর্গ আছে। চাল, ভালো কাপড়, চিনি ও অন্যান্য জিনিস এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।[৪৭] অর্থাৎ ১৫৭৫ সাল নাগাদ পর্যন্ত বন্দর ও পশ্চাদ্‌ভূমির সম্পর্ক রয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যেই হুগলীর উত্থান শুরু হয় ও এই বাণিজ্য হুগলীতে চলে যায়। ততদিনে গৌড় পড়ে গেছে। কিন্তু সপ্তগ্রাম আছে। ১৫৮৩ সাল থেকে ১৫৯১ সালের মধ্যে র‍্যালফ ফিচ ব্যবসায় আসেন। তিনি সপ্তগ্রামে অনেক জিনিসপত্র পাওয়া বলেছেন কিন্তু জাহাজের কথা বলেন নি। হুগলী থেকে সপ্তগ্রামের পথ জঙ্গল, ডাকাত আর বন্য জন্তুতে ভরা।[৪৮] সপ্তগ্রামের পতনের এর থেকে পরিষ্কার ছবি আর কী হতে পারে? কাছাকাছি তাণ্ডায় তখন নুন আর কাপড়ের ব্যবসা চলছে। অর্থাৎ গৌড়ের পতনের পর আর কোনো বড়ো শহর পশ্চাদ্‌ভূমির জিনিস টেনে আনছে না— ফলে বিভিন্ন ছোটো ছোটো জায়গায় সেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে, রাজনৈতিক ক্ষমতা যেমনভাবে বিকেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

এই বিকেন্দ্রীভূত শক্তির প্রকাশ ভাগীরথীর তীর ধরে ছোটো ছোটো বাজার বা হাটে পাওয়া যায়। অন্যান্য বণিকদের মতো, ফ্রেডারিক গঙ্গা দিয়ে বারবার ওঠানামা করেছেন ভালো দামে জিনিস কেনার সুযোগ পেয়ে।[৪৯] ফিচ-ও ঐ ধরনের সাপ্তাহিক হাট বা বাজার দেখেছেন বিভিন্ন জায়গায়। পতনোন্মুখ বিরাট গৌড় শহরের শক্তি বিকেন্দ্রীভূত হাট-বাজারে একটা নতুন যুগ এনে দিয়েছে। গ্রাম-শহরের সম্পর্ক আরো কাছাকাছি এসেছে কিন্তু প্রয়োজন এখন

৪৬. ফ্রেডারিক, পৃ. ৪১০-৪১১।
৪৭. ল্য ব্ল্যঁ, পৃ. ১২৭-২৮।
৪৮. ফিচ ('পারচাজ', পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪৮২-৮৩)।
৪৯. ফ্রেডারিক, পৃ. ৪১০-৪১১।

এমন এক বন্দরের যেটা মোগল-আফগানের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম থেকে দূরে সরে রয়েছে—যে-বন্দর ব্যবসার মাল তুলে দিতে পারবে নির্ভয়ে বিদেশী বণিকদের হাতে যারা রূপা বা সোনায় মাল কেনে। এই রাজনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল বলে হুগলীর উত্থান অতি দ্রুত নয়—কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী ঐ বন্দরের উত্থান অবশ্যম্ভাবী। বলা নিষ্প্রয়োজন যে মোগল শক্তিও ঐ উত্থান ত্বরান্বিত করেছিল—অবশ্য অন্য কারণে। গৌড় পতনের প্রায় তিন দশক ধরে এই পতনোন্মুখ শহর-সভ্যতা মিশ্র হয়ে যাচ্ছিল—গ্রাম-শহর সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়ে আসছিল এবং কেন্দ্রীভূত শক্তির অভাবে স্থানীয় নেতা ও তার মিশ্র শহরের উত্থান—এটা পরিষ্কার হয়ে আসবে ভাটি অঞ্চলের সমসাময়িক অমর ইতিহাসের আখ্যান থেকে। এটাও পরিষ্কার হয়ে আসবে যে, কেন বাংলার এই যুগ পরবর্তী জাতীয়তাবাদী সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছিল।

৬

জোয়া দ্য ব্যারোস (মৃত্যু ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দ)-এর মানচিত্রে[৫০] সুন্দরবন এলাকায় অন্তত পাঁচটি শহরের নাম পাওয়া যায়। অর্থাৎ গৌড়ের পতনের আগেই পূর্ব-বাংলায় নগর পত্তন শুরু হয়েছিল সেটা বলার আর কোনো প্রয়োজন নেই। দাওদ কাররানীর যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর পর তাঁর মন্ত্রী শ্রীহরি কীভাবে তাঁর ধনরত্ন নিয়ে কাতার (যশোহর)-এ পালিয়ে যান তার বর্ণনা আবুল ফজল দিয়েছেন।[৫১] ভাটি অঞ্চলে তিনি পালালেন কেন এর সদুত্তর পাওয়া না গেলেও এটা বুঝতে পারা কঠিন নয় যে ওখানকার অঞ্চলের সঙ্গে শ্রীহরির পূর্বপরিচয় ছিল। ১৫৯৯ সালে খ্রীস্টান পাদ্রীরা যখন যশোহরে আসেন (বর্তমান যশোহর নয়) তখন শ্রীহরির ছেলে প্রতাপাদিত্য প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার।[৫২] তাঁর রাজধানীকে চ্যান্ডিকান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৬০০ সালে করা পেট্রাস বার্ট্রিয়াসের এর মানচিত্রে চ্যান্ডিকান-এর সীমানা দেখানো আছে ভাগীরথীর পার

৫০. সি. আর. উইলসনের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৫১. 'আকবর-নামা', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৭২। এছাড়া, নিজামউদ্দীন আহমদ, 'তবাকৎ-ই-আকবরী' (বি. দে-র অনুবাদ), এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৭৮।

৫২. পাদ্রী পাইমন্ডার বাৎসরিক চিঠি, ১ ডিসেম্বর ১৬০০ (হস্টেন-কৃত অনুবাদ, 'বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেসেন্ট', ১৯২৫, ত্রিশ খণ্ড, পৃ. ৫২-৫৫)। এছাড়া দ্রষ্টব্য, পাদ্রী ফানেন্ডেজ'-এর চিঠি, শ্রীপুর, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৫৯৯ (দ্রষ্টব্য: সতীশচন্দ্র মিত্র, 'যশোহর খুলনার ইতিহাস', কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃ. ৪৭৩-৭৫)।

পর্যন্ত।[৫৩] বার্ট্রিয়াস বাংলায় এসেছিলেন বলে জানা নেই। মনে হয় সমকালীন জেসুইট পাদ্রীদের রচনার উপর ভিত্তি করে তিনি ঐ মানচিত্র আঁকেন।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে রাঢ় সম্পূর্ণ জনবিরল হয়ে যায় নি। বাফিনের মানচিত্রে (টমাস রো-র বই এর সাথে ছাপা ১৬৩২ সালে)[৫৪] সপ্তগ্রামকে দুর্গ সমেত দেখানো হয়েছে। তথ্য সম্ভবত কিছুদিন আগেকার। কিন্তু ভাটি অঞ্চলের দিকে জনপ্রসার নূতন পত্তনী করছে ভাগীরথীর তীর ছেড়ে এটা পরিষ্কার। ঈশ্বরীপুরের ধ্বংসাবশেষ এখনো প্রায় অনাবিষ্কৃত কিন্তু তার সীমানা দেখলে জনারণ্যের একটা ধারণা আসে। প্রতাপাদিত্যব অমর কাহিনীতে ঈশ্বরীপুর একান্তই অবহেলিত।[৫৫]

দাওদের পতনের পর থেকে আর-একজন সমকালীন নেতার উত্থান লক্ষ্য করা যায়। আফগান জমিদার ইশা খান, মোগলদের কাছে পরাজিত হলেও, ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে পূর্ববাংলায় সবথেকে বড়ো নেতা। ১৫৮৬ সালে ফিচ যখন সোনারগাঁতে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, তখনই তিনি সবথেকে বড়ো নেতা এবং খ্রীস্টানদের পরম বন্ধু।[৫৬]

এরা ছাড়াও পূর্ববাংলায় প্রভাবশালী নেতাদের নাম ও কার্যকাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীপুর ও বিক্রমপুরের কেদার রায় (মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান), বাকলার রামচন্দ্র রায় (প্রতাপাদিত্যর জামাই), ভূষণার সত্রাজিৎ রায়—এরা সকলেই আধা-স্বাধীনতাভোগী শক্তিশালী জমিদার।[৫৭] এদের রাজধানী গৌড় বা সপ্তগ্রাম 'স্বাভাবিক মুর শহর' নয়; বরঞ্চ ভাগীরথীর তীরে যে ধরনের মিশ্র শহরের কথা বলেছি আগে—তার মতন। এদের মধ্যে কয়েকটির আবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য জায়গার সাথে সামুদ্রিক যোগাযোগ আছে। দু-একটা দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে আসবে

৫৩. সুসান গোলে, 'এ সিরিস অফ আর্লি প্রিন্টেড ম্যাপস অফ ইন্ডিয়া', নিউ দিল্লী, ১৯৮০, তালিকা ১১।

৫৪. ঐ, তালিকা ১২।

৫৫. জে ওয়েস্টল্যান্ড, 'রিপোর্ট অন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অফ জেসোর', কলিকাতা, ১৮৭১। দ্রষ্টব্য: অনিরুদ্ধ রায়, "কেস স্টাডি অফ এ রিভোল্ট ইন মিডিয়াভাল বেঙ্গল, রাজা প্রতাপাদিত্য গুহরায় অফ জেসোর", ('এসেজ ইন অনার অফ প্রোফেসর সুশোভন চন্দ্র সরকার', নিউ দিল্লী, ১৯৭৬, পৃ. ১৩৬-১৬৪)।

৫৬ ফিচ, পৃ. ৪৮৪-৮৫।

৫৭. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, "বেঙ্গল চীফস স্ট্রাগল ফর ইনডিপেনডেনস ইন দ্য রেইন অফ আকবর এ্যান্ড জাহাঙ্গীর" ('বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেসেন্ট', ১৯২৮, নং ৬৯, পৃ. ২৫-২৯; নং ৭০, পৃ. ১৩৫-৪২; নং ৭১, পৃ. ৩২-৫০; নং ৭৫, পৃ. ১১-২৭)।

এবং বোঝা যাবে ভাগীরথীর তীরের মিশ্র শহরগুলোর সঙ্গে এদের মিল ও অমিল কোথায় আছে।

বাকলায় ফিচ[৫৮] প্রচুর চাল, রেশম ও সাধারণ তাঁতের কাপড়ের আড়ত দেখেছিলেন। যেহেতু মঙ্গল ও বৈষ্ণব কবিরা বরাবরই 'পাটবস্ত্র' এবং তাঁতের কাপড়কে ধনীদের ব্যবহারের উপযোগী বলেছেন, আমরা মনে করতে পারি যে রেশম প্রধানত বহির্বাণিজ্যের বস্ত্র হিসাবে ব্যবহার হতো। বাকলার সম্বন্ধে ফিচ যা বলেছেন তার থেকে দেখা যায় যে বাকলার একটা বড়ো চওড়া পথ, যার দুপাশে বড়ো বড়ো বাড়ি। বাকলার মেয়েরা পায়ে ও গলায় নানারকম রুপো ও তামার গয়না পরে যার মধ্যে হাতির দাঁতও পাওয়া যায়। সমকালীন মোগল ভারতে তামা, রুপো ও হাতির দাঁতের যে চড়া দাম ছিল, তার থেকে এটা মনে হয় যে এগুলো সবই বহির্বাণিজ্য থেকে আসছে। তামা রুপো বাংলার কোথাও পাওয়া যেত বলে জানা যায় নি। এর ফলে একটা শ্রেণীর হাতে বাণিজ্যের লাভ আসছে যারা এই ধরনের গয়নায় ঐ টাকা খাটানো অনর্থক বলে মনে করছে না। অর্থাৎ ঐ টাকা অন্য কিছুতে খাটানোর সম্ভাবনা বিরল এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আগমন হচ্ছে না। বহির্বাণিজ্যের সঙ্গে এই ধরনের যোগাযোগ বাকলার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, কারণ আবুল ফজল বলেছেন, পুরোনো বাকলা সমুদ্রের এত কাছে ছিল যে ১৫৮৫ সালের ভয়াবহ বন্যায় ভেসে যায়। রামচন্দ্র রায়ের বাবা ও কয়েকজনের প্রাণ রক্ষা পেলে তারা শহরকে আরো ভিতরে নিয়ে আসে। ফিচ সম্ভবত এই নূতন শহরকেই দেখেছিলেন যদিও সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। স্পষ্টতই বাকলার সমৃদ্ধির ভিত্তি হচ্ছে তাঁতের কাপড়, রেশম ও চাল। এর থেকে আমরা ভাটি অঞ্চলের পত্তনীর একটা চেহারা পাই। রাঢ়ে দাওদের পতনের পর ভাটি অঞ্চলে যে লোকবসতি হতে থাকে তার ফলস্বরূপ উদ্বৃত্ত চাল ও কাপড়। আরো মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, বাঙালী বণিকরা পর্তুগীজদের পাশ কাটিয়ে বেশি লাভের আশায় এই ধরনের বাণিজ্য নেমেছিল যার ফলে হুগলীর উত্থান বিলম্বিত হয়।

ভাটির সমৃদ্ধির ভিত্তি চাল ও কাপড়ের উদ্বৃত্ত উৎপাদন। কিন্তু তার মূলে রয়েছে জমিদারদের উৎসাহ ও অধ্যবসায়। ফিচ-এর রচনায় এরও কিছু আভাস পাওয়া যায়। শ্রীপুর সম্বন্ধে ফিচ বলেছেন যে এটা চাল ও কাপড়ের বিরাট আড়ত। এখান থেকে বারো মাইল দূরে সোনারগাঁতে ফিচ বাংলার সব থেকে ভালো তাঁতের কাপড় (ভারতের মধ্যে) দেখেছেন। তা সত্ত্বেও ছোটো ছোটো বাড়ি—অধিকাংশই খড়ে ছাওয়া। দেওয়াল ও দরজা

৫৮. ফিচ, পৃ. ৪৮৪।

আছে প্রধানত শিয়াল আর বাঘকে আটকানোর জন্য। অধিকাংশ লোকই খুব ধনী কিন্তু তারা দুধ, চাল আর ফল খেয়ে থাকে। বিপুল পরিমাণ তাঁতের কাপড় এখান থেকে সারা ভারতে, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা ও অন্যান্য জায়গায় যায়। এমনকি পর্তুগীজরাও এখান থেকে চাল ও অন্যান্য খাবার কেনে। তারা সিংহলে যুদ্ধ করছিল বলে সৈন্যদের জন্য পাঠায়।[৫৯]

নবদ্বীপের বা শান্তিপুরের বৈষ্ণবদের খাবারের সঙ্গে মিল থাকায় এটা বলা ঠিক হবে না যে দুই জায়গাই একই ধরনের লোক ছিল। ফিচ বলেন নি যে এখানকার বণিকরা বাঙালী। কিন্তু সাদৃশ্যকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। অন্যান্য সাদৃশ্যও আছে। ভাটি অঞ্চলের মিশ্র শহরগুলিতে গ্রাম ও শহরের মধ্যেকার আড়াল নেই—কোথায় শহর শেষ বা শুরু সেটা বোঝা যায় না। কোনো পাঁচিল গ্রামীণ জগৎকে শহর থেকে আলাদা করে রাখে নি—এমনকি রাতে শিয়াল ও বাঘ সোনারগাঁর মতো পুরনো শহরে আসে।[৬০] এইরকম বড়ো বহির্বাণিজ্য থাকলেও বিদেশী বণিকদের জন্য কোনো সরাইখানা নেই—হামাম বা সিংহদরজা কিছুরই আভাস পাওয়া যায় না। নবদ্বীপ বা শান্তিপুর ঐ একই চেহারার তা আমরা আগেই বলেছি।

সমকালীন বাংলা সাহিত্যে আমরা নূতন শহর বসানোর অভিজ্ঞতা পড়ি যেখানে বণিক ও বাজারের উল্লেখ আছে। মুকুন্দরামের গুজরাট নগর পত্তন এই ধরনের অভিব্যক্তি।[৬১] ভাটি অঞ্চলের এই ধরনের পত্তনের প্রধান কর্মকর্তা হচ্ছে জমিদার যাদের সম্বন্ধে বহু প্রবাদ ও রচনা ভাটি অঞ্চলের ইতিহাসে পাওয়া যায়। রাঢ় অঞ্চলে অপরপক্ষে ঐ ধরনের জমিদারী প্রবাদ বা কাহিনী প্রায় বিরল। বারো ভুঁইয়ার মতো প্রবাদপুরুষ রাঢ়ে পাওয়া যায় না।

ভাটির জমিদারদের পরাক্রম নিয়ে এখানে বলা ঠিক হবে না। কারণ সে আলোচনা এখানকার নয়। ঐ সব জমিদাররা ধনী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি ঐ অঞ্চলে ব্যবসায়ীরাও যে ধনী ছিলেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৬০৮ সালে মোগল শাসনকর্তা ইসলাম খান একরাত্রে ঢাকার পাইকারদের কাছ থেকে প্রচুর ধনরত্ন পেয়েছিলেন। প্রতাপাদিত্য তাঁকে অন্যান্য উপঢৌকন বাদে পঞ্চাশ হাজার রুপোর টাকা পাঠিয়েছিলেন।[৬২] এর পরেও তাঁর কাছে সোনার মোহর চাওয়া হয় কিন্তু তিনি তা পাঠাতে পারেন নি। অবশ্য

৫৯. ঐ।
৬০. ঐ।
৬১. মুকুন্দরাম, পৃ. ৮৪-৮৫।
৬২. 'বাহারিস্তান', পৃ. ১৪২।

সবটাই যে বাণিজ্য থেকে আসছিল এরকম নয়। মোগলরা অনেক সময়েই এই ধরনের জমিদারদের অন্যান্য জায়গার খাজনা আদায় করার ভার দিয়েছিল —বিশেষত তাদের অগ্রসরের প্রথম দিকে। কেদার রায়ের পতনের পর মোগলরা প্রতাপাদিত্যকে শ্রীপুর ও বিক্রমপুরের খাজনা সংগ্রহ করতে অধিকার দেয়। প্রথম দিকে মোগলরা জাবতি প্রথা (জমি জরীপ করা যার অন্যতম অঙ্গ) চালু করার চেষ্টা করে কিন্তু নানা কারণে তারা কৃতকার্য হয় নি। ইসলাম খান প্রথম-দিকে 'পেশকাস' ঠিক করেছিলেন এবং কোনো নির্দিষ্ট ভিত্তিতে এটা করে-ছিলেন এ রকম মনে হয় না: একে 'হস্তাবুদ জমা'র সঙ্গে তুলনা করা চলে না। আবুল ফজলের তথ্য হয়তো তার সামনে ছিল—টোডরমল্লের বন্দোবস্তও যেখানে থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু মনে হয় যে আফগান সময়ের তুলনায় ইসলাম খান অনেক বেশি পরিমাণে পেশকাস ধার্য করেছিলেন যেটা মোগলদের জমিদারদের সঙ্গে লড়ায়ের অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে। সুতরাং 'মোগলাই শান্তি' বাংলায় নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে খাজনার পরিমাণ যে বেড়েছিল এটা আমরা পরে দেখব। সব সময়ই খাজনা বাড়লেই সমৃদ্ধি বাড়ছে এটা মনে করা ঠিক হবে না। সুতরাং ইসলাম খান কেন ভাগীরথীর তীরে না গিয়ে সোজা ভাটিতে এলেন সেটা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

এটা আমাদের মনে রাখা উচিত যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকের ইউরোপীয় মানচিত্রগুলি—যদিও সঠিক নয়, এমনকি ১৬৬০ সালের ভ্যান ড্যান ব্রুক-এর মানচিত্রও—দেখাচ্ছে যে ভাগীরথী পদ্মার তুলনায় অনেক ছোটো অর্থাৎ ভাগীরথীর জল তুলনামূলকভাবে পদ্মার থেকে কম। তবুও পদ্মার পারে আমরা ভাগীরথীর মতো জনপদমালা দেখি না—ঢাকা, সোনারগাঁ ছাড়া বড়ো শহর আর কিছু চোখে পড়ে না।

কোনো বড়ো শহর বা সেরকম কোনো কেন্দ্রীভূত শক্তি, যা ঐ অঞ্চলের উদ্বৃত্ত উৎপাদন শুষে দিতে পারে, ভাটি অঞ্চলে না থাকায় ও ভৌগোলিক কারণে ভাটির সমৃদ্ধি সমহারে সব জায়গায় হয় নি। ভাটির মিশ্র শহরগুলির উন্নতির হার এক রকম নয়। সুতরাং ঐ ধরনের দুই শহরের মধ্যে দস্যু, জঙ্গল ও বন্য-জন্তুতে ভরা। ১৬০০ সালের ১ ডিসেম্বরে পাদ্রী পাইমন্ডার চিঠি এটাই পরিষ্কার করে দেয়।[৬৩] এর আগে ১৫৯৯ সালের ২২ ডিসেম্বরে লেখা এক চিঠিতে জানা যায় যে পাদ্রী ফার্নান্ডেজ শ্রীপুর থেকে চ্যান্ডিকানে নৌকায় দশদিন ধরে আসেন। পথে বারবার দস্যুদের সামনে পড়েন ও শ্রীপুরে পৌঁছে

৬৩. পূর্বে উদ্ধৃত।

দীর্ঘ রোগে ভোগেন, যাকে ম্যালেরিয়া বলা যেতে পারে।[৬৪] পাদ্রী ফনসেকার ১৬০০ সালের জানুয়ারি চ্যান্ডিকান থেকে লেখা[৬৫] চিঠি থেকে জানা যায় যে, তিনি বাকলা থেকে আসার সময় নদীর একপাশে ধানের ক্ষেত ও আখ মাড়াই ও অন্যপাশে ঘন জঙ্গল দেখেছেন। ঐ জঙ্গলে তিনি গণ্ডার, মৌমাছির ঝাঁক ও বাঘ দেখেছেন। একটা বাঘ নদীর ধার ধরে বহু দূর অবধি নৌকার পিছু নিয়েছিল। জায়গায় জায়গায় তিনি জঙ্গল পরিষ্কার করার প্রচেষ্টা ও আখের ক্ষেত দেখেছেন। অর্থাৎ উন্নতির হার এক নয় এবং পত্তনী বসানো—দুটোই পরিষ্কারভাবে এর থেকে আসে।

সুতরাং এটা বোঝা যাচ্ছে যে, ভাটি অঞ্চলের জমিদারদের তৎপরতায় একটা নূতন নাগরিক সভ্যতা জঙ্গল পরিষ্কার করে উঠে আসছে এমন একটা সময়ে যখন কোনো কেন্দ্রীয় শক্তি নেই এবং যখন রাঢ় অঞ্চল ছেড়ে লোকেরা সরে আসছে ভাটিতে। স্বভাবতই প্রায়-স্বাধীনতাভোগী এইসব জমিদাররা আঞ্চলিক ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ যার মধ্যে তাদের ক্ষমতা অসীম। এই স্বাধীনতার ছোঁয়া ও ক্ষমতার সীমাহীনতা এইসব জমিদারদের বারো ভুঁইয়ার প্রবাদপুরুষে পরিণত করেছে। কিন্তু মোগলরা আসার আগেই এদের এই স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি আক্রান্ত হয়েছিল। যার ফলে সুন্দরবন অঞ্চল কিছুকাল পরে প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে।

৭

ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে পর্তুগীজরা বাংলা উপসাগরে বড়ো শক্তি হিসাবে প্রকাশ লাভ করে। আবুল ফজল-এর কথা অনুযায়ী তারা হুগলী ও সপ্তগ্রাম করায়ত্ত করেছিল যার ফলে ভাগীরথীর বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে রাখা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু বণিক পর্তুগীজ ছাড়া অন্য পর্তুগীজ ছিল যারা নৌকায় ডাকাতি করত। মুকুন্দরাম বলেছেন ঐ হারমাদের ভয়ে ধনপতি সওদাগর ভাগীরথীর মোহনায় রাতদিন নৌকা বাইতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৬৬] পাদ্রী ফার্নান্ডেজের বর্ণনা দেখে জানা যায় যে, এই ধরনের ডাকাতে পর্তুগীজরা

৬৪. দিয়াঙ্গা থেকে লেখা ('বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট', ১৯২৫, নং ৩০, পৃ. ৫৯)।
৬৫. 'বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেসেন্ট', পৃ. ৬৩-৬৫, দ্রষ্টব্য ফিচ, পৃ. ৪৮২।
৬৬. মুকুন্দরাম, পৃ. ২৪২। 'বাহারিস্তানে'র লেখকের মতে প্রতাপ আত্মসমর্পণ করেছিলেন কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে হার্মাদদের ঠেকানো সম্ভব হবে না—এরা শান্তির সময়ও বারবার যশোর আক্রমণ করছিল (পৃ. ১৩৬)।

মেঘনার মোহনায় তো ছিলই, বাংলার সামুদ্রিক উপকূলভাগও এদের হাতে।[৬৭]

এই অবস্থায় এটা স্বাভাবিক যে, ভাটির জমিদাররা, যারা নিজেরা বণিক নয়, ঐসব পর্তুগীজদের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চেষ্টা করবে। সমকালীন পাদ্রীদের লেখা চিঠি থেকে জানতে পারা যায় যে এই সমস্ত জমিদাররা পর্তুগীজদের নিজেদের সৈন্যর মধ্যে নিয়েছিল এবং কিছু পর্তুগীজকে জায়গীর দিয়ে নিজেদের এলাকায় বসিয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ব্যাবসা-বাণিজ্য করত। বলা নিষ্প্রয়োজন যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলায়, বিশেষত ভাটি অঞ্চলে পর্তুগীজরা একটা বড়ো শক্তি বলে পরিগণিত হয়েছিল। হুগলীতে আকবরের ফার্মান এই জমিদারদের পর্তুগীজ প্রীতির থেকে পৃথক নয়।

সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে যখন পাদ্রীরা এইসব জমিদারীতে উপস্থিত হয়েছিল, তাদের অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হয় নি। ধনী ও শক্তিশালী পর্তুগীজরাও ঐ পাদ্রীদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। ঈশা খান খ্রীস্টানদের বন্ধু ছিলেন এটা আগেই বলা হয়েছে। বাকলার রামচন্দ্র রায় তখনো বালক কিন্তু খ্রীস্টান পাদ্রীদের সাদর সম্ভাষণ করতে ভোলেন নি।[৬৮] প্রতাপাদিত্য আর এক ধাপ এগিয়েছিলেন, যার ফলে তিনি বিপদে পড়েছিলেন। তিনি পাদ্রীদের গীর্জা বানানোর অনুমতি দিয়েছিলেন। ১৬০০ সালের ১ জানুয়ারি তিনি ও তাঁর বড়ো ছেলে উদয়াদিত্য গীর্জায় আসেন ও তখনকার প্রজাদের খ্রীস্টানধর্ম গ্রহণ করার বাধা অপসারণ করেন। এমনকি গীর্জার খরচ চালানোর জন্য প্রতাপাদিত্য আশেপাশের কিছু জমি গীর্জাকে দান করেন (দেবোত্তর সম্পত্তি) ও তাদের প্রজাদের গীর্জার অধিকারীকে খাজনা দেবার আদেশ দেন। এই সমস্ত আদেশ তিনি লিখিতভাবে দলিল করে দেন। চ্যাণ্ডিকান থেকে গীর্জাটি নৌকায় দুই ঘণ্টার পথ।[৬৯]

জমিদারীর মধ্যে একটি শক্তির এই রকম প্রাধান্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ভিতরকার শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হতে থাকে। পর্তুগীজদের ও আফগানদের মধ্যে দাঙ্গা হওয়ায় প্রতাপাদিত্যকে এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। প্রতাপাদিত্য অন্যান্য ধর্মকেও—মুসলমান, হিন্দু বা বৈষ্ণব—সমান অধিকার দিলেও এই বিরোধের

৬৭. পাদ্রী ফার্নানডেজ, উদ্ধৃত, পৃ. ৫৮-৫৯।
৬৮. পাদ্রী পাইমেন্টার চিঠি, উদ্ধৃত, পৃ. ৬২। এছাড়া, চ্যাণ্ডিকান থেকে লেখা পাদ্রী ফনসেকার চিঠি, ২০ জানুয়ারি, ১৬০০ ('বেঙ্গল পাস্ট এ্যাণ্ড প্রেসেন্ট', ত্রিশ খণ্ড, পৃ. ৬৩-৬৪)।
৬৯. ঐ, পৃ. ৬৫-৬৭।

নিষ্পত্তি হয় না।[৭০] ততদিনে আরাকানী আক্রমণ সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে।

বাংলার উপকূলে পর্তুগীজরা ওখানকার লোকেদের বন্দী করে দাস হিসাবে বিক্রি করছিল। কিন্তু আরাকানবাসীদের আক্রমণ এই অবস্থাকে বাংলার পক্ষে আরো অসহনীয় করে তোলে। আরাকান রাজা মঙ ফেলুঙ (১৫৭১-১৫৯৩) চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা জয়[৭১] করেছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা শুধু সামুদ্রিক উপকূলে ছিল তা নয়, স্থলপথেও বিস্তার লাভ করেছিল। যদি বাধা না দেওয়া যেত তাহলে ঢাকা-সোনারগাঁ অঞ্চল আরাকানীদের কবলে চলে যাবে এটা বুঝতে মোগলদের দেরি হয় নি। সুতরাং মোগলরা বাংলা উপ-সাগরের মোহনায় সন্দ্বীপ দখল করে আরাকানীদের জলপথে সাঁড়াশি আক্রমণকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ১৫৮২ সালে টোডরমল্লের 'বন্দোবস্তে' সন্দ্বীপ ফতোয়াবাদ সরকারের অন্তর্গত হয়ে যায়।[৭২]

কিন্তু ভাটির জমিদাররা নীরব দর্শক হয়ে ছিলেন না। পর্তুগীজ কাপ্তান কার্ভালোর সাহায্য নিয়ে কেদার রায় দুবার আরাকানী আক্রমণ ঠেকিয়ে সন্দ্বীপ ছিনিয়ে নেন। এ ছাড়া বোধহয় বাংলাকে রক্ষা করার কোনো উপায় ছিল না কারণ মোগল অগ্রগতি ক্রমাগত বাধা পেয়ে সমানভাবে এগোতে পারে নি। আরাকান রাজা সেলিম লাহ-র সঙ্গেও পর্তুগীজ সৈন্য ছিল এবং ত্রিকোণ যুদ্ধে সন্দ্বীপ একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। আরাকানী রাজার চূড়ান্ত মতলব কী ছিল তা এখনো প্রমাণিত হয় নি কিন্তু সন্দ্বীপের উপর ভিত্তি করে নীচু বাংলার একটা বিরাট অংশের উপর তিনি আক্রমণ চালাতে চাইছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেখা উচিত কেন বাংলার জমিদাররা খ্রীস্টানদের বন্ধু হতে চেয়েছিলেন। প্রতাপাদিত্যের গীর্জা স্থাপনে অনুমতি দেওয়া খ্রীস্টধর্মের বা খ্রীস্টান পাদ্রীদের প্রতি অনুরাগ-বশত নয়। নিজের জমিদারী রক্ষা করার এটা একটা অপরিহার্য অঙ্গ।

৭০. অনিরুদ্ধ রায়, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এছাড়া সমকালীন ইতিহাস, দ্য জারিক, 'হিসতোয়ার দে মেমরেবল এদভেনু ডেস এ্যান্দ ওরিয়েন্তাল ১৬০৮-১৬১৪' (ফরাসী), বোর্দো, চার খণ্ড, চতুর্থ, পৃ. ৮৬০-৬১।

৭১. এই সময়কার আরাকানী আক্রমণের জন্য দ্রষ্টব্য: এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ-র সুলিখিত প্রবন্ধ ('জার্নাল অফ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল', ১৯৪৫, পৃ. ৩৩-৩৮)। এছাড়া দ্রষ্টব্য: ডি. ই. জি. হল, 'এ হিস্ট্রি অফ সাউথ-ইস্ট এশিয়া', ম্যাকমিলান, ১৯৬৮ সংস্করণ, পৃ. ২৭০-৭৬।

৭২. সন্দ্বীপের যুদ্ধ প্রসঙ্গে দ্য জারিক ছাড়া, চক্রবর্তী ও দাস, 'সন্দ্বীপের ইতিহাস', কলিকাতা, ১৩৩০, পৃ. ৩৬-৫৪ দ্রষ্টব্য।

এ সত্ত্বেও মোগলরা উপকূল এলাকায় শান্তিরক্ষা করা বা আরাকানীদের ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। এর ফলে বহুদিন পর্যন্ত ঐ এলাকায় উন্নতি হয় নি। ১৬৪০ সালে পাদ্রী মানরিক দেখেন যে, এই উপকূল এলাকা প্রায় জনশূন্য হয়ে গেছে।[৭৩] জমিদারদের বিলোপ, ক্রমাগত আরাকানী আক্রমণ ও ভাগীরথী এলাকায় শান্তি ফিরে আসায় লোকেরা আবার ভাগীরথীর তীরে ফিরে যেতে থাকে। ১৬৫০-এর পর ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ঐ যাত্রাকে ত্বরান্বিত করেছিল। কিন্তু ততদিনে ঢাকার প্রভূত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও রাজধানী রাজমহলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়—সেটাই এই যাত্রার প্রতীক বলে ধরা যেতে পারে।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সবা সামীউদ্দীন বাংলার খাজনার[৭৪] একটা হিসাব করেছেন। এতে দেখা যায় বাংলার সামগ্রিক 'জমা' (এখানে জমা বলতে বোঝা যায় যে কতটা খাজনা হওয়া উচিত) সমগ্র মধ্যযুগ ধরে বেড়ে যাচ্ছে এবং এ-জমা বাড়ার মধ্যে আঞ্চলিক অসমতা অনেক বেশি। ১৫৯৫-৯৬ সালের পর থেকে জমা বাড়তে থাকে। আবুল ফজল ২৫ কোটি 'দাম' জমা ধরেছেন—কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে এই জমা অত্যন্ত নিষ্ঠুর হারে বাঁধা, কারণ অন্তত বিশ বছর আগেকার আফগান নথি থেকে এই জমার হিসাব করা হয়েছিল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে মোগলরা ভাটি অঞ্চলে বিশেষ অগ্রসর হতে পারে নি। ঈশা খান মোগলদের পেশকাস দিতেন না বা অন্যান্যরা দু-এক বছর ছাড়া বিশেষ কিছু দেন নি এটা সকলেরই জানা। এর ফলে ইসলাম খানের একটা কাজ ছিল 'পেশকাস' বাড়িয়ে জাবতি প্রথার মধ্যে বাংলাকে নিয়ে আসা। এটার অবশ্য আর একটা কারণও ছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব শুরু হবার দশ বছরের মধ্যে মনসবদারী-জায়গীরদারী প্রথায় বিপর্যয় নেমে আসে। তার পূর্বাভাস শুরু থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। সেটা ঠেকাতে গেলে বাংলা সম্পূর্ণ দখল করে জমা বাড়ানো দরকার যেটা জাহাঙ্গীরের শাসনকর্তা ইসলাম খান কঠোরতার সঙ্গে করেছিলেন। ফলে বাংলার জমিদারদের স্বাধীনতা কমে যায় এবং মোগল জমা বেড়ে যায়।

১৬৩২ সালে মানরিক এই জমা বলেছেন ৩২ কোটি দাম। বায়াজিদ (মোগল দরবারের আমলা) ১৬৩৬ সাল নাগাদ লিখতে গিয়ে বলেছেন যে, বাংলার রাজস্ব

৭৩. সেবাস্টিয়ান মানরিক, 'ট্রাভেলস' (লুয়ার্ড অনূদিত), অক্সফোর্ড, দুই খণ্ড, প্রথম খণ্ড।

৭৪. আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অপ্রকাশিত এম. ফিল। শ্রীমতী সামীউদ্দীনের কাছে তথ্য পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ।

বাড়ে—কিন্তু কোনো সময়েই এটা সমগ্র সাম্রাজের রাজস্বের ৫% শতাংশের বেশি ছিল না। সুতরাং বাংলার রাজস্ব না পেলে মোগল সম্রাটরা অত্যন্ত অসুবিধায় পড়তেন—এই ধারণাটা ধরে রাখার আর কোনো কারণ নেই।

আবুল ফজলের হিসাব অনুযায়ী গৌড় সরকার ও সরিফাবাদ সরকারের জমা প্রতি বর্গমাইলে ছিল যথাক্রমে ১০.৬ ও ১০.৭। সরিফাবাদের মধ্যে ভাগীরথীর পশ্চিম পার অন্তর্ভুক্ত ছিল যেখানে লড়াই বেশি হয় নি। তুলনামূলকভাবে বাকলা, সোনারগাঁ ও সপ্তগ্রামের জমা প্রতি বর্গমাইলে হচ্ছে ৩.৫, ২.৬ ও ৩। মনে রাখা দরকার, আবুল ফজল নিজেই বলেছেন যে, হুগলী ও সপ্তগ্রাম ফিরিঙ্গীদের দখলে ছিল। এর থেকে বোঝা যায় সপ্তগ্রামের পতন হচ্ছে ও ভাটি অংশের উন্নতি তখনো হয় নি। এটা অবশ্য সম্ভব যে ভাটি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য আবুল ফজলের কাছে ছিল না। উপকূলবর্তী অঞ্চল, যেমন খলিফাবাদ এলাকার জমা সবথেকে কম ছিল (১.০)।

আবুল ফজলের হিসাব যে অন্তত বিশ বছর আগেকার পুরোনো তা বোঝা যায় যখন দেখি গৌড় শহরের জমা অন্যান্য শহরের তুলনায় সবথেকে বেশি। আবুল ফজল এই জমা দেখিয়েছেন আট লাক্ষ দাম-এর কাছে। তুলনীয় যে যশোহরকে তিনি দেখিয়েছেন দুই লাখ দাম। অর্থাৎ আমরা যদি এই হিসাব ১৫৭৫ সালের আগের হিসাব অনুযায়ী ধরি তাহলে শ্রীহরি দাওদের ধনরত্ন নিয়ে পালানোর আগেই যশোহর গৌড়ের এক-চতুর্থাংশ ছিল। এ তুলনা হয়তো যথার্থ নয়, কারণ ১৫৭৫-এর আগেই গৌড় থেকে রাজধানী সরে গিয়েছিল। তাহলেও উঠতি যশোহর ও পড়তি গৌড়ের তুলনা আমাদের ভাটি অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান উন্নতির দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করে। এর থেকে বোঝা যায় যে, কেন শ্রীহরি প্রচুর ধন নিয়ে পালিয়েছিলেন, শুধু দর্গম স্থান হলে আরো অনেক জায়গা ছিল। উল্লেখযোগ্য যে ঘোড়াঘাট শহরের জমাও যশোহরের প্রায় সমান।

তুলনামূলক ভাবে সোনারগাঁর জমা অনেক কম—আধ লাখ দাম। আসলে মোগলদের সঙ্গে ঈশা খানের লড়াই সোনারগাঁর উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হয়েছিল—ফলে যশোহরের সমকক্ষ হতে পারে নি। এর ফলে বোঝা যায়, কেন মীর্জা নাথান এবং পাদ্রীরা প্রতাপাদিত্যকে প্রধান জমিদার বলে বর্ণনা করেছেন। এর থেকে আরো বোঝা যায়, কেন পাদ্রীরা প্রতাপাদিত্যর জমিদারীতে প্রথম গীর্জা বানিয়েছিলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ঈশা খান খ্রীস্টানদের পরম বন্ধু ছিলেন এবং তাঁর রাজত্বেও প্রচুর পরিমাণে বিদেশী বণিক ছিল।

সবা সামীউদ্দীন যেভাবে আবুল ফজলের হিসাব আলোচনা করেছেন তাতে দেখা যায় যে বাংলার উত্তর-পশ্চিম অংশে জমা প্রতি বর্গমাইলে সবথেকে বেশি। মান্দারণ যেমন ১৫৯৫ থেকে ১৬০৫-এর মধ্যে তার জমা দ্বিগুণ করে

নেয়। অর্থাৎ ভাগীরথী পার হয়ে বিহারের দিকে যত যাওয়া যায়, ততই জমা প্রতি বর্গমাইলে বেড়ে যাচ্ছে। এর থেকে লোকসংখ্যার ঘনত্ব ও বসতি-র একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ; মনে হয়, ভাগীরথীর এক পার থেকে লোক অপর পারে অনেক আগে থেকেই যাওয়া শুরু করেছিল।

পূর্ব বাংলার উন্নতি ও সমৃদ্ধি আরো তাড়াতাড়ি হবে এটাই আশা করা যায়, বিশেষত যখন ঘোড়াঘাট বা যশোহরের সমৃদ্ধির ছায়া আমরা আগে থেকেই দেখি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সিলেট ছাড়া আর কোনো জায়গায় এরকম উন্নতি আমরা দেখি না। ১৬৫৬ সাল অবধি খালফাবাদ বা দক্ষিণ বাংলার রাজস্ব সব থেকে কম ছিল—এর পরে তার কিছু উন্নতি হয়। কয়েকটা সমৃদ্ধি-শালী জায়গা, যেমন বাকলা, কোনো উন্নতি করে নি। কারণ খোঁজা খুব সহজ নয়। ঢাকা মোগল রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও, মোগলরা আরাকানীদের ক্রমাগত আক্রমণ সব সময় ঠেকাতে পারে নি। যার ফলে উপকূলবর্তী এলাকা থেকে লোকে পালিয়ে যেতে থাকে। এছাড়া কেন্দ্রীয় মোগল শাসনের দাপটে ছোটো-বড়ো জমিদারদের আধা-স্বাধীনতা বিনষ্ট হওয়ায়, যে-উদ্যোগ আগে দেখা গিয়েছিল, সেটা পরে আর দেখা যায় না। সব মিলিয়ে মনে হয় যে, ভাগীরথীর তীরে আবার শান্তি আসায় লোকে পূর্ব বাংলা ছাড়তে শুরু করে। কিন্তু এটা প্রমাণসাপেক্ষ। ১৬৩৯ সালে শাহ-সুজার রাজমহলে রাজধানী সরানো এটাই ইঙ্গিত করে। রাজধানী সরানোর সঙ্গেই যে গণ্যমান্য ও ধনী ব্যক্তিরা সরে গিয়েছিলেন এটা ভাবা খুব অন্যায় নয়। ১৬৫৯ সালে সুজার মৃত্যুর পর মীরজুমলা আবার ঢাকায় রাজধানী নিয়ে এলে এ অঞ্চলের উন্নতি আবার শুরু হয়।

১৫৯৫ সাল থেকে ১৬৪৭-এর মধ্যে সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যের জমা ৫০% বেড়ে যায়। কিন্তু বাংলার জমা বাড়ে প্রায় ১০০% —২৫ কোটি দাম ১৫৯৫-৯৬ সাল থেকে ৫০ কোটি দাম হয়ে যায় ১৬৪৮ সালে। উত্তর-ভারতের ক্ষেত্রে এই জমা বৃদ্ধি খুব বেশি সমৃদ্ধি আনে নি—কারণ একই সঙ্গে উত্তর-ভারতে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছিল।[৭৫] বাংলার দামের হিসাব যদিও সঠিকভাবে পাওয়া যায় না কিন্তু উত্তর-ভারতের তুলনায় বাড়ে নি বলতে কোন বাধা নেই। ফলে আবুল ফজলের হিসাব থেকে ধরলে বাংলায় শান্তি ও খাজনা সংগ্রহ করার অনেক বেশি কৌশলের ও কঠোরতার ফলে এই জমা বেড়েছিল। বলতে বাধা নেই যে এই চাপ পড়েছিল সবশেষে কৃষক ও মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারদের উপর।

৭৫. ইরফান হাবিব, "দ্য মনসব সিস্টেম, ১৫৯৫-১৬৩৭" ('প্রসিডিংস অফ দ্য ইন্ডিয়ান হিস্ট্রী কংগ্রেস', ১৯৬৭ অধিবেশন, পৃ. ২৩৮)।

বাংলায় প্রধানত মোগল আমলারা এই বর্ধিত জমার ফল পেয়েছিলেন। বাংলার শাসকদের মধ্যে শায়েস্তা খান ও যুবরাজ শাহ সুজা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন ব্যক্তিগত ভোগের জন্য। কিন্তু এর থেকে বলা অসঙ্গত হবে না যে, বারো ভূঁইয়াদের আমল থেকেই এই বর্ধিত উৎপাদন শুরু হয়েছিল যদিও তারা বেশিদিন এর ফলভোগ করতে পারে নি। কিন্তু তারা এর জন্য দায়ী ছিল এটা কোনো রকমেই বলা যাবে না। মিশ্র শহরের আত্মরক্ষার অভাব ও আরাকানী-পর্তুগীজ আক্রমণ মোগল আগমন সহজ করে দেয়।

বাংলাদেশে জমিদারী বিবর্তন ও তালুকদারী প্রথা
(১৫৭৬-১৭৬৫)

বি. আর. গ্রোভার

বাংলাদেশই প্রথম প্রদেশ যেটা ইংরাজদের শাসনাধীনে আসে যার ফলে জমিদারী প্রথা সম্পর্কে ইংরাজ আমলাদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়।[১] যদিও মুঘল-যুগের শেষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে জমিদারী প্রথার নিজস্ব ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি নূতন ধারা ব্যবহারের ফলে ইংরাজ আমলা ও বিশ্বৎজনকে ধাঁধার মধ্যে ফেলে দেয়, তাহলেও আদর্শগত দিক থেকে ষোড়শ শতাব্দীর ও বিশেষত সপ্তদশ শতাব্দীর মুঘল যুগের বাংলার জমিদারী প্রথার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি অন্যান্য প্রদেশের মতোই ছিল। মুঘল যুগে জমিদারী প্রথা নানা ধরনের ব্যক্তির জমির উপর অধিকার ও রায়তদের থেকে তার আলাদা স্বত্বকে বোঝাত।[২] বড়ো জমিদার থেকে ছোটো মধ্যস্বত্বভোগীকে এই প্রথার মধ্যে নিয়ে আসা যায়। এর মধ্যে আমলা ও আমলা নয়, তাদের বিভিন্ন রকম ক্ষমতা ও সামাজিক অবস্থান—সবকিছুকেই বোঝায়। সুলতানী যুগেও জমিদারী ছিল এবং প্রাক্-মুঘল যুগেও বাংলায় স্বাধীন জমিদারদের অস্তিত্ব ছিল। কয়েকটি ক্ষেত্রে মুঘলরা ঐভাবেই এগুলো মেনে নেয়; অন্য ক্ষেত্রে, মুঘলরা নূতন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে যেগুলোর সঙ্গে মুঘল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মিল লক্ষ্য করা যায়। মুঘলদের শাসনে জমিদারী প্রথা আর্থিক শাসনব্যবস্থার নির্ধারিত ব্যবস্থার মধ্যে বিবর্তিত হয়; এখন পর্যন্ত মত যে, তিনভাগে বিভক্ত জমি ছিল, যেমন—খালিসা (সরকারী), জায়গীর (দান) এবং জমিদারী (তথাকথিত রাজন্য-ব্যবস্থা)। এখানে এই মত বদলানো

১. বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : বি. আর. গ্রোভার, "নেচার অফ ল্যান্ড রাইটস ইন মুঘল ইন্ডিয়া", 'দ্য ইকনমিক এ্যান্ড সোসাল হিস্ট্রি রিভিউ', দিল্লী, খণ্ড ১, নং ১, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, পৃ. ১-২, ১৭-১৮। এছাড়া দ্রষ্টব্য : বি. আর. গ্রোভার, "সাম রেয়ার পার্সিয়ান ম্যানুস্ক্রিপটস অ্যান্ড ডকুমেন্টস অন ইন্ডিয়া (ষষ্ঠদশ-সপ্তদশ শতাব্দী) ইন দ্য জার্মান লাইব্রেরিস" ('ম্যাক্স মুলার ভবন পাব্লিকেশন ইয়ার বুক', নিউ দিল্লী, ১৯৬৪, পৃ. ৫৯-৭২. দ্রষ্টব্য : বি. আর. গ্রোভার, "নেচার অফ দেহাত-ই তালুকা এ্যান্ড দ্য এভ্যুলিউশন অফ দ্য তালুকদারী সিস্টেম ডিউরিং দ্য মুঘল এজ" ('দ্য ইকনমিক এ্যান্ড সোসাল হিস্ট্রি রিভিউ', খণ্ড ২, নং ৩, জুলাই ১৯৬৫, পৃ. ২৭৭-৭৮)।

২. বি. আর গ্রেভার, "নেচার অফ ল্যান্ড রাইটস", পৃ. ১০-১৫।

দরকার। কারণ জমির শাসনের জন্য মুঘল সরকারি আমলাদের বা এমনকি জমিদারদের সরকারের প্রতি তাদের কাজের বিনিময়ে জমিদারীর অংশ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। আকবরের সময় থেকে মুঘল শাসনের শেষ পর্যন্ত একথা খাটে। এই বিশ্লেষণ সুবা বাংলার মুঘল জমিদারী প্রথা সম্বন্ধেও বলা যায়। সুবা বাংলা সম্বন্ধে, 'আইন-ই-আকবরী' কয়েকটি সরকারে জমিদারদের বিভিন্ন জাতের উল্লেখ করেছে।[৩] কয়েকটি মহালের সঙ্গে তালুক শব্দটি যোগ দেওয়ায় জমিদারদের অধিকার বোঝায়। পরবর্তীকালে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, মীর্জা নাথান 'বাহারিস্তান-ই-ঘায়েবী'তে[৪] রাজন্যবর্গের ও অন্যান্য জমিভোগকারীদের সঙ্গে এই শব্দ অনায়াসে যুক্ত করেছেন।

১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় আফগান ক্ষমতার পতন হলে পর, ঐ জমিগুলিকে খালিসা ও জায়গীরে ভাগ করা হয়,[৫] যদিও ঐ সময়ে মুঘল জায়গীর প্রথার মধ্যে জমিদারদের যে তৎকালীন দখলীদার হিসাবে বাস্তব অবস্থা তা স্বীকার করে নেওয়া হয়। যদিও অন্যান্য সুবার মতো বাংলাতে একই ধরনের শাসনব্যবস্থা ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে প্রবর্তন করা হয়, তাহলেও মুঘল জরীপভিত্তিক ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ততটা প্রচলিত হয় নি।[৬] বাংলার ২৪টি সরকারের ৪৮৭টি মহালের একটিতেও 'আইন-ই-আকবরী'[৭] কোনো জরীপ-তালিকা দেয় নি,

৩. 'আইন-ই আকবরী' (টীকা ৬ দ্রষ্টব্য)।

৪. মীর্জা নাথান, 'বাহারিস্তান-ই ঘায়েবী' (বিবলিওথেক ন্যাশিওনাল, প্যারিস, নং সাপ্ল. ২৫২) এম. আই. বোরা কর্তৃক অনূদিত, দুই খণ্ড, গৌহাটি, ১৯৩৬।

৫. আবুল ফজল, 'আকবরনামা' (এইচ বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত), ১৯১২, তিন খণ্ড, পৃ. ২৮৪-৮৯।

৬. আবুল ফজল, 'আইন-ই আকবরী' (পুঁথি : ব্রিটিশ মিউজিয়াম, এড ৭৬৫২, পৃ. ১৭৫ বি ; অনুবাদক : এইচ এস জ্যারেট, সম্পাদনা : যদুনাথ সরকার, কলিকাতা, ১৯৪৯, পৃ. ১৩৪)। এখানে একটা প্রাথমিক জরীপ করা হয়েছিল যেটা আবুল ফজল উড়িয়ে দিচ্ছেন না, কিন্তু জোর দিচ্ছেন যে এটা বারবার করা হয় নি।

৭. 'আইন', পুঁথি, পৃ. ১৭৭ বি, ১৯২ বি (অনুবাদ : পৃ. ১৪২-৫৭)। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর উৎসে জোর দিয়ে বলা হচ্ছে যে, আকবরের সময়ে সম্পূর্ণ ও বিশদভাবে জরীপ ইত্যাদি করা হয়েছিল, আকবরায়াল ('তাসদিক দর কাফিয়াৎ বাংলা', পুঁথি ও আর. ২৭০ পৃ., বার্লিন)-এর মতে টোডরমল্ল বাংলায় দুইবার জমি বন্দোবস্ত করেন, প্রথমবার মুজাফর খানের সচিব হিসাবে অর্থাৎ আকবরের রাজত্বের ২৫ বছর থেকে ২৮ বছর পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়বার যখন তিনি 'ওয়াকিল' অর্থাৎ ৩৯ বছর রাজত্বের সময়ে। ঐ একই পুঁথিতে পাওয়া যায় যে, সম্রাট আকবরের মুৎসুদ্দীরা, মুজাফর খান ও টোডরমল্ল বাংলার সব জায়গাতেই জমি জরীপ করেন, 'তুমার' ধার্য করেন এবং তিনটি প্রথা অনুযায়ী 'জমা' ঠিক করেন ও কানুনগোদের 'তাকসিম' কাগজপত্র জমা দেন। দ্রষ্টব্য, জেমস গ্রান্ট, 'হিস্টোরিকাল অ্যান্ড কম্পারেটিভ ভিউ, দ্য ফিফথ রিপোর্ট' (দ্রষ্টব্য পুঁথিসহ পৃ. ৪৯), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯১।

যার থেকে বোঝা যায় যে, সমস্ত সরকারেই জমিদাররা ছিল 'যাইর-আমলি'। আকবরের রাজত্বকালে বাংলার অধিকাংশ জমিদাররা ছিলেন বিদ্রোহী[৮] এবং বিভিন্ন স্বাধীন নতুন জমিদাররা ক্ষমতা পেয়ে মুঘল শাসন জারি করার চেষ্টায় বাধা দিয়েছিলেন। এই ধরনের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ফলে মুঘল নীতির উপর ভিত্তি করে জমিদারী পরিচালনা সন্দেহজনক হয়ে ওঠে এবং শাসনতন্ত্রের নীতির সঙ্গে বাস্তবের যে ফারাক আছে সেটা মনে করিয়ে দেয়। কেবলমাত্র আকবরের রাজত্বের শেষদিকে এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমদিকে রাজা মানসিংহ কাছোয়া ও ইসলাম খান মুঘল শাসন জারী করা ও এর স্থায়িত্বের জন্য শক্ত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।[৯] জাহাঙ্গীরের রাজত্বেই মুঘল জমিদারী প্রথার আসল বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। এবং এর ছবিটা মীর্জা নাথান-এর 'বাহারিস্তান-ই ঘায়েবী' থেকে বোঝা যায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, সাম্রাজ্যের নীতি ছিল জমিদারদের বশ্যতা স্বীকার করানো, অর্থাৎ তাদের ধ্বংস করা নয়।[১০] বশ্যতা স্বীকারের নীতির মধ্যে দু ধরনের নীতি বাংলায় জমিদার-

৮. 'আকবরনামা', বেভারিজ অনূদিত, দ্রষ্টব্য পুঁথি পৃ. ৯; 'আইন', অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৩০ থেকে একটা মত বোঝা যায় যে, ভাটি অঞ্চলে (পূর্ব বাংলা) মুঘল সরকার নামমাত্র স্বীকৃতি নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। এর বক্তব্য: 'দেশের পূর্বদিকের যে-জায়গাকে ভাটি বলে, সেটা প্রদেশের অন্তর্গত। ঈশা খান এর শাসক এবং খুতবা পড়া হয় ও মুদ্রা ছাপানো হয় বর্তমান সম্রাটের নামে।' 'আইন'-এর মতে, ঢাকার পূর্বদিকের অংশটিকে ভাটি বলে।

৯. দ্রষ্টব্য পুঁথি, পৃ. ৯; দ্রষ্টব্য: আর এন. প্রসাদ, 'রাজা মানসিং অফ অম্বর', কলিকাতা, ১৯৬৬। কতকগুলি শক্তিশালী দলনেতা নিয়ে ভুঁইয়ারা সংঘটিত। বাংলার শেষ কাররানী রাজা দাউদের পতনের পর (১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে) এরা ক্ষমতায় আসে। মীর্জা নাথান এদের সংখ্যা বারো ধরেছেন, যেটা সঠিক না হলেও কাছাকাছি। ইসলাম খানের বিরুদ্ধে ছোটো ছোটো জমিদার যারা ঈশা খানের ছেলে মুশা খান ও তার প্রধান বন্ধু ওসমানের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছিলেন। মীর্জা নাথান আলাদা করে উল্লেখ করে বলছেন না যে, এই ভূঁইয়ারা কারা। দ্রষ্টব্য: ড. ওয়াইজ, "বারভূঁইয়াজ" ('জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল', ১৮২৪, পৃ. ১৯৭-২১৪); ব্লখম্যান ('জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল', ১৮৭৩, পৃ. ২২৩); বেভারিজ, ঐ. ১৯০৪, পৃ. ৫৭; 'বাহারিস্তান', অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৯৯-৮০০; এছাড়া, তপনকুমার রায়চৌধুরী: 'বেঙ্গল আন্ডার আকবর এ্যান্ড জাহাঙ্গীর', কলিকাতা, ১৯৫৩, পৃ. ১-৩ দ্রষ্টব্য।

১০. বাংলায় রাজা মানসিংহ শাসনকর্তা হয়েছিলেন ১৫৯৪ থেকে ১৬০৪ খ্রীস্টাব্দ ('আকবরনামা', বেভারিজ-এর অনুবাদ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১০০৯, ১০৪০-৪১, ১১৫১, ১১৫৫, ১১৭৪, ১২১৩-১৪, ১২৩১-৪০, ১২৫৬-৫৭। ইসলাম খান শাসনকর্তা ছিলেন ১৬০৮ থেকে ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দ। বিশদ বিবরণের জন্য 'বাহারিস্তান', প্যারিস পুঁথি, পৃ. ৪ বি, ৬১ বি। এছাড়া, 'বাহারিস্তান', অনুবাদ, পৃ. ১৪-২৮; তপন রায়চৌধুরী, পৃ. ১-৫।

দের সম্বন্ধে নেওয়া হয়েছিল। সাধারণত যেসব জমিদাররা ইচ্ছাকৃতভাবে বা হুকুম পেয়ে যুদ্ধ না-করে বশ্যতা স্বীকার করেছেন, তাদের জমিদারী জায়গীর হিসাবে ফেরৎ দেওয়া হয়।[১১] দ্বিতীয়ত জমিদারদের সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন হলে পর, তাদের জমিদারীর একটা বড়ো অংশ মুঘল এলাকার মধ্যে নিয়ে নেওয়া হতো এবং একটা অংশ তাকে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য 'জায়গীর' হিসাবে ফিরিয়ে দেওয়া হতো। যদি কোনো জমিদার বিদ্রোহী হয়, বিদ্রোহ দমনের পর, তার জমিদারীর বৃহৎ অংশ মুঘল মনসবদারদের 'তনখোয়া জায়গীর' হিসাবে দেওয়া হতো।[১২]

জায়গীরদার হিসাবে জমিদারের স্থান যাই হোক না কেন, যে-কোনো ক্ষেত্রে তাকে শাসনকর্তার সামনে এসে ব্যক্তিগতভাবে সম্মান জানানোর দরকার ছিল এবং কখনো কখনো সম্রাটের দরবারে পাঠানো হতো বশ্যতা স্বীকার করার জন্য।[১৩] তাকে একজন নিকট আত্মীয়কে জামিন হিসাবে দিতে হতো তার বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসাবে।[১৪] মুঘল সাম্রাজ্যের প্রসারের জন্য সমস্ত বিশ্বস্ত জমিদারকে সামরিক সাহায্য দিতে হতো এবং কাউকে কাউকে মুঘল সাম্রাজ্যের কাজে যোগ দিতে বাধ্য করা হতো।[১৫] তাদেরকে প্রধানত 'পেশকাস' দিতে হতো যদিও কেউ কেউ চুক্তি অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক দিতেন এবং অন্যান্যরা 'ওয়াতন' বা জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য 'জায়গীর' ছাড়া অন্য জমিদারীর এলাকা থেকে সাধারণ খাজনা দিতেন।[১৬]

বশ্যতা স্বীকার করার পর কয়েকজন জমিদারকে (যেমন ভূষণার সত্রাজিৎ, বীরভূমের বীর হাম্বীর, পাচেট-এর শামস খান) জমিদারী জীবনযাত্রা নির্বাহের জায়গীর হিসাবে দেওয়া হয়।[১৭] ভুঁইয়াদের নেতা মুসা খান ও ভাটি-

১১. 'বাহারিস্তান', প্যারিস পুঁথি, পৃ. ৫৫ এ, ৬১ বি, ১৫২ এ।

১২. ঐ, পৃ. ৫৩ এ ; অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৮ ; ইসলাম খান ভূষণার সত্রাজিতের বিরুদ্ধে ইফতিকার খানকে পাঠান এই আদেশ সমেত যে, যদি সত্রাজিৎ বশ্যতাস্বীকার করে, তাহলে তার জায়গা তাকে জায়গীর হিসাবে ফেরৎ দেবার আশা দেখানো যেতে পারে। অন্যথায় তার জায়গা কারোরীদের ঘোড়ার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে।

১৩. ঐ, পুঁথি, পৃ. ৫৩ এ, ৬১ বি, ১৫২ এ, ১৭০ এ, ২০৮ এ, ৩১২ বি, ৩২৫ বি; অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫১৮।

১৪. 'বাহারিস্তান', অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৬৬-৬৭।

১৫. ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১০০।

১৬. ঐ প্যারিস পুঁথি, পৃ. ৫৩ এ ; অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১০০ ; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫১৭, ৫২২, ৫৬৮।

১৭. ঐ, প্যারিস পুঁথি, পৃ. ৯-১০। অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১২৩ , দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫১২-২২।

অঞ্চলে তার মিত্ররা তাদের জমিদারী 'জায়গীর' হিসাবে সম্পূর্ণ ফেরৎ পায় আভ্যন্তরীণ শাসনের অধিকার সমেত।[১৮] তাদের সকলেই 'পেশকাস' (নির্দিষ্ট খাজনা) দিতে হতো এবং অন্যান্য বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করার জন্য ও মুঘল এলাকা আরো বাড়াবার জন্য মুঘল দলে যোগ দিতে হতো।[১৯] মুঘল শাসনকর্তার দরবারে তাঁদের হাজির হতে হতো।[২০] বৈচুণ্ড-এর আলওয়ার খান বশ্যতাস্বীকার করলে পর তাঁর সবটা এলাকা 'জায়গীর' হিসাবে দেওয়া হয়। তিনি নিজে ইসলাম খান-এর দরবারে হাজির ছিলেন এবং মুঘলদলে যোগ দেন।[২১] কিন্তু তাঁর বিদ্রোহের পরে তাঁর সমস্ত এলাকা বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয় এবং তাঁকে রোটাসের দুর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[২২]

উল্লিখিত বিভাগ ছাড়া যশোর ও বাকলার জমিদারদের তাদের জমিদারীর একটা অংশ ব্যক্তিগত জায়গীর হিসাবে দেওয়া হয় এবং জমিদার হিসাবে মেনে নেওয়া হয়। তাদের জমিদারী এলাকার বাকী অংশ হয় মুঘল মনসবদারদের 'জায়গীর' হিসাবে দেওয়া হয় অথবা খালিসা হিসাবে সরকারের অধীনে নিয়ে নেওয়া হয়। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে ইসলাম খান তার সমস্ত এলাকার উপর কর্তৃত্ব দেন এবং তার খরচা হিসাবে শ্রীপুর ও বিক্রমপুরের খাজনা সংগ্রহ করতে দেন।[২৩] বাকলার রাজা রামচন্দ্রের উপর নজরদারী রাখা হয় এবং তার নৌবহর রাখার জন্য যতটা এলাকা দরকার ততটা এলাকা তাকে দেওয়া হয়। তার

১৮. ঐ, পুঁথি, পৃ. ৩৫ এ. ১৬৫ বি ; অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৮-২০ ; ৩২৭। এই জায়গাগুলির ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য রেনেলের মানচিত্র নং ৭ দ্রষ্টব্য। এছাড়া 'বাহারিস্তান', অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮০০-৮০১।

১৯ 'বাহারিস্তান', অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১০০। মুসা খান ও তার বন্ধুদের বশ্যতা-স্বীকারের পর, প্রত্যেকের জায়গা তাঁদের জীবনযাত্রার জন্য প্রত্যেককে জায়গীর দেওয়া হয়। দ্রষ্টব্য : 'জার্নাল অফ বিহার এ্যান্ড উড়িশা রিসার্চ সোসাইটি', চতুর্থ, পৃ. ১৮৮ : 'বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেসেন্ট', ১৯২৮, নং ৩৫, পৃ. ৩৩ এবং নং ৩৮, পৃ. ২৫ ; এছাড়া, 'বাহারিস্তান', অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৯৬।

২০. 'বাহারিস্তান', প্যারিস পুঁথি, ৫৩ এ, ১৫২ এ ; অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯৯, ২৯, ৩১৯।

২১. ঐ, পুঁথি, পৃ. ৫৩ এ. ১৬৫ বি : 'বাহারিস্তান', অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩২৭। যখন সব জমিদারদের মধ্যে শামস খান (বীরভূমের জমিদার), বীর হাম্বীর (পাচেটের জমিদার) এবং বাহাদুর খান, সলিম খান হিজলীওয়ালের ভাইপো, নিজেরা শাসন-কর্তার দরবারে এলেন না, তখন শেখ কমলকে শামস খান ও বীর হাম্বীরের বিরুদ্ধে পাঠালেন।

২২. 'বাহারিস্তান', অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১০৫।

২৩. ঐ, পুঁথি, পৃ. ১৪০।

জমিদারীর বাকি এলাকা শাসনের জন্য জায়গীরদার ও কারোরীদের দেওয়া হয়।[২৪] তিনি বিদ্রোহী মনোভাব দেখালে তাঁর সমস্ত এলাকাই 'খালিসা'র মধ্যে নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে কাশিম খানের শাসনের সময় তাঁকে তার সবটা এলাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয় উপরিউক্ত জায়গীর সমেত।[২৫] যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যর ছেলেরা বিদ্রোহী হলে তাদের দমন করা হয় এবং নজরদারীর জন্য সম্রাটের দরবারে পাঠানো হয়। পরে ফিরিঙ্গী দস্যুদের দমনের জন্য ও যশোরের সঙ্গে ভালো সম্বন্ধ করার জন্য তাদেরকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয় ও তাদের এলাকা উপরিউক্ত 'জায়গীর' সমেত দিয়ে দেওয়া হয়।[২৬] অধিকাংশ ভূঁইয়াদের এই ধরনের জমিদারদের মধ্যে ধরা হয় এবং তাদের জমিদারীর একটা অংশ তাদেরকে ব্যক্তিগত জায়গীর হিসাবে দেওয়া হয়।

বিয়াজিদ কাররানীর বশ্যতা স্বীকারের পরে, সিলেটের জমিদারী, যা ঐ দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে পৃথক, সম্পূর্ণভাবে মুঘল সরকার বাজেয়াপ্ত করে এবং মুঘল শাসনকর্তার অধীনে রাখা হয়।[২৭] 'বাহারিস্তান-ই ঘায়েবী' যদিও কাছাড়, ত্রিপুরা ও ভুলুয়ার জমীদারদের বশ্যতাস্বীকারের কথা বলেছেন, তাদের জায়গীর সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। এটা সত্য যে ঐসব জায়গায় মুঘল থানা বসানো হয়েছিল।[২৮] তার থেকে মনে হয় যে সিলেটের ধরনের জমিদারী হয় সম্পূর্ণভাবে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল অথবা তাদের এলাকার অধিকাংশ সরাসরি শাসনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছিল, অবশ্য ছোটো ছোটো 'জায়গীর' ছেড়ে দিয়ে।

ভূমিরাজস্ব শাসনের ক্ষেত্রে এটা পরিষ্কার যে, যেসব জমিদারী সবটাই জায়গীর হিসাবে দেওয়া হয়েছে সেগুলোকেই 'ঘায়ের-আমলী' বলে এবং

২৪. ঐ, প্যারিস পুঁথি, পৃ. ৬১ বি, ৩০০ এ ; অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৮। 'আইন' যশোরকে খলিফাবাদ সরকারের 'মহাল' হিসাবে ধরেছে (পুঁথি, টীকা ৫ ; অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৩৪)। 'বাহারিস্তান' একে 'জেসার' বলেছে।

২৫. 'বাহারিস্তান', অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩২।

২৬. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫২১।

২৭. ঐ, প্যারিস পুঁথি, ২৭৩ এ, ২৯৯ বি, ৩০০ এ ; অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫২১।

২৮ ঐ, অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৮। সিলেটের সমস্ত সরকারের সরদার (শাসক) হিসাবে নিযুক্ত হয় মুথারাম খান (পৃ. ৩২৬-২৭)। পরে মীর্জা নাথান, 'বাহারিস্তান'-এর লেখক, সিলেটের সরদার হিসাবে নিযুক্ত হন (ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৩৩)। 'আইন' (অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫২) উল্লেখ করেছে যে সিলেট একটি পৃথক 'সরকার', বাংলা সুবার মধ্যেও তার আটটি 'মহাল' আছে। ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য দ্রষ্টব্য রেনেলের মানচিত্র নং ৬। দ্রষ্টব্য : 'বাহারিস্তান', অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, টীকা, পৃ. ৮১১।

আভ্যন্তরীণ রাজস্ব শাসনে জমিদারদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে সব জমিদারীর ছোটো-ছোটো অংশ ঐ জমিদারদের ব্যক্তিগত 'জায়গীর' হিসাবে দেওয়া হয়েছে, সেগুলোকে 'আমলী' বলে অর্থাৎ সেগুলো মুঘল জমা ও সংগ্রহ প্রথার অধীনে। বাকলার জমিদারীর ক্ষেত্রে, 'বাহারিস্তান-ই ঘায়েবী' বলছে যে, রাজা রামচন্দ্রকে ব্যক্তিগত জায়গীর দেওয়া ছাড়া, ঐ জমিদারীর বাকি অংশ কারোরী ও জায়গীরদের দেওয়া হলো,[২৯] যারা মুঘল প্রথা অনুযায়ী জমি জরীপ করার পর খাজনার পরিমাণ কত হবে ঠিক করবে। ঐ রকমভাবেই যশোরের রাজাকে একটা ছোটো 'জায়গীর' দেওয়া হয় এবং তার এলাকাকে সরাসরি মুঘল শাসনব্যবস্থার মধ্যে আনা হয়। খাজা মহম্মদ তাহিরকে খাজনার পরিমাণ ঠিক করার ভার দেওয়া হয়। তিনি জমা-র (খাজনার পরিমাণ ঠিক করার পর) দলিল ঠিক করেন যার মধ্যে চৌধুরী ও কানুনগোর সই আছে এবং এটা রায়তদের ও চৌধুরীদের উপর চাপানো হয় খাজনা সংগ্রহ করার জন্য।[৩০] এ ছাড়া, যে সব জমিদারী সম্পূর্ণভাবে মুঘল সরকার নিচ্ছেন, সেগুলোকে 'আমলী' হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সিলেটের খাজনার ব্যাপারে যে যে কাজ করা হয়েছিল তার বিস্তৃত বিবরণ 'বাহারিস্তান-ই ঘায়েবী' থেকে পাওয়া যায় এবং সেটা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩১]

'আইন-ই আকবরী'র সুবা বাংলার ভৌগোলিক বিবরণ থেকে কুচ-এর জমিদারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর কাছে হাজার ঘোড়সওয়ার ও হাজার পদাতিক সৈন্য আছে ও তাঁর অধীনে কামরূপ (কামতা) রয়েছে।[৩২] যেহেতু এই জায়গাগুলি সুবা বাংলার সরকারের মধ্যে পাওয়া যায় না, এটা মনে হয় যে আকবরের সময়ে তারা মুঘল আক্রমণ থেকে মুক্ত ছিল এবং কেবলমাত্র জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই তাদেরকে মুঘল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়।[৩৩]

২৯. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৯০।
৩০. ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩২।
৩১. ঐ, প্যারিস পুঁথি, পৃ. ৬১ বি; অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৫৬-৫৭। খাজা মহম্মদ তাহির, যিনি যশোহরে গিয়েছিলেন খাজনা নির্ধারণ করার জন্য, ইসলাম খানের কাছে ফেরৎ আসেন ঐ সব জায়গার খাজনার দলিল সমেত। এরপর রায়তদের সম্মতি মতো খাজনা তৈরি করা হয় যেটা সাম্রাজ্যের কোষাগারের পক্ষে সুবিধাজনক।
৩২. 'বাহারিস্তান', অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩২৬-২৭; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৩৩।
৩৩. 'আইন', অনুবাদ, পৃ. ১৩০। 'আইন' এবং অন্যান্য মুঘল ঐতিহাসিকরা কোনো কোনো সময় কামরূপ এবং কামতা একই অর্থে ধরেছেন। প্রথমে পশ্চিম ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা করতোয়া পর্যন্ত কামতা ছিল এবং কামরূপ রাজ্যের মধ্যে ধরা হতো। কামরূপ এবং কামতা উভয়েই কুচবিহারের মধ্যে ছিল। 'বাহারিস্তান' কামরূপকে মানস নদীর পূর্বে রাজা পরীক্ষিতনারায়ণের রাজ্যের মধ্যে ধরেছে এবং কামতাকে নদীর পশ্চিমপারে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যের মধ্যে ধরেছে। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: 'বাহারিস্তান', অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পাদটীকা ১৫, পৃ. ৮০৬-৭।

বশ্যতা স্বীকার করার পর, রাজা পরীক্ষিতনারায়ণকে তাঁর এলাকায় নামমাত্র জায়গীর দিয়ে বসানো হয়, কিন্তু কামরূপ এলাকার অধিকাংশ জায়গাই মুঘল-শাসনের প্রথার মধ্যে নিয়ে আসা হয়।[৩৪] খালিসাতে কিছু পরগণা আলাদা করে রাখা হয় এবং বাকি তনখা জায়গীর বা ইজারাদের দেওয়া হয় খাজনা সংগ্রহ-র জন্য।[৩৫] কামরূপ এলাকা মুঘল প্রথার ভূমি রাজস্বের শাসনের মধ্যে নিয়ে আসা হয় এবং পরগণা থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করার জন্য কারোরী নিযুক্ত করা হয়। কামতার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন এবং তাঁর এলাকা মুঘল শাসনের মধ্যে নিয়ে আসা হয়।[৩৬] পরে তাঁর আত্মীয় রাজা পরীক্ষিতের সঙ্গে তাঁকেও শাসনকর্তা ইব্রাহিম খান আবার জমিদার হিসাবে মেনে নেন কিছু জায়গীর সমেত। তিনি মুঘল এলাকা বাড়ানোর জন্য মুঘল-দের সাহায্য করেছিলেন।[৩৭]

৩৪. 'আকবরনামা', অনুবাদ তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৪৯, ১০৬৮ ; দ্রষ্টব্য 'আইন', অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, 'বাহারিস্তান', অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, টীকা, পৃ ৮২৬-২৯।

৩৫. ঐ, পৃ. ২৭২, ৪১০ ; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫২১। শাসক ইসলাম খানের মৃতদেহের প্রতি বশতাস্বীকার করার জন্য রাজা পরীক্ষিতকে বাধ্য করা হয় (ঐ, পৃ. ২৫৭, ২৬৪) এবং তাকে নূতন শাসনকর্তা কাশিম খানের সামনে হাজির করা হয় (ঐ, পৃ. ২৯২, ২৯৭, ৪০৭, ৪৫২)। তার সবজায়গা সরাসরি মুঘল শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে কাশিম খানের অধীনে আনা হয় (ঐ, পৃ. ৪০৯-৪১০)। পরে, পরবর্তী শাসনকর্তা ইব্রাহিম খান রাজাকে বিশ্বাসী জমিদার হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন সাত লক্ষ টাকা মুঘল সরকারকে 'পেশকাস' দেবার বিনিময়ে (ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৫২১)।

৩৬. ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃ ২৭২-৭৩। রাজা পরীক্ষিত বশ্যতাস্বীকার করার পর, আবদুস সায়াদকে কুচ-এর সৈনাধ্যক্ষ করা হয়। তিনি আদেশ দেন যে মীর্জা হাসান, দেওয়ান ও বক্সী, পরগণা ও অনান্য জায়গার খাজনা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করবেন। উপরিউক্ত মীর্জা, তাঁর বিরাট অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, কুচ-এর পরগণাকে বিশটি পরিষ্কার বৃত্ততে ভাগ করেন। কয়েকটি কেন্দ্রীয় কারোরীদের এবং জায়গীরদারদের দেওয়া হয় খাজনা সংগ্রহ করার জন্য, কয়েকটি 'মুসতাজির'দের (ইজারাদার) দেওয়া হয় (ঐ, পৃ. ২৭২-৭৩)। পরবর্তীকালে শাসনব্যবস্থা শেখ ইব্রাহিম কারোরী (ঐ, পৃ. ৪১০) এবং তারপরে কুলিচ খান, কুচ-এ সরদারকে জায়গীর হিসাবে দেওয়া হয়।

৩৭. ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৪৮-৪৯। কুচবিহার ও কামরূপে একজন দেওয়ান পদমর্যাদার সমতুল্য আমলা নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি বাংলার শাসনকর্তা ও 'দেওয়ান-ই সুবা'র অধীনে কাজ করেন। মীর্জা হাসান মাশাদির পদত্যাগের পর, কুচ-এর দেওয়ান ও বক্সী, মীর সফি এই পদে নিযুক্ত হন। তিনি জাহাঙ্গীরাবাদের সব পরগণার মধ্যে জমার পরিবর্তন করেন। কিন্তু জমার পরিমাণ অত্যধিক দাবি বলে মনে হওয়ায়, তাঁকেও পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। কামরূপের সব জায়গায় শেখ ইব্রাহিমকে প্রধান কারোরী করা হয়। তিনি খাজনার বন্দোবস্ত করেন এবং কামরূপে এই কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের থানা বসান (ঐ, পৃ. ৪০৩)।

কুচবিহারের জমিদারী ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দ অবধি চলতে থাকে। যেহেতু রাজা ভীমনারায়ণ আসামের রাজাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সেজন্য কুচবিহার মুঘল সরকারে বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়।[৩৮] সিহাবুদ্দীন তালিম সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ওখানকার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা অন্যান্য প্রদেশের মতোই করা হয়। এছাড়া, কুচবিহারের অন্যান্য ছোটো-ছোটো জমিদারদের একে একে মুঘল শাসনব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসা হয়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিনের সমকালীন প্রমাণে পাওয়া যায় যে, তাদের এলাকাগুলি মুঘল সরকারী আমলাদের 'তনখা জায়গীর' হিসাবে দেওয়া হয়েছিল।[৩৯]

বিজয়ের প্রথম পর্বে বিভিন্ন জমিদারদের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা কয়েকটি জমিদারের সন্দেহজনক এবং ক্রমাগত বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যম্ভাবী ছিল।[৪০] ইব্রাহিম খানের সময়ের মধ্যে অবস্থা শান্ত হয়ে এসেছে এবং মুঘল-দরবার যেসব রাজাদের নজরদারীর মধ্যে রেখেছিল, তাদেরকে মুক্তি দিয়েছে। যশোর ও কুচ-এর জমিদারদের আবার জমিদার করা হয়।[৪১] কিন্তু এই জমিদারী ফিরিয়ে দেওয়ার মানে এই নয় যে, জমিদাররা মুঘল সরকারের নাম-মাত্র বশ্যতা স্বীকার করে আধা-স্বাধীন হয়ে থাকবে।[৪২] এমনকি তাদের জায়গীর তাদের সম্পূর্ণ এলাকার নয়, কেবলমাত্র একটা অংশ মাত্র; বাকিটা রাজস্ব শাসনব্যবস্থার জন্য মুঘল আমলাদের কাছে ছিল। উপরন্তু, জমিদারও মুঘল জমিদারীর নিয়মাবলীর—বশ্যতা স্বীকার ও সামরিক সাহায্য—আওতায় পড়ত। ইব্রাহিম খানের নীতি পরবর্তীকালে কুচবিচার, কামরূপ ও আসাম পর্বতমালার জমিদারদের প্রতি অনুসরণ করা হয়। এর থেকেই দেখা যায় যে, জমিদারী এলাকার একটা অংশ শুধু জমিদারদের দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিগত জায়গীর হিসাবে এবং বাংলার দখলীকৃত অঞ্চলে অন্য রকম হওয়া সম্ভব ছিল না। বাংলার জমিদারদের প্রতি যে স্থায়ী নীতি নেওয়া হয়েছিল তা অসাধারণ

৩৮. 'বাহারিস্তান', প্যারিস পুঁথি, পৃ. ১৫২ এ ; অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯০, ৩৫২; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫০৩। কুচবিহারের রাজাদের মধ্যে, কামতা বিভাগের রাজা লক্ষ্মী-নারায়ণই প্রথম মুঘলদের কাছে বশ্যতাস্বীকার করে।

৩৯. 'বাহারিস্তান', অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫২১।

৪০. ঐ, পৃ. ৫৮৯, ৬০৫, ৬১২, ৬২১।

৪১. আবুল ফজল মামুরী, পুঁথি ২০৯৩, রামপুর রাজা গ্রন্থাগার (উত্তরপ্রদেশ), পৃ. ৪৪৯-৫০।

৪২. 'ফতেহা ইব্রীহা', পুঁথি, ওরিয়েন্ট ২৬৬ (বার্লিন), পৃ. ৫৫ এ-৫৫ বি। বসিক খানকে ফৌজদার নিয়োগ করা হয় (দ্রষ্টব্য পৃ. ১৩৪ বি)।

নয়। বরঞ্চ অন্যান্য মুঘল প্রদেশে যে নীতি নেওয়া হয়েছিল তার থেকে অন্যরকম কিছু নয়।

বাংলা দখল করা হলে, ভূঁইয়া ও প্রাক্-মুঘল জমিদারদের সঙ্গে সঙ্গে মুঘল শাসন একটি নূতন সরকারি জমিদারী শ্রেণী তৈরি করে, যারা অন্যান্য প্রদেশের ঐ ধরনের জমিদারদের মতো জায়গীর পেত নিজস্ব এলাকায় খাজনা-সংগ্রহ ও শান্তিশৃংখলা রক্ষা করার জন্য। এরা একেবারেই আমলী এবং এদের সংগৃহীত খাজনা পেশকাস হিসাবে মুঘল সরকারে জমা দেওয়া হতো। বলা বাহুল্য, ঐ সব জমিদাররা খাজনা-সংগ্রহ-র জন্য, বিচার, পুলিশ ও আর্থিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বড় বড় জমিদাররা ('জমিদারন-ই উমদা') ধর্মীয় দান করার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু আমলী এলাকায়, ঐ সব দান মুঘল সরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষ ছিল। 'ঘায়ের-আমলী' এলাকা ছাড়া, উত্তরাধিকারী জমিদাররা কখনো খাজনার পরিমাণ ঠিক করার অধিকার পান নি। তাদের 'আমল'-এলাকায়ও সরকারি জমিদারদের এলাকা, সব সময়ই মুঘল আমলারা ঐ কাজ করে এসেছে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সময় থেকে ধীরে ধীরে বাংলা দখল হলে পর নূতন সমকালীন তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, সাধারণভাবে জমিদারদের 'ঘায়ের-আমলী' এলাকাকে 'আমলী' করে দেওয়া হয়।

জাহাঙ্গীরের সময়ের 'বাহারিস্তান-ই ঘায়েবী' ছাড়াও 'মুকারাৎ-ই হাসান' এবং সিহাবুদ্দীন তালিশের 'ফাতিয়া ইব্রীয়া' আওরঙ্গজেবের রাজত্বে পরিষ্কারভাবে এটা দেখাচ্ছে। মুঘল আমলাদের চিঠি-পত্রের সংগ্রহ করেছেন মীর আবুল হাসান 'মুকারাৎ-ই হাসান'-এ।[৪৩] তিনি আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দিকের বাংলা ও উড়িষ্যা সুবার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার কাজ দেখিয়েছেন। ঐ সময়ের জমিদারী প্রথার বিস্তৃত চেহারা এর মধ্যে পাওয়া যায় এবং উল্লেখযোগ্য এই যে, যেসব জমিদাররা পেশকাস মুকারারী (স্থায়ী বার্ষিক খাজনা) দিচ্ছেন মুঘল সরকারের জমা নির্ধারণ করার পর, তাদের অবস্থা পরিষ্কারভাবে বলছেন। জমিদারদের কখনো কখনো বিদ্রোহ ও খাজনা ফাঁকি দেওয়া সত্ত্বেও, মুঘল সরকার কঠোরভাবে খাজনার নিয়মাবলী মেনে চলছেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দিকে, সিহাবুদ্দীন তালিম পরিষ্কারভাবে

৪৩. বশ্যতাস্বীকার করার পরও কয়েকটি জমিদার মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে প্রায়ই বিদ্রোহ করত। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, 'বাহারিস্তান', অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩২, ১০৫-৬, ১২৭, ১৩১, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৯; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬২৩-২৫, ৬৩৯, ৭৪২।

খালিসা, জাইগীর ও আইমা জমির জরীপ করার পর খাজনা সংগ্রহ উল্লেখ করেছেন। এটা চট্টগ্রাম ছাড়া বাংলার সব অংশ জুড়েই হয়েছিল যেগুলো কানুনগোরা মুঘল বিজয়ের সময় থেকে ঘায়ের আমলীর মধ্যে ফেলেছিল এবং সব সময়ই যেগুলো মনসবদারদের 'তনখা জায়গীর' হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। আদর্শগতভাবে বাংলাদেশে মুঘল জমিদারী প্রথা অন্যান্য মুঘল প্রদেশের মতোই চলছিল। মুর্শিদ কুলী খানের রাজস্ব ব্যবস্থা ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার একটা শেষ পর্বের মিলন দেখায়। মুর্শিদ কুলী (মীর্জা মুহম্মদ হাদি), রাজস্ব ও ফৌজদারী প্রথার বিশেষজ্ঞ, উড়িষ্যার দেওয়ান হন এবং পরে আওরঙ্গজেব তাঁকে সুবা বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করেন।[৪৪] সুবা বাংলার জায়গীর জমি কমিয়ে দিয়ে মীর্জা হাদি খালিসা জমি বাড়িয়ে যান। অধিকাংশ মনসবদারদের জায়গীর উড়িষ্যা সুবায় সরিয়ে দেওয়া হয়। 'জমা' তৈরি করার জন্য, বিশেষত জমি জরীপ করার পর, মীর্জা হাদি সরকারি আইন মোতাবেক সব জমিকে, এমনকি জমিদারী এলাকাগুলিকেও ঐ আইনের মধ্যে নিয়ে আসেন। জমিদারদের 'তনখা জায়গীর' তিনি স্বীকার করে নেন। তিনি রাজস্ব বিভাগে আমলা নিযুক্ত করেন যারা ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য রাজস্ব ('মাল-ওয়া-সইর') তৈরি করবে। সুবা বাংলার সব পরগণা, চাকলা ও সরকার নিয়ে এসব করা হবে। এটা মনে হয় যে তিনি আসার আগে, মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা ভালোভাবে চালু করা হয় নি যার ফলে 'তনখা জায়গীর' ও জমিদারদের হাতে অনেক ক্ষমতা রয়ে গিয়েছিল। জমিদারদের বলা হয়েছিল ভূমি-রাজস্ব নিয়মিত ও সময়মতো দেওয়ার জন্য এবং রায়তদের স্বার্থ দেখার জন্য। এইসব ব্যবস্থার ফলে ভূমি-রাজস্ব অনেক বেড়ে যায়। মুর্শিদ কুলী খানের বাংলায় দেওয়ানী ও সুবাদারীর সময়ে (১৭০০-১৭২৭) রাজস্ব সংস্কার সম্ভব হয় এবং জমিদারী প্রথা শক্ত হয়ে উঠে। খাজনা ঠিক তৈরি করার জন্য জমির বিভিন্ন ভাগ করা হয় জরীপ করার পর। শিকদাররা ও আমিনরা পরগণার চাষযোগ্য ও পতিত জমির বিস্তারিত বিভাগ করেন। এই সব ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে সুবার জমিদারদের রাজস্ব নূতনভাবে নির্ধারণ করা হয়। জমিদারদের অনুমোদিত খরচ ও আয় কমিয়ে দেওয়া হয়। জমিদারদের 'নানকর' ও অন্যান্য আয় নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। অন্যান্য মুঘল প্রথার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, মুঘল শাসনের সঙ্গে রায়তদের সরাসরি যোগ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়। অভাবী রায়তদের 'তাকাভি' ঋণ দেওয়া এবং বাংলার ভূমি-রাজস্ব

৪৪. 'বাহারিস্তান', প্যারিস, পুঁথি পৃ. ২৯৯ বি-৩০০ এ। ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫২১।

ও অন্যান্য রাজস্ব ('মাল-ওয়া সইর') বাড়ানোর সবরকম চেষ্টা করা হয়। বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের আগ্রাসী জমিদারদের জোর করে আর্থিক আইনগুলি মেনে নেওয়ানো হয়। কুচবিহারের জমিদারও, যিনি অধিকাংশ সময়ই বিদ্রোহী হন ও স্বাধীনতার চেষ্টা করেন, বার্ষিক পেশকাস নিয়মিত দিতে বাধ্য হন।[৪৫] সুবা বাংলার পরগণা, চাকলা ও সরকারগুলির শাসনব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করেন মুর্শিদ কুলী। জমিদারী এলাকায়, রাজস্ব আমলা, যেমন আমিল, নিয়োগ করে তিনি জমিদারদের নিয়ন্ত্রণে রেখে মুঘল আর্থিক নিয়মাবলী মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। সুবা বিহার থেকে মেদিনীপুর চাকলা সরিয়ে নিয়ে সুবা বাংলার সঙ্গে লাগানো হয়। বিদ্রোহী মনোভাবসম্পন্ন জমিদারদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য, তাদের জমিদারী এলাকার পুনর্বিন্যাস করে তাদের জমিদারী এলাকা বাড়ান হয় কিন্তু জমিদারদের সংখ্যা কমান হয়। এইভাবে মুর্শিদ কুলী বড়ো বড়ো জমিদারী তৈরি করেন। তাঁর সময়ে বাংলার রাজস্বের প্রায় অর্ধেকই ছটি বড়ো জমিদার দিত—রাজশাহী, বর্ধমান, দিনাজপুর, নদীয়া, বীরভূম ও বিষ্ণুপুর। এদের অধীনে ছোটো জমিদার, তালুকদার, চৌধুরী, মোড়ল এবং গ্রামের কৃষকরা থাকত। সরকারী জমিদার-দের সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে রাজস্ব সংগ্রহ করা সহজ হয়ে যায় কিন্তু এর ফলে ঐ সব বড়ো বড়ো জমিদারী এলাকাগুলিতে একটা স্তরভিত্তিক মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের জন্ম হয়। মুর্শিদ কুলী খান জমিদারি খাজনার মধ্য থেকে 'সেহবন্দি' তুলে দেন যেটা জমিদাররা নিতেন নিয়মিত সৈন্য রাখার জন্য। এর ফলে জমিদারদের সামরিক শক্তি হ্রাস পায় এবং এটা আশা করা হয় যে,

৪৫. অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী (পৃ ১৮ ২০) এটা মেনে নিয়েছেন যে, ইসলাম খান এবং কাশিম খানের শাসনের সময়ে আধা-স্বাধীন রাজারা হয় জায়গীরদার অথবা বশ জমিদারে পরিণত হয়েছিল। তিনি মনে করেন যে, এই অবস্থাটা পরস্পর-বিরোধী। তিনি আরো বলেছেন যে, ইব্রাহিম খানের আপসমূলক নীতি এই পরস্পরবিরোধী অবস্থার পরিবর্তন করে এবং মুঘল সরকার ও জমিদারদের মধ্যে মোটামুটি একটা সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ফলে জমিদাররা সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ বশ্যতাস্বীকার করে। জায়গা ফেরৎ দেওয়াটা কেবলমাত্র মৌখিক ব্যাপার নয়, আসলেই ফেরৎ দেওয়া হয়েছিল। অধ্যাপক রায়চৌধুরী এটা বোঝেন নি যে, জমিদারদের প্রতি ব্যবহারের বৈষম্য, মুঘল বিজয়ের প্রথমদিকে অথবা শেষদিকে, পরস্পরবিরোধী অবস্থার সৃষ্টি করছে না। আসলে মুঘল রাজ্যের মধ্যে বৈষম্য এবং জমিদারদের বিভিন্ন ধরন মুঘল রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, যেটা নির্ভর করছে বিভিন্ন ভৌগোলিক, সামরিক এবং রাজনীতির কার্য-কারণের উপর। কিন্তু জায়গা ফেরৎ দেওয়া বাস্তব ঘটনা হলেও এটা বোঝায় না যে, মুঘল সরকার এইসব জমিদারদের খাজনার অধিকার ছেড়ে দিয়েছে।

জমিদাররা তাদের স্থানীয় শক্তি নিয়ে শুধু খাজনা সংগ্রহ করার দিকে মন দেবেন। জমিদারী এলাকার মধ্যে সরকারি আমলা, যেমন আমিল, নিয়োগের ফলে জমিদারদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশা থাকে যার ফলে তাঁরা মুঘল আর্থিক নিয়মাবলী মেনে চলতে বাধ্য হন।[৪৬]

সুজাউদ্দৌল্লা থেকে মীর কাশিম এর মধ্যে বাংলার সুবাদারীর ক্ষেত্রে সুবাদারদের ব্যক্তিত্ব, কঠোরতা বা উদারতা, জমিদারদের থেকে খাজনা সংগ্রহের ব্যাপার ছাড়াও বা জমিদার নির্ধারিত 'রসুম' (জমার একটা অংশ কেটে নেওয়া),

৪৬. ঐ. পৃ. ২০-২৩। অধ্যাপক রায়চৌধুরীর প্রতি ধরনের জমিদারীর স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে জোর ভ্রান্ত। আসলে জমিদারী প্রথার মধ্যে যে শাসন-ক্ষমতা নিহিত আছে তার ব্যবহারই প্রমাণ করে যে, জমিদারের কোনো স্বাধীনতা নেই, বিশেষত ভূমি রাজস্বের ব্যাপারে। এই ক্ষেত্রে প্রতিটি জমিদারের ক্ষেত্রে আরো বিভাজন করা যেতে পারে। যে সব জমিদাররা 'পেশকাস মুকারারী' (নির্ধারিত বার্ষিক রাজস্ব) (জমিদার-গনই পেশকাস মুকারারী) কতকগুলি ক্ষমতা ভূমি-রাজস্বের ক্ষেত্রে ভোগ করে। কিন্তু পেশকাসের হার অনেক বছর পরপর পুনর্নির্ধারণ করা হতে পারে। কতকগুলি ক্ষেত্রে ভুল সত্ত্বেও, জমিদারদের কাজ মুঘল ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় গ্রান্ট-এর আলোচনা সত্যের কাছাকাছি আসছে (জেমস গ্রান্ট, "হিস্টরিক্যাল এ্যান্ড কম্পারেটিভ আনালাইসিস অফ দ্য ফাইনানসেস অফ বেঙ্গল", ২৭ এপ্রিল, ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দ, পাওয়া যাবে 'ফিফথ রিপোর্ট ফ্রম দ্য সিলেক্ট কমিটি অফ দা হাউস অফ কমনস অন দা অ্যাফেয়ার্স অফ দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, জুলাই, ১৮১২, দুই খণ্ড, ডব্লু কে সারমিঞার কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৭০)। মোরল্যান্ডের সমালোচনা ('এগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মোসলেম ইন্ডিয়া', অ্যাপেনডিকস্ জি) জেমস গ্রান্ট সম্পর্কে মেনে নেওয়া যায় না এবং তাঁর বক্তব্য যে, জমিদাররা জরীপ-বিহীন একটা নির্দিষ্ট রাজস্ব সরকারকে দিত তা নির্ভর করে আছে 'আইন' কে ভুলভাবে পড়ার জন্য। যদি 'আইন' সম্পর্কে মোরল্যান্ডের সমালোচনা মেনেও নেওয়া যায় তাহলেও এটা বলা যাবে না যে অস্থির বাংলার, যেমন আকবরের সময়ে ছিল, ভূমি রাজস্ব শাসনব্যবস্থা সারা মুঘল যুগে অপরিবর্তিত ছিল। মোরল্যান্ডের সমস্যা হচ্ছে যে, তিনি 'আইন' এর রাজস্বব্যবস্থাকে অপরিবর্তিত ছিল বলে ধরেছেন। তাঁর মত হচ্ছে যে, যতই সময় চলতে থাকে ততই দলনেতা, কৃষক ও আমলাদের মধ্যে তফাৎ মুছে যেতে থাকে, কারণ তাদের মধ্যে অবস্থাগত কোনো বৈষম্য ছিল না এবং সকলকেই জমিদার বলা হতে থাকে। এই পরবর্তী ধারণা সপ্তদশ শতাব্দী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মুর্শিদ কুলী খানের দিওয়ানী ও সুবাদারী ও মীর জাফরের সুবাদারী পর্যন্ত অন্তত সত্য নয়। মুর্শিদ কুলী খানের রাজস্ব সংস্কার খুব পরিষ্কার ভাবে বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব আমলা ও জমিদারদের মধ্যে পুরনো পরম্পরার বিভেদ তুলে ধরেছে। সমকালীন দলিলের সাহায্যে বলা খুব সন্দেহজনক যে, আইনগতভাবে জমিদার-রাজা, ইজারাদার ও রাজস্ব আমলার মধ্যে সমস্ত তফাৎ মুছে গেল।

ছাড়াও, কাঠামোগতভাবে জমিদারী প্রথা আগের মতোই চলেছিল।[৪৭] কিন্তু শাসনযন্ত্রের আদর্শের একটা মূল পরিবর্তন হয়ে যায়।[৪৮] ইজারাদারী প্রথার ব্যাপক প্রসার, জমিদারীর আয় কম দেখিয়ে বেশি টাকা তোলা ইত্যাদির প্রচলনের ফলে সুবা বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থার অবক্ষয় হয়।[৪৯]

তালুকদার

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের ভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর উৎসে তালুকদার শ্রেণীর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এরা জমিদারদের মতো মধ্যস্বত্বভোগী।[৫০] এলাকা-গত হিসাবে 'তালুক' বা 'তালুকা' শব্দের মানে শুধু জমিদার বা তালুকদারী এলাকাকে বোঝায়। 'আইন-ই আকবরী'তে সুবা বাংলার মহালের বিস্তৃত রাজস্ব-তালিকাতে[৫১] কয়েকটি মহালকে তালুকা বলে বলা আছে এবং ব্যক্তির সঙ্গে যোগসূত্র দেখান আছে, এলাকার সঙ্গে নয়। বাংলা ও উড়িষ্যা

৪৭. মীর আবুল হাসান আলমগীর, 'মুরাকাৎ-ই হাসান, ইনসা-ই ফারসী' (রামপুর সরকারি গ্রন্থাগার, উত্তর প্রদেশ, ২১৭), পৃ. ৯০-১৪৬, ২৪০-৩২৯। লেখক নিজে ছিলেন রাজস্ব বিভাগের আমলা এবং উড়িষ্যার সুবাদারের অধীনে সরকারি লেখক হিসাবে কাজ করেছেন। পরে, তিনি যে চিঠিগুলি লিখেছেন সুবাদারের হয়ে সেগুলি সংকলন করেন। বাংলার ও উড়িষ্যার দেওয়ান-ই সুবা, মুঘল মনসবদার ও মুঘল রাজস্ব বিভাগের আমলাদের সঙ্গে যেসব চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়, সেইসব চিঠিগুলির সংকলন করেন। ঐসব চিঠিপত্রের মাধ্যমে সুবা বাংলার ও উড়িষ্যার জমিদারী এবং রাজস্ব শাসনব্যবস্থা কীভাবে চলেছিল তার বিবরণ পাওয়া যায়।

৪৮. সিহাবুদ্দীন তালিশ, 'ফাতিহা ই ইব্রীয়া', বোদলিয়ন গ্রন্থাগার, অক্সফোর্ড, ও. আর, ২৪, পুঁথি পৃ ১১৮ এ-১১৯ এ, ১৬৪ এ। এই পুঁথিটি আগেকার কাজের পরবর্তী অংশ, যেটা ছিল ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দ অবধি। শায়েস্তা খানের শাসনতান্ত্রিক ও রাজস্ব সংস্কার বাংলাদেশে যা হয়েছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দস্তুর-উল অমল বাংলার গ্রামের ও জরীপ-করা (আরাজী) জমির বর্ণনা দিয়েছেন। দ্রষ্টব্য: পুঁথি ফ্রেজার ৮৬, বোদলিয়ন গ্রন্থাগার, অক্সফোর্ড; 'ইন্তাখাব-ই দস্তুর-উল অমল পাদশাহী', পুঁথি ২২৪, এডিনবরা গ্রন্থাগার। দ্রষ্টব্য: পৃ. ২৭০, বার্লিন (অষ্টাদশ শতাব্দী)।

৪৯. 'তারিখ-ই বাংলা', পুঁথি ১০৩৮, আশিফিয়া রাজ্য গ্রন্থাগার, হায়দ্রাবাদ (ভারতবর্ষ)। পুঁথি পৃ ১৪ এ, ১৫ বি; 'তারিখ-ই বাংলা', পুঁথি ২৪৮, বার্লিন।

৫০ ঐ।

৫১ অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী (পৃ ১১, ৪২) ভেবেছেন যে, মুর্শিদ কুলী কেবলমাত্র জমিদারদের বাধ্য করেছিলেন নিয়মিতভাবে রাজস্ব দেবার জন্য। এমনকি এই একমাত্র বাঁধন আগেকার বছরগুলিতে অগ্রাহ্য করা হয়েছে যখন মুর্শিদ কুলী অত্যন্ত ভালো-ভাবে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং জমিদাররা তাদের এলাকার মালিক ছিল। উনি সিদ্ধান্ত করেছেন এই বলে যে, জমিদাররা তাদের এলাকার মধ্যে যে রকমভাবে চাইত শাসন করতে পারত; শাসন করতেও স্বাধীন, শোষণ করতেও স্বাধীন। অধ্যাপক

ছাড়া, 'আইন-ই আকবরী' মুঘল সাম্রাজ্যের অন্য কোনো সুবায় তালুকদার শব্দটি ব্যবহার করে নি। অন্যান্য সুবার মতো বাংলাতেও জমিদার-এর উল্লেখ আছে এবং মহালের তালিকায় তাদের জাতির পরিচয় আছে। সুবা বাংলার উড়িষ্যা এলাকার জন্য, জাত ছাড়াও, জমিদারদের স্থানীয় সৈন্যের হিসাব দেওয়া আছে। এই খবর সব স্বাধীন তালুকদারদের ক্ষেত্রেও দেওয়া আছে। এটা খুব জোর দিয়ে বলা যায় না যে, 'আইন-ই আকবরী' তালুকদারদের সঙ্গে জমিদার ও ভূঁইয়াদের সমার্থক করেছে কিনা; কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, তালুক বা তালুকদারদের মহাল জমিদারী এলাকার মতোই। যখন 'আইন-ই আকবরী' পরিষ্কারভাবে উড়িষ্যার কিছু তালুকদারদের স্বাধীন বলে বলছে, তখন এটাই বোধহয় বোঝাতে চাইছে যে, জমিদারী এলাকার মধ্যে স্বাধীন নয় এমনসব তালুকদারদের সঙ্গে তাদের তফাৎ আছে। স্পষ্টতই 'তালুকদার' শব্দটি আকবরের সময়ে বা প্রাক্-আকবর যুগে বাংলায় প্রচলিত ছিল। বাংলায় অবশ্য, আকবরের রাজত্বের শেষ দিকে বা জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমে যখন মুঘল শাসন স্থায়ী হয়, তখন তালুকদারদের মুঘল জমিদারী ও রাজস্ব বিভাগের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয়। এলাকাগতভাবে তালুক শব্দটি জমিদার-দের সঙ্গে যেমন জড়িত, তেমনি তালুকদারদের সঙ্গেও জড়িত। একই সময়ে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজস্বের দলিল থেকে এটা পরিষ্কার যে তালুকদার একটি মধ্যবর্তী শ্রেণীতে রয়েছে, কিন্তু কৌশলগত-ভাবে সে জমিদার থেকে সবসময়ই দূরে রয়েছে। এই তথ্যের ফলে এই সন্দেহ

রায়চৌধুরী বাংলায় জমিদারী প্রথার কার্যকলাপ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন নি। এখানে পুলিশ, শাসনতান্ত্রিক এবং রাজস্ব ক্ষমতা জমিদারী প্রথার মধ্যে নিহিত আছে। রাজস্ব ক্ষমতা অধিকার এর চেয়েও অনেক বেশি দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। 'আমলী' এলাকার মধ্যে এইগুলি রাজ্যের জরীপ ও জমি নির্ধারণের অধীন। অধ্যাপক রায়চৌধুরী পরস্পরবিরোধী ও একযুক্তি থেকে অন্যযুক্তিতে চলে যান। 'বাহারিস্তান-ই ঘায়েবী' এবং মুঘল দলিলের মুখোমুখি হয়ে উনি বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, জমিদারেরা রাজস্ব সংস্কারক ও জায়গীরদার পর্যায়ে নেমে এসেছিলেন, যদিও পরবর্তীকালের পারিবারিক রচনা ও বাংলা সাহিত্যের উপর ভিত্তি করে তিনি বিশ্বাস করেছেন জমিদারদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও বল্গাহীন রাজস্ব-ক্ষমতায় (ঐ, পৃ. ১৯, ২২ ২৩, ২৩৬)। ঐ একইভাবে সম্রাট শাহজাহানের ফার্মানে ফৌজদার নিয়োগের কথায় অধ্যাপক রায়চৌধুরী মেনে নিচ্ছেন যে, জমিদার হিসাবে অধিকারের বদলে জমিদারকে সময়-মতো রাজস্ব দিতে হতো এবং জনগণের সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখতে হতো (ঐ, পৃ. ২১)। অন্যদিকে একজন জমিদারের ব্যক্তিগত জায়গীর পাবার শর্তগুলির কথা বিবেচনা করে এবং পুরোদস্তুর সমসাময়িক দলিল ছাড়াই উনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে মুঘল যুগে বশ্যতার মাপকাঠিই হচ্ছে রাজস্বর দায়িত্ব, যেটা জমিদার সব সময়ই অগ্রাহ্য করছে (ঐ, পৃ. ২২)।

জাগে যে, জমিদার ও তালুকদার শব্দদুটি সমার্থক কিনা। সুবা বাংলার ক্ষেত্রে, অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজস্বের কাগজপত্র শুধু উল্লেখই করে না, এমনকি দুটি শ্রেণীর মধ্যেকার আনুষ্ঠানিক পার্থক্যর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাও দেয়।[৫২] এই প্রমাণ অনুযায়ী, জমিদারীর সঙ্গে তুলনা করলে, তালুকদারীর আইনগত অবস্থা ও মর্যাদা নিচু। সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা ও উড়িষ্যার পরম্পরার সঙ্গে এটা মিলে যায়। সুবা বাংলার আরাকান এলাকার জন্য সিহাবুদ্দীন তালিম রাজা, জমিদার ও তালুকদারদের এলাকার আইনগত মর্যাদা অনুযায়ী পরপর সাজিয়েছেন।[৫৩] এটা মনে হয় যে, মুঘল বিজয়ের পর বাংলায় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এটা খাটে। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দিকে, 'মুরাকাত-ই হাসান' রাজস্ব বিভাগের আমলাদের (চৌধুরী ও কানুনগো) দ্বারা সুবা উড়িষ্যার তালুকদারী থেকে কত রাজস্ব আদায় হবে সেটার উল্লেখ করেছেন।[৫৪] আওরঙ্গজেবের রাজস্ব সংক্রান্ত আদেশে তালুকদারদের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫৫] এই থেকে মনে হয় যে, তালুকদারী শ্রেণী অনেক বেশি সংখ্যায় ছিল ও ব্যাপক ছিল যা আমাদের আঞ্চলিক সমকালীন দলিল থেকে ততটা বোঝা যায় না।

জমিদারের প্রধান কাজ ছিল সরকারের খাজনা ('মালগুজারী') দেওয়া। জমিদারকে সবসময়ই একটা রাজকীয় সনদ দেওয়া হয় ও সে সরকারকে 'পেশকাস' দেয়।[৫৬] অন্যদিকে একজন তালুকদার জমিদারের কাজ করতে পারে এবং জমিদার বলে তাকে ধরা হয় যখন সে তার এলাকার খাজনা সরাসরি সরকারকে দেয়।[৫৭] কিন্তু সাধারণত ছোটো তালুকদাররা তাদের খাজনা তার

৫২. নবাব জাফর খান এবং নবাব সুজাউদ্দীন মহম্মদ খানের শাসনতান্ত্রিক এবং রাজস্ব বিভাগীয় সংস্কারের বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 'হকিকৎ-ই সুবা বাংলা' (অষ্টাদশ শতাব্দী), পুঁথি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, এড ৬৫৮৬, পৃ ২৪ বি ২৭ এ। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজস্ব বিভাগের ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য পুঁথি অর ২৭ কিউ (বার্লিন), ২৪৮। এছাড়া দ্রষ্টব্য : নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, 'ইকনমিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল', দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ১-৪৭।

৫৩. পুঁথি, ওরিয়েন্ট অক্টো, ১০৫, পৃ. ১২ এ, ১৩ বি (বার্লিন)।

৫৪. পুঁথি অর কোয়ার্ট ২৫৮, পৃ. ৩১০ এ, ৩১৩ বি (বার্লিন)। দ্রষ্টব্য সিংহ, পৃ. ২৩-৩৬।

৫৫. বাংলা এবং অন্যান্য প্রদেশের তালুকদারী প্রথার বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : বি. আর গ্রোভার, "নেচার অফ দেহাত-ই তালুকা", উল্লিখিত, পাদটীকা ১, পৃ. ২৬৯-২৮৮।

৫৬. 'আইন', ব্রিটিশ মিউজিয়াম, এড ৭৬৫২, পৃ. ১৭৭ বি, ১৯২ বি।

৫৭ পুঁথি, অর কোয়ার্ট ২৫৮, পৃ. ১৪৫ বি, ১৪৬ এ (বার্লিন)।

চেয়ে বড়ো 'জমিদার-চৌধুরী'-র মাধ্যমে দেয় এবং ঐ 'জমিদার-চৌধুরী' ঐ ছোটো তালুকদারদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে।[৫৮] ঐ ধরনের জমিদার শুধু তার জমিদারীর খাজনা দিচ্ছে তাই নয়। তার অধীনে যতসব জমিদার আছে তাদেরও খাজনা দিচ্ছে। তার জমিদারীর মধ্যে তার ব্যক্তিগত জমিদারী ছাড়াও ছোটো তালুক আছে। কিন্তু তার এলাকার তালুকদারীর উপর তার বিক্রির কোনো অধিকার নেই বা বন্ধকী দেবারও অধিকার নেই।[৫৯] উত্তর ভারতের জমিদাররা যেমন তাদের জমিদারী বিক্রি করতে পারে, বাংলার জমিদাররা কেবলমাত্র তাদের 'পাঁচ তালুকা' বা খাজনা সংগ্রহ করার অধিকার বিক্রি করতে পারে, 'চৌধুরাই' অধিকার ও নানা ধরনের রাজস্বের সুবিধা সমেত।[৬০] সাধারণত উত্তরাধিকার সমেত ধার্মিক দান অর্থাৎ 'দেবোত্তর', 'ব্রহ্মোত্তর', 'মেহেতরান' এবং ফকিরদের দান এইসব জমিদারী, তালুক গ্রাম বিক্রিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং ঐসব দানপত্র যারা পেয়েছে তারা নূতন খরিদ্দার হয় যাদের তালুকদার বলা হয়।[৬১] এদের কাছে পুরনো অধিকারই চলতে থাকে। তালুকদারদের বিক্রি করার অধিকার আছে এবং তার তালুক-দারী অধিকার বিক্রি করতে পারে।[৬২] কেবলমাত্র যে-সব তালুকাগ্রাম তালুকদার নিজে লোক বসিয়ে উন্নত করেছে, তারা ছাড়া তালুকদার রায়তের জমির মালিক নয় এবং তার তালুকের মালিকানা অধিকার জমিদারের যেমন জমিদারীর উপর অধিকার আছে সেইরকম। কিন্তু জমিদার বা চৌধুরী যেমন 'নানকর' পায়, তালুকদার সরকার থেকে 'নানকর' বা 'মাফিয়া জায়গীর' পায় না, কিন্তু তার চিরাচরিত রসুম এবং মালিকানার অধিকার আছে।[৬৩] তালুকদার মালিকানা দাবি করতে পারে তখনই যখন তার তালুকা 'সর-ই হাসিল' করা হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে, কিছু কিছু পরিবার ছিল যাদের তালুকার উপর বহু প্রাচীন দাবি ছিল। কিন্তু অধিকাংশ তালুকাই জমিদারী বা তালুকদারী কেনার পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৬৪] অষ্টাদশ

৫৮. 'ফাতিহা-ই ইব্রীয়া', উল্লিখিত, পাদটীকা ৪৮, পৃ. ১৫৫-১৫৬।
৫৯. 'মুরাকাৎ-ই হাসান', উল্লিখিত পাদটীকা ৪৭, পৃ. ৩১৭-৩১৮।
৬০. 'নিগর-নামা-ই মুন্সী', বোদলিয়ান গ্রন্থাগার, অক্সফোর্ড, পুঁথি, পৃ. ৯৯ বি, বি, ১০০ এ (জাতীয় মহাফেজখানা, নিউ দিল্লী, পুঁথি) পৃ. ৭৬ এ।
৬১. পুঁথি, অর কোয়াট ২৫৮, পৃ. ১৪৫ বি-১৪৬ এ (বার্লিন)।
৬২. ঐ, পুঁথি, পৃ. ৩০৬ এ।
৬৩. ঐ, পুঁথি, পৃ. ১৪৫ বি-১৪৬ এ।
৬৪. ঐ। এছাড়া, পুঁথি অর ২৩৪ (বার্লিন)।

শতাব্দীতে ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অবস্থা থেকে এটা লক্ষ্য করা যেতে পারে। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের ৪৬ বছরে দেওয়ান ইব্রাৎ খানের সীলমোহর করা একটি পরওয়ানা (তারিখ দোসরা শাবন/দোসরা ফেব্রুয়ারি ১৭০২ খ্রীস্টাব্দ) সুবা বাংলার হুগলী চাকলার আমিরাবাদ পরগণার তিনটি গ্রাম - কলিকাতা সুতানটি এবং গোবিন্দপুর—ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জমিদারদের কাছ থেকে কিনছে তার উল্লেখ আছে।[৬৫] এর পরিবর্তে ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এক হাজার একশ পঁচানব্বই টাকা ছয় আনা (১১৯৫ টাকা ৬ আনা) বার্ষিক জমা (খাজনা) হিসাবে মুঘল রাজকোষে জমা দেবে। পরওয়ানায় মনোহর দত্ত ইত্যাদি জমিদারদের বিক্রেতা এবং ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ক্রেতা হিসাবে দেখিয়ে 'তালুকদার' বলে ধরেছে। এইভাবেই বিক্রির দলিলে ক্রেতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে তালুকদার হিসাবে বলছে। পরবর্তীকালে সম্রাট ফারুকশিয়ারের ফার্মানে (তারিখ চতুর্থ সফর পাঁচ বছর রাজত্বকাল। ১৮ জানুয়ারি ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দ) ঐ সব ক্রীত তালুকদারী মেনে নিচ্ছে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে আরো আটত্রিশটি গ্রাম কেনার অধিকার দিচ্ছে। দেওয়ান-ই সুবাকে বলা হচ্ছে ঐসব বিক্রির ব্যবস্থায় মত দিতে।[৬৬] যেহেতু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জমিদারদের কাছ থেকে গ্রাম কেনার পর তালুকদারী স্বত্ব পেয়েছে, ঐ তিনটি গ্রামের (কলিকাতা, সুতানটি, গোবিন্দপুর) বার্ষিক জমা টাকা ১১৯৫ ও ৬ আনাতে ধার্য করা হলো মুঘল সরকারকে দেওয়ার জন্য। দেওয়ান-ই সুবার অনুমতিক্রমে ঐসব শহরের কাছাকাছি ৩৮টি নূতন গ্রামের তালুকদারীর স্বত্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের মালিকদের কাছ থেকে কিনে নেবে। নূতন কেনা গ্রামগুলির বার্ষিক খাজনা হবে আট হাজার একশ একুশ টাকা আট আনা (টাকা ৮১২১ ও ৮ আনা) যেটা মুঘল রাজকোষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জমা দেবে। ফার্মান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঐসব গ্রামের তালুকদারী ঐ বার্ষিক জমা দেবার সাপেক্ষে কেনার অধিকার দিচ্ছে এবং রাজস্ব বিভাগের আমলাদের নির্দেশ দিচ্ছে যে, কাজী-ওল কুজাৎ-এর সীলমোহর করা সমস্ত পুরনো দলিল ও বর্তমান ফার্মানকে গ্রামের তালুকদারী ক্রয় সম্পর্কে গ্রহণ করতে। কিন্তু যেহেতু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঐ ক্রীত গ্রামগুলির খাজনা

৬৫. ঐ, পৃ. ১২৫ বি-১২৬ এ। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দের একটি বিক্রির দলিলের প্রতিবেদন পাওয়া যায় ফার্সীতে ও বাংলায় (১৫ জুলাই এবং ১৫ সেপ্টেম্বর ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দ)। এ ছাড়া দ্রষ্টব্য, গ্রোভার, "নেচার অফ দেহাত ই তালুকা", উল্লিখিত, ১, পাদটীকা ১৯৭, পৃ. ২৮৩।

৬৬. ঐ।

সরাসরি সরকারকে দিচ্ছে, কোম্পানি সাধারণ অর্থে জমিদারদের মতো ব্যবহার করছে। উপরিউক্ত দলিলগুলি থেকে এটা খুব পরিষ্কার যে সরকারি-ভাবে কৌশলগত অর্থে অন্তত ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তালুকদার হয়েছিল। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে মীরজাফর বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে অন্যান্য জমিদারদের মতো জমিদান করেন।[৬৭] জুলাই ১৭৫৭-য় ইংরাজদের ২৪ পরগণার দখল দেওয়া হয় এবং ঐ অর্থে কোম্পানি জমিদার হয়ে ওঠে।[৬৮] ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে মীরকাশিম কোম্পানিকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামে কোম্পানির সমস্ত সৈন্য ইত্যাদি খরচের দায় বহন করার অধিকার দান করেন। এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রধান জমিদারের পদ নেয়, কারণ চুক্তির একটা শর্ত পরিষ্কারভাবে ছিল যে, কোম্পানি জমিদারদের ও অন্যান্য ভাড়াটেদের রেখে দেবে। ১৭৬৩ সালে মীরজাফর যখন আবার আসেন, আরেকটা সরকারি চুক্তি দ্বারা মীরকাশিমের দান, যা কোম্পানির সৈন্য রাখার খরচের জন্য দেওয়া হয়েছিল তা মেনে নেওয়া হয়। অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের 'প্রধান জমিদার' হওয়া আর একবার মেনে নেওয়া হলো। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সুবা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান করা হয়। তথাপি, 'জমিদারী' ও তালুকদারী অবস্থার আইনগত পার্থক্য চলতে থাকে। কেবলমাত্র বাংলা বছর ১১৯৪ সাল / ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে যখন কোম্পানি সরাসরি শাসনাধীনে ঢাকা ও বাংলার অন্যান্য এলাকাগুলিকে নিয়ে এল, তখনই আইনগত দিক থেকে 'জমিদার', 'চৌধুরী' ও 'তালুকদার'-এর পার্থক্য চলে যায় এবং প্রত্যেককেই 'জমিদার' বলে অভিহিত করা যায়।[৬৯]

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বহু বিক্রির ফলে ছোটো তালুকদারের বড়ো একটি শ্রেণী তৈরি হয়েছিল।[৭০] যে ব্যক্তি সরকার থেকে কোনো জমিদারী পায় নি কিন্তু আসল জমিদারের কাছ থেকে একটি গ্রাম বা কয়েকটি গ্রামের জমিদারী কিনেছে, তাকে তালুকদার বলা হয়। সাধারণত ছোটো জমিদারীর বিক্রি বা বন্ধকীর জন্য সরকারের অনুমতি প্রয়োজন হয় না কিন্তু বড়ো জমিদারীর ক্ষেত্রে সরকারের কাছে অনুমতি চাওয়া হয় এবং দেওয়া হয়।

৬৭. ঐ, পৃ. ১৪৫ বি-১৪৬ এ ; দ্রষ্টব্য : সিংহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭-৯, ১০, ২১-২২, পুঁথি পৃ. ১৫, ২৩।

৬৮. ঐ।

৬৯. ঐ। দ্রষ্টব্য : পুঁথি অর, পৃ. ২০৪ (বার্লিন)।

৭০. ঐ।

জমিদারীর সম্পত্তির ক্রেতা জমিদারী পদবী রাখতে পারে তখনই যখন সরকার জমিদার অধিকার সরাসরি খাজনা দেবার জন্য স্বীকার করে নেয়। জমিদারীর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মাপকাঠি হচ্ছে জমিদারী সনদ দেবার মাধ্যমে সরকারি অনুমোদন। কয়েকটি গ্রামের তালুকদার যতক্ষণ না ঐ জমিদারী সনদ পাচ্ছে ততক্ষণ জমিদার বলে ঘোষণা করতে পারবে না।[৭১] যতই পুরনো তালুক হোক না কেন এবং যেভাবেই এর উদ্ভব হোক না কেন, পরনির্ভর তালুকদাররা জমিদারের মাধ্যমে খাজনা দেয় এবং উভয়পক্ষই, যথাক্রমে তালুকদার এবং জমিদার, তাদের সুখসুবিধা ভোগ ('রসুম' ও 'হক') করতে পারে স্থানীয় পরম্পরার ভিত্তিতে। মহম্মদ রেজা খানের মতে (১৭শ খ্রীস্টাব্দে গভর্নর জেনারেলের রাজস্ব বিভাগের উপদেষ্টা ছিলেন) বিভিন্ন ধরনের জমিদার ও তালুকদার আছে।[৭২] কোনো জমিদারী বহু প্রাচীন হতে পারে যেখানে বসতি বসিয়ে জমিদার জায়গার উন্নতি করছে অথবা কেনা হয়েছে অথবা জমিদারী সনদের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। যে-জমিদার বসতি করাচ্ছে, সে চাষযোগ্য অনুর্বর জমি অন্য লোকেদের দিতে পারে যাদের তালুকদার বলা হয়। এরা ঐ জমির উন্নতি করে এতে 'মালকিয়াত' অধিকার প্রয়োগ করে বিক্রি বা দান করতে পারে। কিন্তু তার খাজনা জমিদারকে ঐ প্রথম জমিদারের মাধ্যমে দেবে। তালুকদার বা জমিদারের থেকে ক্রেতা ঐ ধরনের 'মালকিয়াত' অধিকার পাবে কিন্তু সে-ও ঐ আসল জমিদারের মাধ্যমে সরকারকে খাজনা দেবে। কিন্তু যদি কোনো জমিদার কয়েকটি গ্রাম ও জমি সম্পর্কে তালুকদারী পাট্টা দেয়, তালুকদার ঐ ধরনের 'মালকিয়াত' অধিকার ভোগ করবে তখনই যখন পাট্টার মত অনুযায়ী ঐ সব তাকে বিশেষভাবে দেওয়া হয়। যে-তালুকদার সরাসরি সরকারকে খাজনা

৭১. পুঁথি. ব্রিটিশ মিউজিয়াম, এড ৩৪, ৬৯, দলিল নং ৩৬।

৭২. ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ড'স (লন্ডন), হোম সিরিজ, খণ্ড ৫৯, পৃ. ১৩০-৩১। এ ছাড়া ফটো কপি, সুকুমার ভট্টাচার্য. 'দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ্যান্ড দ্য ইকনমি অব বেঙ্গল ফ্রম ১৭০৪ টু ১৭৪০', লন্ডন, ১৯৫৪, অ্যাপেনডিক্স চার, পৃ. ২৩৪। এ ছাড়া, ডব্লু. এইচ. মোরল্যান্ড, 'দ্য এগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মোসলেম ইন্ডিয়া', এলাহাবাদ, পৃ. ১৮৯-২২৩। মোরল্যান্ড সঠিকভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে 'তালুকদার' বলে অভিহিত করেছেন। অধ্যাপক ইরফান হাবিবের পরোয়ানার আলোচনা (উল্লিখিত পৃ. ৭১) এবং তাঁর জমিদার ও তালুকদারকে সমার্থক করা সঠিক নয় ও মোরল্যান্ড সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনা যুক্তিযুক্ত নয় ('দ্য এগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইন্ডিয়া', বোম্বাই, ১৯৬৩, পৃ. ১৭২-৭৩, পাদটীকা ১৮)। সুকুমার ভট্টাচার্যের ঐ ফার্মানের (১৭১৭ খ্রীস্টাব্দের) পঠন (পৃ. ২৪-২৫) ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে জমিদার রূপে অভিহিত করাও একই কারণে সঠিক নয়।

দেয় তাকে 'হুজুরী' বলে এবং যে-তালুকদার জমিদারের মাধ্যমে দেয় তকে 'মুস্কুরী' বলে।

উত্তর-ভারতের অন্যান্য জায়গায় যেখানে তালুকদারী প্রথা আছে, সেখানে তালুকদারের অবস্থা বাংলার থেকে অনেক পৃথক। একজন তালুকদার জমিদার হয়ে যায় যখন সে তার নিজের জমিদারীর এবং তার অধীনে যে সব জমিদারী আছে তার সব খাজনা সরকারকে দেয়। সরকার ঐ খাজনা ঠিক করে দেয় এবং তালুকদার সমস্ত নিয়মাবলী, যা খাজনা দেবার জন্য জমিদারের পক্ষে প্রযোজ্য, মেনে চলতে বাধ্য। সে বড়ো জমিদারের মতো শুধু তার জমিদারী গ্রামের খাজনা দেবার দায়িত্বে নেই। অন্যান্য নিচু জমিদারদের খাজনা, যা তারা সরাসরি সরকারকে দিতে পারছে না, সেগুলো দেবার মাধ্যম হিসাবে সে, কাজ করে। সেইভাবে যৌথ জমিদার গ্রামে, একজন অংশীদার, যে সকলের খাজনা দেবার দায়িত্বে আছে, তালুকদার নামে পরিচিত, কিন্তু যখন একজন জমিদার ও তালুকদার তাদের গ্রামের একই খাজনা দেয়, জমিদারের আয় ও মর্যাদা তালুকদারের থেকে বেশি। এটা উল্লেখযোগ্য যে এখানে ঐ ধরনের তালুকদারী প্রথার উদ্ভব হয়েছে। তিনটি সমান্তরাল দাবি, যেগুলো কোনো রকমেই পরস্পর বিরোধী নয়, তালুকগ্রামগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাদের নির্ভরশীল জমিদার মধ্যবর্তী পর্যায়ক্রমে পড়ে এমন সব জায়গায়, যেখানে কয়েকটি ধরনের রায়ত চাষযোগ্য জমির মালিক। ঐ ধরনের সদ্য বসতি গ্রামগুলিতে ওদের পরিবার জমির উপর অধিকার রাখে। অথচ, তালুকদার ও তার নির্ভরশীল জমিদার বিশেষ সুবিধা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে এবং নিয়োগের ব্যবস্থা নির্ভর করে স্থানীয় প্রচলনের উপর।

তালুকদারকে যখন 'তালুকের মালিক' বলা হয় অর্থাৎ তার নিজের জমিদারী ও নির্ভরশীল জমিদারী গ্রামগুলির, তখন সে নির্ভরশীল জমিদারীর সুবিধার অংশ ভোগ করতে পারে এবং ঐ অবস্থায় দুটি মধ্যবর্তী পদাধিকারই জমিদার গ্রামগুলির উপর সমান্তরাল 'মালকিয়াত' অধিকার ভোগ করে। জমিদারের মতো তালুকদারও তার তালুকে তার নিজের জমি রাখতে পারে কিন্তু সে অথবা তার নির্ভরশীল জমিদার তাদের অধীনে রায়তের চাষযোগ্য জমির উপর কোনো 'মালকিয়াত' অধিকার পাবে না।[৭৩]

বাংলার জমিদার সব সময়েই উঁচু মর্যাদা পায় তালুকদারের থেকে এবং ঐ তালুকদার জমিদারের উপর আইনগতভাবে নির্ভরশীল। অথচ জমিদার ও তালুকদার, উভয়পক্ষই উত্তর-ভারতে তাদের সমান পদাধিকারীদের মতো

৭৩. 'দ্য ফিফথ রিপোর্ট', ক্যানিংহামের ভূমিকা (দ্রষ্টব্য: পাদটীকা ৪৬), পৃ. ১০।

মধ্যবর্তী শ্রেণীতে পড়ে এবং তাদের সুখ-সুবিধা ভোগ করে। ব্যক্তিগত জমি-ছাড়া তাদের অধীনের রায়তদের জমি বা কৃষি জমির মালিক তারা নয়। ঐ দিকে থেকে তারা রায়তদের সঙ্গে একই সম্পর্কে থাকে যেরকম অন্য তালুকদার ও জমিদারের মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশে রয়েছে। অথচ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো জমিতে মধ্যবর্তী শ্রেণীর পর্যায়ক্রমে উদ্ভব হচ্ছে। অন্যান্য প্রদেশে নিচু জমিদাররা একজন বড়ো জমিদার (যাকে তালুকদার বলে)-এর মাধ্যমে খাজনা দেয়, যেমন বাংলায় ছোটো তালুকদাররা বড়ো জমিদারের মাধ্যমে খাজনা দেয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্যের সব জায়গাতেই একই ধারা লক্ষ্য করা যায়।

এম. এন. দাস ও অনিরুদ্ধ রায় কর্তৃক আয়োজিত ১৯৭৬ সালে ভুবনেশ্বরের সেমিনারে পঠিত।

অনুবাদ : অনিরুদ্ধ রায়

ফরাসী কোম্পানি ও বাংলার বণিক (১৬৮০-১৭৩০)

ইন্দ্রাণী রায়

১

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ফরাসী কোম্পানির আবির্ভাবের পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। এটি প্রধানত ইউরোপে 'ভারতীয়তা'র প্রতি ক্রমবর্ধমান ঝোঁক প্রকাশ করে, যেটা ভারী রেশমবস্ত্র বা চিত্রিত কাপড় থেকে ছাপা, জরী অথবা সাদা মলমলের দিকে চলে যায়। একটি প্রতিবেদনে কোম্পানির ডিরেক্টররা উল্লেখ করেছেন যে, এই চাহিদা হয়েছে রীতির মাধ্যমে এবং 'চোখ এমনভাবে এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে এগুলো ছাড়া বর্তমানে অসম্ভব'।[১] পন্ডিচেরীর চতুর শাসনকর্তা, ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁ বাংলায় বাণিজ্যের সম্ভাবনা আগেই দেখে নিয়েছিলেন। ভারতের প্রথম ও প্রধান ফরাসী কুঠি সুরাটে ফরাসী বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান সমস্যা উনি আগেই সার্বিকভাবে অনুধাবন করেছিলেন। মার্চ ১৬৮২-এর প্রতিবেদনে তিনি দুঃখ না করে পারেন নি যে, অন্যান্য অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টি না-দিয়ে যেন কোনো একটা বিশেষ সম্মোহনে কোম্পানি সুরাটের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।[২] কিন্তু ১৬৮৬ সালের ডিক্রির ফলে ফরাসী দেশে টাফেটা ও ছাপা কাপড় আসা বন্ধ হয়ে গেল

* এখানে ব্যবহৃত অধিকাংশ অপ্রকাশিত দলিল জাতীয় মহাফেজখানা, প্যারিসে সিরিজ কলোনী সি (২)-তে পাওয়া যাবে। প্রয়োজনীয় খণ্ডগুলি এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে টীকায় সি (২) ৬৩, সি (২) ৬৪ ইত্যাদি হিসাবে। ১ নং টীকায় প্রতিবেদনটি উদ্ধৃত করা হয়েছে জাতীয় মহাফেজখানা, প্যারিস থেকে।

১. ভারতীয় কাপড়ের জন্য সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ক্রমবর্ধমান চাহিদা ইওরোপে হয়েছিল তা এতই জানা যে তার উৎস-র সম্পূর্ণ তালিকা করার প্রয়োজন নেই। নিচের কয়েকটি যথেষ্ট :
   - ক. কোম্পানির ডিরেক্টরদের প্রতিবেদন, ২১. ১২. ১৬৬১। জাতীয় গ্রন্থাগার, ফন্দ ফ্রান্সে ১৬৭ ৩৭, পৃ. ১৯।
   - খ. কে. গ্লামান, 'ডাচ এশিয়াটিক ট্রেড ১৬২০-১৭৪০' (হেগ, ১৯৫৮), ১৩২-১৪৮।
   - গ. সুকুমার ভট্টাচার্য, 'দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অ্যান্ড দ্য ইকনমিক অফ বেঙ্গল (১৭০৪-১৭৩৯)', (কলিকাতা, ১৯৫৪) ১৫৮।

২. ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁ, 'মেময়ারস'. তিন খণ্ড (১৬৬৫-১৬৯৪), এ. মার্তিনো সম্পাদিত (প্যারিস, ১৯৩১-৩৪), দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯০ ও ২১৭-২১৮।

এবং ডিরেক্টররা সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারলেন। এর ফলে সুরাটের সম্ভাবনা, যার প্রধান উৎস ছিল এক ধরনের পণ্য, একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল।[৩] বাণিজ্যিক বাধা-নিষেধের বেড়া থেকে মুক্ত হয়ে ফরাসীরা নূতন পণ্যের খোঁজে বাংলায় এলেন। ১৬৮১ থেকে ১৬৮৭-এর মধ্যেকার প্রাথমিক অনুসন্ধানের ভালো ফল পেয়ে, ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁ তাঁর জামাই দেলান্দকে (অত্যন্ত ভালো বণিক ও সংগঠন করার শক্তি ধরে) পাঠালেন ফরাসীদের একটি নিজেদের কুঠি এই প্রদেশে তৈরি করার জন্য। ১৬৯১-এর মধ্যে ফরাসীরা তাদের নিজেদের পত্তনী চন্দননগরে করবার মতো অবস্থায় এল।[৪]

ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার বাণিজ্যিক কাঠামোর মধ্যে দুপ্লেক্সের ক্ষণস্থায়ী গৌরব ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ ছিল না এবং প্রথম তিরিশ ও চল্লিশ বছর তাদের পক্ষে খুব শক্ত সময় গিয়েছে। বাংলার আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় কাপড়ের উৎপাদনের পরিমাণ এবং করমণ্ডল উপকূলের তুলনায় দুর্ভিক্ষ কম হওয়া সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে বাংলার বাণিজ্যের সম্ভাবনা বেশ কিছু কমে যায়।[৫] শোভা সিংহ ও রহিম খানের বিদ্রোহ এবং যুবরাজ আজিম-উস-শানের অসম্ভব পরিমাণে টাকা জমানো বাণিজ্যে সরাসরি আঘাত করল।[৬]

৩. পল কেপল্যান, 'লা কোম্পানি দেস এন্দ ওরিয়েন্তাল' (প্যারিস, ১৯০৮), ২০৫-২০৬।

৪. এফ. মার্তাঁ, উদ্ধৃত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে চন্দননগরে কুঠির প্রথম দিকের সমস্যার নানা উল্লেখ আছে। কোম্পানিকে লিখিত দেলান্দের একটি চিঠি [সি (২) পৃ: ২০২-১৬] তারিখ ১৫.১২ ১৬৯১, বাংলায় ফরাসী কোম্পানির কার্যাবলীর ও চন্দননগরের উত্থানের সব থেকে ভালো দলিল।

৫ উদ্ধৃত প্রথম খণ্ড, ৪৪৮-৪৫১, ৫০৫-৫০৬, ১৬৭৪-৮৮ সালে করমণ্ডল উপকূলে কতকগুলি দুর্ভিক্ষের ফলে ওখানকার বাণিজ্য ও উৎপাদন বন্ধ হবার কথা লিপিবদ্ধ আছে। ১৬৮৭তে মসলিপত্তন ছিল ছাপা কাপড়ের ঐ অঞ্চলের সব থেকে ভালো উৎপাদন কেন্দ্র। দুর্ভিক্ষ ও ভয়াবহ মহামারীতে তা একেবারে দুর্গত অবস্থায় পৌঁছে যায়।

৬ শোভাসিংহ ও রহিম খানের বিদ্রোহের ফলে গোলমালের জন্য দ্রষ্টব্য:
মার্তাঁ, দেলান্দ ও পেলরে চিঠি সুরাটকে লেখা হুগলী থেকে, ২১.৯.১৬৯৬ [সি (২) ৬৪. পৃ. ১৬৬ ও পর, ১৭৫-১৭৭]
মার্তাঁ ও দেলান্দের চিঠি হুগলী থেকে, ১৬. ১. ১৬৯৭ [সি (২) ৬৪. পৃ. ২৪৫-২৪৬]
ঐ। ১৯. ১০. ১৬৯৭ [সি (২) ৬৪, পৃ ২৪৮]
হুগলী কুঠি থেকে আজিম উস-শানের জুলুমের উপর, হুগলী কুঠি, ১১. ১৭. ১৭০০, [সি (২) ৬৫, পৃ. ১৫৯-৬০]
দেলান্দ কোম্পানিকে, ৪. ১. ১৭০০ [সি(২) ৬৫. পৃ. ১১২]
দেলান্দ, দুলিভিয়ার, রেনো, ১০. ১. ১৭০০ [সি ২) ৬৫, পৃ. ১২৪]
হুগলী বণিকরা কোম্পানিকে, ১২. ১ ১৭০০ [সি (২) ৬৬, পৃ. ২২৬]

এছাড়া এশীয় বাণিজ্যের সুপরিচিত কেন্দ্র বাংলা ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল, যারা প্রত্যেকেই ইউরোপীয় ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিভিন্ন এবং অসাধারণ কাপড় খুঁজে বের করতে ব্যস্ত। ব্যক্তিগত ব্যবসা ও 'ইন্টারলোপার'দের সার্থক বাণিজ্য এ-সমস্যা আরো বাড়িয়ে তোলে। বাণিজ্যিক কাঠামো স্বাভাবিকভাবে শর্ত কড়া করে, মালের উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিশদ আদেশাবলী সম্বন্ধে উদাসীন ইত্যাদি থেকে এর প্রত্যুত্তর দেয়।[৭] দুটি ইংরাজ কোম্পানির মতো ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অর্থনৈতিক সমস্যায় বিজড়িত হয়ে, একতরফা বা বেশি মাল খরিদ করে বাজার ধরবার মতো অবস্থায় ছিল না।[৮] ওলন্দাজদের মতো এশীয় বাণিজ্যের সাফল্যে পুঁজি বাড়ানোর মতো অবস্থাও তাদের ছিল না।[৯]

বাংলায় অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিদের মতো, ফরাসী কোম্পানিও সমকালীন প্রথার বহু প্রতিষ্ঠিত পরম্পরার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রয়োজন ছিল। এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রয়োজনীয় মাল খরিদের জন্য দালালের উপর নির্ভর করা। উৎপাদকের সঙ্গে কোম্পানিদের একটিই যোগ-সূত্র এই সব বণিকদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের ফলে বাণিজ্যিক কাজকর্ম কমিয়ে দেয়। আমাদের গবেষণার সময়ের মধ্যে সারা ফরাসী চিঠিপত্র এই প্রথার বিভিন্ন দিক বা সমস্যা জুড়ে আছে।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চিঠি-পত্রের মাধ্যমে বাংলার বণিকদের কার্যকলাপ উপস্থাপনা করা। চন্দননগরের বণিকদের প্যারিসে ফরাসী কোম্পানির পরিচালকদের লেখা চিঠি এবং ভারতের অন্যান্য কুঠির চিঠি এর অন্তর্গত। ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁর ডায়েরী, বাংলায় ফরাসী ভ্রমণ-কারীদের মন্তব্য এবং চন্দননগরের নোটারী থেকে প্রাপ্ত কিছু বিক্ষিপ্ত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। চিঠিপত্রের মধ্যে বেশ কিছু ফাঁক রয়ে গিয়েছে। যেমন হল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের যুদ্ধের বছরগুলি (১৬৯৪-১৬৯৮, ১৭০৩-১৭০৭)। ওলন্দাজরা হুগলীর মোহনা বন্ধ করে দেবার ফলে ফরাসী-

৭. বাংলায় উত্তরোত্তর চাহিদার বৃদ্ধির ফলের উপর: হুগলী, ১০. ১. ১৭০০, উদ্ধৃত সি (২) ৬৫, পৃ. ১২৪ ডি ১২৬; হুগলী, ১৭.১.১৭০০, উদ্ধৃত, সি (২) ৬৫, পৃ. ১৬১-১৬১ ডি।

৮. দুই ইংরাজ কোম্পানির কার্যকলাপের উপর: দেলান্দ ও হুগলীর অন্যান্য বণিকদের কোম্পানিকে লেখা চিঠির প্রতিলিপি. ৮. ২. ১৭০০ সি (২) ৬৫, পৃ. ১১৭।

৯. এই সময় ওলন্দাজদের বাংলায় বাণিজ্যিক কার্যকলাপের উপর ফরাসী বক্তব্য দ্রষ্টব্য— যেমন, দুলিভিয়ার-এর লেখা পনসার্তাঁকে প্রতিবেদন, ১২. ২. ১৭১৬, সি(২) ৬৬, পৃ. ২২১ ডি-২২২ ডি।

দের সাধারণ-বাণিজ্যিক কাজকর্ম প্রায়শই বন্ধ হয়ে যেত।[১০] বাংলায় ফরাসী-কোম্পানির বাণিজ্যে প্রধানত ইউরোপে কাপড় চালান দেবার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে বাংলার বণিকদের স্বভাবতই একটা আংশিক ছবি দেয় কারণ এটি এশীয় বাণিজ্যের প্রায় সবটাই উপেক্ষা করছে। দ্বিতীয়ত ফরাসী কোম্পানির অবস্থা এমন ছিল যার ফলে ওলন্দাজদের মতন পাসপোর্টের মধ্য দিয়ে[১১] বা পন্ডিচেরীর ফরাসী বণিকদের মতো, স্থানীয় বণিকদের নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় নি।[১২] সংক্ষেপে বলা যায় যে, এই সময়ের ফরাসী কোম্পানির কাগজপত্রের মধ্যে বাংলার বণিকদের সামাজিক বা পেশাগত অবস্থার জটিল ছবিটা আসে না।

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বাণিয়ার অতি পরিচিত ছবিটা আমরা বদলানোর চেষ্টা দিয়ে শুরু করতে পারি। প্রধান এই চরিত্রটির উপরই কোম্পানির যে কোনো জায়গার বা যে কোনো কুঠি-র সমস্ত কাজকর্ম নির্ভর করছে এবং যার মাধ্যমে দেশের শাসনকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ, অন্যান্য বণিকদের বা পেশাগত গোষ্ঠীদের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ভর করছে। সে শুধু জামীন বা বিশেষজ্ঞ নয়, আলোচনাকারী, দালাল, শর্তাবলী-নিরূপণকারী ও অনুবাদকও বটে।[১৩] ফরাসী কোম্পানির প্রথম পঞ্চাশ বছরের (১৬৮০-১৭৩০) কাজকর্মের বিশেষত্ব এই বর্ণনাটিতে ঠিকমতো আসে না। আসলে আমরা দেখছি বাংলায় বিভিন্ন কাজকর্ম ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংকার বা বণিকদের মধ্যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে যাদের বাণিজ্যিক কাজকর্মের পরিধির মধ্যে জাতিগত প্রভেদ রয়েছে এবং যাদের লগ্নী করার পুঁজির মধ্যেও ফারাক আছে। চন্দননগরের খাতকদের ১৭৩১ সালের তালিকায় মধ্যে এই প্রভেদ দেখা যায়। বাঙালী নাম দুয়ারকাদৎ (দুর্গা বা দ্বারকাদত্ত) এবং দামোদর চন্দ্র বাণিয়ার পাশে পাশে মারওয়ার-এর মাণিকচাঁদ, আর্মেনিয়ান খোজা ওয়ানেস জোনা খান এবং বিরজী বুয়োকান্দার (চন্দননগর শেষোক্তকে তার প্রধান ব্যক্তি বলছে)-এর নাম পাওয়া যায়।[১৪]

১০ কেপল্যান, ৩৩১-৩৩৮, ৫২৪-৫৩১।

১১. ওমপ্রকাশ, "দ্য ইউরোপীয়ান ট্রেডিং কোম্পানিজ অ্যান্ড দ্য মারচেন্টস অব বেঙ্গল, ১৬৫০-১৭২৫", 'ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোসাল হিস্ট্রি রেভ্যু', খণ্ড ১, নং ৩, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৬৪।

১২. পন্ডিচেরীর বণিকদের উপর ফরাসী নিয়ন্ত্রণের জন্য দ্রষ্টব্য টীকা নং ১৭।

১৩. এল. ডি দারমিনি, 'ল কমার্স আ ক্যান্টন' (প্যারিস, ১৯৬৪), দ্বিতীয় খণ্ড, ৭৮৩।

১৪. "এতা জেনেরাল দে দেত দে কম্পতোয়ার দ্য হুগলী দ্য বালাসোর এ দ্য কাশিমবাজার সুইভাঁ লেতা দ্য বেঙ্গল দু প্রমিয়ের নভেম্বর কম সুই" [সি (২) ৬৪, পৃ. ৩৪৯-৩৪৯ ডি]।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুরাট কুঠির সঙ্গে এই এই অবস্থার ফারাক দেখা যায় এই সব বড়ো বড়ো বণিকদের ফরাসীদের সঙ্গে যোগাযোগের মধ্য দিয়ে। বাণিয়ার উপরিউক্ত ছবিটা মনে হয় প্রধানত আসছে সুরাট কুঠির দালাল স্যামসন-এর যে সব বর্ণনা মার্তা দিয়েছেন তার তার থেকে।[১৫]

এছাড়া, বাংলায় কোম্পানির কর্মে রত বণিকদের সমবেত গোষ্ঠীর অভাব ভারতের বিভিন্ন জায়গার বাণিজ্যিক অবস্থার ভেদাভেদের আর একটি আঞ্চলিকতার নিদর্শন। করমণ্ডল উপকূলে আমরা দেখি যে, ভারতীয় বণিকরা পরস্পরের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সংগঠিত, যদিও সেটা অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের এবং ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির নিয়ন্ত্রণের মধ্যে।[১৬] মার্তা যখন পন্ডিচেরীতে ছিলেন, তখনকার সময়ে ঐ ধরনের কোম্পানির সংগঠন ও কাজকর্মের কথা বলেছেন। ওখানে বণিকরা স্বভাবতই ইউরোপীয়দের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। মার্তা মাঝে মাঝে উল্লেখ করেছেন, টাকা উদ্ধার করার জন্য জবরদস্তি করা, জোর করে আটকে রাখার।[১৭] ঐ ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত আছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং পরম্পরা, যেগুলো বাংলায় তখনও পর্যন্ত দেখা যায় না। মার্তার 'মেময়ারস'-এর তিরিশ বছর (১৬৬৫-১৬৯৪) আসলে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতা। ক্রমাগত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে করমণ্ডল উপকূলের বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার ছবিটি পরিস্ফুটিত হয়ে আসে।

আমাদের সময়ের মধ্যে বাংলার বণিকরা কোনো একটি কোম্পানির সঙ্গে এককভাবে ব্যবসা করত না, যদিও অনেক সময়েই তাদেরকে কোম্পানির বণিক বলে বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে তারা ঐ সময়েই একের বেশি ইউরোপীয় কোম্পানির সঙ্গে কাজ করছে। এছাড়া, তাদের কাজকর্মের ফলে তার শুধুমাত্র দালালে পরিণত হয় নি। এদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীনভাবে আন্তর্জাতিক ও এশীয় বাণিজ্যে ভালো ব্যবসা করছে। ১৬৯১ সালের ১৫ ডিসেম্বরের চিঠিতে দেলান্দ এদের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, 'ভারতের ও

১৫. স্যামসন-এর চরিত্রচিত্রণের জন্য : মার্তা, 'মেময়ারস', খণ্ড ১, ২২৪-২২৬।

১৬. এস. আরসরত্নম, "ইন্ডিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড দেয়ার ট্রেড মেথডস (সিরকা ১৭০০)", 'ইন্ডিয়ান ইকনমিক এ্যান্ড সোসাল হিস্ট্রি রেভ্যু', মার্চ, ১৯৬৬।
তপন রায়চৌধুরী, 'জান কোম্পানি ইন করমণ্ডল, ১৬০৫-১৬৯০' (দ্য হেগ, ১৯৬২), ১৪৬।
আরাডিনের প্রবন্ধ, 'জার্নাল অব ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল হিস্ট্রি' নং ২, ১৮৫৬, ২৯।

১৭. মার্তা, 'মেময়ারস', দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৪৪-৪৫৩, ৪৪৬, ৪৯১ ; তৃতীয় খণ্ড, ৬০।

বাংলার গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ও শহরে এদের গদী ও দালাল রয়েছে' এবং 'এই বণিক যদি মাল বিক্রি করতে না পারে, তাহলে বলা যায় যে আর কেউ তা পারবে না'।[১৮]

এই বিচ্ছিন্নভাবে গড়া গোষ্ঠীর মধ্যে আমরা পাই মতিরা (মথুরা ২) দাস ও বল্লভ দাস, হুগলীর প্রভাবশালী বণিক এবং ১৭০০ সালে চন্দননগর লিখছে যে 'আমরা বাংলায় আসার পর এরা আমাদের সব চালান দিয়েছে'।[১৯] অথবা মুসলমান ব্যবসায়ী মামেত (?) জাস, প্রভাবশালী ব্যক্তি যে ১৬৯৩-৯৬ সালে কাশিমবাজারের রেশম সুরাটে চালান দিত। ফরাসীদের থেকে সে অনেক কম দামে এই গুরুত্বপূর্ণ পণ্য পেত কারণ 'তার কাছে অগ্রিম দাদনের টাকা ছিল এবং তার দালালরা বাংলার উৎপাদনের ক্ষেত্রে গিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় মাল কিনে নিত'। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে পত্রলেখক লিখছেন যে 'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এরা আমাদের থেকে অনেক সুবিধাজনকভাবে এগুলি সংগ্রহ করে।' মামেত জাসের জাহাজ বাংলা ও সুরাটের মধ্যে ফরাসীদের টাকা ও চিঠিপত্র চালাচালি করত।[২০]

কসমে গোমেস, একজন প্রভাবশালী পর্তুগীজ বণিক যার সম্বন্ধে ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁ ভালো বলেছেন। তিনি ফরাসীদের প্রচুর টাকা ধার দিয়েছিলেন। তিনি আবার ফরাসী কর্তাদের চটিয়েছিলেন ফরাসীদেশ থেকে তাদের জাহাজ হুগলীতে আসার আগে বাংলার পণ্য প্রচুর লাভ সমেত বিক্রি করে।[২১] এটি একটা বিশেষ ব্যাপার। ওঁর বিদেশে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও মনে হয় যে, স্থানীয় বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি ভালোভাবে মিশে গিয়েছিলেন। ওঁর মধ্যে

১৮. দেলান্দ, উদ্ধৃত, ১৫.১২.১৬৯১, সি (২) ৬৩, পৃ. ২১২।

১৯. হুগলী, ১৭.১১.১৭০০, উদ্ধৃত, সি (২) ৬৬, পৃ. ২৩১, ২৪৪। ডিরেক্টর জেনারেলদের হুগলী ও প্যারিসে লেখা চিঠি ও উত্তর, ১৫.১.১৭০০; ১২.১.১৭০২, সি (২) ৬৭, পৃ. ৯২।

২০. মামেত জাস, দ্রষ্টব্য :
হুগলী, ২০.১.১৬৯৩, সি (২) ৬৪, পৃ. ১০২
২৫.৭.১৬৮৬, সি (২) ৬৪, পৃ. ১৪৮

২১. কসমে গোমেস, দ্রষ্টব্য :
মার্তাঁ, মেময়ারস', তৃতীয় খণ্ড, ১৬১, ৩০৩, ৩০৮
বার্ট্রান্ড কোম্পানিকে, ৭.৪.১৬৮৬, সি (২) ৬৩, পৃ. ৫২
হুগলী, ২৭.৯.১৬৯৩, সি (২) ৬৪, পৃ. ১০৮
হুগলী, ১৩.১.১৬৯৮, সি (২) ৬৪, পৃ. ৬৩৬
১০.১.১৭০০ উদ্ধৃত, সি (২) ৬৫, পৃ. ১২৬
১২.১.১৭০২, উদ্ধৃত, সি (২) ৬৬, পৃ. ৭৬।

পর্তুগীজ পরম্পরার বণিককে দেখা যায়, যেটা এশীয়রা মেনে নিয়েছিলেন শুধু তাদের প্রতি বিনম্র ব্যবহারের জন্যই নয়, যেটা অনেক সময় স্থানীয় বিবাহ-র জন্য হতো ; কিন্তু সব ছাড়িয়ে, জাহাজী কারবারের সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের জন্য।[২২] আমরা দেখব রাজনৈতিক শাসকদের সামনে অক্ষমতার মধ্যেও, কসমে গোমেস সংগঠিত কোম্পানির অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের থেকে নিজেকে বিশেষভাবে উজ্জ্বল করতে পেরেছিলেন।[২৩] বার্জ বোয়াকেন্দার, আরেক জন বণিক, একটু পরে এসেছিলেন—১৭০২ সালের মধ্যে কয়েকজনের উপর নির্ভর করার নীতি বদল করে কোম্পানি অনেকগুলি বণিকের সঙ্গে ব্যবসা করার নীতি নেওয়ার ফলে।[২৪]

ছোটো ছোটো অনেক বণিক ছিল যাদের কয়েকজনের নাম ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না—যেমন, খোজা আরাটুন লাজার, চন্দননগরের অধিবাসী এবং নয়নানন্দ পাতি, ১৭৯২ সালে চন্দননগরের কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ওইলাঙ্গোর সাথে যিনি বাঙালী জাহাজ 'ফুলঝুরী' করে মাল পাঠাতেন।[২৫] খাতকদের উপরিউক্ত তালিকার উপর চোখ বোলালেই দেখা যাবে যে, অনেকেই দাদনের টাকার উপর নির্ভর না করে কোম্পানিকে মাল জোগান দিতে পারতেন।[২৬] পণ্ডিচেরীতে খাতক বণিকরা মার্তাঁর মাথাব্যথার কারণ হয়েছিল। অন্যদিকে চন্দননগর সর্বদাই বণিকদের ধার শোধ দেবার জন্য উদ্বিগ্ন ছিল যদি জাহাজ প্রয়োজনীয় টাকা না নিয়ে আসে ঠিক সময়ে।

ফরাসীদের এ-কথা আমাদের বলার দরকার নেই যে, স্থানীয় বণিকরা তাদের পেশার সব কৌশল জানে। এ-প্রসঙ্গে ফরাসীদের মন্তব্য অত্যন্ত সাধারণ। কেবল প্রাথমিক মন্তব্য করেই ক্ষান্ত : 'এরা ইউরোপীয়দের মতই ধুরন্ধর,' ১৬৮৬ সালে বাট্রান্ড মন্তব্য করছেন। সেটার পুনরাবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে করছেন ১৬৯১ সালে দেলান্দ। এসব মন্তব্যের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল, যেন পরিচালকবর্গ স্থানীয় বণিকদের সরল না ভাবেন। বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে পরিচালকবর্গ সম্পূর্ণ অন্ধ ছিলেন বলে বোধ হয়। এখানে, অন্যান্য বিষয়ের

২২ এম. এ. পি. মেইলিঙ্ক রলোফেজ, 'এশিয়ান ট্রেড অ্যান্ড ইউরোপীয়ান ইনফ্লুয়েন্স' (হেগ, ১৯৬২), ১৮৬।

২৩. টীকা ৪৭ দ্রষ্টব্য।

২৪. হুগলী, ১২.১.১৭০৩, সি (২) ৬৭, পৃ. ৩৩, ৩৭।

২৫. সি. সি. রায়, "কমার্স পার্টিকুলিয়ের দে ফ্রান্সেজ অ বেঙ্গল", 'রেভ্যু হিস্টরিক দ্য ল্যান্দ ফ্রান্সেজ', তৃতীয় খণ্ড, ১৯১৯, ৩৬১, ৩৬৮, ৩৮০।

২৬. টীকা ১৪ দ্রষ্টব্য।

মতো, সুরাট ও করমণ্ডলের পূর্বতন অভিজ্ঞতা থেকে অল্পই শিখেছিলেন। যখন বণিকরা ইউরোপীয় পণ্য (এমারল্ড, স্ফটিক) অত্যন্ত চড়া দামে নিতে অস্বীকার করে, তখন দেলান্দ তাদের পক্ষ নিয়েছিলেন এবং যখন তারা অত্যন্ত চড়া প্রতিযোগিতার সময় বেশি দাম চায় তখন তিনি সেটা মেনে নিয়েছিলেন।[২৭] এটা বোধহয় বলা অত্যুক্তি হবে না যে, ভারতীয় ধুরন্ধরতার বহু উল্লেখ সত্ত্বেও, চন্দননগরের পরিচালকবর্গ স্থানীয় বণিকদের একবার মাত্র কথার খেলাপের উল্লেখ করেছেন। এটি হচ্ছে, রঘুনাথ দাস ফরাসীদের আগাম টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়ে ফরাসীদের বিব্রত করেছিল। দেলান্দের মতে এটাই একমাত্র ঘটনা যেটা তাদের বাংলায় আসার বারো বছরের মধ্যে ঘটেছে।[২৮]

২

আমরা আগেই বলেছি যে, এইসব বছরের চন্দননগরের চিঠিপত্র প্রধানত স্থানীয় বণিকদের সঙ্গে যোগাযোগের বিভিন্ন সমস্যার উপরই লেখা। ঐ সব সমস্যাগুলি তলিয়ে দেখলে স্থানীয় বণিকদের সঙ্গে কোম্পানির বাণিজ্যিক সম্পর্কের আকর্ষণীয় দিকগুলি ধরা যায়। এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সব ইউরোপীয় কোম্পানির মধ্যেই আছে বা বাংলার ঐ সময়ের বিশেষ অবস্থা প্রতিফলিত করে। কিছুটা পরিমাণে ফরাসীদের বাংলায় তাদের বাণিজ্যিক কাঠামোর মধ্যেকার অবস্থা ফরাসীদের প্রভাবান্বিত করে।

ইউরোপ থেকে পাঠানো নমুনার কাছাকাছি ভালো কাপড়ের পণ্য জোগাড়ের প্রধান শর্ত হচ্ছে যে বণিক ও কারিগরদের সারা বছর ধরে ফাঁক না দিয়ে কাজ করানো। এর জন্য প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে চলতি বছরের জাহাজ দেশে রওনা হবার পর থেকেই বণিকদের টাকা আগাম দেওয়া। ক্রমাগত টাকা আগাম দেওয়া সঠিক বলে বোঝানোর জন্য সমস্ত রকমের যুক্তি দেওয়া হতো। বাংলার সামগ্রিক বাণিজ্যিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এগুলো বোঝা সহজ।

অন্যান্য কোম্পানির মতো, ফরাসীরাও, দেশের চাহিদার পূরণ করার জন্য, তারা যা চাচ্ছে তার জটিলতা বুঝতে পেরেছিল। বাংলার কাপড় রপ্তানি এ-পর্যন্ত ভারতীয় ও এশীয় বাজার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে—তাদের টুকরো কাপড়ের গুণ ও মাপের উৎকর্ষের অনড় ও বিশেষ চাহিদার সঙ্গে। 'ভারতীয়তা'র ইউরোপে ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে দেশের পরিচালকবর্গ জোর

২৭. বার্টান্ড, উদ্ধৃত, সি (২) ৬৩, পৃ. ৫২।
২৮. হুগলী, উদ্ধৃত, সি (২) ৬৫, পৃ. ১৩৩।

দিচ্ছেন পণ্যের বৈচিত্র্য আনার জন্য। ইংরাজ কোম্পানির নির্দেশাবলীর মতো, চন্দননগরও নির্দেশ পাচ্ছে যেখানে বলা হচ্ছে 'তুমি এতে কখনও বেশি করতে পারবে না।' নির্দেশমতো উৎপাদনের প্রতি সরকারের অতিমাত্রায় বাণিজ্যিক ঝোঁক, ফরাসীদের পক্ষে তাদের চাহিদার নম্রতায়, বিশেষত, সূক্ষ্ম কাপড়ের নিজেদের দেশে প্রয়োজনীয়তা, অনড়তার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হতো।[২৯] বাংলার পক্ষে এই নূতন চাহিদার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার সময় লাগছিল এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে স্বভাবতই উৎপাদক ও বণিকদের ঐ বৈশিষ্ট্যের প্রতি উদাসীন করেছিল। ওরা নিশ্চিত ছিল যে, এগুলো নিশ্চয়ই কাউকে বিক্রি করা যাবে। অবিক্রীত পণ্য এশীয় বাণিজ্যে লাভজনক অবস্থায় লাগানো যাবে।

১৬৮০-১৭২০ সালের মধ্যে কাপড়ের অভাবনীয় সংখ্যায় উৎপাদন বৃদ্ধি, যখন বিশেষ বৈচিত্র্যের জন্য নির্দেশ না দেওয়া হচ্ছে, এশীয়দের জন্য প্রধানত উপযোগী ছিল। যতক্ষণ না এটা ফরাসী চাহিদার নির্দেশমতো বিশেষভাবে তৈরি না করা হচ্ছে ততক্ষণ এটা ফরাসী চাহিদা মেটাতে অক্ষম। এ সত্ত্বেও স্থানীয় উৎপাদন প্রথা এমনই যে, এটা একমানসূচক উৎপাদন প্রথার বিরোধী। ফরাসী দলিলের স্বল্প সূত্রের তথ্য ধরে আমরা তাঁতির উপর বণিকের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ-খবর নিতে পারি না। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল ছাড়াও, এটা মনে হয় যে, বণিকরা তাঁতিদের আওরঙ-এর উপর যতটা নিয়ন্ত্রণ খাটানো দরকার ততটা খাটাতে চায় বা পারে কিনা। ১৭০২-০৩ সালে বাংলাদেশে পর্যটনকারী লুইয়িয়ার মন্তব্য করেছেন যে, বড়ো দেশীয় বণিকরা 'বহুসংখ্যায় তাদের নিজেদের দালাল রাখা ছাড়াও…বহুসংখ্যক কারিগর রাখে যাদের দিয়ে অল্প-মূল্যে কাজ করিয়ে নেয়।'[৩০] কিন্তু এসত্ত্বেও তারা যখন তাঁতিদের নিয়ে এসে কাজ করায়, ওদের ছেড়ে দেওয়া হয় নিজেদের কাজ করার জন্য, পরম্পরায় যে শৈলী চলে আসছে তার থেকে বিচ্যুত হবার জন্য কোনোরকমে জোর করা হয় না। 'যখন আমাদের কিছু সংখ্যক মখমলের প্রয়োজন হয়, তখন আমরা দুই বা তিন বণিকের কাছে নির্দেশ পেশ করি তাদের উৎসাহ দেবার জন্য যাতে সম্পূর্ণ জিনিসটা একজনের হাত দিয়ে না যায় এবং আমরা যাতে ভালো কাজ পাই। যারা এটা নেয়, তারা এগুলোকে এক জায়গায় বানাতে দেয়—একহাজার টুকরোর জন্য তিন-চারশো কারিগরকে আগাম দিতে হয় যাদের মধ্যে কোনো সমান ভাব নেই। যার ফলে একজন তার টুকরোটা সূক্ষ্ম করবে, আরেকজন

২৯. যেমন দ্রষ্টব্য: হুগলী, ১৭.১১.১৭০০, সি (২, ৬০, পৃ. ১৬২ ভি।

৩০. লুইয়িয়ার, ভইয়াজ দ্য সিউর লুইয়িয়ার দাঁ লে গ্রান্দ্ এ্যান্ড ওরিয়েন্টাল' (রটারডাম, ১৭২৬). পৃ. ১৫৫।

মোটা করবে (জমাট বোনা)। আরেকজন এমন সুতো ব্যবহার করবে যার ফলে গোল হবে—এবং এটাই প্রথমটার মতো উৎকৃষ্ট হবে বা আর একটু সূক্ষ্ম হবে। এই কাজও দৈর্ঘে কমবেশি হবে—কেউ দেবে এক, বা কেউ দেবে দু আঙুল বেশি নির্দেশের থেকে, অন্যদের কম হবে···যে ২৫ বছর আমরা এই ব্যবসা করছি, আমরা এটা দেখেছি যে এই দেশে ১০০টি নিঃসন্দেহে একই মাপের টুকরো করা সম্ভব নয়।'[৩১] একমাত্র একভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করা যায় যে, বণিক ও কারিগরদের ফাঁক না দিয়ে সারা বছর কাজ করানো, পরের বছরের পণ্য ঠিক করার জন্য প্রচুর সময় হাতে রাখা—খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মাল পরীক্ষা করা এবং বাতিল হওয়া মালের পরীক্ষা (ফরাসীতে একে 'পরিদর্শন' বলছে) করা এমন একটা গুরুত্ব পেয়েছিল, যেটা এখন অবাস্তব বলে মনে হয়। আসলে, এই পরীক্ষার উপর এক বিরাট সাহিত্য রচনা করা হয়েছে।

বণিকদের আগাম দেওয়া নিয়ে আরেকটি জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। আমাদের সময়কালের মধ্যেকার অধিকাংশ সময় ফরাসী কোম্পানির অস্বাভাবিক খারাপ আর্থিক অবস্থার জন্য চন্দননগর কুঠিতে সবসময়ই নগদ টাকার টানাটানি ছিল। কোম্পানির লোকেরা অধিকাংশ সময় স্থানীয় যা ধার পাওয়া যায় সেটা নিতে বাধ্য হতেন (এটা অধিকাংশ কোম্পানির পক্ষেই সত্য ; কেবল ফরাসী কোম্পানির পক্ষে এটা আরো সংকটজনক হয়ে ওঠে)। এই সব বছরের চিঠিপত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ধার পাওয়ার সমস্যা ও বণিকদের নিজেদের টাকায় মাল জোগানো। এখানে ফরাসী মন্তব্যগুলি সবসময় যুক্তিপূর্ণ নয়। বরঞ্চ এগুলো এমন এক অবস্থার ইঙ্গিত করে, যদিও এ অবস্থা ভারতে খুবই প্রচলিত, যেটা বাংলার বাণিজ্যের সমস্যা ও পরিবর্তনের এবং বাংলায় প্রধানত ফরাসী অবস্থানের প্রকৃতি প্রতিফলিত করছে।

আসার পর থেকেই ফরাসীরা বলে আসছে 'বাংলায় ধার পাওয়া খুবই শক্ত' অথবা 'এ জায়গায় টাকা ধার দেবার জন্য ইচ্ছুক বেশি লোককে পাওয়া যায় না অথবা প্রচুর সুদ সত্ত্বেও বেশিদিনের জন্য টাকা বাইরে রাখতে চায় না।'[৩২] বণিকরা তাদের নিজেদের খরচে জিনিস তৈরি করা সম্বন্ধে এই মন্তব্য ফরাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে দিচ্ছে : 'সত্য কথা বলতে কি, অনেককে পাওয়া

৩১. হুগলী, ১৮.১২.১৭০৪, সি (২) ৬৭, পৃ. ১৮৯-১৯ ডি।
৩২. হুগলী, ৩০.১২.১৬৯৭, সি (২) ৬৪, পৃ. ২৫৪ ডি
১৩.১.১৬৯৮. সি. (২) ৬৪, পৃ. ২৬৩
১৫.১.১৭০১, সি (২) ৬৬, পৃ. ৮২-৮৩
১.১ ১৭০২, সি (২) ৬৬, পৃ. ২১৬।

যাবে যারা আমাদের অধিকাংশ চাহিদা জোগান দেবার জন্য চুক্তি করতে রাজি আছে।'[৩৩] 'নগদ টাকা হাতে থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভালোভাবে কাজ পাওয়া যায়।' তার মধ্যে দেশীয়দের সাধারণ দারিদ্র সম্বন্ধে বক্তব্য মেনে নেওয়া শক্ত[৩৪] ওদের সঙ্গে বণিকদের লেনদেনের মধ্যে বণিকদের আগাম না নিয়ে জোগান দেবার প্রতিশ্রুতি দেবার পরিপ্রেক্ষিতে। যখন টাকা আসবে তখন কেবল সুদ সুদ্ধ টাকা ফেরৎ চায় বণিকরা। যে পরিমাণ টাকা দরকার, চন্দননগরের হিসাবের থেকে তা অনেক কম হতো অধিকাংশ সময়ই। ফরাসীরা সব সময়ই দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করত যে, ঐ টাকার একটা বড়ো অংশ চড়া সুদে (শতকরা ১২) খেয়ে নিচ্ছে। খাতকদের কাছে ঋণী হয়ে থাকার ভয়ে, যেগুলো অন্য খরচে প্রয়োজনীয়, চন্দননগরের অনিচ্ছা ছিল বাংলায় বেশি ধার নেওয়ায়।[৩৫]

অধিকাংশ সময়ই ফরাসীরা টাকার অভাব দেখেছে, যেটা বাংলার অর্থ-নীতির একটা বিশেষ অবস্থা। এর জোরালো প্রকাশ দেখা যায় জিনিসপত্রের নিচু দামে এবং কড়ির ব্যাপক প্রচলনের মধ্যে।[৩৬] একটু চাপ পড়লেই নগদ টাকার টানাটানি শুরু হয়। এই সময়ের মধ্যে অবস্থাটা বিশেষভাবে খারাপ ছিল যেহেতু যুবরাজ আজিম-উস-শান ধনসঞ্চয় করছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবসা ও তাঁর এবং দেওয়ানের (ভবিষ্যৎ মুর্শিদ কুলী খান) জোরজুলুম ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে জোরে আঘাত করেছিল। স্বভাবতই তারা তাদের ধন-

৩৩. হুগলীকে ডিরেক্টর জেনারেলের চিঠি ও উত্তর, জানুয়ারি ১৭০৩, সি (২) ৬৭, পৃ. ৬১।

৩৪ হুগলী, ৩০ ১২ ১৬৯৭, সি (২) ৬৪, পৃ. ২৫৪
১৩.১.১৬৯৮, সি (২) ৬৪, পৃ. ২৬৩।
মার্তা, "মেময়ার সিউর ল্যান্দ", ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৭০০, প্রকাশিত 'রেভ্যু দ্য হিস্তয়ার কলোনিয়াল ফ্রান্সেজ', প্যারিস, আগস্ট ১৮৬১, ৪১০ (অংশ বিশেষ অনূদিত ও প্রকাশিত: অনিরুদ্ধ রায়। 'ইতিহাস', নিউ সিরিজ, তৃতীয় খণ্ড, ১৩৭৫, পৃ. ২৬৭-২৭৬)।

৩৫. হুগলী, ৩০ ১২.১৬৯৭, সি (২) ৬৪, পৃ. ২৫২
১০.১.১৭০০, সি (২) ৬৫, পৃ. ১২৫-২৬, ১৩৫
১৭.১১.১৭০০, সি (২) ৬৫, পৃ. ১৬১
১৭.১.১৭০২, সি (২) ৬৬, পৃ. ৮২-৮৩।

৩৬. ডব্লিউ. এইচ মোরল্যান্ড, 'ফ্রম আকবর টু আরংজেব', (লন্ডন ১৯২৩), ১৭৪-১৮২, বলেছেন যে ১৬৫০ এর আগে বাংলায় জিনিসপত্রের কম দামের কারণ হচ্ছে অন্যান্য প্রদেশের উপকূলের তুলনায় রুপোর যথেষ্ট পরিমাণ চালান না থাকা।

দৌলত লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল ও টাকা ধার দিতে অস্বীকার করছিল।[৩৭] এই দুই নীতির মোট ফল এই যে, ব্যবসা গোলমাল হয়ে গেল এবং নগদ টাকার এত অভাব হলো যে, 'এখন ধরে নেওয়া যায় যে বণিকরা খুব বেশি ব্যবসা করবে না' – ১৭০২ সালে এই চন্দননগর সরাফদের মতটাই পুনরুক্তি করছে 'যারা সব থেকে ভালো জানে যে বণিকদের ক্ষমতা কতদূর যেতে পারে, কারণ লগ্নীর (বুলিয়ান) অধিকাংশই একভাবে বা অন্যভাবে তাদের হাত দিয়ে যায়।'[৩৮] বাংলায় ধার পাওয়ার এই সমস্যা সুরাটের অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে সম্বন্ধে ১৮৬৬ সালে ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁ বলেছেন যে 'এক নগণ্য চেহারার লোককেও বাণিয়ারা বিমুখ করে না যদিও তারা তাদের সঙ্গে ব্যবসা করার মতো অবস্থায় নাও থাকে ...পৃথিবীতে এর থেকে সহজে টাকা ধার করার মতো ভালো জায়গা আর নেই' এবং ঐ শহরের শাসনকর্তার ক্রমাগত 'জুলুম ও লোভ' থাকা সত্ত্বেও।[৩৯] বাংলায় অল্প কয়েকজন লোকের ধার দেবার ইচ্ছার উল্লেখ এটাই দেখায় যে, যতদিনে ফরাসীরা এসেছে, ইউরোপীয় বাণিজ্যের ফল এতটা জোরদার হয়ে ওঠে নি যে পর্যাপ্ত সংখ্যক ভারতীয় ব্যাঙ্কারদের টেনে আনতে পারে।

কিন্তু ঐ বছরের সময়গুলিতে ফরাসী বাণিজ্যের সীমাবদ্ধতা এবং অস্থির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ধরা উচিত, যেটা বণিক ও সরাফদের কাছে তাদের ব্যবসায়িক মর্যাদার হানি করেছিল।[৪০] সুরাটে ফরাসীদের বিশাল ঋণ, স্পেনের সিংহাসনের দাবিতে যুদ্ধের সময়ে কোম্পানির কাছ থেকে বাংলায় সাহায্য না পাওয়ার ফলে সমস্যা এবং সর্বোপরি ওলন্দাজদের গঙ্গার মোহনা আটকে দেওয়া নিশ্চয়ই ভারতীয় বণিকদের প্রভাবান্বিত করেছিল, যাদেরকে বহু বছর ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল টাকা পাওয়ার জন্য অথবা প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল।[৪১] এইসব ঝুঁকির ফলে ভারতীয় বণিকরা অত্যন্ত সাবধানী হয়েছিল ইউরোপীয় রাজ্যগুলির মধ্যে যুদ্ধের প্রতিটি সম্ভাবনায়।[৪২]

৩৭. হুগলী, ১২.১.১৭০২, সি (২) ৬৬, পৃ. ২২৬
২৪.১২ ১৭০৩, সি (২) ৬৭, পৃ ৯২
১৮ ১২ ১৭০৪, সি (২) ৬৭, পৃ. ২০১।

৩৮. হুগলী, জানুয়ারি ১৭০২, সি (২) ৬৬, পৃ ৯০।

৩৯ মার্তাঁ, মেময়ারস'. দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৩১, ৪৩৪-৩৫।

৪০. মার্তাঁ, মেময়ারস', ১৭৭০, উদ্ধৃত, ৪০৯।

৪১ কোম্পানিকে হার্দানকোর্ট, চন্দননগর, ৬ ১.১৭১৪, সি (২) ৬৯, পৃ. ১১৯-২০; হার্দানকোর্ট, ৩০ ১২ ১৭১৫, সি (২) ৬৯, পৃ ১৬৭ ডি।

৪২. হুগলী. ১ ১ ১৭০২, সি (২) ৬৬, পৃ ২১৬।
১২ ১ ১৭০২, সি (২) ৬৬, পৃ ২৩৭।

এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে 'এই দেশের বাসিন্দারা যারা স্বইচ্ছায় টাকা ধার দেয় না, তারা আরো কম দেবে যখন তারা দেখবে আমাদের বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'[৪৩]

৩

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ কয়েক বছরে আর একটা জিনিস ফরাসীদের মনে খুব ছাপ ফেলেছিল। সরকারি জুলুম থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী বণিকও নিস্তার পায় না। ১৬৯৬ থেকে ১৭০২ সালের মধ্যে স্থানীয় কয়েকটি প্রভাবশালী বণিক ও ব্যাঙ্কাররা আটক থাকার ফলে ফরাসীদের বাণিজ্য অনেকখানি চোট খায়। হুগলী থেকে ১৭০৩ সালের লেখা চিঠি বলছে, 'মস্ত্রা দাস এবং ভালাপদাস এই এলাকার প্রভাবশালী বণিক…যাদের উপর আমরা প্রয়োজনের সময় নির্ভর করি, তারাও আমাদের মতো ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছে…রাজার কাজে যোগ দেবার পরে প্রচুর লোকসান হয়েছে…এদের মধ্যে যে বড়ো তাকে দেওয়ান আটকে রেখেছে পুরনো পাওনা—যেটা তার দিতে পারার মতো অবস্থা নেই—না দেবার জন্য'।[৪৪] ওরা দুঃখের সঙ্গে বলছে যে, কয়েকজন আর্মেনীয় বণিক যুবরাজের অত্যাচারের ফলে হুগলী ছেড়ে চলে যাবে বলে ঠিক করেছে।[৪৫] কসমে গোমেসকে 'তার বিরুদ্ধে অন্যায় মামলায় যুবরাজের সৈন্যদের কাছে ডেকে সব রকম অত্যাচার তাকে সহ্য করতে হয়েছে প্রায় তিরিশ মাস ধরে।' তাকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা শাসনকর্তাদেরকে দিতে বাধ্য করা হয়। এ সবের ফলে সে নূতন ইংরাজ কোম্পানির জাহাজ, 'ট্যাঙ্কারমল'-এ উঠবার সিদ্ধান্ত নেয়। ইংরাজরা ১৫ জন সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করার ফলে, সে যুবরাজের কর্মকর্তাদের, যারা তাকে আর একবার আটক করতে এসেছিল, হাত এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়।[৪৬]

মনে হয়, অন্তত দুটি ক্ষেত্রে স্থানীয় বণিকরা যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে এই অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। জুলাই ১৬৯৭ সালে স্থানীয় বণিকরা কোনোরকম ব্যবসা করতে অসম্মতি জানায়, যতক্ষণ না পর্যন্ত তিন মাস ধরে জেলে আটক রাখা পাটনার একজন বড়ো সরাফ ও তার দুই ছেলেকে যুবরাজ ছেড়ে না দিচ্ছেন।[৪৭] মার্তাঁ ও দেলান্দ এতেই এতই ব্যস্ত

৪৩. হুগলী, ১.১.১৭০২, সি (২) ৬৬, পৃ. ২১৬।
৪৪ হুগলী, ২৪.১২.১৭০৩, সি (২) ৬৭, পৃ. ৯২।
৪৫. হুগলী, ১৫.১.১৭০২, সি (২) ৬৬, পৃ. ২৪৪।
৪৬. হুগলী, ২৪.১২.১৭০৩, সি (২) ৬৭, পৃ. ১০৩।
৪৭. হুগলী, ১০.৭.১৬৯৬, সি (২) ৬৪, পৃ. ১৪৩।

হয়ে পড়েন যে তাঁরা সুরাটকে লিখছেন : 'আমাদের ভয় হচ্ছে যে তোমরা নিশ্চয়ই যে হুণ্ডী পাঠিয়েছ তার টাকা দিতে অসুবিধা হবে।' একবার, মুর, হিন্দু, আর্মেনীয় ও অন্যান্য বণিকরা নিজেদের রক্ষা করার জন্য একটা আত্ম-রক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক দল তৈরি করার পরিকল্পনা করে।[৪৮] এটাই বোধহয় বণিকদের সমবেত প্রচেষ্টা। কিন্তু বোধহয় এই দুটোই বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত। অধিকাংশ সময়ই বণিকরা স্থানীয় রাজনৈতিক শাসকদের জুলুমে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।

সেন্ট মালোর বেসরকারি বণিকদের নিয়ে তৈরি একটি সোসাইটির উপর কোম্পানির ভারতীয় বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হয়েছিল ১৭১৮-২২ সালে কোম্পানি পুনর্গঠিত হবার আগের দশকে। এদের অভিজ্ঞতা সামগ্রিকভাবে বাংলার অবস্থা সমর্থন করে। ফরাসী কোম্পানির মালুয়ান বাণিজ্যের লাভের একটা অংশ নেওয়া ও ভারতে এর প্রয়োজনীয় ঋণ থেকে তার শোধ করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না।[৪৯] এই সময়ে বাংলার খাতকদের মধ্যে থেকে কয়েকটি স্থানীয় বণিকদের আর্থিক অবস্থা জানা যায়—আমরা মাণিকচাঁদের নাম পাই যিনি পরবর্তীকালে বাংলার ইতিহাসে বিশেষ অংশ নিয়েছিলেন। তাঁকে বলা হচ্ছে 'আমাদের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ খাতক'। যদিও তাঁর কাছেই কোম্পানির সব থেকে বেশি টাকা ঋণ ছিল না, কিন্তু তাঁকে সবাই ভয় করে, কারণ তিনি সম্রাটের সরাফ বা ব্যাঙ্কার ছিলেন। এখানে কোম্পানি পুরানো ঋণ ফেরৎ দেবার সময় তাঁকে প্রাধান্য দিচ্ছে।[৫০] এই হচ্ছে বাংলার আর্থিক স্বার্থ ও ও রাজনৈতিক শাসনের মধ্যে যোগসূত্রের আরম্ভ যেটা পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দী ধরে এই প্রদেশের বাণিজ্যিক কাজকর্ম প্রভাবিত করেছিল।

ইংরাজিতে প্রকাশিত : 'দ্য ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোস্যাল হিস্ট্রি রেভু', খণ্ড ৮ নং ১, ১৯৭১, পৃ ৩২-৫৫।

অনুবাদ : বর্ণালী রায়

৪৮. হুগলী, ১২.১.১৭০২, সি (২) ৬৬, পৃ. ২২৬।
৪৯. মালোয়াঁদের উপর, কেপল্যান, ৫৬৫-৬০৭।
৫০. হার্দানকোর্ট-এর চিঠি, চন্দননগর, ৩০ ১২.১৭১৫, সি (২) ৬৯, পৃ. ১৬৭ ভি-১৬৮।

বঙ্গীয় সমাজে জাতিবর্ণ প্রথা

স্বপ্না ভট্টাচার্য

ভূমিকা

জাতিবর্ণ প্রথা ভারতীয় হিন্দু সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। জাতিবর্ণের বিভাগ ভারতীয় সমাজের গতিপ্রকৃতি নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল।[১] সমাজের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় আরও নানা প্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার দ্বারা। পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাংলাদেশের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় সর্বভারতীয় বর্ণব্যবস্থার ধারণা শাসকদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে উচ্চাবচ স্তরবিন্যাস তথা বর্ণের অপরিবর্তনীয়তা মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের শাসকরা প্রচার করতেন। এই তথ্য জানা যায় শিলা- ও তাম্রলিপিগুলি থেকে। বর্ণব্যবস্থার পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাদেশেও জাতব্যবস্থা।

জাতব্যবস্থা গড়ে ওঠার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছিল শ্রমবিভাগ। শ্রমবিভাগ এবং এক-একটি বৃত্তির সঙ্গে এক-একটি গোষ্ঠীর সংযোগ ইতিহাসের একটি দীর্ঘ জটিল ঘটনা। বস্তুত জাতব্যবস্থার মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাসের বিচিত্র গতি। উদাহরণস্বরূপ, বাঙালী সমাজে কায়স্থ জাতির সামাজিক মর্যাদা বাংলাদেশেরই বৈশিষ্ট্য। জাতিবর্ণ ব্যবস্থার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম অন্তর্বিবাহ। বিবাহ ছাড়াও উচ্চবর্ণের ব্যক্তি নিম্নবর্ণের ব্যক্তির কাছ থেকে অন্নজল গ্রহণের মাধ্যমে বর্ণত্ব বা জাতিত্ব দূষিত করতে পারতেন। তাই বিবাহ বা অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকর্ম তথা অন্নজল গ্রহণের নানা প্রকার বিধান তৈরি হয়েছিল বঙ্গীয় সমাজে। মোটামুটিভাবে পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে শুরু হয় বঙ্গে ব্রাহ্মণদের আগমন। এই সময় থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি নানা প্রকার ঘটনা বঙ্গীয় সমাজের জাতিবর্ণ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে।

১. ভারতীয় সমাজে জাতিবর্ণ প্রথা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য : লুই দুমো, 'হোমো হিয়ারার্কিকুস', দিল্লী, ১৯৮০ (ইংরাজি অনুবাদ)।

চারটি যুগাধ্যায়ে বিভক্ত করে বর্তমান প্রবন্ধে উপস্থাপিত করা হবে বঙ্গীয় সমাজে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বিবর্তন। উপস্থাপনার কেন্দ্রে থাকবে জাতিবর্ণ প্রথার তিনটি মূল ধারণা—বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক সংযোগের ব্যাপারে বর্ণ-বিভাগ, শ্রমবিভাগ এবং শ্রমবিভাগের ফলে বৃত্তি-বিশেষের সঙ্গে ব্যক্তি-বিশেষের একাত্মতা এবং উচ্চাবচ স্তরবিন্যাস। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের বিচ্যুতি হিসাবে উপস্থাপনা করা হবে জাত্যুৎকর্ষ ও জাত্যপকর্ষের উদাহরণ অর্থাৎ বৃত্তি পরিবর্তনের মাধ্যমে জাতি পরিবর্তনের বিধান।

সংস্কৃত ও বাংলায় লেখা যে গ্রন্থগুলি আকরগ্রন্থ হিসাবে এই রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে তার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে।

আকরগ্রন্থ

এই প্রবন্ধের আকর হিসাবে ব্যবহার করা হবে তাম্রলিপি, ঐতিহাসিক কাব্য রামচরিত, বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং মঙ্গলকাব্যগুলি। অপ্রকাশিত কুলজীগ্রন্থগুলি[২] মূল আকর হিসাবে ব্যবহার না করা হলেও ক্ষেত্রবিশেষে সেগুলির উল্লেখ করা হবে। এই মূল আকরগুলি ছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত মূল্যবান প্রবন্ধ বা গ্রন্থ লেখিকাকে চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে যথাস্থানে সেগুলিরও উল্লেখ করা হবে। মূল আকরগ্রন্থগুলির ব্যাপক পরিচয় দেওয়া হবে প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশে যেখানে চারটি যুগাধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে সমাজ ও জাতিবর্ণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগ (খ্রী. পঞ্চম-অষ্টম)

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে বাংলাদেশে জাতিবর্ণ প্রথার চিত্র পাওয়া যায় ঐ যুগের তাম্রলিপিগুলি থেকে।[৩] তাম্রলিপিগুলি অধিকাংশ পাওয়া গিয়েছে পুণ্ড্র-

২. কুলজী সাহিত্যে ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য জাতির বংশ-ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছিল এই প্রকরণগুলি। কয়েকটি বিখ্যাত প্রকরণের নাম নুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা, বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা, ধনঞ্জয়ের কুলপ্রদীপ, রামানন্দ শর্মার কুলদীপিকা ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য: রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'হিস্ট্রি অফ এনসিয়েন্ট বেঙ্গল', কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ ৪৬৯-৪৭৯।

৩ গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগ তথা পালোত্তর যুগের তাম্রলিপি প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: ব্যরি এম. মরিসন, 'পলিটিকাল সেন্টারস এ্যান্ড কালচারাল রিজিওনস ইন আর্লি বেঙ্গল', টুসকন, ১৯৭০।

বর্ধনভুক্তি বা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে। উত্তরবঙ্গই বাংলাদেশে জনবসতির প্রথম সাক্ষ্য বহন করছে। উত্তরবঙ্গের তাম্রলিপিতে খোদিত আছে ভূমিবিক্রয় ও ভূমিদানের নানা ঘটনা। কোথাও ব্রাহ্মণরা নিজে উদ্যোগ করে ভূমিক্রয় করছেন। কোথাও আঞ্চলিক শাসকরা বা ধনাঢ্য গৃহস্থরা ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করছেন বেদপাঠ ও পূজার্চনার দ্বারা পুণ্যলাভের আশায়। এই-ভাবেই শুরু হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রসার।[8] আলোচ্য যুগাধ্যায়ের তাম্রলিপি-গুলি থেকে অন্যান্য যেসকল শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায় তারা হলেন কুলিক (হস্তশিল্পী), কায়স্থ (লেখক), সার্থবাহ (বণিক) এবং শ্রেষ্ঠী (ব্যবসায়ী)। এছাড়াও ভূমিবিক্রয় ও ভূমিদানের ব্যাপারে এই যুগে যাঁদের নাম পাওয়া যাচ্ছে তাঁদের মধ্যে আছেন পুস্তপাল, করণিক, কুলভার, মহত্তর, গ্রামিক। পুস্ত-পালের কাজ ছিল ভূমিক্রয়েচ্ছু ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রে লিখিত মূল্যের যাথার্থ্য বিচার করা। করণিক ছিলেন লেখক। কুলভার ছিলেন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি এবং মহত্তর ছিলেন গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি।

ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোনো বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না এই পর্বের তাম্রলিপিতে। তবে উপরিউক্ত বৃত্তিধারী ব্যক্তিদের মধ্যে যে একটি উচ্চাবচ স্তরবিন্যাস ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রথম কুলিক, জ্যেষ্ঠ কায়স্থ ইত্যাদি নামের পূর্বে বিশেষণ 'প্রথম' 'জ্যেষ্ঠ' ইত্যাদি এই স্তরবিন্যাসের ইঙ্গিত করে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রসার হলেও ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে যে ভেদ পরবর্তীকালে প্রকট হয়ে উঠেছিল তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না এই পর্বে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচারের পাশাপাশি জৈন ও বৌদ্ধ-ধর্মের[5] অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায় পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দীর বাংলাদেশে। এই যুগে এবং পরবর্তীকালে অর্থাৎ পাল-সেন যুগেও ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের এককালীন অস্তিত্ব কখনও একে অপরের বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় নি। তাই আদর্শগতভাবে বৌদ্ধধর্ম জাতিবর্ণপ্রথার বিরোধী হলেও বৌদ্ধ শাসকরাই জাতিবর্ণপ্রথার প্রচার ও পালন করেছেন। পালপূর্ব যুগে একজন শাসকের রাজত্বকালেই শুধু ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ঘটে নি। এই

৪. দ্রষ্টব্য পুষ্পা নিয়োগী, 'ব্রাহ্মণিক সেটলমেন্ট ইন ডিফারেন্ট সাব-ডিভিসনস অফ এনসিয়েন্ট বেঙ্গল', কলিকাতা, ১৯৬৭।

৫. জৈনধর্মের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবে দ্রষ্টব্য: পাহাড়পুর তাম্রলিপি ('এপিগ্রাফিকা ইন্ডিকা', খণ্ড ২০, পৃ. ৫৯-৬৪)। বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবে দ্রষ্টব্য: খৃীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর গুনাইঘর তাম্রলিপি। ভূমিদানের গ্রহীতা তৎকালীন কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত বৌদ্ধ আশ্রমবিহার। তাম্রলিপিটি প্রকাশিত 'ইন্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টারলি', খণ্ড ৬, পৃ. ৪৫-৬০।

শাসক হলেন শশাঙ্ক (আনু. খ্রী. ৫৯৫-৬২১)। শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম-বিরোধী গোঁড়া শৈব ছিলেন। শশাঙ্কের আমলে ব্রাহ্মণরা যে বিশেষ প্রভাবশালী জাতি হিসাবে সমাজে স্বীকৃত হতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাম্রলিপি ছাড়া অন্যান্য প্রকরণে।[৬]

শশাঙ্কের রাজ্যকেন্দ্র ছিল কর্ণসুবর্ণে, অর্থাৎ বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অর্থাৎ সমতটে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব জোরদার ছিল, একথা জানা যায় খড়্গ (আনু. খ্রী. সপ্তম শতাব্দী), দেব (আনু. খ্রী. অষ্টম শতাব্দী) প্রভৃতি বংশের তাম্রলিপিগুলি থেকে। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সত্ত্বেও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রসার হতে থাকে এবং ফলত জাত-বর্ণ প্রথাও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

পাল-চন্দ্র-বর্মন যুগ [আ. খ্রী. অষ্টম-দ্বাদশ শতাব্দী]

খ্রীস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী অবধি পাল রাজারা বাংলা ও বিহারে রাজত্ব করেন।[৭] পাল রাজাদের রাজত্বকালেই দশম শতাব্দীতে চন্দ্র রাজারা এবং একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্মণ রাজারা বিক্রমপুরে (ঢাকা-বিক্রমপুর অঞ্চল) শাসনকেন্দ্র বা রাজধানী স্থাপন করেন। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর তাম্রলিপিগুলি এবং রামচরিত কাব্য বাংলার সমাজের দ্রুত ব্রাহ্মণীকরণ বা আর্যীকরণের সাক্ষ্য বহন করে।[৮] ব্রাহ্মণীকরণ বা আর্যীকরণ বলতে বোঝায় কৌম-সমাজে ব্রাহ্মণ-নির্দেশিত রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে কৌমসমাজের ব্রাহ্মণীকরণ এবং বাঙালী সমাজের জাতিবিন্যাস যে খুব বিঘ্নহীনভাবে হতো সে ধারণা করা যায় না। উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চল নিয়ে পাল ও কৈবর্তদের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়েছিল, তার বিবরণই এই মতের সমর্থন করে। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাল ও কৈবর্তদের মধ্যে যে সংঘর্ষ দেখা দেয় তার কাহিনী দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।[৯]

৬ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ঐ, পৃ. ৫৬।
৭. দীনেশচন্দ্র সরকার, 'পালসেন যুগের বংশানুচরিত', কলিকাতা, ১৯৮২।
৮ বাংলার মধ্যযুগে (পঞ্চম-ত্রয়োদশ শতাব্দী) ভূমিদান ও বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের বিষয়ে লিখিত বর্তমান লেখিকার জার্মান ভাষায় প্রণীত গ্রন্থ—'ল্যান্ডসেনকুনগেন উন্ড স্ট্যাটালখ এনটউইকলুঙ্গ ইম ফ্রুকমিটেলঅল্টারলিখেন বেঙ্গলেন', এয়েসব্যাডেন, ১৯৮৫ দ্রষ্টব্য।
৯ বিদ্যাবাচস্পতি রাধাগোবিন্দ বসাক (সম্পাদিত), 'রামচরিত', এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৬৯।

কৈবর্তদের এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে রাক্ষস অনার্য মাংসভুক্ হিসাবে। অন্যদিকে পাল রাজাদের বর্ণনা করা হয়েছে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী আর্য হিসাবে। বহিরাগত শাসকদের সঙ্গে আদিবাসী কৈবর্ত আঞ্চলিক শাসকদের সংঘর্ষকে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী 'ধর্মবিপ্লব' আখ্যা দিয়েছেন এবং বরেন্দ্রভূমির প্রতি পাল রাজাদের দাবি ন্যায্য দাবি বলে স্বীকার করেছেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে বোঝা যাবে সন্ধ্যাকর নন্দীর দাবির পেছনে আছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উন্নাসিকতা এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির ভূমিভোগের অধিকার অস্বীকার করা। কৈবর্ত জাতি পূর্ব-ভারতের, বিশেষত বাংলা ও উড়িষ্যার একটি প্রভাবশালী জাতি।[১০] গুপ্তযুগের একটি সুলতানপুর তাম্রলিপিতে (খ্রী. ৪৪০) কৈবর্ত ব্রাহ্মণের সন্ধান পাওয়া যায়। আদিপর্বের এই উদাহরণ প্রমাণ করে মৎস্যজীবী কৈবর্ত বর্ণসম্পর্কে ব্রাহ্মণ বর্ণেরও অন্তর্ভুক্ত হতে পারতেন। দশম-একাদশ শতাব্দীতে কৈবর্ত গোষ্ঠীকে উত্তরবঙ্গের একটি প্রভাবশালী জনগোষ্ঠী হিসাবে দেখা যাচ্ছে। বল্লালসেনের রাজত্বকালে তাঁদের এই প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। সুবর্ণবণিকদের দমন করবার জন্যে বল্লালসেন কৈবর্তদের সামাজিক স্তর উন্নীত করেছিলেন। এ হলো জাত্যুৎকর্ষের উদাহরণ। পরবর্তীকালে সুলতানী ও মুঘলযুগে ও ব্রিটিশযুগে নবশাখা ও অসৎশূদ্রের মধ্যবর্তীস্তরে কৈবর্ত বা মাহিষ্যরা স্থান পায়।[১১] বাংলার ইতিহাসে আদিপর্ব থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নানা সামাজিক উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়েও কৈবর্তরা নিজেদের জাতিসত্তা রেখে বাংলার সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে।

এতক্ষণ আলোচনা করা হলো 'রামচরিত' গ্রন্থে বিবৃত ঘটনার প্রেক্ষাপটে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও কৌমধর্মের সংঘাত এবং কৈবর্ত জাতির সামাজিক মান। পালপর্বের তাম্রলিপিগুলি থেকে এই পর্বের সমাজব্যবস্থার স্তরবিন্যাস সম্বন্ধে কিছু ধারণা লাভ করা যায়। পাল রাজাদের সময়ে বর্ণসমাজে ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল সর্বাধিক উচ্চে। পাল ও চন্দ্র রাজারা বৌদ্ধ ('পরমসৌগত') হলেও

১০. হার্বার্ট রিজলে, 'ট্রাইবস অ্যান্ড কাস্টস অব বেঙ্গল', কলিকাতা, ১৯৮১, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫-৩৮২।

১১. 'নবশাখ-এর নীচে এবং অন্যান্য অসৎ শূদ্র জাতির উপরে, মধ্যবর্তী বিভিন্ন জাতি দাঁড়িয়েছিল, যাদের জলাচরণীয় বলে মনে করা হতো কিন্তু শুদ্ধ ব্রাহ্মণরা তাদের কোনো কাজ করত না। ঐতিহাসিকভাবে, এই গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাত ছিল কৈবর্ত, যাদের কৃষিকাজের অংশ পরে মাহিষ্য বলে দাবি করেছিল।' শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, "কাস্ট অ্যান্ড সোসাইটি ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল: চেন্‌জ্ অ্যান্ড কনটিনুয়িটি" ('দ্য জার্নাল অফ সোসাল স্টাডিস', সংখ্যা ২৮, পৃ. ৬৭)।

ভূমিদানের গ্রহীতা হিসাবে প্রথম স্থান অধিকার করে আছেন ব্রাহ্মণরা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শৈব ও বৈষ্ণব দেবাধিষ্ঠান। বৌদ্ধমঠ গ্রহীতা হিসাবে এসেছে মাত্র কয়েকটি তাম্রশাসনে। উত্তর- এবং পূর্ববঙ্গে যাঁরা ভূমিদানের গ্রহীতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁরা অনেকেই উত্তর- ও মধ্য-ভারত থেকে আগত।[১২] সংস্কৃতিমান্ এবং শাস্ত্রের নানা শাখায় পারদর্শী হিসাবে তাম্র-পট্টোলীতে এই ব্রাহ্মণদের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে বাংলার সমাজে 'কুলীন' বলে বিশেষ মর্যাদা পেতেন যে-ব্রাহ্মণরা তাঁদেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন বহিরাগত এই ব্রাহ্মণরা। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় দলবদ্ধ হয়ে ভূমিদানের গ্রহীতা হয়েছেন যে-ব্রাহ্মণরা সেই ব্রাহ্মণরা যে সম্পূর্ণ অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সে ধারণা করা যায় তাঁদের নাম থেকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ত্রয়োদশ শতাব্দীর দশরথ-দেবের আদাবাদি তাম্রলিপি[১৩] উল্লেখ করা যায়। গ্রহীতাদের নাম শ্রীমাক্রি, শ্রীনান্ডি, শ্রীলেধু ইত্যাদি। কৌম সমাজ থেকে উত্থিত এই ব্রাহ্মণদের বৃত্তি ছিল বেদপাঠ বা পূজার্চনা নয়, এঁরা জীবিকার তাগিদে চাষের হাল ধরতেন। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্র এই ধরনের ছয় হাজার ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন।

পাল-চন্দ্র যুগে ব্রাহ্মণ ছাড়াও আরও যেসব শ্রেণীর বর্ণনা তাম্রলিপিতে পাওয়া যায় তাদের তালিকা উপস্থাপনায় নিম্নলিখিত সামাজিক স্তরবিন্যাসের চিত্র ফুটে ওঠে—শাসকদের নিকটতম ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন রাজরাজণক, রাণক, রাজপুত্র, অমাত্য, মহাকার্তাকৃতিক, মহাদন্ডনায়ক, মহাপ্রতীহার, মহাসামন্ত, মহাসেনাপতি, মহাসন্ধিবিগ্রহিক, মহাক্ষপটলিক, মহাকরণাধ্যক্ষ, মহাকায়স্থ, মহাকুমারামাত্য, প্রমাতৃ, ঔপরিক। দ্বিতীয় স্তরে আছেন বিষয়পতি, মন্ডলপতি, গ্রাম্যপতি, ক্ষিতিপতি, দশগ্রামিকা, ঠক্কুর, ষষ্ঠাধিকৃত, নিয়োগী, ধর্মজ্ঞ, বাস-গারিক, আভ্যন্তরিক, বৃদ্ধধনুষ্ক ইত্যাদি। তৃতীয় স্তরে আছেন চৌরধরণিক, দান্ডিক, ক্ষেত্রপ, প্রান্তপাল, কোটপাল, খন্ডরক্ষ, গৌল্মিক, তদাযুক্তক হস্তি-অশ্ব-উষ্ট্র, বলব্যপৃতক, কিশোর-বড়প, গোমহিষ আজীবিক অধ্যক্ষ, গমগামিক, অভিত্বরমণ, তরপতি, দূতপ্রৈষণিক, গূঢ়পুরুষ এবং মন্ত্রপাল। সর্বশেষের স্তরে আছেন অন্ধ্র, চন্ডাল এবং মেদ। উল্লিখিত তালিকা থেকে প্রথমেই যে ধারণা হয় তা হলো বর্ণ ও শ্রেণী বিভাগের সামঞ্জস্য। প্রথম স্তরে যে রাজ-

১২ উত্তর ভারত ও মধ্যভারতের স্থানগুলির নাম কোলাম্ব (কানপুর), শ্রাবস্তি (উত্তর-প্রদেশ), হস্তিপাদ (দিল্লী আমেদাবাদ অঞ্চল)।

১৩ ননীগোপাল মজুমদার, 'ইনস্ক্রিপশনস অফ বেঙ্গল', রাজশাহী, ১৯২৯ পৃ. ১৮১ ১৮২।

পুরুষদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা বর্ণগতভাবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এ-মত পোষণ করা যায়। উল্লিখিত শ্রেণীস্তরের সর্বনিম্নে যাঁরা স্থান পেয়েছেন তাঁরা ছিলেন শূদ্র ও অন্ত্যজ। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস'[১৪] গ্রন্থে 'আমলাতন্ত্রের শ্রেণীস্তর' শীর্ষক অংশে পাল রাজাদের তাম্রলিপিতে এই রাজপুরুষ ও আমলাদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনাতেও তিনি বর্ণ ও শ্রেণীস্তরের সামঞ্জস্যের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তাদের রাজনৈতিক আদর্শ ছিল বর্ণাশ্রমধর্ম সমাজে অনুসৃত হচ্ছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখা। চতুর্বর্ণের আদর্শ রক্ষা করা রাজাদের কর্তব্য হলেও সমাজে সৃষ্টি হতে থাকল নানা বৃত্তিজীবী জাতি। জনবসতি গড়ে উঠল পুণ্ড্রবর্ধন, রাঢ়-বঙ্গ এবং সমতটে। গ্রামগুলিকে ঘিরে গড়ে উঠল কৃষিনির্ভর সমাজ। গ্রামীণ সমাজের নানা-প্রকারের কর্ম নিষ্পত্তির জন্যে গড়ে উঠল নানাপ্রকার বৃত্তি এবং তাম্রলিপিগুলি মধ্যে গতানুগতিক ভূমিদানের বার্তা ছাড়া অন্য কোনো সংকেত তেমন পাওয়া যায় না। তবে ব্রাহ্মণ ছাড়া কায়স্থ, কৈবর্ত ইত্যাদি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, সে-কথা আমরা আলোচনা করেছি।

সেনযুগ

খ্রী. দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেনবংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশে, বিশেষত পূর্ববঙ্গে (বঙ্গ) ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র দৃঢ়তর হয়। সেনরাজারা ছিলেন দাক্ষিণাত্য থেকে আগত ব্রহ্মক্ষত্রিয়।[১৫] ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়বর্ণের মিলনে ব্রহ্মক্ষত্রিয়। বর্ণ হিসাবে ব্রাহ্মণ এবং বৃত্তি হিসাবে (রাজ্যশাসন) ক্ষত্রিয় এই যুক্তিতে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সেন রাজারা। সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে আনুষ্ঠানিকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদনের জন্যে ব্রাহ্মণের উপস্থিতি হয়ে ওঠে অপরিহার্য এবং এইভাবে সমাজে ব্রাহ্মণের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়।

সেন বংশের রাজত্বকালে জাতিবর্ণ প্রথার কথা আলোচনা করতে গেলে উল্লেখ করতে হয় কৌলীন্য প্রথার। সেন বংশের রাজা বল্লালসেনের নামের সঙ্গে যুক্ত এই প্রথা — তবে সেন আমলের কোনো লিপিতে এর উল্লেখ নেই। এই সামাজিক ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায় পরবর্তীকালে লিখিত কুলজী-

১৪. নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', আদিপর্ব, প্রথম খণ্ড, (পুনর্মুদ্রণ), পৃষ্ঠা. ৩৪৯-৩৫১।

১৫. দ্রষ্টব্য : লক্ষ্মণ সেনের তর্পণলিপি (ননীগোপাল মজুমদার, ঐ, পৃ. ১০৭)।

গ্রন্থগুলিতে। কৌলীন্য প্রথা অনুসারে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এই দুই জাতির অন্তর্ভুক্ত পরিবারবিশেষকে সমাজে উচ্চস্থান দেওয়া হতো। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে, 'বঙ্গদেশের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে, উড়িষ্যার দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে এবং মিথিলার ব্রাহ্মণদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা একদা বহু প্রচলিত ছিল। কৌলীন্যের অনুরূপ প্রথা ভারতবর্ষের অন্যত্রও ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখা যেত, তবে বঙ্গদেশেই এই প্রথার প্রাবল্য বেশি। কৌলীন্য বলতে বোঝায় গুণের ভিত্তিতে সৃষ্ট একটি কাল্পনিক উচ্চশ্রেণী, মূলত ব্রাহ্মণদের মধ্যেই। এই গুণের সংখ্যা নয়টি : আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপস্যা ও দান। এই গুণগুলির ভিত্তিতে উত্তর-রাঢ়ীয় ও দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থরাও নিজেদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা প্রচলন করে। এই প্রথা প্রবর্তনের ফলে কুলীন আখ্যায় ভূষিত ব্রাহ্মণদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় যদিও তাদের মধ্যে আচার বিদ্যা বিনয় প্রভৃতি কুললক্ষণের রীতিগত ঘাটতি ছিল।'[১৬] কৌলীন্য প্রথা অনুসারে কুলীনই একমাত্র কুলীনের ঘরের কন্যা বিবাহ করত। আমেরিকান সমাজ বিজ্ঞানী আর. ইনডেন[১৭]-এর মতে, যে ব্রাহ্মণ ও শূদ্ররা নিমন্ত্রিত হয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন তাঁদেরকে তৎকালে বাংলাদেশে বসবাসকারী ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের থেকে আলাদা করবার জন্যে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তিত হয়। কুলজীকার নন্দরাম মিত্রের দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ সমাজের বিবরণ থেকে আদিশূর নামে খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দীর এক মহারাজার নাম পাওয়া যায়। কুলজীগ্রন্থের প্রমাণ অনুসারে এই আদিশূরই প্রথম গৌড়েশ্বর যিনি পাঁচজন ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ-সেবক অনুসারে পাঁচজন শূদ্রকে বাংলাদেশে নিমন্ত্রণ করেন।[১৮] কুলীন শূদ্রদের মধ্যে ছিলেন ঘোষ, বসু ও মিত্র। আশিজন শূদ্রের একটি গোষ্ঠীর মধ্যে কুলীন-জনোচিত নয়টি গুণের অভাব ছিল। সেনযুগের সমাজে তাঁরা স্থান পেলেন মৌলিক হিসাবে দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে। এই আশিজনের মধ্যে কেবল দত্তকে বলা হতো উত্তর-ভারত থেকে আগত। অন্য উনআশিজন সম্পর্কে মনে করা হতো যে, তাঁরা পঞ্চ শূদ্রের বাংলায় আগমনের আগে থেকেই বাংলায় বসবাস করতেন। এই গোষ্ঠীকে ভাগ করা হতো সিদ্ধ ও সাধ্য এই দুই ভাগে। সিদ্ধ মৌলিক হলো বাংলাদেশের আদি-শূদ্র গোষ্ঠী থেকে আগত। সেন, দত্ত, কর, দেব, পালিত, সিংহ এবং গুহ এই মৌলিকরা বৈবাহিক সম্পর্কের

১৬. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'ভারতীয় জাতিবর্ণ প্রথা', কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ১৬৬।
১৭. আর ইনডেন, 'ম্যারেজ এ্যান্ড র‍্যাঙ্ক ইন বেঙ্গলী কালচার', নিউ দিল্লী, ১৯৭৬, পৃ. ৬১।
১৮. ইনডেন, ঐ, পৃ. ৫৩।

মাধ্যমে তাঁদের কুলকে ঘোষ, বসু ও মিত্র পর্যায়ে উন্নীত করতে পেরেছিলেন।[১৯] আবার দেখা যায় পাঁচজন ব্রাহ্মণের ছাপ্পান্ন জন পুত্রকে বল্লাল সেন তাঁর সভায় নিমন্ত্রণ করেন এবং প্রত্যেককে এক-একটি করে গ্রামদান করেন। গ্রামের নামানুসারে কুলের নাম করা হয়। একেই বলা হয় গাঁঞী কিন্তু গাঁঞীর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল ব্রাহ্মণদের আঞ্চলিক বিভাগ—বারেন্দ্র ও রাঢ়ী। বারেন্দ্র ও রাঢ়ী ব্রাহ্মণরা যথার্থ বেদবিদ্ না হওয়ায় প্রয়োজন হলো আরও এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের। এঁরা অভিহিত হলেন বৈদিক ব্রাহ্মণ হিসাবে। বারেন্দ্র ও রাঢ়ী বৈদিক ছাড়াও কুলজী গ্রন্থে ও লিপিমালায় পাওয়া যায় আরও দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের। এঁরা হলেন শাকদ্বীপী ও সারস্বত।[২০]

সেন পর্বের 'বল্লালচরিত' নামক দুইটি গ্রন্থ থেকে বাংলার সমাজের আরও কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথম 'বল্লালচরিত' গ্রন্থের রচয়িতা আনন্দভট্ট, রচনাকাল খ্রীস্টাব্দ ১৫১০। দ্বিতীয় 'বল্লালচরিতে'র রচয়িতা গোপালভট্ট। প্রথম 'বল্লালচরিত' গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী বল্লালসেন একবার বল্লভানন্দ নামে এক ধনাঢ্য সুবর্ণবণিকের কাছ থেকে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য দেড়-কোটি সুবর্ণমুদ্রা চেয়েছিলেন।[২১] বল্লভানন্দ এই প্রার্থনার বিনিময়ে হরিকেল প্রদেশের রাজস্ব দাবি করলে বল্লালসেন ক্ষুব্ধ হয়ে সুবর্ণবণিকদের শূদ্রের পর্যায়ে অবনীত করেন। সুবর্ণবণিকরা তখন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে দাস ভৃত্যদের প্রভাবান্বিত করেন। বল্লালসেন তখন কৈবর্তদের বশীভূত করার জন্যে তাঁদের জলচল সমাজে উন্নীত করেন। এই উন্নীতকরণ বা জাত্যুৎকর্ষের ফলে কৈবর্তদের হাত থেকে ব্রাহ্মণরা জল গ্রহণ করতে পারতেন। সেন আমলে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাল আমলের তাম্র-লিপিগুলিতে যে আমলা শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায় সেন লিপিগুলিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রী. চতুর্দশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালে বিভিন্ন জাতির মধ্যে উন্নীত ও অবনীতকরণের যে প্রবণতা দেখা যায়, তার বীজ হয়তো সেন আমলেই ছিল। সুলতানী-মুঘল যুগে এই প্রবণতার অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। সুলতানী-মুঘল যুগেই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই তিনটি জাতির উৎকর্ষের ধারণাও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সুলতানী-মুঘলযুগে জাতিবর্ণ প্রথার একটি আলেখ্য উপস্থাপিত করব।

১৯. ইনডেন, ঐ, পৃ. ৬৪-৬৫।
২০. নীহাররঞ্জন রায়, ঐ, পৃ. ৩১৪।
২১. দ্রষ্টব্য : রমেশচন্দ্র মজুমদার, ঐ, পৃ. ২৫২-২৫৩।

সুলতানী-মুঘলযুগ (খ্রী ত্রয়োদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী)

খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইখতিয়ারউদ্দিন মোহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজী বাংলাদেশে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।[২২] ১২০১ সালে খিলজী বংশ উত্তরবঙ্গ অধিকার করার পঞ্চাশ বছর পরে পূর্ববঙ্গ মুসলমানদের অধীনে আসে। বাংলাদেশ দিল্লী সুলতান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৩৪৫ থেকে ১৪৯৩ সাল অবধি বাংলাদেশে ইলিয়াস শাহী বংশ রাজত্ব করেন। উপরিউক্ত সময়ের মধ্যে স্বল্পকালের জন্যে জনৈক হিন্দুরাজা গণেশ রাজত্ব করেন। ১৪৯০ সালে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ বাংলায় সৈয়দ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজত্বের শেষে ১৫৩৮ সালে সম্রাট হুমায়ুনও বাংলাদেশ জয় করেন। পরে শেরশাহ বাংলায় আধিপত্য স্থাপন করেন। শেরশাহের বংশধরেরা ১৫৬৪ সাল অবধি রাজত্ব করেন। এরপর সুলেমান কাররানি নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। যার শেষ রাজা দায়ুধকে আকবর পরাজিত করেন ১৫৭৬ সালে। বাংলাদেশ আবার দিল্লীর অধীনে আসে। শান্তি ও ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলায়। এই ঐশ্বর্যের আকর্ষণেই ইউরোপীয় বণিকরা বাংলায় আগমন শুরু করেন। ১৭৪০ সাল থেকে ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত আলীবর্দি খান বাংলার স্বাধীন সুলতান হিসাবে রাজত্ব করেন। তাঁর পৌত্র এবং উত্তরাধিকারী নবাব সিরাজ-উদ্‌দৌল্লা ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন। এই পলাশীর যুদ্ধের মধ্যে দিয়েই বাংলায় মুসলমান শাসনের অবসান ঘটে।

রাজনৈতিক ইতিহাসের এই উত্থান-পতন সত্ত্বেও বাঙালী সমাজে জাতিবর্ণ প্রথা প্রচলিত থাকে। জাতিবর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে মুসলমানরাও স্থান করে নেন। যবন অর্থাৎ মুসলমানদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ হলেও কর্মজীবনে হিন্দু ও মুসলমানদের পারস্পরিক সংস্পর্শ বিদ্যমান ছিল। মুসলমান শাসকরা জাতিবর্ণের আদর্শ প্রচার করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতিবর্ণ প্রথা বাঙালী সমাজে পালিত হতে থাকল এবং উচ্চ জাতের সঙ্গে নিম্নজাতির বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকল। সুলতানী-মুঘল যুগের সূচনার মধ্যে দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অবধি যে যুগের আলোচনায় আমরা অবতীর্ণ হয়েছি সেই যুগে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ এই তিনটি জাতি উচ্চজাতি হিসাবে বাঙালী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং আজও আছে।

ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে যে ছয়টি প্রকরণ বাংলার সমাজ এবং জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে ধারণা করতে সাহায্য করে সেগুলি হলো বৃহদ্ধর্ম পুরাণ

২২. আবদুল করিম, 'বাংলার ইতিহাস' (সুলতানী আমল), ঢাকা, ১৯৭৭।

ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী), চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' (ষোড়শ শতাব্দী), কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' (ষোড়শ শতাব্দী শেষভাগ), ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্মমঙ্গল' (অষ্টাদশ শতাব্দী), রায়গুণাকর ভারত চন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল' (সপ্তদশ শতাব্দী)। বৃহদ্ধর্ম পুরাণের বিবৃতি অনুসারে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য বর্ণ সমস্তই সংকর বা মিশ্র। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহের ফলে এই সংকর-বর্ণগুলির উদ্ভব হয়েছে। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর এবং অধম সংকর এই তিন পর্যায়ের ছত্রিশটি উপবর্ণ বা জাতের কথা বলা হয়েছে তবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে একচল্লিশটি।[২৩] নিচে উক্ত তালিকাটি উপস্থাপিত করা হচ্ছে :

১। করণ — লেখক ও পুস্তক-কর্মদক্ষ।
২। অম্বষ্ঠ — বৈদ্য এবং ঔষধ প্রস্তুতকারক।
৩। উগ্র — যুদ্ধবিগ্রহবৃত্তধারী
৪। মাগধ — সূত বা চারণ এবং সংবাদবাহী
৫। তন্তুবায় — তাঁতী
৬। গান্ধিক — বণিক (গন্ধবণিক)
৭। নাপিত
৮। গোপ — লেখক
৯। কর্মকার — কামার
১০। তৈলিক বা তৌলিক — সুপুরী ব্যবসায়ী
১১। কুম্ভকার — কুমোর
১২। কংসকার — কাঁসারী
১৩। শাংখিক বা শঙ্খকার — শাঁখারী
১৪। দাস — কৃষিকার্য-বৃত্তিধারী অর্থাৎ চাষী
১৫। বারুজীবী — বারুই বা পান-উৎপাদক
১৬। মোদক — ময়রা
১৭। মালাকার

২৩. তালিকাটি মূল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, নীহাররঞ্জন রায়, পৃ ৩১৫-৩১৯ এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার, ঐ, পৃ. ৪৭১-৪৭৯। বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্লোক ৩৩-৪৮ দ্রষ্টব্য। বৃহদ্ধর্মপুরাণ (সম্পাদনা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী), 'কলেকসন অফ ওরিয়েন্টাল ওয়ার্কস', এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, নিউ সিরিজ, ৬৬৪ এবং আর. সি. হাজরা, 'স্টাডিস ইন দ্য উপপুরাণস', তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৩ দ্রষ্টব্য।

১৮। সূত — চারণ গায়ক
১৯। রাজপুত্র — বৃত্তি অজ্ঞাত
২০। তাম্বুলী — তামলী অর্থাৎ পান বিক্রেতা

মধ্যম সংকর

২১। তক্ষণ — খোদাইকর
২২। রজক — ধোপা
২৩। স্বর্ণকার — স্বর্ণালংকর প্রস্তুতকারক
২৪। সুবর্ণবণিক — স্বর্ণ ব্যবসায়ী
২৫। আভীর (আহীর) — গোয়ালা, গোরক্ষক
২৬। তৈলকার—তেলী
২৭। ধীবর—মৎস্যব্যবসায়ী
২৮। শৌণ্ডিক — শুঁড়ি
২৯। নট — যারা নাচ, খেলা ও বাজি দেখায়
৩০। শাবাক, শাবক — বৌদ্ধ শ্রাবকদের বংশধর [?]
৩১। শেখর — [?]
৩২। জালিক — জেলে, জালিয়া

অধম সংকর বা অন্ত্যজ

অধম সংকর বা অন্ত্যজ পর্যায়ে ৯টি উপবর্ণ। এরা সকলেই বর্ণাশ্রমবহির্ভূত এবং অস্পৃশ্য :

৩৩। মালগ্রহী
৩৪। কুড়ব
৩৫। চণ্ডাল
৩৬। বরুড় — বাউড়ী
৩৭। তক্ষ — তক্ষণকার
৩৮। চর্মকার — চামার
৩৯। ঘট্টজীবী — ঘণ্টজীবী। খেয়াপারাপারের মাঝি
৪০। ডোলাবাহি — ডুলি
৪১। মল্ল — বর্তমানে মালো [?]

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে[২৪] ব্রাহ্মণেতর সমস্ত বর্ণকে (সংকর বর্ণকে) সৎ এবং অসৎ শূদ্র পর্যায়ে ভাগ করেছে।

সৎ শূদ্র

১। করণ
২। অম্বষ্ঠ
৩। বৈদ্য—চিকিৎসাবিদ্
৪। গোপ
৫। নাপিত
৬। ভিল্ল—আদিবাসী ভিল
৭। মোদক
৮। কুবর
৯। তাম্বুলী—তামলী
১০। স্বর্ণকার ও অন্যান্য বণিক
১১। মালাকার
১২। কর্মকার
১৩। শংখকার
১৪। কুবিন্দক—তন্তুবায়
১৫। কুম্ভকার
১৬। কংসকার
১৭। সূত্রধার
১৮। চিত্রকার—পটুয়া
১৯। স্বর্ণকার

অসৎ শূদ্র

২০। অট্টালিকাকার
২১। কোটক—গৃহনির্মাণ যাদের বৃত্তি
২২। তীবর
২৩। তৈলকার

২৪. ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের দশম পরিচ্ছেদ এবং নীহাররঞ্জন রায়, ঐ, পৃ. ৩১৮-৩২০ দ্রষ্টব্য।

২৪। লেট
২৫। মল্ল
২৬। চর্মকার
২৭। শুঁড়ি
২৮। পৌণ্ড্রক—পোদ [?]
২৯। মাংসচ্ছেদ—কসাই
৩০। রামপুত্র
৩১। কৈবর্ত—ধীবর
৩২। রজক
৩৩। কোয়ালী
৩৪। গঙ্গাপুত্র—লেট-তীবরের বর্ণসংকর সন্তান
৩৫। যুঙ্গি—যুগী [?]
৩৬। আগরী—বৃহদ্ধর্ম পুরাণের উগ্র এবং বর্তমানের আগুরী

অসংশূদ্রের নিম্নপর্যায়ে অর্থাৎ অন্ত্যজ অস্পৃশ্য পর্যায়ে যাদের নাম আছে তাঁরা হলেন ব্যাধ, ভড়, কাপালী, কোল, কোঞ্চ, হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগদী), ব্যালগ্রাহী (বৃহদ্ধর্ম পুরাণের মালগ্রাহী), চন্ডাল ইত্যাদি।

উপরিউক্ত সারণী অনুযায়ী বৃহদ্ধর্ম পুরাণের উত্তম সংকর পর্যায়ে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের সৎ শূদ্র পর্যায়ে আধুনিক বাঙালী সমাজের দুই সংকর উচ্চজাতি বৈদ্য ও কায়স্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাল আমলের লিপিতেও কায়স্থ ও করণের উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু বৈদ্য ও অম্বষ্ঠের উল্লেখ নেই। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বর্ণ হিসাবে বৈদ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে নেই, যদি সেখানেও বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ পৃথক উপবর্ণ হিসাবে পরিগণিত। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে দ্বিজ পিতা ও বৈশ্য মাতার মিলনে অম্বষ্ঠের উদ্ভব। কিন্তু বৈদ্যদের উদ্ভব সূর্যতনয় অশ্বিনীকুমার ও জনৈকা ব্রাহ্মণীর আকস্মিক মিলনে। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈদ্য কুলজীকার ভরত মল্লিকই প্রথম ব্যক্তি যিনি বৈদ্য ও অম্বষ্ঠের অভিন্নতা দাবি করেন। বাংলার সমাজে নবশাখা নামে যে গোষ্ঠী ছিল তার অন্তর্ভুক্ত ছিল নয়টির জায়গায় চোদ্দোটি জাতি—গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, কংসবণিক, তাম্বালবণিক, গোপ (সদ্গোপ), তন্তুবায়, মোদক, নাপিত, তিলি, পলাদার, কর্মকার, কুম্ভকার, বারুই, এবং মধুনাপিত। বৈদ্য ও কায়স্থের মতো নবশাখা জাতিও ছিল জলাচরণীয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে জলদানের উপযুক্ত এবং ব্রাহ্মণের পূজার্চনা গ্রহণের উপযুক্ত। শ্রেণীস্তরের দিক থেকে

নবশাখা গোষ্ঠী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের নিচে। নবশাখার নিচে আছেন অজলচল এবং অন্ত্যজেরা। উচ্চজাতি, নবশাখা এবং অন্ত্যজের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন হিতেশরঞ্জন সান্যাল তাঁর গ্রন্থে।[২৫] নবশাখা গোষ্ঠীর নিচে এবং অসৎ শূদ্রের উপরে যে গোষ্ঠী ছিলেন তাঁরা জলাচরণীয় হলেও তাঁদের গৃহে ব্রাহ্মণ পূজানুষ্ঠান করতেন না। কৈবর্ত বা মাহিষ্য এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। (এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, "কাস্ট অ্যান্ড সোসাইটি ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল")।[২৬]

ইতিপূর্বে আমরা সুলতানী-মুঘল যুগের জাতিবর্ণ প্রথা প্রসঙ্গে যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণগুলির কথা উল্লেখ করেছি তার মধ্যে ছিল খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল'। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর রচিত গ্রন্থে[২৭] জাতিস্তরের যে চিত্র পাওয়া যায় তা হলো গোলিক, গোপ, কামার, তাম্বুলি, কুম্ভকার, মালি, বারুই, নাপিত, আঘরি (আগুরি), মোদক, গন্ধবান্যা, শঙ্খবান্যা, কাঁসারি, সাপুড়ো, সুবর্ণবণিক, কৈবর্তধীবর, কলু, বাগদি, মাটিয়া, ছুথার (ছুতোর), পাটনি, চণ্ডাল, কিরাত, কোল,'চামার, ডোম, নাটুয়া। চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গ বিজয়' কাব্যেও[২৮] তৎকালীন জাতিগুলির একটি তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, বারুই, সৎশূদ্র গোপ, বারুই, তাম্বুলী, তৈলী, তাঁতী, মালী, নাপিত, মোদক, কুমার। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়[২৯] তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে তৎকালীন জাতিগুলির তালিকা দিয়েছেন। এই তালিকায় প্রারম্ভে ভারতচন্দ্র ছত্রিশটি জাতির কথা বলেছেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ আছেন উপরের স্তরে। তারপর আছেন বেণে, কাঁসারি, শাঁখারি, নাপিত, বারুই, কামার এবং অন্যান্য। জাতিবর্ণ স্তরের সর্বনিম্নে আছেন চণ্ডাল, বাগদী, হাড়ী, ডোম, মুচি, শুঁড়ি। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে প্রাপ্ত প্রকরণগুলির প্রত্যেকটিতেই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, গন্ধবণিক, তাম্বুলি, শঙ্খবণিকের উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে সুলতানী-মুঘল যুগে বাংলার রাজনীতিক গঠনের সঙ্গে জাতব্যবস্থার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

২৫ হিতেশরঞ্জন সান্যাল, 'সোসাল মোবিলিটি ইন বেঙ্গল', কলিকাতা, ১৯৮১।
২৬. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ৬৭।
২৭ সুকুমার সেন, 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী' : চণ্ডীমঙ্গল', নিউ দিল্লী, ১০৮২, পৃ. ৮০-৮১।
২৮. সুকুমার সেন (সম্পাদিত), 'গৌরাঙ্গবিজয়', এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৫৭, পৃ. ৩০-৩১।
২৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭০-১৭১।

কেন্দ্রীয় শাসনতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ মধ্যযুগেও কমই হয়েছে। জমিদার এবং স্থানীয় রাজারাই ছিলেন সর্বেসর্বা। তাদের নিজস্ব স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার বলেই তারা জাত ব্যবহার বিধি-নিষেধ ঠিকঠাক মানা হচ্ছে কিনা দেখতেন। প্রত্যেক জাতির ছিল একটি করে পঞ্চায়েত আর স্থানীয় রাজা বা জমিদার ছিলেন তার আওতাভুক্ত এলাকার সব জাত পঞ্চায়েতের প্রধান। অর্থাৎ জাত-সমাজের শৃংখলা রক্ষার ভার ছিল তাঁর উপর এবং এই কর্তৃত্ব বাস্তবে রূপায়িত হতো সামাজিক নেতৃত্বের এক উচ্চাবচ-স্তরবিন্যাসের মধ্যে দিয়ে। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও এই রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে জাত-সমাজের সভ্যদের একটি পৃষ্ঠপোষক-পোষ্যবৃন্দের (patron-client) সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। স্থানীয় রাজারাই কৃষির রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, পতিত জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা করতেন এবং কারিগর শ্রেণীরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। নির্মলকুমার বসুর মতে[৩০] এইভাবেই গড়ে উঠেছিল একটি সমবায়মূলক অর্থ-নীতি। জাতব্যবস্থাকে ভিত্তি করে গঠিত অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতার কোনো স্থান ছিল না। উচ্চবর্ণের আধিপত্য ছিল কিন্তু নিজ বৃত্তিতে নিয়োজিত থাকলে জীবনধারণের ন্যূনতম সংস্থানের অভাব ঘটত না কারুরই।

এখন প্রশ্ন হলো জাত ব্যবস্থার এই শৃংখলা কতটা কড়াকড়িভাবে মানা হতো? সমাজ-কাঠামোর জাতিগুলির স্থান কি চিরদিনের জন্যই অপরি-বর্তনীয়? বৃত্তি পরিবর্তন কি একেবারেই সম্ভব ছিল না? সামাজিক বিধি-নিষেধ মেনে চলায় চ্যুতি-বিচ্যুতি ঘটলে কী হতো? আসলে শাস্ত্র পড়ে সমাজটাকে যতটা অনড়-অচল মনে হয়, বাস্তবে তা ছিল না। সংকর জাতির উদ্ভব তত্ত্ব দেখলে মনে হতে পারে, অন্তর্বর্ণ বিবাহ সমাজে আদরণীয় না হলেও একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। ধর্মীয় নিয়মকানুন না মেনে জাতিচ্যুত হলেও স্মৃতিকারদের প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল না। বৃত্তি পরিবর্তন সম্বন্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিককার কোলব্রুক-এর মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে—কারণ এই সময়ে তিনি ব্রাহ্মণ সহ সমস্ত জাতির লোকেদেরই সমস্ত রকম বৃত্তিতে নিয়োজিত দেখেছিলেন। গোষ্ঠীগত বৃত্তি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে জাতকাঠামোয় স্থান পরিবর্তন ঘটাও সম্ভব ছিল তার প্রমাণ সামাজিক গতি-শীলতা বা সোসাল মোবিলিটি-র অস্তিত্ব, যা নিয়ে হিতেশরঞ্জন সান্যাল তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তিনি মোট চার প্রকার গতিশীলতার কথা বলেছেন।[৩১] প্রথমত কোনো নিম্নজাতির ব্যক্তি উচ্চজাতির গোষ্ঠীতে প্রবেশ করতে

৩০. নির্মলকুমার বসু, 'দ্য স্ট্রাকচার অফ হিন্দু সোসাইটি', ১৯৭৬।
৩১. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, ঐ, পৃ. ৪২-৪৫।

পারতেন, যেমন মৌলিকদের কুলীন গোষ্ঠীতে প্রবেশ। দ্বিতীয়ত কোনো একটি জাতি নিজের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে স্থান রেখেও উন্নীত হতে পারতেন। উদাহরণ স্বরূপ গন্ধবণিক, তাম্বুলিবণিক, নবশাখার মধ্যে থেকেও নবশাখাস্থিত বারুই বা ময়রার উচ্চে স্থান পেতেন। তৃতীয় উদাহরণ হিতেশরঞ্জন সান্যাল দিয়েছেন মধুনাপিতের। মূলত নাপিত গোষ্ঠী হলেও মিষ্টান্ন প্রস্তুতির মাধ্যমে বৃত্তি পরিবর্তন করে মধুনাপিতের জাত্যুৎকর্ষ ঘটেছিল। চতুর্থ এবং সর্বশেষ উদাহরণ হিসাবে লেখক নিয়েছেন গোপ (গোয়ালা) এবং তেলিদের। সদ্গোপ ও তিলি হিসাবে একত্র হয়ে এঁরা স্থান পেয়েছেন নবশাখা গোষ্ঠীতে। জাত্যুৎকর্ষের অর্থাৎ উন্নীতকরণের আরেকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ভূমিজদের মধ্যে। মূলত ভূমিহীন কৃষক হলেও পরে অনাবাদিত জমি চাষ করে জমিদার হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে এঁরা ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি করেছেন। সামাজিক গতিশীলতার প্রসঙ্গ শেষ করে আমরা সংসার জাতিবর্ণপ্রথার সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারের ও জনপ্রিয়তার কথা আলোচনা করছি।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব এবং ভক্তি আন্দোলন। শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ভক্তিধর্ম স্মৃতি-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূলে কুঠারঘাত করে। ভক্তিই ঈশ্বর-প্রেমের পথ এবং ভক্তির পথে জাতিভেদের কোনো স্থান নেই—এটা ছিল শ্রীচৈতন্যের বাণী। বস্তুত সমাজের নিম্নস্তরের কাছে এই ভক্তিধর্ম বিশেষভাবে সমাদৃত ছিল। সদ্গোপ, তিলি, ভূমিজ ইত্যাদি জাতি সক্রিয়ভাবে বৈষ্ণবধর্ম পালন এবং প্রচার করেন। চৈতন্য-জীবনীকার গোবিন্দদাস ছিলেন জাতিতে কর্মকার। চৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম নিম্নজাতির মধ্যে সামাজিক এমনকি অর্থনৈতিক সংহতি আনতে পেরেছিল, এ-মত প্রচলিত। চৈতন্যজীবনীকারদের রচনা পড়লেই প্রমাণ হয় যে, চৈতন্যের আবির্ভাবের একটি সামাজিক প্রয়োজন ছিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রচারকে সামাজিক প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে দেখেছেন রমাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'বৈষ্ণবইজম ইন বেঙ্গল ১৪৮৬-১৯০০' শীর্ষক গ্রন্থে।[৩২]

চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম ছাড়াও বাংলার সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম, সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম, নাথধর্ম, তান্ত্রিক সাধনা ইত্যাদি ঐতিহ্যগুলি জাতিবর্ণ-প্রথার গঠন ও বিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

চারটি যুগাধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে আমরা জাতিপ্রথার যে বিবরণ দিয়েছি তার মূল বক্তব্য নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা যায়।

৩২ রমাকান্ত চক্রবর্তী, 'বৈষ্ণবইজম ইন বেঙ্গল, ১৪৮৬-১৯০০', কলিকাতা।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পাল-পূর্বযুগে বাংলার সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকলেও অন্যান্য বৃত্তিজীবীদের প্রাধান্যও বৃদ্ধি পেতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বৈদ্য ও কায়স্থদের পরবর্তীকালে সমাজে প্রভাবশালী জাতি হিসাবে স্বীকৃতির কথা উল্লেখ করা যায়। অর্থোৎপাদক শ্রেণীগুলির সঙ্গে সেই সেই যুগের পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের যোগ ছিল। এই প্রসঙ্গে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় সেন যুগের তাম্রলিপিতে। সেন যুগের তাম্রলিপিতে পণ্যদ্রব্য হিসেবে সুপুরি ও বারজের উল্লেখ আছে। বস্তুত পরবর্তীকালে সুপুরী ও বারজ ব্যবসায়ীরাই আম্বুলী ও বারুই জাতি হিসাবে আবির্ভূত হন। বাংলার জাতিব্যবস্থার আপেক্ষিক উদারতার[৩৩] কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় নদীবহুলতা, ও ধর্মবিশ্বাসের বহুমুখিতা। আপেক্ষিক উদারতারই আরেকটি নামকরণ করা যায় সামাজিক গতিশীলতা। এই গতি-শীলতার জন্যই সময়-সময় নিচের স্তরের কোনো কোনো গোষ্ঠী উপরের স্তরে স্থান পেয়েছে। এই দিয়ে নিচের স্তরের মানুষের অসন্তোষ প্রশমিত হয়েছে। জাতব্যবস্থার এই নমনীয়তাটুকু ছিল বলেই সম্ভবত মৌলিক অসাম্য সত্ত্বেও এই ব্যবস্থা টিঁকে ছিল।

৩৩. এম. এন. শ্রীনিবাস, 'সোসাল চেন্‌জ ইন মডার্ন ইন্ডিয়া', বোম্বাই, ১৯৭৭ দ্রষ্টব্য।

মধ্যযুগে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম এবং তার প্রভাব

রমাকান্ত চক্রবর্তী

১

মধ্যযুগে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসের অস্তিত্ব ছিল ; ছিল শৈব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম, নানান লোকধর্ম, নানান ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। গ্রাম্য সমাজে প্রচলিত ছিল বহু রকমের দেব-দেবীর পূজা, যেমন ধর্মপূজা, মনসাপূজা, চণ্ডীপূজা, শীতলা ও ষষ্ঠীদেবীদের পূজা ; ছিলেন পঞ্চানন্দ, ব্রহ্মদৈত্য, বাবাঠাকুর, ছিলেন পীর। সবার উপরে ছিল ব্রাহ্মণ্য স্মার্ত সংস্কার এবং কৃত্যসমূহ, যা সম্ভবত সেন রাজাদের সময় থেকেই ধারানিবন্ধ হয়ে আসছিল।

এসব ধর্মবিশ্বাসের পরিমণ্ডলে বৈষ্ণব ধর্ম, চৈতন্যের এবং তাঁর অনুগামী-দের কিছুটা সংগঠিত ক্রিয়া-কলাপের ফলে, বিশিষ্টতা অর্জন করে। মধ্যকালীন বঙ্গ-সংস্কৃতিকে বুঝতে হলে বৈষ্ণব ধর্মকে জানতে হয় ; বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিভঙ্গির, এবং জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার।

২

চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বৈষ্ণব বর্ণের একাধিক স্তর ছিল।[১] গুপ্ত-সম্রাটদের সময় থেকে বৈষ্ণব ধর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৈষ্ণব উপাসনা পঞ্চোপাসনার অঙ্গ হলো ; অর্থাৎ, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য উপাসনার মধ্যে বৈষ্ণব উপাসনাও বিশিষ্ট হয়ে উঠল। তার আগেই প্রচারিত হয়েছিল বৈষ্ণব অবতারবাদ। বৌদ্ধ বোধিসত্ত্বের মতো অবতারও অসংখ্য ; কিন্তু তাঁদের মধ্যে প্রধান দশাবতার : এবং দশাবতারের মধ্যে একজন বুদ্ধদেব। বৈষ্ণবরা অন্যান্য প্রধান ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে যথেষ্ট সহনশীল ছিলেন। কলহ বিবাদের নিদর্শন থাকলেও, দেখা যায়, বৈষ্ণবরা অন্য ধর্মবিশ্বাসে উপাস্য দেবতাদের সঙ্গে সব

১. দ্রষ্টব্য : রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), 'দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল', প্রথম খণ্ড (পাটনা সংস্করণ, ১৯৭১), পৃ. ৪০০ ; শ্যামাচরণ চক্রবর্তী, 'দ্য বৈষ্ণব কাল্ট', রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, মনোগ্রাফ নং ৪, জুলাই ১৯৩০ ; এস. সি মুখার্জি, 'এ স্টাডি অফ বৈষ্ণবিজম ইন এনসিয়েন্ট এ্যান্ড মিডিয়াভাল বেঙ্গল', কলিকাতা, ১৯৬৬।

সময়ে আপসের চেষ্টা করেন ; যেমন : ইন্দ্রের ছোটো ভাই উপেন্দ্র অথবা কৃষ্ণ ; সূর্য আসলে বিষ্ণু ; সাযুয্য-গ্রন্থিত হরিহর ; বুদ্ধাবতার ; বৈষ্ণব ব্যূহবাদের সামঞ্জস্য ; ইত্যাদি। শিলালেখ এবং তাম্রলেখসমূহ থেকে জানা যায় যে, গুপ্তযুগ থেকে শুরু করে সেনযুগ পর্যন্ত বাংলাদেশে বৈষ্ণব অবতার-পূজার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল। বিশেষভাবে স্থানীয় আমলাতন্ত্র, এবং পূর্ববঙ্গে কোথাও কোথাও কৃষকগণ অবতারদের উপাসনা করতেন। অবতার পূজার প্রভাবে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কিছুটা কমে যায়।[২] তারণকর্তারূপে বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর কোনো অবতার, যথা নৃসিংহ বরাহ, কিংবা কৃষ্ণ, জনপ্রিয় হন।

বৈষ্ণব ধর্ম উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ঐতিহ্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। বুদ্ধকে অবতার-রূপে গ্রহণ করলেও, বৈষ্ণবরা কখনো বৌদ্ধধর্মের নামে দৈত্য-পূজা মানেন নি। ওদিকে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণরা নাথসিদ্ধবৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত শৈব-শাক্ত ধর্মকে 'পাষণ্ড' মতবাদরূপে বিচার করেন, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মকে মেনে নেন।[৩] একদিকে যেমন বৈষ্ণবরা অহিংসা এবং সদাচার পালনের মাধ্যমে উচ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণদের কাছে গ্রাহ্য হলেন, অন্যদিকে রামানুজাচার্যের চেষ্টায় বেদান্তের বৈষ্ণবীয় ব্যাখ্যা—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—প্রচারিত হলো। প্রায় একই সময়ে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত পৌরাণিকগণ সম্মিলিতভাবে রচনা করেন সমন্বয়মূলক 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' এবং পরে 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'। এ-সব পুরাণে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব কাহিনী সমূহ সমন্বিত, সংশ্লিষ্ট। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক পুরাণও রচিত হলো, যেমন, বৈষ্ণবদের 'ভাগবতপুরাণ', শৈবদের 'শিবপুরাণ', শাক্তদের 'দেবীপুরাণ', 'কালিকাপুরাণ'।

পুরাণের মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের মঞ্চে আবির্ভূত হলেন। বিষ্ণু উচ্চ দেবতা ; 'ত্রয়ী'র মধ্যে একজন। তাঁরই গোপবেশধারী এবং বংশীধর অবতার কৃষ্ণ, তিনি চিরকুমার ; তাঁর ব্যক্তিত্বের অঙ্গীভূত যৌন আকর্ষণ দুষ্প্রতিরোধ্য ; তিনি গোপীবল্লভ ; সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুর্ধর্ষ বীর, এবং দানবারি। যৌনতা ছিল তান্ত্রিক বৌদ্ধ ব্যবহারে ; ছিল শিবের লিঙ্গরূপী প্রতীকের পূজনে ; ছিল শক্তি তান্ত্রিক সাধনায়। কিন্তু যৌনতার এ-সব ভাববাদ, এবং তার উপরে প্রতিষ্ঠিত 'রহস্যজনক পদ্ধতি', সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল কি-না সন্দেহ। সম্প্রতি রামশরণ শর্মা দেখিয়েছেন যে, যৌন তান্ত্রিকতার প্রধান

২. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, "বিক্রমপুরের প্রাচীন ভাস্কর্য কীর্তি", যোগেশনাথ গুপ্ত সম্পাদিত 'বিক্রমপুর', ১৩২০ (১৯১৩), পৃ. ১৮৪।

৩. দ্রষ্টব্য : বল্লালসেন, 'দানসাগর' (ভবতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৫৫, ১, পৃ. ৬-৭।

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন উম্মার্গগামী কিছু রাজাগজা ধরনের লোক।[৪] তাঁদের অর্থেই নির্মিত হয় খাজুরাহোর, এবং কনার্কের মন্দির। কিন্তু কৃষ্ণ ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি প্রধানত প্রেমিক; এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্রম-বর্ধমান দুর্বলতার ফলে দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামীণ সমাজের রক্ষক। তারপরে তিনি দেবতা। এভাবে পরিকল্পিত অন্য কোনো দেবতা ছিলেন না। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'প্রেমিক' কৃষ্ণের প্রভাব যতই বাড়তে থাকল, শিব ততই বৃদ্ধ, অকর্মণ্য, স্ত্রী-নির্জিত কৃষকরূপে পরিস্ফুট হতে থাকলেন। চণ্ডী থেকে উৎসারিত হলেন মনসা, শীতলা, বাসুলি, ষষ্ঠী, বনবিবি, পোড়া মা। শিবের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন ধর্ম। কিন্তু, প্রেমিক কৃষ্ণের কোনো রূপান্তর ঘটল না; অবহট্ট সাহিত্য কৃষ্ণকথায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সম্ভবত তারই প্রভাবে জয়দেব উপহার দিলেন তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি 'গীতগোবিন্দ'; বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণব কবিতা লিখলেন প্রায় একাত্তর জন কবি।[৫]

ক্রমবর্ধমান যৌনভাবাত্মক তান্ত্রিকতা; দেবতার নাম করে, স্মৃতিশাস্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আদিরসাত্মক কাব্য রচনা; শিল্পে মৈথুন প্রদর্শন; ধর্মের নামে ব্যভিচার; এ-সব, ঐতিহাসিক পানিক্কারের মতে, ছিল হিন্দু-সভ্যতার শোচনীয় অবক্ষয়ের লক্ষণ।[৬] তারই সুযোগ নিলেন মূর্তিধ্বংসী ধর্মের নামে অনুপ্রাণিত বৈদেশিক মুসলমানগণ; সহজেই তাঁরা ভারতে আধিপত্য বিস্তার করলেন। আরও একজন ঐতিহাসিক 'হিন্দু'-ভারতের পতনের জন্য বৌদ্ধ, জৈন, এবং বৈষ্ণব 'অহিংসা'কে দায়ী করেছেন। এই মত অবশ্য বিতর্কিত।[৭]

৩

পৌরাণিক কৃষ্ণতত্ত্বে কৃষ্ণের যৌনতা পরিত্যক্ত হলো না; কিন্তু সেখানে দুটি কথা প্রাধান্য পেল, যথা: ক. বৈষ্ণব ধর্ম শাস্ত্রবিরোধী নয়; খ. কৃষ্ণপ্রেমের ভক্তির ব্যাখ্যাও দেওয়া যায়। শাস্ত্রানুমোদিত বৈষ্ণব ধর্ম কর্মকাণ্ডের উপরে

৪. রামশরণ শর্মা, "মেটেরিয়াল মিলিউ অফ তান্ত্রিকিজম" ('ইন্ডিয়ান সোসাইটি: হিস্টরিকাল প্রোবিংস: ইন মেমারি অফ ডি. ডি. কোসম্বী', আর এস শর্মা ও বিবেকানন্দ ঝা সম্পাদিত, নিউ দিল্লী, ১৯৭৪)।
৫. বিষয়টির আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: রমাকান্ত চক্রবর্তী, 'বৈষ্ণবিজম ইন বেঙ্গল, ১৪৮৬-১৯০০', কলিকাতা, ১৯৮৫ (পরে সংক্ষিপ্ত 'ভি. আই. বি'), পৃ. ৫-১৩।
৬ কে. এম. পানিক্কর, 'এ সার্ভে অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি' কলিকাতা, ১৯৫৪, পৃ. ১০৪।
৭. সি. ভি. বৈদ্য, 'ডাউনফল অফ হিন্দু ইন্ডিয়া' (পুনঃ প্রকাশ, দিল্লী, ১৯৮৬), পৃ. ৪০০-৪০৩। আরো দ্রষ্টব্য: মুল্করাজ আনন্দের 'মিথুনশিল্প' সম্পর্কে সপ্রশংস মূল্যায়ন: মুল্করাজ আনন্দ, 'কামকলা', জেনিভা, ১৯৫৮, ভূমিকা।

প্রতিষ্ঠিত ; বৈষ্ণবাচার ও বৈষ্ণব পূজাপদ্ধতি বৈষ্ণব উপপুরাণসমূহে তালিকাভুক্ত এবং বর্ণিত হলো।[৮] কিন্তু যে-সব বৈষ্ণব আচার-বিচার পছন্দ করতেন না, অথচ যাঁদের কছে নিছক যৌনতাও অশ্রদ্ধেয় ছিল, তাঁরাই একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্ব উপস্থাপিত করলেন। সেটি হলো ভক্তি। ভক্তিমূলক সুবিখ্যাত পুরাণ, 'ভাগবতপুরাণ'। প্রচলিত ধারণা এই যে, এটি দাক্ষিণাত্যে রচিত হয়। বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৬৯) 'ভাগবতপুরাণে'র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।[৯] ত্রয়োদশ শতকে মিথিলার শিষ্ট-মন্ডলে এটি একটি 'উপপুরাণ' রূপে চিহ্নিত হয়।[১০] 'ভাগবতপুরাণে'র বিখ্যাত টীকাকার ছিলেন শ্রীধর স্বামী ; কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে তিনি বাঙালী ছিলেন।[১১] কিন্তু বাংলা দেশে, প্রযৌক্তিক অর্থে, ভক্তির তত্ত্ব তেমন জানা ছিল না। 'গীতা ভাগবত যে যে জনে পড়য়। ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাঁহার জিহবায়॥'—লিখেছেন চৈতন্যের অমর জীবনীকার বৃন্দাবন দাস।[১২]

বিদ্যাপতি, মিথিলার বিখ্যাত কবি, ব্রজবুলি ভাষায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক চমৎকার পদাবলী রচনা করেছিলেন।[১৩] সে-পদাবলী পরবর্তী পদকর্তাদের আদর্শ হয়ে রইল। কেউ কেউ বলেন, বিদ্যাপতি ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন না ; ছিলেন 'পঞ্চোপাসক'। কিন্তু যে হৃদয়-বিদারক ভক্তি নিয়ে 'দয়া'র জন্য বিদ্যাপতি মাধবের কাছে 'বহুত মিনতি' করেছেন, তাতে তাঁর বৈষ্ণবীয় মনোভাবই প্রকটিত হয়েছে। মিথিলার হিন্দুধর্মের পরিমন্ডলে যেমন ভক্তির অন্তর্নিহিত বিদগ্ধতা সম্মাননীয় হয়ে ওঠে, বাংলাদেশে ঠিক তা হয় নি। এখানে তান্ত্রিক দেবী বাসুলি পূজার অনুষ্ঠানরূপে অশ্লীল গান করা হতো রাধাকৃষ্ণের নামে। তাই দেখা যায় ১৯১৬-তে আবিষ্কৃত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'।[১৪] এ-পুঁথির রাধাকৃষ্ণ বিদ্যাপতির রাধা-কৃষ্ণ নন। এখানে

৮. বৈষ্ণব উপপুরাণ প্রসঙ্গে : আর. সি হাজরা, 'স্টাডিস অন দা বৈষ্ণব উপপুরাণস', কলিকাতা, ১৯৫৮, প্রথম খণ্ড ; ভি আই. বি, পৃ: ১০।

৯. দানসাগর, ১, পৃ: ৬ (দ্রষ্টব্য নং ৩)।

১০. সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী (সম্পাদিত), 'বর্ণরত্নাকর অফ জ্যোতিরীশ্বর, ববুয়া মিশ্র', কলিকাতা, ১৯৪০, পৃ: ৬০।

১১ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, "শ্রীধর স্বামীর কুলপরিচয় ও কালনির্ণয়" ('প্রবাসী' ১৩৫৮, মাঘ), পৃ: ৪১১-৪১৪।

১২. মৃণালকান্তি ঘোষ (সম্পাদিত), 'বৃন্দাবন দাস : শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত'। কলিকাতা, ১৩৫৬, ষষ্ঠ সং, পৃ: ১২ (অতঃপর, চৈ-ভা)।

১৩. নগেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমানবিহারী মজুমদার (সম্পাদিত), 'বিদ্যাপতির পদাবলী সংগ্রহ', কলিকাতা, ১৯৫২।

১৪. বসন্তরঞ্জন রায় (সম্পাদিত), বড়ু চণ্ডীদাস : শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন', কলিকাতা, ১৯১৬।

কৃষ্ণ রিরংসায় উন্মত্ত গ্রাম্য যুবক। রাধা লজ্জিতা, সন্ত্রস্তা, গ্রামের মেয়ে। বহু রকমের সুরের ও তালের উল্লেখ করেছেন বড়ু চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাসের পরিচয় নিয়ে বিতর্কের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। এখানে তার আলোচনার স্থান নেই। নিদেনপক্ষে দু-জন বিশিষ্ট চণ্ডীদাস তো ছিলেনই, যথা: পূর্বোক্ত বড়ু চণ্ডীদাস, এবং সহজিয়া পদাবলীর রচয়িতা চণ্ডীদাস। দ্বিতীয় চণ্ডীদাস অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। তাঁরই বিখ্যাত কথা: 'শুনহ মানুষ ভাই / সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই॥' এখানে 'মানুষ' কথাটির একটি সহজিয়া তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা আছে; তা ধরা না হলেও, এই ঘোষণায় মানবতার যে জয়ধ্বনি শোনা যায়, তার তুলনা নেই।

বৈষ্ণবতার সামাজিক/ভৌগোলিক অর্থে নিম্নস্তরে ভক্তি প্রথমে না থাকলেও, পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে তার লক্ষণ দেখা যায়। সেই শতকের সপ্তম দশকে মালাধর বসু 'ভাগবতপুরাণ'-কে অবলম্বন করে রচনা করেন 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়'।[১৫] মালাধর ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী; বাড়ি ছিল বর্ধমানের কুলীনগ্রামে, এবং জাততে ছিলেন কায়স্থ। চৈতন্যের জন্মের কিছু পরে মালদহের রামকেলি গ্রামের চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য রচনা করেন 'হরিচরিতম্'[১৬]। এ-কাব্যেও ভক্তি স্পষ্ট। মনে হয়, ভক্তি তিন ধরনের লোকের মধ্যে ধীরে ধীরে এসেছিল, যথা: ক. উচ্চপদস্থ, উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চজাতির লোক, যিনি প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নূতন কোনো অর্থ খুঁজে পান নি; খ. উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতজ্ঞ, উচ্চ বর্ণের লোক, যিনি 'ভাগবতপুরাণে' কৃষ্ণকাহিনীর নূতন কাব্যিক আদর্শ খুঁজে পেলেন; এবং গ. অবস্থাপন্ন শিক্ষিত নাগরিক, যিনি প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ এবং প্রচলিত লোকধর্ম পূর্ণভাবে সমর্থন করতে পারেন নি।

৪

বৈষ্ণব ভক্তি একটি সদর্থক এবং ধর্মীয়-সামাজিক অর্থে প্রগতির সহায়ক মতাদর্শ রূপে উপস্থাপিত এবং প্রচারিত হয়েছিল। ভক্তির যুক্তি-রূপে সমকালীন

১৫. নগেন্দ্রনাথ মিত্র (সম্পাদিত), 'মালাধর বসু: 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', কলিকাতা, ১৯৪৪।
১৬. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য: 'হরিচরিতম্', কলিকাতা, ১৯৬৭।

চৈতন্য-জীবনীকারগণ প্রচলিত সংস্কৃতির তীব্র সমালোচনা করেন।[১৭] তাঁদের বিবরণে এবং পরবর্তীকালে সংগ্রহ করা বিভিন্ন তথ্যের আলোকে, কতকগুলো সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একজন গৌরপদ রচয়িতা লিখেছিলেন যে, চৈতন্যের আবির্ভাবকালে ষড়্‌রিপুর প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়; ভক্তি প্রচার করে চৈতন্য যে শুধু পাপীদের উদ্ধার করেন, তাই নয়; সাধারণ 'জীব'দেরও উদ্ধার করেছিলেন।[১৮] বৃন্দাবন দাস লিখেছেন যে, ধনীদের কোনো উচ্চ আদর্শ ছিল না; তাঁরা তাঁদের অর্থ বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করতেন।[১৯] যাকে লোকধর্ম বলা হয়, তার ভিত্তি ছিল যাদুবিশ্বাস, এবং তার আচার-অনুষ্ঠান ছিল মদ্য মাংস ব্যবহারের ফলে নিন্দনীয়।[২০] নবদ্বীপের হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি ছিল প্রশ্নাতীত, এবং তাঁরা সর্বদা নিজেদের বর্ণ-ভিত্তিক অধিকারের উপরেই জোর দিতেন। তার কারণ ছিল এই যে, এককালে রাজাদের ও সামন্তদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র বাংলাদেশে ব্রাহ্মণদের যেসব উপনিবেশ গড়ে ওঠে, মুসলমানদের রাজত্ব কায়েম হওয়ার ফলে সেগুলো লুপ্ত হয়ে যায়।[২১] সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণরা পূর্বে অন্যান্য যে-সব সুযোগ-সুবিধা পেতেন (যেমন মন্ত্রীত্বের পদ

১৭. মণীন্দ্রনাথ গুহ (সম্পাদিত), 'কবি কর্ণপুর: 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্', পানিহাটি, ১৯৭১, মৃণালকান্তি ঘোষ (সম্পাদিত), 'মুরারি গুপ্ত: শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্', কলিকাতা, ১৯৪৫, চতুর্থ সং; বৃন্দাবন দাস, প্রাগুক্ত (চৈ-ভা); শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ: শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', অম্বিকা-কালনা, ১৯২৩ (কালনা সংস্করণ রূপে বিখ্যাত); মৃণালকান্তি ঘোষ (সম্পাদিত) 'লোচন দাস: চৈতন্যমঙ্গল', কলিকাতা, ১৯৪৭, তৃতীয় সং; বিমানবিহারী মজুমদার, সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'জয়ানন্দ: চৈতন্যমঙ্গল', কলিকাতা, ১৯৭১; দীনেশচন্দ্র সেন ও বনোয়ারীলাল গোস্বামী (সম্পাদিত), গোবিন্দদাসের কড়চা', কলিকাতা, ১৯২৬; সুকুমার সেন (সম্পাদিত), 'চূড়ামণি দাস: গৌরাঙ্গ বিজয়', কলিকাতা, ১৯৫৭।

১৮. জগদ্বন্ধু ভদ্র ও মৃণালকান্তি ঘোষ (সম্পাদিত), 'গৌরপদতরঙ্গিণী', কলিকাতা. ১৩৪১, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথন তরঙ্গ, দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস, গৌরাবতার ঐশ্বর্য ও মাধুর্য,' পৃ ১৮-৩৬; ২৪১। 'বাসুদেব ঘোষ ভনে / কাঁদ শশী কি কারণে / জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী।।'

১৯. 'চৈ-ভা', পৃ. ৩৩। 'জগৎ প্রমত্ত ধনপুত্র বিদ্যারসে। দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সবে উপহাসে।। তারে বলে সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে। দশ বিশ জন যার আগে পিছে চলে।।'

২০. 'চৈ-ভা', পৃ. ১২। 'বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে। মদ্য-মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে।'

২১ দ্রষ্টব্য: পুষ্পা নিয়োগী, 'ব্রাহ্মণিক সেটলমেন্টস ইন ডিফারেন্ট সাবডিভিশনস অফ এনসিয়েন্ট বেঙ্গল', কলিকাতা, ১৯৬৭।

লাভ) তাও রইল না। বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ হয়ে যদি সুলতানদের দরবারে মন্ত্রিত্ব লাভ হতো তবুও সেই ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে মুসলমান-সংসর্গের অভিযোগ আনা অসম্ভাব্য ছিল না ; সনাতন গোস্বামী শুধু একারণেই প্রায় অচ্ছুৎ ছিলেন।[২২] এ-অবস্থায়, বর্ণভিত্তিক ধর্মীয় অধিকারসমূহের, এবং ব্রাহ্মণদের অগ্রাধিকারের তত্ত্ব সমকালীন স্মৃতিতে বিশিষ্ট স্থান পেল। চৈতন্যের সমকালীন বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন এমন কথাও বললেন যে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া অন্য কোনো জাতি নেই ; এবং, তাঁর মতে শূদ্রের প্রধান কৃত্যই হলো 'দ্বিজশুশ্রূষা'।[২৩] স্মার্তমতে স্ত্রীলোকদের এবং শূদ্রদের বেদমন্ত্র পাঠের অধিকার ছিল না।[২৪] এখানকার মতো তখনও শূদ্রদের সংখ্যাই ছিল বেশি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সুশিক্ষিত, সমৃদ্ধ, সম্ভ্রান্ত, এবং ধনী। জমিদারদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন কায়স্থ, অথবা শূদ্র।[২৫] তাঁদেরই পৃষ্ঠ-পোষকতায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বিবর্ধিত হয়েছে। তাঁরা এ-সব বিধান মানবেন কেন ?

প্রচলিত স্মৃতির বিধানসমূহে লোকধর্ম সম্পর্কে অবশ্য কিছুটা উদারতা দেখা যায়। শাবরোৎসব, মনসাপূজা, বাসুলিপূজা, যক্ষপূজা, বিভিন্ন আঞ্চলিক ব্রতপার্বণ ব্রাহ্মণরা মেনে নিয়েছিলেন। শৈব শাক্ত বৈষ্ণব ধ্যানধারণার প্রভাব ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিতে স্পষ্ট। আঞ্চলিক/লৌকিক ধর্মানুমোদিত আচার-অনুষ্ঠানসমূহ প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুধর্মের অঙ্গরূপে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছেন, বলা যায়।[২৬] কিন্তু তাতে সামাজিক সংহতি জোরদার হয় নি। বর্ণভেদমূলক সমাজ-ব্যবস্থায় সামাজিক সংহতি থাকে না ; থাকে শুধু একটা ধর্মের আবরণ। হিন্দুধর্ম ছিল সেই আবরণ মাত্র।

২২. সনাতন ছিলেন 'দবীর খাস', অথবা প্রাইভেট সেক্রেটারি। দ্রষ্টব্য : 'চৈ-ভা', মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৯৫। রূপ এবং সনাতন চৈতন্যকে বলেন : 'নীচ জাতি, নীচ সঙ্গে করি নীচ কাজ…ম্লেচ্ছ জাতি, ম্লেচ্ছ সঙ্গী, করি ম্লেচ্ছ কর্ম। গোব্রাহ্মণ-দ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম।'

২৩. বেণীমাধব দত্ত (সম্পাদিত), রঘুনন্দন : 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি', "শূদ্রাহ্নিকাচার তত্ত্বম্"। কলিকাতা, পৃ. ৫০৪।

২৪. শূদ্রাহ্নিকাচারতত্ত্বম্, পৃ. ৫০৪।

২৫. যদুনাথ সরকার (সম্পাদিত), 'আবুল ফজল : আইন-ই-আকবরী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৪৩, ১৪৫।

২৬. কমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ (সম্পাদিত), 'গোবিন্দানন্দ : বর্ষক্রিয়া কৌমুদী,' কলিকাতা, ১৯০২, রঘুনন্দন, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, 'কৃত্যতত্ত্বম্', এবং 'ভি. আই. বি', পৃ. ৩২-৩৪।

রক্ষণশীল সমাজে চিন্তাধারা রক্ষণশীল হয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় নূতন চিন্তার উন্মেষ ছিল অভাবনীয়। সেখানে সমস্ত জোর এসে পড়ে স্মৃতি, ব্যাকরণ আর নব্যন্যায়ের উপরে। স্মৃতি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের বিধানসমূহের উদ্দেশ্যমূলক সংকলন, এবং উদ্দেশ্য-সম্ভূত তার ব্যাখ্যা। ব্যাকরণ—সর্বাংশে সংস্কৃত ; ফলত বঙ্গভাষা ব্রাহ্মণ্য সমাজে অবহেলিত। আর প্রসিদ্ধ নব্যন্যায়—যা মিথিলাতে উদ্ভাবিত হয়—'তর্ক-কর্কশ' পরিভাষায় আচ্ছন্ন। এই পরিভাষা আয়ত্ত করাই ছিল কঠিন ব্যাপার। নব্যন্যায়ের সুবিখ্যাত অধ্যাপকদের কোনো সামাজিক মত ছিল না। এ-সব তথ্য চৈতন্যের সমকালীন বঙ্গীয় হিন্দু-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীলতার এবং অচলতার প্রমাণ।

এমন মনে হতে পারে যে বাংলাদেশে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সেখানে হিন্দু সংস্কৃতির অগ্রগতি অবরুদ্ধ হয়। কোনো কোনো জায়গায় হিন্দু মন্দির ভাঙা হয় ; বহু অঞ্চলে হিন্দুদের মুসলমান করা হয়। গাজি ও মোল্লাদের প্রভাব বৃদ্ধি পেল। কোনো কোনো সুযোগসন্ধানী অভিজাত হিন্দু সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য মুসলমান হলেন।[২৭] এ-সবই তর্কাতীত। কিন্তু এ-সম্পর্কে আরও তথ্য আছে যা বিচার্য। প্রথমত, মুসলমানগণ কখনো বাঙালি সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ করেন নি। একাধিক সুলতান বঙ্গভাষার পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। দ্বিতীয়ত, শাসনের ক্ষেত্রে, সামরিক ব্যবস্থায়, হিন্দুদের বিশিষ্ট স্থান ছিল ; এ কথা ভুলি কী করে যে, হিন্দু জমিদার গণেশ (ঐতিহ্য অনুসারে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ) সুলতানি আমলেই বাংলার 'রাজা' হয়েছিলেন ? কোনো হিন্দু গণ-বিদ্রোহের মাধ্যমে তিনি রাজা হন নি। রাজা হয়েছিলেন দরবারি রাজনীতির সূত্র ধরে। তৃতীয়ত, এ-প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, যাদের মুসলমান করা হয়েছিল, তারা কি হিন্দু/বৌদ্ধ ছিল ? 'হিন্দু'-শব্দটির যে পারিভাষিক ব্যঞ্জনা আছে তা প্রচলিত পাথরপুজো এবং আঞ্চলিক পুজো-পার্বণের সব কিছু সম্পর্কে প্রযোজ্য ছিল কি ? একাধিক স্মৃতি-নিবন্ধে হিন্দু 'কৃত্য' এবং সংস্কার বর্ণিত হয়েছে। তার বাইরে যে-সব পুজো-পার্বণ ছিল, সেগুলো কি স্মৃতিসম্মত, কিংবা শাস্ত্র-সম্মত ছিল ?[২৮] তাছাড়া ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা

২৭. দুয়ার্ট বারবোসা, 'দ্য বুক' (অনুবাদ : এম. এল. ডেমস), লন্ডন, ১৯১৮, দুই খণ্ড, খণ্ড ২, পৃ. ১৪৭-৪৮।

২৮. দ্রষ্টব্য : বিনয়কুমার সরকার, 'বাংলায় দেশী-বিদেশী : নব্য সংস্কৃতির লেনদেন', কলিকাতা, ১৯৪২।

জানা যায় না।[২৯] সবচেয়ে বড়ো কথা, চৈতন্যের জীবনীসমূহে কোথাও কোথাও মুসলমানদের অত্যাচারের কথা থাকলেও, তার উপরে বিশেষ কোনো জোর দেওয়া হয় নি। জোর দেওয়া হয়েছে হিন্দু সমাজের এবং হিন্দু ধর্মের অবক্ষয়ের উপরে।

৫

অনেকক্ষেত্রেই অর্থনীতির সঙ্গে ধর্মীয় ঘটনার অথবা ধর্মসংস্কারের সংযোগ থাকে ; যেমন, পশ্চিম ইউরোপে পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে প্রটেস্টান্ট ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের যোগ ছিল।[৩০] কিন্তু, পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে চৈতন্যের আবির্ভাবকালে অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে ধর্মীয় ঘটনার সংযোগের বিষয়টি স্পষ্ট নয়। সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের সঙ্গে ধর্মের যোগসূত্র কিছুটা বোঝা যায়। বিশেষ বিশেষ শ্রেণী অথবা 'জাতি' চৈতন্যের ধর্মান্দোলনকে সমর্থন করে, হয়তো তার মধ্যে অর্থনৈতিক সংযোগের বিষয়টি গবেষিত হতে পারে। কিন্তু তাতেও কোনো স্থির উপপাদ্য থাকে না। একটি হিসাবে দেখা যায়, চৈতন্যের ৪৯০ জন পরিকরদের মধ্যে ২৩৯ জন ছিলেন ব্রাহ্মণ, ৩৭ জন ছিলেন বৈদ্য ; ২৯ জন ছিলেন কায়স্থ ; ২ জন মুসলমান, এবং ১৬ জন 'স্ত্রীলোক' ছিলেন।[৩১] পরবর্তীকালে অবশ্য 'শূদ্র' বৈষ্ণবদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এ-বিষয়টা পরে আলোচ্য। প্রথম দিকে পরিকরদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের সাংখ্যাধিক্য থেকে এ-সিদ্ধান্ত করা যায় যে, অন্তত নবদ্বীপের, শান্তিপুরের অনেক ব্রাহ্মণের চিন্তা-ভাবনা প্রচলনির্ভর ছিল না। সব ব্রাহ্মণই স্মৃতির এবং নব্য-ন্যায়ের গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যান নি।

চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে উচ্চ শ্রেণীর বৈষ্ণবদের নেতা ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। তিনি শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে-শান্তিপুরে এসেছিলেন। এই দুই নগরে শ্রীহট্ট থেকে আগত বৈষ্ণবরাই সক্রিয় ছিলেন। চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসেছিলেন। স্থানীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে বর্ধমানের

২৯. ঐ ; ই. সি. ডিমক, "হিন্দুইজম এ্যান্ড ইসলাম ইন মিডিয়াভাল বেঙ্গল", র‍্যাচেল ভ্যান বৌমার (সম্পাদিত), 'এ্যাসপেক্টস অফ বেঙ্গলী হিস্ট্রি এ্যান্ড সোসাইটি', নিউ দিল্লী. ১৯৭৬, পৃ. ১০। এখানে একটি পাদটীকায় বলা হয়েছে যে ১৬৫০ খৃীস্টাব্দে বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৮৬ লক্ষ, আর মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৪১ লক্ষ।

৩০. বিষয়টির আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : আর. এইচ. টনি. 'রিলিজিয়ন এ্যান্ড দ্য রাইজ অফ ক্যাপিটালিজম'. পেঙ্গুইন, পুনঃপ্রকাশ, ১৯৪৮।

৩১. বিমানবিহারী মজুমদার, 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান', কলিকাতা, ১৯৫৯। দ্বিতীয় সংস্করণ. পৃ. ৫৬৭ ; এখানে লক্ষণীয়, দাক্ষিণাত্যে শৈব-ভক্তি আন্দোলনেও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য এবং সংখ্যাধিক্য ছিল। দ্রষ্টব্য : কামিল জেবলেবিল, 'দ্য স্মাইল অফ মুরীগান', লাইডেন. ১৯৭৩, পৃ. ১৯২।

শ্রীখণ্ড গ্রামের, এবং কুলীনগ্রামের বৈষ্ণবদের সক্রিয়তার তথ্য পাওয়া যায়; শ্রীখণ্ডবাসী বৈদ্য নরহরি সরকার সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'গৌরাঙ্গ জন্মের আগে/ বিবিধ রাগিণীরাগে / ব্রজরস করিলেন গান ।।'[৩২]

নবদ্বীপের 'শ্রীহট্টিয়া' বৈষ্ণবদের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের অথবা ধর্মাবলম্বনের পূর্ব-ইতিহাস অজ্ঞাত। এ-প্রসঙ্গে মাধবেন্দ্রপুরী নামক সন্ন্যাসীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। তিনি ছিলেন কুমারহট্ট (কামারহাটি) নিবাসী সন্ন্যাসী ঈশ্বর পুরীর গুরু। অদ্বৈত আচার্যেরও গুরু ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী; নিত্যানন্দ অবধূতকেও তিনি বৈষ্ণব করেন ; তার আগে, অনুমান করি, নিত্যানন্দ শৈব অবধূত ছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরীর পরিচয় অজ্ঞাত। বিষ্ণুদাস আচার্য নামক এক ব্যক্তি অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য ছিলেন : বলা হয় তিনি ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীর পুত্র।[৩৩] মাধবেন্দ্র পুরী, গুরুপরম্পরা অনুসারে, চৈতন্যের 'পরমগুরু' ছিলেন ; অথচ পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁর কোনো খোঁজ রাখলেন না।

বৈষ্ণবরা প্রথমে বহু বাধা পেয়েছিলেন ; ভক্তিমূলক বৈষ্ণবীয় চিন্তাধারা 'ভট্টাচার্য'দের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আদৌ সমর্থিত হয় নি। এ-কারণে, বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, অদ্বৈত আচার্য ভীষণ রেগে যেতেন, এবং বিরোধীদের সম্পর্কে কটু মন্তব্য করতেন।[৩৪] সম্ভবত ব্রাহ্মণরা জ্ঞানকাণ্ড এবং কর্মকাণ্ড থেকে ভক্তিমার্গকে ক্ষুদ্র ভাবতেন। বৈষ্ণব মাত্রই ছিলেন উপহাসের পাত্র।[৩৫] কেন এমন হলো, তা বুঝবার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য জানা দরকার। ভক্তির উৎসরূপে 'ভাগবতপুরাণ' উল্লিখিত হয়েছে। এ গ্রন্থ ছাড়া অন্য দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ছিল 'নারদ ভক্তিসূত্র'[৩৬] এবং 'শাণ্ডিল্যসূত্র'।[৩৭] চৈতন্যের

৩২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'বৈষ্ণব পদাবলী,' কলিকাতা, ১৯৬১, ''রায়শেখর', পৃ. ৩০৩, পদ-১৪।

৩৩. হরিদাস দাস, 'শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান', নবদ্বীপ, ১৯৮৭, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সং, পৃ ১৩৭২, দ্রষ্টব্য : ফ্রেডহেলম হার্ডি, ''মহাদেবেন্দ্রপুরী : এ লিঙ্ক বিটউইন বেঙ্গল বৈষ্ণবিজম এ্যান্ড সাউথ ইণ্ডিয়ান ভক্তি'' ('জার্নাল অফ দ্য রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি', ১৯৭৪, নং ২)।

৩৪. 'চৈ-ভা', পৃ. ১৩। 'শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে। দিগম্বর হই সর্ব বৈষ্ণবেরে বোলে ।।' ইত্যাদি।

৩৫. 'চৈ-ভা', পৃ ৩৬। 'কুতর্ক ঘুষিয়া সব অধ্যাপক মরে। ভক্তি হেন নাম নাহি জানয়ে সংসারে ।। ...'দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সবে উপহাসে...আর্য্যা তর্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া...'

৩৬. দ্রষ্টব্য : নন্দলাল সিনহা (সম্পাদিত), 'ভক্তিসূত্রস অফ নারদ এ্যান্ড শাণ্ডিল্যসূত্রম্,' দিল্লী, পুনঃপ্রকাশ, তারিখ নেই।

৩৭. ঐ।

সময়ে বিষ্ণু পুরী নামক অবাঙালী বৈষ্ণব 'ভাগবতপুরাণে'র ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশক শ্লোকসমূহ 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী'-তে গ্রন্থিত করেন।[৩৮] তার পূর্বে রচিত হয় রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', বিখ্যাত বাঙালী পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতীর 'ভগবদ্ভক্তিরসায়ন', এবং জীব গোস্বামীর 'ভক্তিসন্দর্ভ'। 'ভাগবত-পুরাণ'-সহ এ-সব ভক্তি-গ্রন্থে আধ্যাত্মিক ভাবধারার সঙ্গে সামাজিক ভাবধারার সংমিশ্রণ দেখা যায়। ভক্তিবাদীদের মৌল বক্তব্য ছিল এইরূপ :[৩৯]

ক. ভক্তি প্রধানত ভক্তের চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ভক্তিমিশ্রিত চৈতন্য রহস্যবাদীভিত্তিক। তাই তার কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। ভক্তির সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করা সুকঠিন।

খ. ভক্তি সদাচারমূলক ; ভক্তির সাধনায় দুর্নীতির স্থান নেই।

গ. ভক্তি 'জ্ঞানবিচার' এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান-ক্রিয়াকাণ্ড বিরোধী।

ঘ. ভক্তি বর্ণাশ্রমধর্মের ঊর্ধ্বে।

ঙ. ভক্তির সাধনায় জাতিভেদ স্বীকৃত হয় না। এখানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপরে জোর দেওয়া হয়। সব ভক্তের মধ্যে সাম্য মানা হয়।

চ. ভক্তির তত্ত্বে, এবং সাধনায় গুরুর বিশেষ স্থান আছে।

ছ. ভক্তি ছিল প্রধানত সন্ন্যাসী এবং যতিদের ধর্ম। অন্তত ভক্তিতত্ত্ব তাই বলে।

জ. ভক্তির পাত্র/পাত্রী, দেব/দেবী ভক্তের 'ব্যক্তিগত' দেবতা।

রূপ গোস্বামী-সংকলিত 'পদ্যাবলী'তে ভক্তি সম্পর্কে বেশ কিছু সংস্কৃত-শ্লোক সংকলিত হয়েছে। কয়েকটি শ্লোকের ভাবানুবাদ নিচে দেওয়া হলো ; তা থেকে বৈষ্ণব ভক্তদের মনোভাব কিছুটা বোঝা যাবে।

ক. ভালো কাজ আর মন্দ কাজের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই ; শ্রীকৃষ্ণে আমার ভক্তি ক্রমশ গভীরতর হোক [তাহলে খারাপ কাজ করলেও আমার কিছু হবে না]। সর্পরাজ বিষও বমন করেন ; চাঁদ থেকে অমৃত পাওয়া

৩৮. এ. বি. (সম্পাদিত), 'বিষ্ণুপুরী : ভক্তিরত্নাবলী', এলাহাবাদ, ১৯১৮।

৩৯. দ্রষ্টব্য : জে. এন. ফারকুহার ও এইচ. ডি. গ্রীসওয়াল্ড, 'দ্য রিলিজিয়াস কোয়েস্ট অফ ইন্ডিয়া', অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২২, বুক ২, অধ্যায় ৫, পৃ. ১৬৫-১৭৯ ; টমাস জে. হপকিন্স্. "দ্য সোস্যাল টিচিংস অফ দ্য ভাগবত পুরাণম্", মিলটন সিঙ্গার (সম্পাদিত), 'কৃষ্ণ, মিথস, রাইটস এ্যান্ড এটিচিউডস', হনলুলু, ১৯৬৬, পৃ. ৩-২২ ; 'ভি. আই. বি.' পৃ. ৭১-৯০ ; উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ভক্তি আন্দোলনের জন্য দ্রষ্টব্য : কারিন শোমার ও এইচ. এইচ ম্যাকলিয়ড (সম্পাদিত), 'দ্য সেন্টস : স্টাডিস ইন এ ডিভোশনাল ট্রেডিশন অফ ইন্ডিয়া', দিল্লী, ১৯৮৭।

যায়। শিব বিষও বহন করেন, অমৃতও বহন করেন। কারণ, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। [বিষ্ণু পুরী রচিত][৪০]

খ. নানান রকমের ঔষধ খেলাম ; নানান নিয়ম মানলাম ; মৌনী হলাম ; বনে বাস করলাম ; শাস্ত্র কথা শুনলাম ; তীর্থে গেলাম ; তবু আমার বাসনার বিনাশ নেই। কিন্তু সামান্যভাবেও যখন গোবিন্দের পদকমলে মনঃসংযোগ করি, তখনি আমার বাসনা ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে।

[অজ্ঞাত কবি রচিত][৪১]

গ. জ্ঞান ও কর্ম মাপা হয় : কিন্তু ভক্তি, আর কৃষ্ণ নামের শক্তি মাপা যায় না। [শ্রীধর স্বামী][৪২]

ঘ. নীতিবাগীশদের মতে আমি মোহগ্রস্ত ; বেদবাদীদের মতে আমি ভ্রান্ত ; বন্ধুরা বলেন, আমি বাজে লোক ; আমার ভাইরা আমাকে নির্বুদ্ধি ভেবে ভালবাসে না। ধনীদের ধারণা, আমি পাগল। বিবেকী লোকদের মতে আমি দাম্ভিক। (তবুও) আমার ভক্তি এতই দৃঢ় যে, মুহূর্তের জন্যও কৃষ্ণপদকমলের চিন্তা ত্যাগ করতে পারি না। [মাধব রচিত][৪৩]

ঙ. কণাদের দর্শন পড়েছি ; ন্যায়শাস্ত্র আমার জানা আছে। মীমাংসাও জানি ; জানি সাংখ্য। যোগশাস্ত্রের সঙ্গেও আমি পরিচিত। যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে বেদান্তের চর্চা করেছি। এ সবের কোনোটাই আমার চিত্তকে তেমন আকর্ষণ করে না, যেমন করে কোনো এক নন্দের ছেলের বাঁশরী বাদনের মাধুরী-ধারা। [বাসুদেব সার্বভৌম][৪৪]

এ রকমের আরও অনেক শ্লোক 'পদ্যাবলী'তে আছে। বাসুদেব সার্বভৌম যে চৈতন্যের সঙ্গে পুরীতে তাঁর সাক্ষাৎকারের পূর্বেই বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন, তা জানা গেছে।[৪৫] তিনি সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর শ্লোকে অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশিত। এই সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত

৪০. রূপ গোস্বামী, 'পদাবলী', বহরমপুর সং, দ্রষ্টব্য, পৃ. ১২-১৬, ২১ ২২, ৮৬, ৯৮-৯৯ ইত্যাদি।

৪১. তদেব, পৃ. ১৫-১৬।

৪২. তদেব, পৃ. ২১-২২।

৪৩. তদেব, পৃ. ৮৬।

৪৪. তদেব, পৃ. ৯৮-৯৯।

৪৫. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'বাঙালীর সারস্বত অবদান : বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা,' কলিকাতা, ১৯৫১, প্রথম খণ্ড, হেত্বাভাস প্রকরণ, পৃ. ৩৮।

থেকেই বোঝা যায়, বুদ্ধিজীবী-ভক্তগণ ভক্তির উচ্ছ্বাসের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিকে চেপে রাখেন।

৬

চৈতন্য [সংসারাশ্রমে গৌরাঙ্গ নামে পরিচিত] (১৪৮৬-১৫৩৩) বৈষ্ণব ভক্তিকে জনচিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রাষ্ট্রের, অর্থনীতির, এবং সমাজব্যবস্থার মধ্যযুগীয় অবস্থায় আমাদের দেশে কোনো ধর্মনিরপেক্ষ, রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক উদারনীতির উদ্ভাবনার ক্ষেত্র ছিল না। তাই ধর্মীয় আন্দোলনের মাধ্যমে, ভক্তির সূত্র ধরে, এক ধরনের ধর্মীয়-সামাজিক উদারনীতি চৈতন্য এবং তাঁর পরিকরদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে প্রচলিত বৈষ্ণবতার কতক-গুলো বিশিষ্ট ধারার কথা বলা হয়েছে। চৈতন্য এবং তাঁর পরিকরগণ এসব ধারার সংমিশ্রণ ঘটাবার চেষ্টা করেন নি। তাঁরা ভক্তির সঙ্গে 'ভাগবতপুরাণে' বর্ণিত কৃষ্ণলীলা কাহিনীর মিশ্রণ ঘটালেন। তার কারণ ছিল এই যে, কৃষ্ণকাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

ভক্তির প্রচারের জন্য চৈতন্য যে-সব কাজ করেন, নিচে তা সাজিয়ে দেওয়া হলো।

ক. চৈতন্যের নেতৃত্বে নবদ্বীপে একটি প্রভাবশালী বৈষ্ণব-গোষ্ঠী সংগঠিত হলো।

খ. 'মহান্ত'দের সংগঠন সম্ভবত চৈতন্যের নেতৃত্বে করা হয়।

গ. তিনি ঘরে ঘরে 'নাম' প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

ঘ. আগে বদ্ধদ্বার গৃহে, অথবা শ্রীরাম পণ্ডিত নামক বৈষ্ণবের অঙ্গনে, কীর্তন হতো। চৈতন্য শোভাযাত্রা সহ 'নগর কীর্তন' পরিচালনা করেছিলেন। এ-কীর্তনে জাত-বিচার করা হতো না।

ঙ. চৈতন্য নিজে স্বর্ণকার, মালাকার, শঙ্খকার, গোয়ালা প্রভৃতি শূদ্র, এবং পেশাভিত্তিক জাতিসমূহের লোকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করেন।

চ. নবদ্বীপে প্রভাবশালী জগাই এবং মাধাই নামে দুই কুক্রিয়াসক্ত দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণকে তিনি 'উদ্ধার' করেন।

ছ. চৈতন্য বৈষ্ণব কাহিনীর উপরে রচিত নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, এবং নিজে তাতে অংশগ্রহণ করেন।

এখানে লক্ষণীয়, দক্ষিণ ভারতে শৈব নয়নার, এবং বৈষ্ণব আলবার ভক্তদের

সম্পর্কে বহু 'অতিপ্রাকৃত' গল্প তৈরি করা হয়।[৪৬] চৈতন্যের প্রামাণিক জীবনীসমূহে কিন্তু অতিপ্রাকৃত কাহিনী বিশেষ নেই। ভক্তি বৈষ্ণবদের দ্বারা একটি নান্দনিক 'রস' রূপে বিবেচিত হতে থাকে। রসসৃষ্টিতে ভাবের অস্তিত্ব অপরিহার্য। পাঁচটি ভাবের কথা বলা হলো, যথা : শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। বিশেষভাবে বৃন্দাবন দাসের বিবরণ পড়ে মনে হয়, নবদ্বীপে ভক্তি-প্রচারের সময়ে চৈতন্য 'দাস্যভাবে'র উপরে জোর দিয়েছিলেন।[৪৭] দাক্ষিণাত্যে শক্তি-আন্দোলনে 'দাস্য' প্রধান ভাব ছিল।[৪৮] ইন্দোনেশিয়াতে 'বক্তি' শব্দে দাস বোঝায়; 'বক্তি' শব্দটি 'ভক্তি' শব্দের ইন্দোনেশীয় রূপান্তর।[৪৯] চৈতন্যের সমকালীন শঙ্করদেব অসমে যে বৈষ্ণব-ভক্তি প্রচার

৪৬. দ্রষ্টব্য : কামিন জেদুলেবিল, প্রাগুক্ত গ্রন্থ ; এম. জি. এস নারায়ণন ও ভেলুথাট কেশবন, "ভক্তি মুভমেন্ট ইন সাউথ ইন্ডিয়া", ডি এন ঝা (সম্পাদিত), 'ফিউডাল সোস্যাল ফরমেশন ইন আর্লি ইন্ডিয়া', দিল্লী, ১৯৮৭, পৃ ৩৪৮-৩৭৫ ; সুবীরা জয়সবাল, 'অরিজিন এ্যান্ড ডেফলপমেন্ট অফ বৈষ্ণবিজম', দিল্লী, ১৯৬৭ ; জান গোন্ডা, 'বিষ্ণুইজম এ্যান্ড শৈবিজম : এ কম্পারিজন', লন্ডন, ১৯৭০ ; হারমান কুলকে, "রয়াল টেম্বল পলিসি এ্যান্ড দ্য স্ট্রাকচার অফ মিডিয়াভাল হিন্দু কিংডমস" এ এসম্যান ইত্যাদি (সম্পাদিত), 'দ্য কাল্ট অফ জগন্নাথ এ্যান্ড দ্য রিজিওনাল ট্র্যাডিশন অফ ওড়িশা', দিল্লী, ১৯৭৮ ; কে. এ. নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, 'ডেভলপমেন্ট অফ রিলিজিয়ন ইন সাউথ ইন্ডিয়া', দিল্লী, ১৯৭৫ ; কে. সি. বরদাচারী, "সাম কন্ট্রি-বিউশনস অফ দ্য আলবারস টু দ্য ফিলজফি অফ ভক্তি", 'আনালস অফ দ্য ভান্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট', সিলভার জুবিলী ভল্যুম, ১৯৪২ ; ভেলুঘাট কেশবন, "দ্য টেম্বল বেস অফ দ্য ভক্তি মুভমেন্ট অফ সাউথ ইন্ডিয়া" ('প্রসিডিংস অফ দ্য ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস', ওয়ালটেয়ার, ১৯৭৯)।

৪৭. 'চৈ ভা', পৃ ১৫৪ : 'নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রভাব সর্বথা। তিলার্ধেক দাস্যভাব নাহিক অন্যথা ॥'...পৃ. ১৭৫ : 'বেদে ভাগবতে কহে দাস্য বড় ধন। দাস্য লাগি রমা অজভাবের যতন। ...দাস্যভাবে নাচে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর...', পৃ. ১৯৮ : 'চৈতন্যের দ স্য বই নিতাই না জানে। চৈতন্যের দাস্যে নিত্যানন্দ করে দান ॥' পৃ. ২২০ : 'নির্মাঞ্চ পণ্ডিত সত্য শ্রীকৃষ্ণের দাস...' ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য 'চৈ চ' : পৃ. ৯৭ : 'দাস্যভাবে আনন্দিত পারিষদগণ...নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল। চৈতন্যের দাস্যপ্রেমে হইল পাগল ॥ কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু। কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু ॥' পৃ. ১৩১ : 'পিতামহ তরু সখাভাব কেনে নয়? / কৃষ্ণ-প্রেমার স্বভাব দাস্যভাব সে করায় ॥'

৪৮. এম. জি. এস নারায়ণন ও কেশবন, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ।

৪৯. দ্রষ্টব্য : সুবীরা জয়সবাল, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৭-৩৯, ১১০-১১১ ; বেণুগোপাল পানিক্কর, "ভাষা ইন্দোনেশিয়া" ('সরণী', কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭, পৃ. ৩২)।

করেন, তাতে দাস্যভাব প্রাধান্য পেয়েছে।[৫০] 'দাস্য' কোনো কোনো বৈষ্ণবীয় পুরাণেও বিশিষ্ট। 'দাস', অর্থাৎ কৃষ্ণদাস। 'দাস্যভাব' সম্পর্কে আপত্তি তুলে বলা হয়েছে যে, আসলে তার অর্থ ছিল শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কর্তাব্যক্তিদের 'দাস'-দের মানসে তাদের দাসত্ব বদ্ধমূল করা, তাকে ভক্তিরসে গ্রহণযোগ্য এবং সম্মানীয় করে তোলা।[৫১] কিন্তু লক্ষণীয়, 'দাস্যভাব' কিছুটা গণতান্ত্রিক ছিল; অর্থাৎ 'জীব' মাত্রই যদি কৃষ্ণদাস হয়, তবে, অন্তত আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে এক কৃষ্ণদাসের যে-রূপ অবস্থা এবং যে-অধিকার, অন্য কৃষ্ণদাসেরর তাই।[৫২] সেখানে সামাজিক বৈষম্য প্রতিফলিত হয় না।

চৈতন্য-প্রবর্তিত নামকীর্তনে কোনো বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্য ছিল না। ভক্তিসহ 'নামগান' করলেই যদি ভক্তের উদ্ধার সম্ভাব্য হয়, তবে আর স্মার্ত ক্রিয়াকলাপের কোনো প্রয়োজন থাকে না, ভক্তির দ্বারা বিশিষ্ট অর্থে বৈষ্ণব ধর্ম, এবং সাধারণ অর্থে হিন্দু ধর্ম একটি ব্যাপক সামাজিক ধর্মে রূপান্তরিত হয়। ভক্তির সামাজিকীকরণ অথবা সোশ্যালিজেশন করার জন্যই চৈতন্য এবং তাঁর পরিকরগণ প্রচলিত 'ভট্টাচার্য'-সংস্কৃতির এবং জীবনধারার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন। বলা হলো, লেখাপড়া করলে মুক্তি হয় না, 'কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাই'; 'জ্ঞানে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই'।[৫৩] এভাবে ভক্তিকে একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক বিকল্প রূপে উপস্থাপিত করা হলো। চৈতন্যের আন্দোলনে যেহেতু সংস্কৃত বিদ্যা-চর্চাকে ছোটো করে দেখা হলো, তাই স্বাভাবিকভাবেই শুরুতে তাতে বাংলা ভাষার স্থান সুনিশ্চিত করা হলো। বাংলা ভাষায় রচিত হলো ধর্মীয় সঙ্গীত, চৈতন্য-জীবনী, সন্ত-জীবনী। বাংলা ভাষা ভক্তি-প্রচারের মাধ্যম হয়ে উঠল।

স্বাভাবিকভাবে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ ও উচ্চবর্গের হিন্দুগণ বৈষ্ণবদের বিরোধিতা করেন। দুর্নাম রটিয়ে তাঁদের চরিত্রহননের জন্য চেষ্টা করা হয়।[৫৪]

৫০. দ্রষ্টব্য: এইচ. ভি. শ্রীনিবাস মুরতি, বৈষ্ণবিজম অফ শংকরদেব এ্যান্ড রামানুজ', দিল্লী, ১৯৭৩, পরিশিষ্ট ২।

৫১. নারায়ণন ও কেশবন, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃ ৩৫৫, ৩৬০; কামিল জেবলেবিলের ভিন্ন মত।

৫২. এই মত জেবলেবিলের। তিনি এ প্রসঙ্গে ''স্পিরিচুয়াল ডেমোক্রেসী' শব্দদুটি ব্যবহার করেছেন।

৫৩. 'চৈ-ভা', পৃ. ১৯১: 'জাতিকুল ক্রিয়াধনে কিছু নাহি করে। প্রেমধন আর্তি বিনে না পাই কৃষ্ণরে।।' এবং মূল উদ্ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য, পৃ. ১৯৭।

৫৪. 'চৈ-ভা,' পৃ.১৯২: 'শুনিয়া পাষণ্ডী সব মরমে বলিগয়া। নিশায় এগুলো যায় মদিরা আনিয়া।' —ইত্যাদি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে কয়েকজন 'পাষণ্ড' নবদ্বীপের কাজিকে কীর্তন বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করে।[৫৫] কাজি নিজেও কীর্তনের ফলে 'হিন্দুয়ানী' বেড়ে যাচ্ছে দেখে চিন্তিত হন। তিনি কীর্তন বন্ধের আদেশ জারি করেন। চৈতন্য সাহসের সঙ্গে এই আদেশের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছিলেন এবং বিশাল নগরকীর্তন ও শোভাযাত্রা সংগঠিত করে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তখন বিখ্যাত সুলতান আলা-উদ্-দীন হোশেন শাহ্ দেশের শাসনকর্তা, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপরে তখন অত্যাচার অভাবনীয় ছিল। কাজি ভয় পেয়ে কীর্তন নিষিদ্ধকরণের আদেশ তুলে নিলেন, এবং সুদর্শন, তরুণ চৈতন্যকে 'গ্রাম সম্পর্কে' নিজের ভাগ্নে বলে অভ্যর্থনা জানালেন।[৫৬] এ-ঘটনার ফলে ভক্তি, কীর্তন আরো বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

কিন্তু সংরক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের বিরোধিতা কমে নি। পরবর্তী বৈষ্ণবরা 'অধ্যাপক'-চৈতন্যের অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং অধ্যাপনার কৃতিত্ব সম্পর্কে কাহিনী তৈরি করেছিলেন।[৫৭] শেষপর্যন্ত নবদ্বীপের ছাত্ররাই তাঁর বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়, এমনকি তাঁকে জব্দ করার জন্য 'সমবায়' পর্যন্ত গঠন করে।[৫৮] এতে পণ্ডিত, এবং অধ্যাপক-রূপে চৈতন্যের শোচনীয় ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়। বড়োই দুঃখের কথা হলো এই যে, বাঙালি ছাত্রদের দুর্নাম অনেক আগে থেকেই ছিল ; কাশ্মীরের খ্যাতনামা কবি ক্ষেমেন্দ্র, কাশ্মীরে পঠন-পাঠনে রত গৌড় দেশীয় ছাত্রদের গুণ্ডামোর, দৌশ্চারিত্র্যের, মাতলামোর যে বিবরণ দিয়েছেন, তা পাঠ করলে স্তম্ভিত হতে হয়।[৫৯] চৈতন্য নিজেও যখন ছাত্র ছিলেন তখন তাঁর ব্যবহারও সমালোচিত হয়েছিল। যাই হোক, আমার ধারণা—এই 'পড়ুয়া'রা তাঁকে ঘরছাড়া করল ; কারণ, বৃন্দাবন দাসের বিবরণ অনুসারে, উক্ত 'সমবায়' গঠনের পরেই, দুঃখিত, আর ব্যর্থতার চিন্তায় বিরক্ত, চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। বৃদ্ধা মাতা এবং স্ত্রী-কে কাঁদিয়ে তিনি সন্ন্যাসী হলেন ; কিন্তু মাতার কথা ভেবে নিরুদ্দেশ হন নি ; পুরীতে যাওয়ার এবং সেখানে বাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণের করুণ কাহিনী

৫৫. 'চৈ চ', পৃ. ৭৬ : 'হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল / আসি কহে হিন্দুর ধর্ম নাশিল নিমাই / যে কীর্তন প্রবর্তাইল কভু শুনি নাই ॥' ইত্যাদি।

৫৬. 'চৈ-চ', পৃ. ১৭৪ ; চৈ-ভা', ২৬৬-২৭৭।

৫৭. চৈ-চ', পৃ. ১৬০-১৬৫। দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে চৈতন্যের বিচার।

৫৮. 'চৈ-ভা', পৃ. ২৯১-২৯২। চৈতন্যের বিখ্যাত উক্তি : 'করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে। উলটিয়া আরো কফ বাঢ়িল দেহেতে।' 'চৈ-ভা', পৃ. ২৯২।

৫৯ ই. ভি. ভি. রাঘবাচার্য্য ও ডি. জি পাঠ্য (সম্পাদিত), 'ক্ষেমেন্দ্র : লঘু কাব্যসংগ্রহ', হায়দ্রাবাদ, ১৯৬১, "দেশোপদেশ : ষষ্ঠ উপদেশ : ছাত্রবর্ণনম্", পৃ. ২৭০-২৮৪।

লোক-সাহিত্যে অমর হয়ে আছে ; তার অর্থ, এ-ঘটনায় 'পাষণ্ড'-দের চোখের জল না পড়লেও অগণিত সাধারণ নরনারী সুগভীর বেদনা অনুভব করেন ; তারই সুস্পষ্ট আভাস আছে চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিকর বাসুদেব ঘোষ রচিত পদাবলীতে।[৬০]

৭

চৈতন্যের সঙ্গে পূর্ণভাবে সহযোগিতা করেছিলেন অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস পণ্ডিত এবং গদাধর পণ্ডিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চারটি 'শাখা'র কথা বলেছেন ; যথা : চৈতন্যের শাখা, অদ্বৈত আচার্যের শাখা, নিত্যানন্দের এবং গদাধর পণ্ডিতের দুই শাখা।[৬১] এঁরাই ছিলেন প্রধান বৈষ্ণব। পুরীতে চৈতন্য অদ্বৈত আচার্য এবং নিত্যানন্দকে ধর্ম-প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।[৬২] সম্ভবত বার্ধক্যের জন্য অদ্বৈত আচার্য বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। তাঁর শাখার বৈষ্ণবদের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী সীতা দেবী, এবং পুত্র অচ্যুতানন্দ (বৈষ্ণব শাখার বৈষ্ণব) অদ্বৈতপন্থী বৈষ্ণবদের ঐক্যবদ্ধ করেন।[৬৩] শান্তিপুরে তাঁর বংশ 'গোসাই'-বংশ রূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। বর্ধমানে, পাবনাতে, ঢাকায়, অদ্বৈতের জন্মভূমি শ্রীহট্টে, এবং মালদহের গিয়াশপুরে অদ্বৈত শাখার বৈষ্ণবদের কিছুটা প্রভাব ছিল। তাঁদের মধ্যে সক্রিয় ছিলেন বর্ধমানে নবগ্রামে শ্যামদাস আচার্য, ঢাকা জেলার তেওতা গ্রামে ঈশান নাগর, এবং শ্রীহট্টে রাজা দিব্য সিংহ। প্রক্ষিপ্তভাবে অদ্বৈত আচার্যের ও সীতা দেবীর কয়েকটি জীবনী রচিত হয়েছিল।[৬৪]

উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন নিত্যানন্দ অবধূত।[৬৫] তাঁর বারোজন প্রধান পরিকর 'গোপাল' আখ্যায় ভূষিত হয়ে মধ্য-রাঢ় অঞ্চলে দাস্যভাব প্রচার

৬০. মালবিকা চাকী (সম্পাদিত) : 'বাসু ঘোষের পদাবলী', কলিকাতা, ১৯৬১ ; দ্রষ্টব্য : 'গৌরপদতরঙ্গিণী', পূর্বোক্ত, ৩য়, ৪র্থ উচ্ছ্বাস, পৃ. ২৩৬-২৬২।

৬১. চার শাখার বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : চৈ-চ', আদিলীলা, পৃ. ১২৩-১২৪।

৬২ 'চৈ-চ', পৃ. ৩৮৭ : 'আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিলা করিয়া সম্মান…' ইত্যাদি।

৬৩. 'ভি আই বি', অধ্যায় ছয়, পৃ. ১২২-১৩২।

৬৪. মৃণালকান্তি ঘোষ (সম্পাদিত), 'অদ্বৈত প্রকাশ, ঈশান নাগর', কলিকাতা, ১৯৩২-৩৩ ; রবীন্দ্রনাথ মাইতি (সম্পাদিত), 'অদ্বৈতমঙ্গল', হরিচরণ দাস, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩, সীতাদেবীর জীবনী 'সীতাগুণকদম্ব'।

৬৫. 'ভি আই বি', অধ্যায় সাত, পৃ. ১৩৩-১৫৮ ; অমূল্যধন রায়ভট্ট, 'দ্বাদশ গোপাল', পানিহাটি, ১৯২৪।

করেন। বৈষ্ণব ঐতিহ্যে তাঁরা 'দ্বাদশ গোপাল' নামে পরিচিত।[৬৬] তাঁরা হলেন, অভিরাম [হুগলী : খানাকুল-কৃষ্ণনগর], ধনঞ্জয় পণ্ডিত [বর্ধমান : শীতলগ্রাম], সুন্দরানন্দ ঠাকুর [যশোহর : মহেশপুর], গৌরীদাস পণ্ডিত [বর্ধমান : অম্বিকা-কালনা], কমলাকর পিপলাই [হুগলী : মাহেশ], উদ্ধারণ দত্ত [হুগলী : সপ্তগ্রাম], মহেশ পণ্ডিত [নদীয়া : পালপাড়া], পুরুষোত্তম দাস [নদীয়া : চাঁদুরে], পরমেশ্বর দাস [হুগলী : তরা-আটপুর], কালাকৃষ্ণ দাস [বর্ধমান : আকাইহাট], শ্রীধর [নদীয়া : নবদ্বীপ], এবং হলায়ুধ ঠাকুর [নদীয়া : রামচন্দ্রপুর]।

নিত্যানন্দ সম্পর্কে বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাস লিখেছিলেন : 'মত্ত সিংহ যেন/ গরজন ঘনঘন / জগমাঝে কাহু না মানে।'[৬৭] অসাধারণ লোক ছিলেন তিনি ; বিচিত্র সাজে, পায়ে ঘুঙ্ঘুর বেঁধে, গ্রামে গ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছেন। সপ্তগ্রামের বণিকদের তিনি 'উদ্ধার' করেন। জাতবিচার মানতেন না নিত্যানন্দ, সর্বদা 'শূদ্রের আশ্রমে' থাকার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে চৈতন্যের কাছে অভিযোগ করা হয়। চৈতন্য তা অগ্রাহ্য করলেন।

ওদিকে বাংলাদেশ থেকে বহু দূরে, বৃন্দাবনে, চৈতন্যের মতাবলম্বী বলে পরিচিত ষড়্‌গোস্বামী গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন।[৬৮] এঁরা হলেন দুই ভাই, সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী ; তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী ; একদা নিত্যানন্দের অনুচর, সপ্তগ্রামের ধনী গৃহের সন্তান, রঘুনাথ দাস গোস্বামী ; কাশীর রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ; এবং দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব গোপাল ভট্ট গোস্বামী। বাংলাদেশে যাঁরা বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন গৃহস্থ কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ ছিলেন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী এবং পরম পণ্ডিত। সনাতন ও রূপ ছিলেন, আধুনিক ভাষায় 'ক্যাবিনেট' পর্যায়ের মন্ত্রী, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং কবি। রঘুনাথ প্রসিদ্ধ ধনীর সন্তান ছিলেন ; তাঁর অর্থে নিত্যানন্দ 'চিড়ামহোৎসব' করেছিলেন।[৬৯] রঘুনাথ ভট্ট ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ভাগবত পাঠক ; গোপাল ভট্ট পণ্ডিত ছিলেন। আর জীব গোস্বামীরও ছিল প্রায় অতুলনীয় পাণ্ডিত্য।

৬৬. 'দ্বাদশ গোপাল', দ্রষ্টব্য : 'ভি. আই. বি', অধ্যায় আট, পৃ. ১৫৯-৭৩।
৬৭. 'বৈষ্ণব পদাবলী', পূর্বোক্ত, পদ আঠারো, পৃ. ৩৭৩।
৬৮. দ্রষ্টব্য : নরেশচন্দ্র জানা, 'বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী', কলিকাতা, ১৯৭০।
৬৯. চিড়ামহোৎসবের বিবরণ, 'চৈ-চ', ৭০২-৩৪ : 'বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচসাতে। এক বিপ্র প্রভু লাগি ভিজাইল তাতে ।। এক ঠাঁঞি তপ্ত দুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া। অর্দ্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া ।। অর্দ্ধেক ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধেতে ছানিল। চাঁপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল ।।'

একটি কেন্দ্রীয় তত্ত্বের অভাবে চৈতন্যের ধর্মান্দোলন ক্রমশ মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলেছিল ; এক-এক জায়গায় এক-এক রকমের তত্ত্বের অথবা মতবাদের উদ্ভব হচ্ছিল। এমনকি চৈতন্যের নামে কোনো কোনো লোক এমন সব মত প্রচার করছিল, যা ছিল নিতান্ত অভব্য এবং অশ্রদ্ধেয়। রাঢ়ে-বঙ্গে বিভিন্ন দল ও উপদল গঠিত হয় ; তাদের মধ্যে প্রধান ছিল :

অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য সম্প্রদায়।
নিত্যানন্দের শিষ্য-সম্প্রদায়।
শ্রীখণ্ডের 'গৌরনাগরবাদী' বৈষ্ণব সম্প্রদায়।[৭০]
গদাধর পণ্ডিতের অনুগামী 'গদাই গৌরাঙ্গ' সম্প্রদায়।[৭১]
চৈতন্য-পূজক 'গৌরপারম্যবাদী' সম্প্রদায়।[৭২]
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভক্ত-সম্প্রদায়।[৭৩]
প্রচলিত বৈষ্ণব মত-বিরোধী বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

যতদূর জানা যায়, এসব বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং উপগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ কোনো যোগাযোগ ছিল না। এ-অবস্থায় প্রয়োজনীয় ছিল একটি কেন্দ্রীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা সেই কেন্দ্রীয় তত্ত্ব নানাভাবে লিখলেন। ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, দার্শনিক তত্ত্ব, বৈষ্ণবীয় পুরাণের ব্যাখ্যা, বিবিধ কাব্য-নাটক-চম্পূ, বৈষ্ণব স্মৃতি, সন্ততত্ত্ব, এমনকি বৈষ্ণবীয় ব্যাকরণ—এ সবই তাঁরা নতুন দৃষ্টি-কোণ থেকে বিচার করে রচনা করলেন। তাঁদের রচনাসমূহ সামূহিকভাবে 'গোস্বামী-শাস্ত্র' হয়ে দাঁড়াল। তাঁদের বিবিধ গ্রন্থসমূহে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বিদগ্ধতা, বিচারের সূক্ষ্মতা, এবং চিরায়ত সংস্কৃত সাহিত্যে ও ভাষায় অসামান্য অধিকার দেখা যায়। অসাধারণ প্রতিভাশালী কৃষ্ণদাস কবিরাজ পরিণত বার্ধক্যে রচনা করেন তাঁর অমর চৈতন্য-জীবনী 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'। তিনি বৃন্দাবনে থাকতেন ; সম্ভবত বঙ্গভাষায় চৈতন্য-জীবনী রচনা করার জন্য তিনি 'গোস্বামী' রূপে পরিচিত হলেন না। কিন্তু বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের আলোকে

৭০. গৌরগুণানন্দ ঠাকুর, 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব', শ্রীখণ্ড, বর্ধমান, ১৯৫৪, দ্বিতীয় সং ; 'ভি. আই বি.', অধ্যায় নয়, পৃ. ১৯০-২০০।

৭১. 'ভি. আই. বি.', পৃ. ১৯০-১৯১।

৭২. মণীন্দ্রনাথ গুহ (সম্পাদিত), প্রবোধানন্দ সরস্বতী: 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্', পানিহাটি, ১৯৭০।

৭৩ হরিদাস গোস্বামী, 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহস্রনাম স্তোত্র', কলিকাতা ১৯২২। বিষ্ণুপ্রিয়া নিজের ভাতুষ্পুত্র বাদাচার্য্যকে দীক্ষা দেন। 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান', ২, পৃ. ১৩৭৩।

তিনি যে-ভাবে চৈতন্যের জীবনী রচনা করেছেন, তার সৌন্দর্য, মাধুর্য, পূর্ণতা ছিল অতুলনীয়। এ-ধরনের রচনা বাংলা সাহিত্যে আর একটিও নেই।

বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ চৈতন্যের মত অনুসারে এ-সব লিখেছিলেন কি-না, অথবা তাঁদের বিভিন্ন রচনায় চৈতন্যের মত কতটা প্রতিফলিত হয়েছিল, এ-সব প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু তার আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। শুধু এটুকু বলা যায় যে, বৃন্দাবনের গৌড়ীয় মতে চৈতন্যের প্রসঙ্গ সামান্যই আছে; সেখানে সর্বত্র কৃষ্ণেরই প্রাধান্য। এ কৃষ্ণও আবার 'গোপীকান্ত', 'মুরারি' নন। এখানে 'মধুরভাবে'র প্রাধান্য ; অন্যান্য 'ভাব' প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 'এহো বাহ্য, আগে কহ আর।'[৭৪] এখানে 'মধুরভাব' 'রাগানুগা' ভক্তি মিশ্রিত হয়ে সৃষ্ট হলো কৃষ্ণের 'পরকীয়া' রতির তত্ত্ব; সব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবরা বাংলাদেশে 'পরকীয়া রতি'-র তত্ত্ব মেনে নিলেন।[৭৫] অগণিত গোপিনীর সঙ্গে কৃষ্ণের লীলার দার্শনিক মতের নাম দেওয়া হলো 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'। অর্থাৎ 'জীবে'র সঙ্গে কৃষ্ণ-রূপ 'ব্রহ্মনে'র যেমন অভেদত্ব, তেমনই ভিন্নতা। একই সঙ্গে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক এই সম্পর্ক যেহেতু যুক্তিবিরুদ্ধ, তাই তা 'অচিন্ত্য'।[৭৬] যে স্মার্ত ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধেই ছিল চৈতন্যের, নিত্যানন্দের আন্দোলন, তাই বৈষ্ণবীয় রূপ পেল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর 'হরিভক্তিবিলাস' নামক বিশাল বৈষ্ণব স্মৃতির গ্রন্থে।[৭৭] যে পাণ্ডিত্যের এবং 'শুষ্ক' জ্ঞানচর্চার বিরুদ্ধে চৈতন্য প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে নির্বাসিত হলেন, তারই অসামান্য প্রকাশ দেখি 'গোস্বামী-শাস্ত্রে'। এই 'জ্ঞান-বিচারে'র ধারাকে উচ্চবর্গের কাছে গ্রাহ্য করার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা দেখাবার চেষ্টা করলেন যে, চৈতন্য নিজেও ছিলেন প্রকাণ্ড নব্যনৈয়ায়িক! তিনি নাকি ন্যায়ের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তত্ত্বচিন্তামণি'র 'পরীক্ষা' নামক একটি টীকা রচনা করেছিলেন![৭৮] শুধু তাই নয়; যে-চৈতন্য, একজন বৃদ্ধা বৈষ্ণবীর কাছ থেকে চাউল আনার জন্য স্ত্রীসংসর্গের অপরাধে ছোটো হরিদাসকে তাড়িয়ে

৭৪. 'চৈ-চ', পৃ. ২৭২-২৮৩।

৭৫. 'ভি. আই. বি.', পৃ. ১০৮-১১১।

৭৬. স্টুয়ার্ট মার্ক এল্কম্যান, 'জীব গোস্বামী'স তত্ত্বসন্দর্ভ', দিল্লী, ১৯৮৬, পৃ. ১৪৩; 'চৈ-চ', পৃ. ৫১, ৫৬।

৭৭. রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন (সম্পাদিত), 'গোপাল ভট্ট: হরিভক্তি বিলাস', বহরমপুর, ১৮৯৪, দ্বিতীয় সং।

৭৮. দ্রষ্টব্য: 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ (পত্রিকা)', অক্টোবর ১৯৮২-মার্চ ১৯৮৩, পৃ. ১৮২।

দিলেন[৭৯] (ছোটো হরিদাস পরে এলাহাবাদে গিয়ে আত্মহত্যা করেন), সেই চৈতন্যের মুখ দিয়ে, রাগানুগা পরকীয়া রতির সমর্থনে, অশ্লীল সংস্কৃত শ্লোক পর্যন্ত বলিয়ে নেওয়া হয়েছে।[৮০]

এ-প্রসঙ্গ আর বড়ো করব না। বাঙালি বৈষ্ণবদের মধ্যে অনেকেই জানতেন যে বৃন্দাবনে গোস্বামীগণ একটি ব্যাপক ধর্মতত্ত্ব রচনা করেছেন। যখন দেখা গেল, বাংলাদেশে বৈষ্ণবদের মধ্যে নানান ধরনের মতবাদ আছে, এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীও আছে, তখন তাত্ত্বিক একতার জন্য অনেকেই চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তিনজন সক্রিয় বৈষ্ণব সেই তত্ত্বগ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করার জন্য বৃন্দাবনে গেলেন। তাঁরা হলেন বর্ধমানের যাজীগ্রামের শ্রীনিবাস আচার্য, রাজশাহীর খেতুরির নরোত্তম দত্ত এবং মেদিনীপুরের ধারেন্দা-গোপীবল্লভপুরের শ্যামানন্দ।[৮১] তাঁরা বৃন্দাবন থেকে বহু পুঁথি নিয়ে এলেন। বৃন্দাবনী তত্ত্ব প্রচার করার জন্য অনেকগুলো বৈষ্ণব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সবচেয়ে বড়ো মহোৎসব হলো খেতুরিতে, সম্ভবত ১৬১০ খ্রীস্টাব্দে, অথবা তার কাছাকাছি সময়ে। অন্তত পচাশিবই জন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগুরু ও মহান্ত সশিষ্য এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এখানে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মতবাদ গ্রহণ করা হলো।[৮২]

৮

খেতুরির বৈষ্ণব সম্মেলন নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। নবদ্বীপে চৈতন্য যে-আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, তার সমাপ্তি এই সম্মেলনে সূচিত হয়। কারণ যখন ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক কেন্দ্রীকরণ হয়, তখন ধর্মীয় আন্দোলন আর 'আন্দোলন' থাকে না; তা ধর্ম হয়ে পড়ে। ইউরোপের 'রিফর্মেশন' অথবা ক্যাথলিক ধর্ম-বিরুদ্ধ সংস্কার আন্দোলনেও এই পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। এখন চৈতন্যের বৈষ্ণব আন্দোলনের সদর্থক ফলসমূহ আলোচ্য।

৭৯. 'চৈ-চ', পৃ. ৬১০-৬১৩। চৈতন্য বলেছিলেন: '...বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥'

৮০. 'চৈ-চ', পৃ. ১৮৭-১৮৮। শ্লোকের প্রথম চরণ; 'যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তাএব চৈত্রক্ষপা'।

৮১. দ্রষ্টব্য: 'ভি. আই. বি.', অধ্যায় বারো, চোদ্দো, পনেরো, পৃ. ২০১-২৫৬।

৮২. ঐ, পৃ. ২০১-২০৮।

চৈতন্যের এবং তাঁর পরিকরদের অসাধারণ উৎসাহ, উদ্দীপনা, এবং উচ্ছ্বাসের কোনো প্রশংসাই বোধ হয় পর্যাপ্ত নয়। তার ফলে ব্যক্তির এবং সমাজের প্রগতির লক্ষণসমূহ স্পষ্ট হয়ে উঠল। সাধারণ মানুষের মনে সৃষ্টি হলো নূতন মূল্যবোধ ; ব্যক্তি-মানসে জাগল ব্যক্তির সম্পর্কে শ্রদ্ধা। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য এটা প্রয়োজন ছিল। সংরক্ষণশীল স্মার্ত এবং 'নব্য' নৈয়ায়িক-মতে সামাজিক/ধর্মীয় চলমানতার ধারণা স্পষ্ট নয়। কিন্তু, চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ফলে 'আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রে'র যে পরিবেশ তৈরি হলো, তাতে, অন্তত ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে, জাতবিচারের বিশেষ কোনো গুরুত্ব রইল না। এমন কথা অবশ্য বলা যায় না যে, চৈতন্য সামাজিক ক্ষেত্রে বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন, কিংবা তা ঘটিয়েছিলেন। কোথাও প্রচলিত বিধির বিরুদ্ধে চৈতন্যের কোনো সমালোচনার প্রমাণ নেই। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে নামকীর্তনে, নগরকীর্তনে, মহোৎসবে চণ্ডাল-ব্রাহ্মণের কোলা-কুলির যথেষ্ট সম্ভাবনাময় তাৎপর্য ছিল।[৮৩] অবশ্য বামাচারী ভৈরবী চক্রেও জাত-বিচার করা হতো না : 'প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্বে বর্ণাঃ দ্বিজোত্তমাঃ'। কিন্তু ভৈরবী-চক্র জাতীয় বামাচারী তান্ত্রিক ধর্মানুষ্ঠান ছিল গোপনীয় ; আর বৈষ্ণব-দের কীর্তন মহোৎসব ছিল সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। কাজেই তার আকর্ষণ এবং প্রভাব ছিল অনেক বেশি ব্যাপক। নিত্যানন্দ শূদ্রের বাড়িতে থাকতে ভয় পান নি ; চৈতন্য ব্রাহ্মণ-সমাজের গণ্ডী পার হয়ে জনসাধারণের কাছাকাছি এসেছিলেন।[৮৪] এ-সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই ঐতিহাসিক সত্য বিচার্য যে, বাংলাদেশে কখনো জাতপাতের লড়াই মারাত্মক হয়ে ওঠে নি। দাক্ষিণাত্যে শৈব এবং বৈষ্ণব ভক্তির প্রচারের পরেও জাতিবর্ণের বিভিন্নতা কমে নি ; তার কারণ সেখানে ভক্তির একটা মৌল উদ্দেশ্য ছিল, ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজতন্ত্র, এবং পুরোহিতদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মন্দিরকে কেন্দ্রবিন্দু করে, প্রচলিত অনার্য, বৌদ্ধ, জৈন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, 'আর্য' ব্রাহ্মণদের মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।[৮৫] বাংলা দেশে, ঐতিহাসিক কারণে, এসব হয় নি।

বৈষ্ণব কবি পরমানন্দ লিখলেন : 'নাচিতে না জানি তমু / নাচিয়ে

৮৩. 'গৌরপদতরঙ্গিণী', পৃ. ১৯, পদ ৪ : 'হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ। চণ্ডাল ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ ?'

৮৪. 'চৈ ভা', পৃ. ৬৯-৭১। ম্যাক্স ওয়েবার লিখেছিলেন : খ্রীষ্ট থেকে কৃষ্ণ পর্যন্ত সব জগদুদ্ধারকারী নাগরিকবর্গসমূহের সমর্থন চেয়েছিলেন (এইচ. এইচ. গার্থ ও সি রাইট মিলস (সম্পাদিত), 'ফ্রম ম্যাক্স ওয়েবার : এসেজ ইন সোসিওলজি', লন্ডন, ১৯৫৭, পৃ. ২৮৩-৮৪)।

৮৫. নারায়ণন ও কেশবন এ-সিদ্ধান্ত করেছেন। প্রাগুক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

গৌরাঙ্গ বলি/ গায়িতে জানি না তমু গাই।'[৮৬] এই বিখ্যাত পদের তাৎপর্য এই যে, বৈষ্ণবীয় ভাবাবেগ, মানুষের স্বাভাবিক সৃজনশীলতাকে একটি ধর্মীয় ধারণা দ্বারা, প্রবুদ্ধ করল। তার ফল হলো দুটো। প্রথমত ভক্ত বৈষ্ণবগণ সাক্ষরতার জন্য ব্যস্ত হলেন, সাক্ষরতা প্রসারের জন্য সক্রিয় হলেন। সাক্ষরতা যত বাড়ল, ততই বাড়ল বৈষ্ণব কবিদের সংখ্যা; সঙ্গে সঙ্গে বাড়ল বৈষ্ণব গীতি-কবিতার সংখ্যা। বৈষ্ণব কবিদের প্রকৃত সংখ্যা এবং তাদের রচনার সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য অনেকেই চেষ্টা করেছেন।[৮৭] কিন্তু তা দুর্নির্ণেয়, কারণ, সব কবির এবং গীতিকবিতার সন্ধান পাওয়া যায় নি। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'বৈষ্ণব পদাবলী' নামক সুবৃহৎ সংকলনে ২০৮ জন কবির ৩৭৮৭টি পদ সংকলিত করেছেন। কবিদের এবং তাঁদের রচিত পদাবলীর সংখ্যা আরো অনেক বেশি হবে।

লক্ষণীয়, চৈতন্যের জীবনী, বাংলাভাষায় রচিত মানুষের জীবনীসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম। এই সম্মিলিত সৃষ্টিপ্রবাহ এখনো পর্যন্ত অব্যাহত। ফলত বাংলা ভাষার অভূতপূর্ব উন্নতি হলো। অন্য যে-কোনো মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী মিলিয়ে পড়লে, পদাবলীর আপেক্ষিক সৌন্দর্য, সুষমা, ছন্দের ও সুরতালের উৎকর্ষ তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বৈষ্ণবীয় ধর্মের তত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা যেহেতু মানব-মানবী, এবং যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের নরলীলাই সব লীলার মধ্যে সর্বোত্তম, তাই বৈষ্ণব কবিতার ভাব, ভাষা এবং ব্যঞ্জনা অসাধারণ মানবিকতার দ্বারা সমৃদ্ধ।[৮৮] এই 'আধ্যাত্মিক' মানবিকতার সমান্তর বিশ্ব-সাহিত্যে দুর্লভ। বাল্যলীলার, এবং অগাধ মাতৃস্নেহের যে কাব্যগীতিময় প্রকাশ পদাবলীতে দেখি তা অতুলনীয়।

এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্ব, দার্শনিক তত্ত্ব, বিবিধ কাব্য-নাটক সংস্কৃত ভাষায় রচিত হওয়ার ফলে বাংলাদেশে সংস্কৃত চর্চার ক্ষেত্রে নূতন প্রাণের সঞ্চার হলো। সেনযুগের পর থেকে সংস্কৃত নিবন্ধ রচনার মধ্যে বাঙালির সংস্কৃত-চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যিকদের নিরন্তর

৮৬. 'বৈষ্ণব পদাবলী', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭, পদ ছয়।

৮৭ দ্রষ্টব্য : সতীশচন্দ্র রায়, 'পদকল্পতরু', কলিকাতা, ১৯৩১, পঞ্চম খণ্ড; 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী', উপক্রমণিকা; সুকুমার সেন, 'এ হিস্ট্রি অফ ব্রজবুলি লিটারেচার', কলিকাতা, ১৯৩৫।

৮৮. বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে যাঁরা কেবলমাত্র ধর্ম খুঁজতেন, তাঁদের সমালোচনা করে লেখার জন্য দ্রষ্টব্য : বিনয়কুমার সরকার, 'দ্য পজিটিভ ব্যাকগ্রাউন্ড অফ হিন্দু সোসিওলজি', এলাহবাদ, ১৯৩৭, পৃ. ৪৮৬।

সাহিত্য সাধনার ফলে নূতন কবিতা, নাটক, চম্পু, নিবন্ধ, অলংকার বঙ্গীয় সংস্কৃত-চর্চাকে সমৃদ্ধ করে তুলল।

চৈতন্যের আন্দোলনের ফলেই সপ্তদশ শতক থেকে রাঢ়ে-বঙ্গে সর্বত্র নূতন ভাস্কর্য ও স্থাপত্য বিকশিত হয়।[৮৯] বিষ্ণুপুরের মন্দির শিল্প তার বড়ো প্রমাণ। গ্রামে-গ্রামে তৈরি হলো বহু মন্দির; অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্দির শূদ্রদের অর্থে নির্মিত হয়। এ ঘটনা ক্রমবর্ধমান সামাজিক চলমানতার প্রমাণ রূপে বিচার করা হয়েছে।[৯০] প্রসঙ্গত স্মরণীয়, পদাবলীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল পদাবলীগায়নের কতকগুলো বিশিষ্ট ধরন, যেমন গরানহাটী, মনোহরশাহী, রেণেটী, মন্দারিণী। নানা কারণে শেষ পর্যন্ত মনোহরশাহী কীর্তনই রইল; অন্য শৈলীসমূহ অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। বৈষ্ণব কীর্তনের প্রভাব অষ্টাদশ শতকের শেষে, এবং ঊনিশ শতকে উদ্ভাবিত, কবিগান, যাত্রা, পাঁচালী, ঢপ, আখড়াই, 'হাফ'-আখড়াই, ঝুমুর প্রভৃতি গানের মধ্যে দেখা যায়। রবীন্দ্র-সঙ্গীতেও বৈষ্ণবীয় প্রভাব সুস্পষ্ট।[৯১] ঊনিশ শতকের বাঙালি সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও মধ্যকালীন বৈষ্ণব ঐতিহ্যের স্থান বিশিষ্ট ছিল।[৯২]

বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের অন্যতম সদর্থক ফল ছিল সামাজিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের অবস্থার উন্নতি। চৈতন্যের দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবী, নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবী দেবী, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী প্রভৃতি সম্মানীয়া মহিলা-গণ বৈষ্ণব সমাজে পূজনীয়া ছিলেন, সীতা দেবীর, জাহ্নবী দেবীর, এবং হেমলতা ঠাকুরাণীর বহু শিষ্য ছিল।[৯৩] স্ত্রী-গুরু রূপে জাহ্নবী দেবী

৮৯. দ্রষ্টব্য : ডেভিড জি ম্যাকাচ্চিয়ন, 'লেট মিডিয়াভাল টেম্পলস অফ বেঙ্গল', কলিকাতা, ১৯৭২।

৯০. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, "টেম্পল প্রমোশন এ্যান্ড সোশাল মোবালিটি ইন বেঙ্গল" (ডি. পি চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'এসেজ ইন অনার অফ প্রফেসর নীহাররঞ্জন রায়', কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃ ৩৪১-৩৭১) এবং এই লেখকের 'সোসাল মোবিলিটি ইন বেঙ্গল', কলিকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৫৮-৬৪ দ্রষ্টব্য।

৯১. রমাকান্ত চক্রবর্তী, "বৈষ্ণব কীর্তন ইন বেঙ্গল" ('জার্নাল অফ দ্য ইন্ডিয়ান মিউজি-কোলজিকল সোসাইটি', বরোদা, ১৭, ১, জুন ১৯৮৬, পৃ. ১২-৩০); হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'বাংলার কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনীয়া', কলিকাতা, ১৯৭১; খগেন্দ্রনাথ মিত্র, 'কীর্ত্তন', কলিকাতা, ১৯৪৫।

৯২. 'ভি. আই. বি', অধ্যায় একুশ, বাইশ, পৃ. ৩৮৫-৪৫২।

৯৩. দ্রষ্টব্য : লোকনাথ দাস ও অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি (সম্পাদিত), 'সীতা চরিত্র', হুগলী, ১৯২৬; রাজবল্লভ গোস্বামী, 'মুরলীবিলাস', বাঘনাপাড়া, ১৮৯৫; নিত্যানন্দ দাস, 'প্রেমবিলাস', বহরমপুর সং, ১৯২২; যদুনন্দন, 'কর্ণানন্দ', বহরমপুর সং, ১৮২৯।

বৃন্দাবনে গিয়ে সম্মানিতা হয়েছিলেন।[৯৪] পরবর্তীকালে সম্ভ্রান্ত পরিবারে অন্দর মহলে শিক্ষিতা বৈষ্ণবীদের গৃহ-শিক্ষিকারূপে নিযুক্ত করা হতো।[৯৫] বৈষ্ণবগণ সামাজিক ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন।

বিশেষভাবে বৃন্দাবন দাস ধর্মীয় সহিষ্ণুতার উপরে জোর দেন। তিনি স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন যে, বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে অত্যাচারের, এবং অত্যাচারীর সম্পর্ক নেই।[৯৬] তাছাড়া, ভক্তির তত্ত্বে সদাচার প্রাধান্য পেল। অর্থাৎ, ভক্তি, চিন্তার ক্ষেত্রে কিংবা জীবনাচরণের ক্ষেত্রে নৈরাজ্যবাদী বিশৃঙ্খলা নয়; ভক্তি, বৈষ্ণব অর্থে, একটি গঠনমূলক তত্ত্ব।

উত্তর ভারতের মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বৈষ্ণব প্রভাব দেখা যায়, গৌড়ীয় গোস্বামীদের তৎপরতায় তার কেন্দ্র হলো বৃন্দাবন। এভাবে বাংলা-দেশের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার অবসান হলো; রাঢ়বঙ্গের সঙ্গে সমগ্র ভারতের ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপিত হলো।

একথা অনস্বীকার্য যে, চৈতন্যের ধর্মান্দোলনের কোনো রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক অভিপ্রায় ছিল না। চৈতন্যের কোনো রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চিন্তার প্রমাণ নেই। তবুও দু-একটি ক্ষেত্রে বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের প্রভাব কিছুটা অনুমান করা যায়। প্রথমত, পূর্বে ধনীদের উদ্বৃত্ত অর্থ স্মৃতি-শাস্ত্রানুমোদিত অনুষ্ঠানে ব্যয় করা হতো। বৈষ্ণব আন্দোলনের ফলে সেই অর্থে মহোৎসব, নামকীর্তন, নগরকীর্তন ও মেলা হতে থাকে। রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দের 'চিড়ামহোৎসবে'র ব্যয়ভার বহন করেন। পরে বড়ো বড়ো মহোৎসব হয়েছে কাটোয়াতে, মেদিনীপুরে এবং খেতুরিতে। খেতুরির উৎসবের ব্যয়ভার বহন করেন নরোত্তম দত্তের জ্ঞাতি-ভাই 'রাজা' সন্তোষ দত্ত। মেলা, মহোৎসব গ্রামীণ অর্থনীতিকে কিছুটা সচল করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব গুরু এবং মহান্তগণও ধনী হতে থাকেন।[৯৭]

৯৪. 'ভি. আই. বি.', অধ্যায় নয়, পৃ. ১৭৪-১৮৩।
৯৫. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', কলিকাতা, ১৯১৯, পৃ. ৬২; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রের সেকালের কথা', কলিকাতা, ১৯৩৩, ১, পৃ. ২০৯।
৯৬. 'চৈ-ভা', পৃ. ১৫৫: 'বিষ্ণু পূজিয়াও প্রজার পীড়া করে। পূজাও নিষ্ফলে যায় আরো দুঃখে মরে॥ ...যত পাপ হয় প্রজাগণের হিংসনে। তার শতগুণ হয় বৈষ্ণব নিন্দনে॥ ...এক অবতার ভজে না ভজয়ে আর। কৃষ্ণ রঘুনাথে করে ভেদ ব্যবহার॥ বলরাম শিব প্রতি প্রীত নাহি করে। ভক্তাধম শাস্ত্রে কহে এ সব জনারে॥'
৯৭. 'ভি. আই. বি.', পৃ. ৩৩৫-৩৩৭; ম্যাক্স ওয়েবার, 'দ্য রিলিজিয়ন অফ ইন্ডিয়া', গ্লেনকো, ১৯৬২, পৃ. ৩২৩।

দ্বিতীয়ত, দেশী ও বৈদেশিক বিবরণ থেকে জানা যায়, সতেরো শতকে কৃষির ও শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনে বাংলা দেশ প্রশংসনীয়ভাবে প্রাগ্রসর ছিল।[৯৮] লোকের আয় এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাণিজ্য সমৃদ্ধ হয়। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অত্যাচার ছিল ; কর আদায়কারীরা তেমন কিছু দয়ালু ছিলেন না। অর্থনীতির ক্ষেত্রে অন্যান্য অসুবিধাও ছিল। কিন্তু তারপরেও এমন ধারণা হয় যে, ধর্মের ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈষ্ণবতা উদারভাবপূর্ণ বাতাবরণ সৃষ্টি করে। তার প্রভাব উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পড়েছিল। ধর্মীয়-সামাজিক উদারতা প্রাথমিক উৎপাদকদের যথেষ্ট উৎসাহিত করেছিল। এ ধারণার ভিত্তি হলো এই যে, ১৮৭০-এর পরে যে জনগণনা হয়, তাতে প্রাথমিক উৎপাদকদের বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধার প্রমাণ আছে। অধিকাংশ শূদ্র-জাতি ছিল বৈষ্ণব ভাবাপন্ন।[৯৯]

৯

যদুনাথ সরকার এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত প্রচার করেন যে, বৈষ্ণব ধর্ম বাঙালি এবং উড়িয়াদের দুর্বল করে ফেলেছিল।[১০০] এই মতের কোন সুনির্দিষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য প্রমাণ তাঁরা দিতে পারেন নি। সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এবং সুশীলকুমার দে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভাবালুতা এবং নীতিহীনতা পছন্দ করেন নি।[১০১] অন্য ধরনের ভাববাদ সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের বিশেষ আপত্তি নেই। সুশীলকুমার দে বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্বে নিহিত সদাচারের কথা মনে রাখেন নি। এ-সব ভুল এবং বিকৃত মূল্যায়নের ফলে বৈষ্ণবদের প্রতিক্রিয়া বিরূপ হয়ে ওঠে।[১০২]

৯৮. তপন রায়চৌধুরী, 'বেঙ্গল আন্ডার আকবর এ্যান্ড জাহাঙ্গীর', দিল্লী, ১৯৬৯, অধ্যায় ৪, পৃ. ২০৪, ২০৫, ২০৯।

৯৯. এইচ এইচ রিজলী, 'দা ট্রাইবস এ্যান্ড কাস্টস্ অব বেঙ্গল', কলিকাতা, নূতন সং ১৯৮১, দুই খণ্ড, ১, পৃ. ৪৪২।

১০০. যদুনাথ সরকার, 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল', মুসলিম পিরিয়ড, পাটনা সং, ১৯৭৭, পৃ. ২২২ ; আর ডি ব্যানার্জী, 'হিস্ট্রি অফ ওড়িষ্যা', কলিকাতা, ১৯৩০-৩১, দুই খণ্ড, ১, পৃ. ৩৩০-৩১, ৩৩৬।

১০১. এস. এন. দাসগুপ্ত, 'এ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান ফিলসফি', ১৯৬১ সং, ৪, পৃ. ৩৮৯ ; এস. কে. দে, 'আর্লি হিস্ট্রি অফ দ্য বৈষ্ণব ফেথ এ্যান্ড মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া', কলিকাতা, ১৯৬১, পৃ. ৫৪৬।

১০২. দ্রষ্টব্য : কে এল দত্ত ও কে এম পুরকায়স্থ, 'দ্য বেঙ্গল বৈষ্ণবিজম এ্যান্ড মডার্ন লাইফ', কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ৮৪-৯৮ ; একজন বৈষ্ণব লেখক লিখেছিলেন : 'সর্বোচ্চ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন' (ভক্তি প্রদীপতীর্থ, 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু', মাদ্রাজ, ১৯৪৭, দ্বিতীয় সং, পৃ. ৯)।

তাই বৈষ্ণব ইতিহাসতত্ত্ব নূতনভাবে বিচার্য। চৈতন্যের আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল সদর্থক ফলসমূহ সহজেই চোখে পড়ে; কিন্তু তা সর্বভাবেই সার্থক হয় নি। তার বহু ত্রুটি এবং দুর্বলতা ছিল। এগুলো এখন সংক্ষেপে আলোচনা করি।

প্রথম থেকেই ব্রাহ্মণগণ এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ক্রমশ তাঁদের প্রাধান্য দুষ্প্রতিরোধ্য হয়ে উঠল। 'গোস্বামী শাস্ত্রে' তাই প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে ভাষা সংস্কৃত; প্রমাণ, পৌরাণিক; তত্ত্ব, বৈদান্তিক; রসের বিচার, প্রাচীন রসশাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল; স্মৃতি, ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির বৈষ্ণবীয় রূপ।

দ্বিতীয়ত, 'মধুর ভাব' এবং 'মধুর রস' প্রভৃতি যৌনতাগ্রস্ত চিন্তাধারার পরিণাম ভালো হয় নি। 'মধুর ভাব' থেকেই এল রাধাকৃষ্ণলীলার স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন। তাতে ভক্তির যা কিছু সামাজিক অর্থ ছিল, তা অবলুপ্ত হলো। অন্যদিকে সন্ন্যাসের উপরে জোর দেওয়া হলো। তার ফলে, চৈতন্যের আন্দোলন যুক্তিহীন হয়ে পড়ল। একদিকে সন্ন্যাস, কঠোর তপস্যা, আত্মনিগ্রহ, উপবাস। অন্যদিকে সর্বদা কৃষ্ণের যৌনলীলার স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন। নিত্যানন্দের দাস্যভাব, 'মঞ্জরী'-উপাসনায় 'দাসীভাব' হয়ে দাঁড়াল। ব্রজের 'মঞ্জরী উপাসনা'র মাহাত্ম্য ঘোষিত হলো। মঞ্জরীভাবভাবিত বৃদ্ধ বৈষ্ণব শাড়ি পরে দাসী সাজলেন।[১০৩] এককথায়, বৈষ্ণব রহস্যবাদের কোনো পার্থিব তাৎপর্যই রইল না।

রাধাকৃষ্ণলীলার 'মনন'কে শৃঙ্খলিত করার জন্য তৈরি করা হলো রসতত্ত্বের এবং বৈষ্ণব স্মৃতির আইন-কানুন। রসতত্ত্বের নিয়ম মেনে রচিত হলো বৈষ্ণব গীতিকবিতা; নিয়মের ও রীতির মধ্যে সংযমিত হলো কীর্তন। ফলত ক্রমশ ভক্তির উচ্ছ্বাস অদৃশ্য হলো; তার জায়গায় এল অলংকার এবং অলঙ্করণ। বৈষ্ণব কবিতা, গান প্রাণহীন হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব স্মৃতিতে ব্রাহ্মণবৈষ্ণব গুরুর প্রাধান্যই স্বীকৃত হয়;[১০৪] সেখানে 'চণ্ডাল দর্শনজাত পাপক্ষালনের উপায় পর্যন্ত বর্ণিত হয়।[১০৫]

চৈতন্যের সময় থেকে ধনী জমিদার, বণিক এবং উচ্চপদস্থ সরকারি আমলাদের বৈষ্ণব করার জন্য চৈতন্য সহ অনেক বৈষ্ণবই উদ্যোগী হন। রাজা প্রতাপরুদ্র, সনাতন, রূপ, রামানন্দ রায়, রঘুনাথ দাস চৈতন্যের অনুবর্তী হলেন।

১০৩. 'ভি. আই. বি', পৃ. ২৩৮-২৪০; হরিদাস, "সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজি", 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবন', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯১; "ললিতা সখী", তদেব, পৃ. ৩৭৪-৩৮৬।

১০৪. 'হরিভক্তিবিলাস,' পূর্বোক্ত, পৃ. ২১, শ্লোক ৩৭; পৃ. ২২, শ্লোক ৩৮।

১০৫. তদেব, পৃ. ১৩৮৭।

অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য ছিলেন শ্রীহট্টের লাউড় নামক স্থানের রাজা দিব্যসিংহ। সপ্তগ্রামের বণিকরা নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীনিবাস আচার্য বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরকে চৈতন্যদাস' নাম দিয়ে দীক্ষিত করেন। নরোত্তম দত্তের শিষ্য ছিল উত্তরবঙ্গের বহু 'রাজা' এবং 'ভুঁইঞা'-দের গুরু হলেন শ্যামানন্দ, এবং শ্যামানন্দের শিষ্য, রয়নীর রাজপুত্র, রসিকানন্দ।[১০৬] পরে শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবরা কাশিমবাজারের রাজবংশের আনুগত্য লাভ করেন।[১০৭] ত্রিপুরার রাজবংশ, এবং মণিপুরের রাজবংশ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে।[১০৮]

ব্রাহ্মণ, উচ্চশূদ্র, রাজা, মন্ত্রী, ভুঁইয়া, আমলা, বণিক—এঁরা কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ব্রাহ্মণ্য রূপে মুগ্ধ হন। এই ধর্ম ব্রাহ্মণ্য-ধর্মীয় ঐতিহ্যের অঙ্গ হয়ে পড়েছিল। প্রখ্যাত শূদ্র গুরু নরোত্তম, এবং শ্যামানন্দ সম্ভবত খেতুরি উৎসবে 'ব্রাহ্মণত্ব' অর্জন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের সমতার কথা বলা হলো ; অর্থাৎ দীক্ষিত বৈষ্ণব এবং দ্বিজ ব্রাহ্মণ যে সমান, তা গুরু-মহান্তগণ প্রচার করলেন।[১০৯] এই অর্জিত ব্রাহ্মণত্বের জন্যই ক্রমশ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আচারনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। তাঁদের ধর্মে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ব্রাহ্মণত্বের এবং আভিজাত্যের সংক্রাম দুর্নিবার হয়ে উঠল। বৃহত্তর জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরা 'শ্রীপাট'-সমূহে এবং বিভিন্ন মঠে আশ্রয় নিলেন।

১০

বৈষ্ণব ধর্মের একটা প্রাচীন, তান্ত্রিকতা-মিশ্রিত স্তর ছিল। সহজিয়া কবি চণ্ডীদাস এই স্তরের বৈষ্ণব ছিলেন। ধর্মান্দোলনের ফলে সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কমে যায় ; এক সময়ে বণিক এবং বৈশ্যরা তার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিন্তু পরে তাঁরা বৈষ্ণব হলেন, তাঁর ফলে সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্ম অপ্রচলিত হয়ে পড়ল। বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র বৌদ্ধ নেড়া-নেড়ীদের (মস্তক মুণ্ডনের ফলে নেড়া) দীক্ষা দিয়েছিলেন।[১১০] কিন্তু মনে হয় বৈষ্ণব হলেও নেড়া-নেড়ীগণ তাঁদের পূর্বাবস্থা ভুলতে পারেন নি।

১০৬. 'ডি. আই. বি', অধ্যায় পঁচিশ, পৃ. ২২৪-২৫৬।
১০৭. সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, "সেই বিখ্যাত কান্তবাবুর দুইটি হিসাবের বই", 'ঐতিহাসিক', প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৭৯, পৃ. ২৮-৫৪।
১০৮. দ্রষ্টব্য : দীনেশচন্দ্র সেন, 'বৃহৎ বঙ্গ', কলিকাতা, ১৯৩৬, দ্বিতীয় খণ্ড।
১০৯ মধুসূদন তত্ত্বনিধি, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস', হুগলী, ১৯২৬, দ্বিতীয় সং, পৃ. ২৫৩-২৫৪।
১১০. 'ডি. আই. বি', অধ্যায় নয়, পৃ. ১৭৯-১৮৩।

প্রথম থেকেই বৈষ্ণবদের মধ্যে কেউ কেউ প্রচলিত মত গ্রহণ করতে পারেন নি। পরে তাঁরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বকে ব্যবহারিক পর্যায়ে নামিয়ে আনেন।[১১১] কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্য-জীবনীতে যে প্রেমতত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, সহজিয়া বৈষ্ণবরা তা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করতে থাকেন। বাংলাদেশে কোথাও কোথাও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার মধ্যেই সহজিয়া যৌনতার অনুপ্রবেশ দেখা গেল। তার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বর্ধমানের বাঘনাপাড়ার বৈষ্ণবদের 'রসরাজ'-উপাসনাতত্ত্ব।[১১২]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা যতই জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকলেন, ততই এসব বৈষ্ণব 'উপ-সম্প্রদায়' সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। পঞ্চাশটিরও বেশি উপ-সম্প্রদায় গঠিত হয়। বিখ্যাত উপ-সম্প্রদায় ছিল জগন্মোহনী সম্প্রদায়, কিশোরীভজন সম্প্রদায়, বাউল সম্প্রদায়, কর্তাভজা সম্প্রদায় প্রভৃতি। এ-সব সম্প্রদায়ের মূল কথা ছিল গুরুপূজা।

এইসব উপ-সম্প্রদায়ের গুরুগণ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তাঁদের মত অনুসারে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। এত বেশি লোক বৈষ্ণব হলো যে, 'জাত-বৈষ্ণব' নামে একটি বিশেষ জাতি তৈরি হলো।[১১৩] কট্টর মৌলবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই মত প্রচার করলেন যে, 'জাত বৈষ্ণব'-রা ব্যভিচারী কুক্রিয়াসক্ত, এবং আসলে বৈষ্ণবই নয়।[১১৪]

অথচ, বৈষ্ণবতার এই 'ক্ষুদ্র ঐতিহ্য'-কে কোনো রকমেই অবহেলা করা যায় না। এই ঐতিহ্য শক্তিশালী ছিল বলেই ধর্মীয় ঐক্যের ধারণা শক্তিশালী হয়েছিল। সহজিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে কখনো কখনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বলিষ্ঠ চেতনার প্রকাশ দেখা যায়।[১১৫] মুসলমান ফকির এবং বৈষ্ণব একে অপরের বন্ধু হন।[১১৬] এই ধর্মীয় উদারতার বাতাবরণে শাক্ত কবি রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য কালী-কৃষ্ণের অভিন্নতা সম্পর্কে গান রচনা করেন।[১১৭]

১১১. দ্রষ্টব্য : ই. সি. ডিমক, 'দ্য প্লেস অফ দ্য হিডেন মুন', শিকাগো, ১৯৬৬, "নায়িকা সাধনা টীকা", পৃ. ২০৪-২০৫।
১১২. 'ভি আই. বি.', অধ্যায় ষোলো, পৃ. ২৫৭-২৭৪।
১১৩ বিপিনচন্দ্র পাল, 'বেঙ্গল বৈষ্ণবিজম', কলিকাতা, ১৯৩৩, পৃ. ১২৯-১৩০।
১১৪ 'ভি. আই. বি.', পৃ. ৩৩৩-৩৩৫।
১১৫ ঐ, পৃ. ৩৭০-৩৪২।
১১৬ ঐ. পৃ. ৩৪২-৩৪৪।
১১৭. দ্রষ্টব্য : অমরেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদিত), 'শাক্তপদাবলী', ১৯৭১, নবম সং, পদ ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ২২০, ২২১, ২৬২ প্রভৃতি।

লোকধর্মরূপে যে বৈষ্ণব ধর্মের কথা আমরা জানি, তা ঠিক গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম নয়। তা এ-সব উপ-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ধর্ম, যা বৌদ্ধ সহজ ভাবধারা, হিন্দু তন্ত্র এবং কখনো কখনো সুফীবাদ-প্রভাবিত। সুফীবাদের সঙ্গে বৈষ্ণবতার ক্ষুদ্র-ঐতিহ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বহু মুসলমান লোককবিকে চৈতন্য এবং রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক গীত-রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল।[১১৮] বিষয়টি সম্পর্কে গভীরতর গবেষণা বাঞ্ছনীয়।

১১৮. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, 'বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি', কলিকাতা, ১৯৬২; গুরুসদয় দত্ত ও নির্মলেন্দু ভৌমিক (সম্পাদিত), 'শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত', কলিকাতা, ১৯৬৬।

শাক্তধর্ম ও তন্ত্র

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

তন্ত্র কী ও কেন

'মনুস্মৃতি'র টীকাকার কুল্লুকভট্টের মতে শ্রুতি বা জ্ঞান দ্বিবিধ : বৈদিক ও তান্ত্রিক। বেদ তথা বৈদিক সাহিত্য বস্তুতপক্ষে সুপ্রাচীনকালের মানুষের অর্জিত বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সংকলন। কিন্তু নানা ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রে বৈদিক সাহিত্যের বিষয়বস্তুর চেয়েও, বেদসমূহে বর্ণিত ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারা একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। বেদ অপৌরুষেয় হিসাবে ঘোষিত হয়। বেদের পঠন-পাঠন, ব্যাখ্যা ও আলোচনা ক্রমশ দ্বিজাতি, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। বেদ একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক, দার্শনিক ও সামাজিক আদর্শের প্রতীক হয়ে ওঠে, যে আদর্শ প্রধানত প্রভাবশালী সামাজিক শ্রেণীর জীবনচর্যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু যেহেতু জ্ঞানচর্চা কখনও এক জায়গায় থেমে থাকতে পারে না. বিশেষ করে জাগতিক বা বৈষয়িক জ্ঞানের ক্ষেত্র যখন প্রতিনিয়তই প্রসারমান, সেই প্রসারমান জাগতিক জ্ঞানই তন্ত্রগ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু। তন্ত্র সম্পর্কে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই একটা অলীক ধারণা আছে, যা অপনোদনের জন্যই জানা প্রয়োজন তন্ত্র বলতে আসলে কী বোঝায়। কারিগরী বিদ্যা, কৃষি, পশুপালন, বয়নশাস্ত্র, রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা, শল্যবিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় বৈষয়িক জ্ঞানই তন্ত্রের আদি বিষয়বস্তু।

তন্ত্রের আদি-সামাজিক ভিত্তি

যেহেতু বেদের মতো তন্ত্রের বিষয়বস্তু প্রাচীন জ্ঞান, এবং প্রধানত জাগতিক জ্ঞানের বিকাশ অনভিজাত সাধারণ মানুষের প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল, স্বাভাবিকভাবেই তন্ত্রের প্রকৃতি একান্তই লোকায়ত। ভারতীয় সমাজ অসংখ্য বৃত্তিজীবী জনগোষ্ঠীর দ্বারা গঠিত একটি বহুত্ববাদী সমাজ। এই বৃত্তিজীবী জনগোষ্ঠীসমূহ 'জাতি' বা 'কাস্ট' হিসাবে পরিচিত। সামাজিক কাঠামোয় এই সকল বৃত্তিজীবী জাতির অবস্থান ও মর্যাদার ভেদ থাকলেও, প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর বৃত্তিগত এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা স্বীকৃত। সকল

জাতিই তার নিজস্ব সামাজিক বিধিবিধান ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলতে পারবে এটা স্বীকার করে নিয়েই এই সকল জাতিকে বর্ণ ব্যবস্থার অধীন করা হয়েছে। এই সকল বৃত্তিজীবী মানুষের হাতেই যেহেতু ব্যবহারিক তন্ত্রসমূহ রচিত হয়েছিল, সাধারণ নিয়মেই এই সকল জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব যে তন্ত্রসমূহের উপর পড়বে, এক্ষেত্রে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তদুপরি এই সকল 'জাতি' বা বৃদ্ধিজীবী জনগোষ্ঠী যেহেতু আদিতে উপজাতীয় বা কৌমসমাজের অন্তর্গত ছিল (জাতিপ্রথাকে কৌম-সমাজের অসমাপ্ত বিলোপের পরিণাম বলা হয়) সেই হেতু স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন আদিম কৌমসমাজের বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির প্রতি-ফলন তন্ত্রে থাকতে বাধ্য। ফলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন তন্ত্রে জাগতিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাশাপাশি এমন কিছু কিছু ধর্মীয়, দার্শনিক ও আচার-অনুষ্ঠানগত ধ্যান-ধারণার বিকাশ ঘটেছে যেগুলি বৈদিক আদর্শের বিরোধী, এবং সেই কারণেই তন্ত্রকে বেদবাহ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

তান্ত্রিক বিশ্বতত্ত্বের গোড়ার কথা

দুই-একটি উদাহরণের দ্বারা বিষয়টিকে একটু স্পষ্ট করা যেতে পারে। পৃথিবীর সর্বত্রই আদিম কৃষিজীবী কৌমসমাজে ধরণীর ফলোৎপাদিকা শক্তিকে নারী-জাতির সন্তান-উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে অভিন্ন করে দেখার রীতি বর্তমান। সংস্পর্শ বা অনুকরণের দ্বারা একের প্রভাব অন্যের উপর সঞ্চারিত করা সম্ভব এই বিশ্বাসকে অবলম্বন করে অনেক আচার-অনুষ্ঠান ও ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। মানবীয় প্রজনন ও প্রাকৃতিক উৎপাদন যে একই সূত্রে গ্রথিত এই ধারণাকেই অবলম্বন করে সাংখ্য দর্শনে ও তন্ত্রে প্রকৃতি ও পুরুষের ধারণা গড়ে উঠেছে। প্রকৃতির রহস্য মানবদেহেরই রহস্য, কারণ মানবদেহই বিশ্ব-প্রকৃতির সংক্ষিপ্তসার। এই কারণেই তন্ত্র সাধনায় দেহতত্ত্ব ও কাম সাধনার গুরুত্ব অপরিসীম। তন্ত্র মতে, 'যা আছে দেহভাণ্ডে, তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে।' অর্থাৎ দেহরহস্যের মধ্যেই বিশ্বরহস্যের পরিচয় বা মূল সূত্র অনুমেয়। এই সকল ধারণার সঙ্গে বৈদিক ঐতিহ্যবাহী বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের ধারণা—যার উদ্ভব উপনিষদে এবং পরিণতি বেদান্ত দর্শনে—সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন।

তন্ত্রের পল্লবিত রূপ

তান্ত্রিক সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের জানাশোনার ক্ষেত্র এখনও পর্যন্ত সীমা-বদ্ধ। তন্ত্র অত্যন্ত প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ তান্ত্রিক গ্রন্থই মধ্য ও

শেষ-মধ্যযুগে রচিত। এই গ্রন্থগুলিতে প্রচুর বাড়তি ব্রাহ্মণ্য ও বৈদিক উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে যার ফলে তন্ত্রের মূল বক্তব্য সমূহ বিপর্যস্ত হয়েছে। তন্ত্র নিয়ে যে সকল আধুনিক চর্চা হয়েছে, সেগুলি এই অনুপ্রবিষ্ট ব্রাহ্মণ্য উপদানগুলির চর্চা। উনিশ শতকের পন্ডিতদের অধিকাংশই তাঁদের যুগের নীতিবোধের তাগিদে তন্ত্রকে একটি অশ্লীল ব্যাপার ও বিকৃত ধর্মাচরণ বলেই দায়িত্ব শেষ করেছেন। অবশ্যই তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চতত্ত্বের সাধনা হিসাবে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এইগুলির তাৎপর্য যে আনুষ্ঠানিক এবং প্রতীকী সেটা অনুধাবন না করেই বহু পশ্চিমী ও ভারতীয় পন্ডিত তন্ত্রকে এক ধরনের যৌনাচারী ধর্ম হিসাবে প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। এরই পরিণামে আধুনিককালের সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে তন্ত্র ও তান্ত্রিকতার দোহাই দিয়ে অসংখ্য বিকৃত মনগড়া বক্তব্যকে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করার কাজকে যুক্তিসহ করার জন্য একশ্রেণীর তথাকথিত তান্ত্রিক গুরুরও আমদানি হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এই সকল বিষয়ের সঙ্গে তন্ত্রের কোনো সম্পর্কই নেই। পক্ষান্তরে যাঁরা তন্ত্র নিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যোগ্যতা সহকারে কাজ করেছেন—যেমন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, স্যার জন উডরোফ, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, অটলবিহারী ঘোষ প্রভৃতি—তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁদের অগাধ পান্ডিত্য সত্ত্বেও তাঁরা তন্ত্রের মূল ও আরোপিত অংশের পার্থক্য করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। তাঁরা তান্ত্রিক ঐতিহ্যকে বৈদিক ঐতিহ্যের পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করেছেন, এবং তন্ত্রশাস্ত্রকে বেদান্তেরই একটি শাখায় পরিণত করার জন্য প্রভৃত পরিশ্রম করেছেন। বেদান্তের বক্তব্যের সঙ্গে তন্ত্রের বক্তব্যের যে কোনো বিরোধ নেই এটা প্রদর্শন করার জন্য তাঁরা তন্ত্রের সেই অংশের উপর নির্ভর করেছেন সেগুলি ব্রাহ্মণ্য হস্তাবলেপে তন্ত্রের উপর প্রক্ষিপ্ত।

সকল ভারতীয় ধর্মেরই তান্ত্রিক ধারা বর্তমান : জৈন ও বৌদ্ধধর্ম

আরও একটি ভ্রান্ত ধারণা বহুলপ্রচলিত যা হচ্ছে শাক্তধর্ম ও তন্ত্র যেন একই মুদ্রার দুই দিক। এই ধারণা মোটেই সঠিক নয়। ভারতীয় ধর্মচেতনার বিকাশের প্রভাতকাল থেকেই একটি বিকল্প লোকায়তিক জ্ঞান, কর্ম ও সাধনার ধারা হিসাবে তান্ত্রিক ধারাটি বরাবর বিদ্যমান ছিল। প্রাচীনতম এই লোকায়তিক ধারণার বিকাশ ঋগ্বেদের কিছু অংশে, অথর্ববেদ এবং ব্রাহ্মণ্যগ্রন্থগুলির বহু অংশে দেখা যায়। যেহেতু বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম বেদ ও ব্রাহ্মণ্য-

সংস্কৃতি-বিরোধী, বেদবাহ্য তান্ত্রিক ধারাটি অতি সহজেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে স্থান পেয়ে যায়, এবং উভয় সম্প্রদায়ের সংঘেই তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতি বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে। বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে আদিম তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার বিশেষ সম্পর্কের একটি যুক্তিসঙ্গত কারণ বর্তমান। প্রাচীনতম তান্ত্রিক বিশ্বাসে মানবদেহের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব অর্পিত। এই পর্যায়ের ধ্যান-ধারণায় দেহাতিরিক্ত আত্মার কোনো কল্পনা একেবারেই অনুপস্থিত। পরবর্তীকালের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অন্যান্য সম্প্রদায়ের চিন্তাশীলেরা—বিশেষত আত্মবাদী বা অধ্যাত্মবাদীরা—এই কারণেই এই লোকায়তিক-তান্ত্রিক দেহাত্মবাদকে (অর্থাৎ দেহ ও আত্মা একই, দেহাতিরিক্ত কোনো আত্মা নেই) অত্যন্ত গর্হিত বলে বিবেচনা করেছিলেন। বুদ্ধ কিন্তু এই লোকায়ত-তান্ত্রিক দেহাত্মবাদকেই (নৈরাত্ম্যবাদ) গ্রহণ করেছিলেন এবং দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। সে যাই হোক, তান্ত্রিক ধারার অনুগামীরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পরেও নিজেদের প্রাচীন জীবনচর্যা ও সাধন পদ্ধতিকে বজায় রাখে ও সংঘের মধ্যেই নানা ধরনের গুহ্য সমাজের সৃষ্টি করে। তারা নিজস্ব শাস্ত্রগ্রন্থও প্রণয়ন করে, এবং তাদের বক্তব্যকে বুদ্ধের বক্তব্য বলে চালিয়ে দেয়। এই তন্ত্রসাধকদের প্রভাবেই পরবর্তীকালে 'তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে'র উদ্ভব হয়।

বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য ও শাক্তধর্মে তান্ত্রিকতার বিকাশ

বৈষ্ণব ও শৈব, উভয় ধর্মের ভিত্তি তান্ত্রিক। প্রাচীনতর পর্যায়ে এই উভয় ধর্মমত যথাক্রমে পাঞ্চরাত্র ও পাশুপত নামে পরিচিত এবং বেদবাহ্য হিসাবে গণ্য ছিল। পাঞ্চরাত্রের মূল তত্ত্ব ব্যূহবাদ যেখানে সাংখ্যোক্ত ও তন্ত্রোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বের সঙ্গে বৃষ্ণি-বীরদের সম্পর্কিত করা হয়েছে। পরবর্তীকালে অবশ্য বৈষ্ণবধর্ম সাংখ্যের পরিবর্তে বেদান্তের ঈশ্বরবাদী ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করে এবং এই ধর্মের প্রধান দেবতা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হিসাবে ঘোষিত হন। আজও পর্যন্ত বৈষ্ণব পূজাপদ্ধতির ক্ষেত্রে বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় রীতিই বর্তমান। বৈষ্ণবদের 'লক্ষ্মীতন্ত্র' শাক্তদের নিকটও প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত। শৈব পাশুপত ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পুরোদস্তুর তান্ত্রিক। কাপালিক, কালামুখ প্রভৃতি শৈব উপসম্প্রদায়সমূহ সর্বতোভাবে তন্ত্রনির্ভর। একথা আগমান্ত শৈবধর্মের ক্ষেত্রেও খাটে। পরবর্তীকালের শৈব সিদ্ধান্ত, বীরশৈব ও কাশ্মীর শৈবধর্মকে বেদান্তভিত্তিক করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সেগুলির উপর তান্ত্রিক প্রভাব বরাবরই বিদ্যমান ছিল, এখনও আছে। গাণপত্য সম্প্রদায়,

বিশেষ করে উচ্ছিষ্ট-গণপতির উপাসকবৃন্দ নিজেদের খোলাখুলিভাবেই তান্ত্রিক বলে দাবি করে। শাক্তধর্মের ক্ষেত্রে তন্ত্রের প্রভাব এতই বেশি যে সাধারণ মানুষ শাক্তধর্ম ও তান্ত্রিকতাকে সমার্থক বলে মনে করে।

শক্তির ভূমিকা : কায়সাধনা

বাংলাদেশে পাল রাজাদের আমল থেকেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটে। বঙ্গের কৃষিজীবী সমাজে স্বাভাবিকভাবেই দেবীপ্রাধান্যমূলক ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। এই দেবীকেন্দ্রিক জীবনচর্যা উত্তরকালে শাক্ত-ধর্মে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কৃষিজীবী সমাজের সুপ্রাচীন মাতৃদেবীর ধারণাই কালক্রমে সকল জাগতিক উপাদানের প্রতিরূপ বা প্রকৃতি এবং সেগুলির কার্যকারিতার মূল প্রেরণা বা শক্তি হিসেবে কল্পিত হয়েছিল। বৈষ্ণবধর্মে এই শক্তিই বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী বা কৃষ্ণের শক্তি রাধা হিসাবে কল্পিত হয়েছে, শৈবধর্মে এই শক্তিই শিবের শক্তি দেবী। তন্ত্রমতে সৃষ্টিকার্য পুরুষ ও নারী উভয় আদর্শের সংযোগের ফল, তবে গুরুত্বের বিচারে নারী শ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধতন্ত্রে এই দুই আদর্শ প্রজ্ঞা ও উপায়। অথবা শূন্যতা এবং করুণা। প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনই হচ্ছে যুগনদ্ধ বা সমরস, নিজের ক্ষেত্রে যিনি তা ঘটাতে পারেন, তিনিই পূর্ণজ্ঞান ও পরম সুখ লাভ করেন এবং জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হন। দেহই সকল সত্যের আবাসস্থল, বিশ্বের যা কিছু রহস্য তা দৈহিক ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। হিন্দুতন্ত্রে দেহের মধ্যে ষট্‌চক্রের বা ছয়টি স্নায়ুচক্রের কথা আছে যেগুলি হলো মূলাধার (পায়ুদেশ ও লিঙ্গ-মূলের তলদেশের মধ্যবর্তী অংশ), স্বাধিষ্ঠান (লিঙ্গমূলের উপর দিক), মণিপুর (নাভি অঞ্চল), অনাহত (হৃৎপিণ্ড অঞ্চল), বিশুদ্ধ (সুষুম্নাকাণ্ড ও গুরু-মস্তিষ্কের নিম্নভাগের সংযোগস্থল) এবং আজ্ঞা (দুই ভুরুর মধ্যবর্তী অংশ)। এছাড়া সর্বোচ্চ মস্তিষ্ক অঞ্চলকে বলা হয় সহস্রার। কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা সেই শক্তি ইড়া-পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়ের মাধ্যমে সহস্রার অঞ্চলে নিয়ে যেতে পারলেই এই শক্তি তার উৎসে মিলিত হতে পারে। বৌদ্ধতন্ত্রেও অনুরূপ তিনটি স্নায়ুচক্রের কথা আছে, যেগুলি বুদ্ধের ধর্মকায়, সম্ভোগকায় ও নির্মাণকায়ের প্রতীক। এছাড়া আরও একটি চক্র আছে যা উষ্ণীষকমল বা সর্বোচ্চ মস্তিষ্কে অবস্থিত, বুদ্ধের বজ্রকায় বা সহজকায়ের প্রতীক। নির্মাণচক্রে একটি অগ্নিময়ী নারী শক্তি বর্তমান, যা চণ্ডালী নামে পরিচিত। এই চণ্ডালী ধর্মচক্র ও সম্ভোগচক্রকে প্রজ্বলিত করে উপর দিকে

উঠতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত উষ্ণীষকমল বা মস্তিষ্ক অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে আবার সেখান থেকে স্বস্থানে নেমে আসে।

বঙ্গদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম

খ্রীস্টীয় অষ্টম শতক থেকেই বঙ্গদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক অনুপ্রবেশের ফলে যে গুণগত রূপান্তর হয় তার ফলে দুইটি বিশিষ্ট সাধন পদ্ধতির উদ্ভব হয় – মন্ত্রযান ও পারমিতাযান। মন্ত্রযান হচ্ছে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক স্তর যেখানে মন্ত্র, ধারণা, মুদ্রা, মণ্ডল, অভিষেক প্রভৃতির প্রচলন ঘটে। বজ্রযান মন্ত্রযানেরই বিবর্তিত রূপ। সেখানে শূন্যতার স্থানে বজ্র শব্দটির ব্যবহার হয়। বজ্র বলতে তাই বোঝায় আত্মা এবং ধর্মসমূহের, অর্থাৎ অস্তিত্বর মূলে সত্তাসমূহের, অপরিবর্তনীয় শূন্য প্রকৃতি। বজ্রযানে পরম সত্য হিসাবে যাঁকে কল্পনা করা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন বজ্রসত্ত্ব, কখনও কখনও যিনি বজ্রধর নামেও পরিচিত, যিনি শূন্যতা ও করুণার অন্বয় অবস্থার প্রতীক। বজ্র-সত্ত্বকে আদিবুদ্ধও বলা হয় যাঁর থেকে বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘ-সিদ্ধি ও অক্ষোভ্য নামক পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধের উদ্ভব হয়েছে যাঁরা যথাক্রমে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধের প্রতীক। বজ্রসত্ত্বের সঙ্গিনীর নাম বজ্রসত্ত্বাত্মিকা এবং ধ্যানীবুদ্ধগণের সঙ্গিনীদের নাম বজ্রধাত্বীশ্বরী, লোচনা, মামকা, পাণ্ডরা ও আর্যতারা। আনুমানিক দশম শতকে বজ্রযানের আওতায় বঙ্গদেশে কালচক্রযান নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের একটি শাখা গড়ে ওঠে। এই সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ দেবতা শ্রীকালচক্র। 'কাল' শব্দটির অর্থ – প্রজ্ঞা বা শূন্য অস্তিত্ব, 'চক্র' হচ্ছে জাগতিক পদ্ধতি, ওই দেবতার দেহের দ্বারা যা ব্যাপ্ত তা হচ্ছে 'উপায়'। অতএব কালচক্র প্রজ্ঞা ও উপায়ের অন্বয়াবস্থা। এছাড়া কালচক্রযানে কালের একটি স্বতন্ত্র কল্পনা আছে 'সময়' হিসাবে। প্রাণ-বায়ুর দ্বারা সময়ের বিভাগ ঘটে যা মানুষের প্রাণবায়ুর মধ্যে ছড়ানো থাকে। যোগাভ্যাসের দ্বারা এই প্রাণবায়ুকে সংযত করতে পারলে মানুষ সময়ের চক্রকে এড়াতে পারবে, যার ফলে তার সকল দুঃখের অবসান ঘটবে। বঙ্গদেশ ছাড়া এই কালচক্রযান মগধ, কাশ্মীর ও নেপালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

সহজযান ও তার প্রভাবের ক্ষেত্র

বজ্রযানের পর সহজযান বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশে জনপ্রিয় হয়। সহজযানী বৌদ্ধরা বজ্রযানের সকল নিয়মকানুন, আচার-অনুষ্ঠান, মন্ত্র, মণ্ডল ইত্যাদি বর্জন

করে। তাদের মতে সত্যোপলব্ধি একটা অন্তরের ব্যাপার, কোনো কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক উপায়ে তা হয় না। এই জন্য সহজ বা স্বাভাবিক পথ গ্রহণ করতে হবে, এবং তা হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির অনুবর্তী হওয়া। যা নেই দেহভাণ্ডে তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে, অতএব দেহই সকল সাধনার উৎস, লক্ষ্য ও মাধ্যম। যৌগিক পদ্ধতিতে কায়সাধনা, নাভিমূলে অবস্থিত নির্মাণচক্রে অবস্থানকারী নারীশক্তিকে জাগিয়ে তোলা, প্রভৃতি সহজযানী মার্গ। সহজিয়া সম্প্রদায়ের রচিত চর্যাপদ ও দোহাসমূহে তাদের সাধন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। বজ্রযানীদের মত সহজযানীরাও যুগনদ্ধে বিশ্বাসী, সাধক বুদ্ধ, তার শক্তি বুদ্ধের সঙ্গিনী, উভয়ের মিলনে পূর্ণ জ্ঞান ও মহাসুখ। চর্যা ও দোহাসমূহে তান্ত্রিক দেবীশক্তি নৈরাত্মা, ডোম্বী, চণ্ডালী, শবরী প্রভৃতি নামে পরিচিতা। এই নামগুলির ক্ষেত্র লোকায়ত প্রভাব লক্ষ্যণীয়। বজ্রযান ও সহজযানের প্রভাব বঙ্গদেশের বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। 'আনন্দভৈরব' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, শিব স্বয়ং শক্তিস্বরূপা কোচ নারীদের সঙ্গে সহজ সাধনায় নিরত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালের শিবায়ন কাব্যসমূহে এই সকল কাহিনী আরো পল্লবিত হয়েছে। 'চৈতন্য চরিতামৃত' এবং অকিঞ্চন দাসের 'বিবর্তবিলাসে' বলা হয়েছে যে, মহাপ্রভু স্বয়ং সহজিয়া মার্গে সাধনা করেছিলেন। মহাযান বৌদ্ধমতের করুণা ও শূন্যতা, তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের উপায় ও প্রজ্ঞা সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মে কৃষ্ণ ও রাধায় রূপান্তরিত হয়েছেন। নর ও নারী যথাক্রমে কৃষ্ণ ও রাধার প্রতিরূপ এবং তাদের মিলনেই সহজ মহাসুখের উদ্ভব হয়। এই মিলন দুই প্রকার—স্বকীয়া ও পরকীয়া। 'দীপকোজ্জ্বল', 'রতিবিলাসপদ্ধতি' প্রভৃতি সহজিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থে দুই ধরনের মিলনের কথা বলা হয়েছে—প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত।

সিদ্ধ পরম্পরা

বজ্রযান-কালচক্রযান-সহজযান পরিমণ্ডলে আরও একটি তান্ত্রিক ধারার উদ্ভব বঙ্গদেশে হয়েছিল যা সিদ্ধ ধারা নামে পরিচিত। এই ধারার অনুগামীদের লক্ষ্য ছিল সিদ্ধি বা অলৌকিক শক্তিলাভ। 'বর্ণরত্নাকর', 'শবরতন্ত্র' এবং বিভিন্ন তিব্বতী পুঁথিতে চুরাশীজন সিদ্ধের উল্লেখ আছে; প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই সকল সিদ্ধদের অধিকাংশ ছিলেন সমাজের অতি নিম্নবর্গের মানুষ। আরও একটি বিশেষ কথা এই প্রসঙ্গে বলার আছে। মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ-ভারতের সিদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে বঙ্গদেশের সিদ্ধরা বিশেষ যোগাযোগ রেখে

চলতেন। ভোগ বা বোগার নামক জনৈক চৈনিক তাও-পন্থী এই সিদ্ধ সমাজে বিশেষ স্থান করে নিয়েছিলেন। তিনি প্রথমে বঙ্গদেশে বসতি করেন, এবং তারপর দক্ষিণ-ভারতে আশ্রম স্থাপন করেন। সিদ্ধদের লক্ষ্য ছিল জীবন্মুক্তি অর্থাৎ অমরত্বের সাধনা। এই জন্য তাঁরা যৌগিক কায়সাধন ছাড়াও ঔষধপত্র ব্যবহারে বিশ্বাসী ছিলেন। এই সকল ঔষধ প্রধানত পারদ ও অভ্রের দ্বারা প্রস্তুত করা হতো। তাঁরা রসায়নশাস্ত্রের প্রভূত চর্চা করেছিলেন, এবং এই তান্ত্রিক রসায়নবিদ্যা রসেশ্বর দর্শন নামে পরিচিত হয়েছিল। চুরাশীজন সিদ্ধের তালিকায় কয়েকজন প্রসিদ্ধ নাথ সম্প্রদায়ের গুরুর নাম পাওয়া যায় যাঁরা তান্ত্রিক ঐতিহ্যবাহী ছিলেন। 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়' নামক গ্রন্থে মৎস্যেন্দ্র-নাথকে যোগিনী কৌলের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বলা হয়েছে। 'অকুলবীরতন্ত্র' নামক গ্রন্থের লেখকত্ব তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছে। গোরক্ষনাথ রচিত 'গোরক্ষ সংহিতা', জালান্ধরী বা হাড়িপা রচিত 'বজ্রযোগিনীসাধনা', 'শুদ্ধিবজ্র-প্রদীপ', 'শ্রীচক্রসংবরগর্ভতত্ত্বনিধি' 'হুংকারচিত্তবিন্দুভাবনাক্রম' প্রভৃতি তন্ত্রের কথা এখানে উল্লেখ করা চলতে পারে। অবধূত সম্প্রদায়েরও উদ্ভব বৌদ্ধ-তান্ত্রিক পরিমন্ডলে। বিখ্যাত বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধক অদ্বয়বজ্র অবধূতিপাদ নামে পরিচিত দিলেন। মহাপ্রভুর অন্যতম প্রধান শিষ্য নিত্যানন্দ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

শাক্তধারার বিকাশ

এ পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করলাম তা থেকে বোঝা যায় যে, সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় চিন্তাধারার একটি বিশেষ শাখায় এই মত ব্যক্ত হয়েছে যে সৃষ্টিকার্য দুইটি বিপরীতমুখী শক্তির সংযোগের ফলে সম্ভব হয়েছে। এই বিপরীত শক্তিদ্বয় পুরুষ ও নারীশক্তি হিসাবে কল্পিত। দার্শনিক পরিভাষায় প্রথমটিকে বলা হয় প্রকাশ এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় বিমর্শ। প্রথমটি শক্তির স্থির অবস্থা এবং দ্বিতীয়টি গতিশীল অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থাটি সক্রিয় না হলে সৃষ্টিকার্য সম্ভব নয়। সৃষ্টিকার্যে এই নারীপ্রাধান্য বা প্রকৃতিপ্রাধান্যের ভিত্তিতেই শাক্তধর্মের বিশেষ বিকাশ ঘটে। এখানে সর্বোচ্চ দেবতা বা পরম-সত্তা একজন নারীর ন্যায়ই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রসব করেছেন, এবং সেই হিসাবে তিনি আদ্যাশক্তি বা জগন্মাতা। এই শাক্ত আদর্শের বিকাশ সর্বভারতীয় হলেও পূর্ব-ভারতে, বিশেষ করে বঙ্গদেশে, এই আদর্শ আদি-মধ্য ও মধ্যযুগে একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। শাক্ত পুরাণসমূহের মধ্যে দেবীপুরাণ, কালিকা

পুরাণ ও দেবীভাগবত পূর্বাঞ্চলে রচিত হয়েছিল। এই পুরাণে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে আদ্যাশক্তিই একমাত্র সত্তা হিসাবে বর্তমান ছিলেন এবং নিজেকে প্রকৃতির তিনটি গুণস্বরূপ মহালক্ষ্মী (রাজস), মহাকালী (সাত্ত্বিক) এবং মহাসরস্বতী (তামস) ব্যক্ত করেন। মহালক্ষ্মী থেকে শ্রী এবং ব্রহ্মার উদ্ভব, মহাকালী থেকে ত্রয়ী ও রুদ্রের উদ্ভব এবং মহাসরস্বতী থেকে উমা ও বিষ্ণুর উদ্ভব। ব্রহ্মা এবং ত্রয়ীর সংযোগে জগতের সৃষ্টি, বিষ্ণু এবং শ্রীর সংযোগে জগতের স্থিতি এবং রুদ্র ও উমার সংযোগে জগতের বিলয় ঘটে।

বঙ্গদেশে শাক্তধর্মের প্রসঙ্গ : শাক্ত পীঠ

সর্বব্যাপিনী দেবীশক্তির ধারণার বিস্তৃতির ফলে পুরাতন আমলের স্থানীয় গ্রাম্য দেবীগণ মহাশক্তির সঙ্গে অভিন্না হিসাবে ঘোষিতা হতে শুরু করেন। শাক্তধর্ম এইভাবে লৌকিক উপাদান সংগ্রহ করে বৃহত্তর জনগণের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। লৌকিক উপাদানসমূহকে গ্রহণ করার জন্য একটি বিশেষ তত্ত্বের উদ্ভব ঘটানো হয়। বলা হয় যে, সৃষ্টির প্রতিটি কল্পে মূল প্রকৃতি অংশরূপিনী, কলারূপিনী ও কলাংশরূপিনী এই তিনটি পর্যায়ে বিরাজমান হন। প্রথম পর্যায়টি দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী ও রাধা এই পাঁচজন দেবী নিয়ে গঠিত। দ্বিতীয় পর্যায়টি গঙ্গা, তুলসী, মনসা, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডিকা ও কালীকে নিয়ে গঠিত। তৃতীয় পর্যায়টি অসংখ্য গ্রামদেবীকে নিয়ে গঠিত। দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগের কাহিনী, সতীর বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হতে বিভিন্ন পীঠের উদ্ভব এই সকল কাহিনী সম্প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় প্রভাবশালী দেবীদের শক্তি পরমেশ্বরীর সঙ্গে সনাক্ত করা। বঙ্গদেশেই অধিকাংশ সংখ্যায় শাক্তপীঠ দেখা যায়, যেমন বরিশালের শিকারপুরের নিকট সুগন্ধা, সাঁওতাল পরগণার দেওঘর-বৈদ্যনাথধাম, বর্ধমান জেলার কাটোয়ার অন্তর্গত কেতুগ্রাম ও উজানি বা কোগ্রাম, চট্টগ্রাম জেলার চন্দ্রনাথ, ত্রিপুরার রাধাকিশোরপুর, জলপাইগুড়ি জেলার শালবাড়ি, বর্ধমান জেলার ক্ষীরগ্রাম, কলিকাতার কালীঘাট, মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগের নিকট বটনগর, বগুড়া জেলার ভবানীপুর, মেদিনীপুরের জেলার তমলুক, বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর, খুলনা জেলার ঈশ্বরীপুর এবং বীরভূম জেলার লাভপুর ও নন্দীপুর। এছাড়া

অং.েশ অবস্থিত।

দুর্গাপূজা

বঙ্গদেশের শাক্ত দেবীদের মধ্যে দুর্গা ও কালী বিশেষভাবে পূজিতা হন। রামচন্দ্র কর্তৃক শারদীয় দুর্গাপূজার কাহিনী বাল্মীকির রামায়ণে নেই, কিন্তু তা কৃত্তিবাসের রামায়ণে, দেবীভাগবতে ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বর্তমান, এবং একটু ভিন্ন আকারে কালিকা পুরাণে। ঠিক কবে থেকে বাংলাদেশে দুর্গাপূজার ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়েছে সে কথা বলা যায় না, তবে বিদ্যাপতির 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী', জীমূতবাহনের (পঞ্চদশ শতক) 'কালবিবেক', শূলপাণির (পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক) 'দুর্গোৎসববিবেক', 'বাসন্তীবিবেক', এবং দুর্গোৎসবপ্রয়োগ' গ্রন্থে এবং তৎসহ ষোড়শ শতকের শ্রীনাথ, গোবিন্দপুর, রঘুনন্দন প্রভৃতির রচনায় দুর্গাপূজা সংক্রান্ত বহু তথ্য পাওয়া যায়। 'মায়াতন্ত্রে' দুর্গাপূজো সংক্রান্ত বিভিন্ন কুলাচারের উল্লেখ আছে। 'রুদ্রযামল তন্ত্রে'র অন্তর্গত দেবী-চরিত্র ও নবদুর্গাপূজার রহস্য দুর্গার নানা রূপের কথা ব্যক্ত করে। 'প্রাণ-তোষণী তন্ত্রে' উদ্ধৃত মৎস্যসূক্তে বিভিন্ন ধরনের দুর্গামূর্তির নানা রূপের কথা বলা হয়েছে। 'তন্ত্রসারে' দুর্গার অষ্টোত্তর শতনামের উল্লেখ আছে। জীমূত-বাহনের 'কালবিবেক' গ্রন্থে দুর্গাপূজার লৌকিক পদ্ধতি শবরোৎসব নামে উল্লিখিত হয়েছে। এই শবরোৎসবের কথা শূলপাণি ও রঘুনন্দন উল্লেখ করেছেন। সপ্তদশ শতকে রচিত 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণে' ও এই লৌকিক অনুষ্ঠানের বিশদ বর্ণনা আছে। শবরোৎসব শব্দটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে জীমূত-বাহন বলেন যে, এই অনুষ্ঠানে শবরের ন্যায় সমস্ত শরীর পত্রাদির দ্বারা আবৃত ও কর্দমলিপ্ত করে গীতবাদ্য করতে হয়। দেবী পুরাণে চণ্ডাল, পুক্কস প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিকে দেবীপূজার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, এবং বলা হয়েছে যে উচ্চজাতিভুক্ত গুণহীন ব্যক্তি অপেক্ষা গুণবান শূদ্র শ্রেয়।

কালীপূজা

কালীপূজার ক্ষেত্রে তান্ত্রিক প্রভাব অনেক বেশি। বঙ্গদেশে কালীপূজার জনপ্রিয়তার মূলে 'তন্ত্রসার' প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইনি চৈতন্যদেবের পরবর্তী ছিলেন। কথিত আছে কালী বর্তমানে যে মূর্তিতে পূজিতা হন কৃষ্ণানন্দই সেই মূর্তির পরিকল্পনা করে-ছিলেন। তান্ত্রিক কালীমূর্তি বিপরীতরতাতুরা এবং সেই হিসাবে বৃহত্তর জনসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। 'তন্ত্রসার' ও রঘুনাথের 'আগমতত্ত্ব-বিলাসে' দক্ষিণকালী, মহাকালী, শ্মশানকালী, গুহ্যকালী, ভদ্রকালী, চামুণ্ডাকালী, সিদ্ধকালী, হংসকালী ও কামকলাকালীর উল্লেখ আছে।

গোবিন্দনাথ, শ্রীনাথ ও বাচস্পতি রটন্তী চতুর্দশীর রাত্রে কালীপূজার বিধান দিয়েছেন। দীপাবলীর রাত্রে কালীপূজার উল্লেখ কোনো প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ১৬৬৯ শকাব্দে রচিত কাশীনাথের 'শ্যামাসপর্যায়বিধি' গ্রন্থে দীপাবলীর সঙ্গে কালীপূজার সংযোগের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে কালী দশমহাবিদ্যার প্রথম দেবী হিসাবেই বিশেষ পরিচিত। এই পর্যায়ের অন্যান্য দেবীরা হচ্ছেন তারা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা. ছিন্নমস্তা, বাগ্বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যাঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী ও শৈলবাসিনী, যদিও দশমহাবিদ্যার ভিন্ন কয়েকটি তালিকাও বর্তমান। শাক্ত-বৈষ্ণব সমন্বয়ের চেষ্টা হিসাবে কোনো কোনো তন্ত্রগ্রন্থে দশমহাবিদ্যার সঙ্গে বিষ্ণুর দশ অবতারকে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

শাক্ত-তান্ত্রিক লেখকবৃন্দ

বঙ্গদেশের শাক্ত-তান্ত্রিক লেখকদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পরিব্রাজকাচার্যের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায় না, তবে তাঁর রচিত 'কাম্যযন্ত্রোদ্ধার' নামক পুঁথির তারিখ ১২৯৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৩৭৫ খ্রীস্টাব্দ। পরবর্তী তান্ত্রিক সাধক ও লেখকদের মধ্যে সর্বানন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'সর্বোল্লাস'। তিনি ত্রিপুরা জেলার মেহার নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তি মেহার-কালী নামে আজও বিদ্যমান। সর্বানন্দের জন্ম তারিখ ১৪২৫ খ্রীস্টাব্দ। তাঁর পুত্র শিবনাথ 'সর্বানন্দতরঙ্গিণী' নামে একটি পিতৃজীবনী রচনা করেন। বিখ্যাত 'তন্ত্রসার' গ্রন্থের প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সময়কাল ১৫৯৫-১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দ, যদিও কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে তিনি চৈতন্য-সমকালীন বা চৈতন্যের ঈষৎ পরবর্তী ছিলেন। ব্রহ্মানন্দগিরি ছিলেন ত্রিপুরানন্দের শিষ্য এবং পূর্ণানন্দের গুরু। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত দুইটি গ্রন্থ খুবই বিখ্যাত। একটির নাম 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী' ও অপরটির নাম 'তারারহস্য'। ব্রহ্মানন্দের শিষ্য পূর্ণানন্দ পরমহংস পরিব্রাজক নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি মৈমনসিং জেলার নেত্রকোণার অন্তর্গত কাটিহালি গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'শ্যামারহস্য', 'শাক্তক্রম', 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি', 'তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী' এবং 'ষট্‌কর্মোল্লাস' উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি ব্রহ্মানন্দের 'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী' নামক গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন। মধ্যযুগের অপর উল্লেখযোগ্য শাক্ত-তান্ত্রিক লেখক শঙ্কর যাঁর 'তারারহস্যবৃত্তি'র রচনাকাল ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দ। ইনি শঙ্কর

আগমাচার্য নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। 'তারারহস্যবৃত্তি' ছাড়াও তিনি 'শিবার্চন-মহারত্ন', 'শৈবরত্ন', 'কুলমূলাবতার' এবং 'ক্রমস্তব' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

শাক্তধর্মের মূল ভিত্তির দার্শনিক পরিবিভকরণ

শাক্ত দর্শনের মূল ভিত্তি সাংখ্য, যা গড়ে উঠেছিল প্রাচীন যুগের তন্ত্র থেকে উদ্ভূত প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বকে আশ্রয় করে। তান্ত্রিক পুঁথিসমূহের চেয়ে তন্ত্র অনেক বেশি প্রাচীন, যার মূল খুঁজতে গেলে আমাদের বৈদিক যুগেরও অনেক পিছনে যেতে হবে। সেই সুদূর অতীতের মাতৃপ্রধান সমাজ থেকে প্রকৃতিপ্রাধান্যবাদের উদ্ভব হয়েছে, মাতৃকাদেবীকেন্দ্রিক সেই প্রাচীন জীবন চর্যাই আদি তন্ত্র। পরবর্তীকালের সাংখ্যা দর্শন সেই প্রাচীন তন্ত্রকেই অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। মাতৃ- বা প্রকৃতি-প্রধান ধর্মব্যবস্থা, যার আবেদন ছিল, মূলত সমাজের নিম্নস্তরে, বিশেষ করে কৃষিজীবী মানুষদের মধ্যে, বরাবরই সাধারণ মানুষের জীবনে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল, এবং এই প্রভাবের পরিধি এত বিস্তৃত যে, ভারতের অন্যান্য প্রধান ধর্মগুলিও শাক্ত-তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই ধ্যান-ধারণাগুলি বিভিন্ন ধর্মকে প্রভাবিত করে ফুরিয়ে যায় নি। মধ্যযুগে, বিশেষ করে বঙ্গদেশে নূতনভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছিল, আধুনিক শাক্তধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণরাও এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, যার ফলে শাক্তধর্ম ও তন্ত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদের স্পর্শ লাগে এবং তারই প্রভাবে শাক্তধর্ম ও তন্ত্র তাদের নিজস্ব কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। ব্রাহ্মণ দার্শনিকেরা সাংখ্যকে একেবারে পরিত্যাগ করেন নি। কিন্তু তাঁরা সংখ্যের উপর কারিকুরি করে তাকে প্রচ্ছন্ন বেদান্তে পরিণত করেন। শাক্ত দর্শনের ক্ষেত্রে বুদ্ধি, অহংকার, তন্মাত্র, মহাভূত প্রভৃতি সাংখ্য ধারণাকে বজায় রাখলেও এইগুলির উপর তাঁরা বেদান্তকে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। সাংখ্যের পুরুষের ধারণাকে একেবারে পরিবর্তিত করে সেখানে তাঁরা বেদান্তের ব্রহ্মকে বসিয়েছিলেন যার সঙ্গে তাঁরা সমীকরণ করেছিলেন শিবের। প্রকৃতিকেও তাঁরা স্বধর্মবিচ্যুত করে ওই ব্রহ্মেরই বিমর্শ শক্তিতে রূপান্তরিত করেছিলেন।

শাক্ত দর্শন

বৈদান্তিক দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় মতবাদ শাক্তধর্মে স্থান পেয়েছে। তন্ত্র সাধনায় দুইটি বিশেষ কুল বা সম্প্রদায়ের প্রচলন আছে—শ্রীকুল ও কালীকুল। শ্রীকুল অবলম্বীরা কিছুটা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁরা শিবের সং ও চিৎ,

প্রকাশত্ব স্বীকার করেন এবং শক্তিকে বিমর্শিনী অর্থাৎ শিবের স্বতঃসিদ্ধা স্পন্দস্বরূপা বলে মনে করেন। কালীকুল অবলম্বীরা সাধারণত অদ্বৈতবাদী। তাঁরা বলেন সচ্চিদানন্দরূপে দেবী ব্রহ্মস্বরূপিনী, এবং তাঁর মায়া বিবর্ত, পরিণামী নয়। তাঁদের মতে শিবশক্তিতত্ত্ব গুণাতীত, নির্দ্বন্দ্ব ও একমাত্র উপলব্ধিগম্য। চরম সত্তা, যা দেশ কাল ও ধারণাতীত বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, প্রকাশ্যরূপে বর্তমান। বিমর্শ শক্তি সেই প্রকাশেরই ক্রিয়া সম্পর্কীয় স্বাতন্ত্র্য, যদিও প্রকৃতপক্ষে এই শক্তি তাঁর স্বরূপ অর্থাৎ চরম সত্তার সঙ্গে অভিন্ন, তাঁরই মধ্যে নিহিত এবং তাঁরই অবিচ্ছেদ্য গুণরূপে প্রকাশিত। শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে তখন বলা হয় যে বিমর্শ প্রকাশে লীন হয়ে গেছে, কিন্তু যখন জাগ্রত তখন চরম সত্তাও স্বয়ং চেতন হন। তখন তাঁর আত্মজ্ঞান অহম্‌রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সমগ্র বিশ্বজগৎ দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবির ন্যায় এই অহমে প্রতিফলিত হয়। চরমসত্তা, যাঁর প্রকাশ শিব এবং বিমর্শ শক্তি, একই সঙ্গে বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত। দুই-এ মিলে এক অখণ্ড সত্তা। এই চরম সত্তার সঙ্গে শক্তি বা কলা চিরকালীন ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছেন। কলা শব্দটির অর্থ বিশ্বাতিক্রমী সর্বাতীত শক্তি। এই শক্তির প্রথম বিকার ইচ্ছা। তৈলবীজের মধ্যে হতে যেমন তৈল নিষ্ক্রান্ত হয় তেমনই সৃষ্টির প্রারম্ভেই শক্তির আবির্ভাব হয়। এই শক্তির আবির্ভাব নিদ্রার অচেতনতার পর জাগ্রত ব্যক্তির স্মৃতির পুনরাবির্ভাবের মতো। সত্তা ও শক্তি উভয়েই চিৎ বা শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, তার শক্তি সকল বস্তুর উপর ক্রিয়া করেন বলেই তাদেরই প্রকৃতি অনুসারে কখনও জ্ঞান কখনও ক্রিয়ারূপে প্রতিভাত হন।

স্ববিরোধ

বেদান্তকে ভিত্তি করার দরুন ভারতের ধর্মীয় দর্শনসমূহ একটি বিশেষ ধরনের স্ববিরোধ এড়াতে পারে নি। শঙ্করাচার্য কথিত বেদান্তের চরম অদ্বয়বাদী ব্যাখ্যা বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত কোনো তরফই মানতে পারে নি, কেননা জগৎকে কোনো ধর্মব্যবস্থার পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। কাজেই তাঁদের প্রধান সমস্যা ছিল বিশুদ্ধ চিদ্‌স্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে—তা তিনি বৈষ্ণবের বিষ্ণুই হন, শৈবের শিবই হন বা শাক্তের শক্তি হন—জড় জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার সমস্যা। কেউ কেউ বলেন যে পরিদৃশ্যমান জগৎ নিত্যসিদ্ধ চরমতত্ত্বে অর্থাৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত, সুতরাং জগৎ মিথ্যা অবভাসমাত্র—এবং ব্রহ্মসত্তায় তার কোনো ক্রিয়া নেই, তবে মোটামুটি যাঁরা বৈষ্ণব, বা শৈব বা শাক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্রহ্ম ও জগতের সম্পর্ক নির্ধারণের প্রয়াস পান, তাঁদের সমস্ত বক্তব্যের বাড়তি উপাদানগুলি

বাদ দিয়ে একটি কাজচলা গোছের সারাংশ করা যায় যে, জগৎ সত্য এবং তা কোনো না কোনো প্রকারে ব্রহ্মের পরিণাম বা বিকার, বিকল্পে ব্রহ্মের বা শক্তির বা বিমর্শ সারূপ্যের বিকার। কিন্তু শাক্ত দর্শনের ক্ষেত্রে সমস্যাটা আরও বেশি। আমরা দেখেছি যে তন্ত্র একটি সুপ্রাচীন যুগের অন্তঃস্রোত যার মধ্যে বহু ধরনের উপাদান বর্তমান। তন্ত্রের ভাববাদী রূপান্তরকরণ হাল আমলের, অর্থাৎ আদি-মধ্য ও মধ্যযুগের, যখন বৈদান্তিকরা তন্ত্র ও শাক্তধর্মকে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। কিন্তু তার পূর্ববর্তী যুগে তন্ত্র মূলত বস্তুবাদী ও লোকায়তিক চরিত্রের অধিকারী ছিল। এই সকল উপাদান ছাড়াও আদিম জাদুবিশ্বাসমূলক নানা উপাদান তন্ত্রে বর্তমান। তান্ত্রিক যৌন প্রতীকসমূহ এই সকল আদিম উপাদানের অভিব্যক্তি। অনুরূপভাবে কায়-সাধন ও জীবন্মুক্তির ধারণার উৎস পৃথক যেগুলির উপর কিছুটা লোকায়ত প্রভাব আছে। জাদুবিশ্বাসের পক্ষে অপরিহার্য শব্দ ও ধ্বনিগত কলাকৌশল তান্ত্রিক মন্ত্রসমূহের রহস্যময়তায় ব্যক্ত হয়েছে। শব্দ, নাদ, বীজ, বিন্দু, বর্ণ, অক্ষর এইগুলির উৎস সম্ভবত ওই আদিম জীবনচর্যা। এতগুলি বিচ্ছিন্ন উপাদানের সমন্বয় এবং একটি বিশিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে সেগুলিকে ব্যাখ্যা করার যে-কোনো প্রয়াসের মধ্যেই স্ববিরোধ থাকতে বাধ্য, কাজেই কোনো সমন্বয়ী ব্যাখ্যার চেষ্টা না করে শাক্তধর্ম ও তন্ত্রের আলোচনায় যদি গঠনকারী উপাদানগুলিকে বিশিষ্ট করে দেখা যায় এবং সেইগুলিকে তাদের ঐতিহাসিক উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝার চেষ্টা হয়—বিবর্তিত ও পল্লবিত রূপ থেকে আলাদা করে—তা হলেই বিষয়টির উপর সুবিচার করা সম্ভব হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

গ্রন্থপঞ্জী

পি. সি. বাগচী। 'স্টাডিস ইন দ্য তন্ত্র', কলিকাতা, ১৯৩৯।

এস সি. ব্যানার্জী। 'তন্ত্রস ইন বেঙ্গল', কলিকাতা, ১৯৭৮।

এ. বার্থ। 'রিলিজিয়নস অব ইন্ডিয়া' (জে উড কর্তৃক ইংরাজি অনুবাদ), লন্ডন, ১৮৮২।

এ. ভারতী। 'দ্য তান্ত্রিক ট্র্যাডিশন', লন্ডন, ১৯৬৯।

এন এন. ভট্টাচার্য। 'হিস্ট্রি অব দ্য শাক্ত রিলিজিয়ন', নিউ দিল্লী, ১৯৭৪।

—'ইন্ডিয়ান মাদার গডেস', নিউ দিল্লী, '১৯৭৭, দ্বিতীয় সংস্করণ।

—'হিস্ট্রি অব দ্য তান্ত্রিক রিলিজিয়ন', নিউ দিল্লী, ১৯৮৮, দ্বিতীয় সংস্করণ।

এম. এম বসু। 'পোস্ট-চৈতন্য সহজীয়া কাল্ট অব বেঙ্গল', কলিকাতা, ১৯৩০।

জে. ই. কারপেণ্টার। 'থেইজম ইন মিডিইভাল ইণ্ডিয়া', অক্সফোর্ড, ১৯২১।
সি. চক্রবর্তী। 'দ্য তন্ত্রস', কলিকাতা, ১৯৬৩।
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। 'লোকায়ত', নিউ দিল্লী, ১৯৫৯।
এস বি দাশগুপ্ত। 'অবসকিওর রিলিজিয়াস কাল্টস', কলিকাতা, ১৯৪৬।
—ইনট্রোডাকশন টু তান্ত্রিক বুদ্ধিজম', কলিকাতা, ১৯৫০।
টি. সি দাশগুপ্ত। 'এসপেক্টস অব বেঙ্গলী সোসাইটি ফ্রম ওল্ড বেঙ্গলী লিটারেচার', কলিকাতা, ১৯৩৫।
এস কে. দে। 'আর্লি হিস্ট্রি অব দ্য বৈষ্ণব ফেথ এ্যান্ড মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল', কলিকাতা, ১৯৬২, দ্বিতীয় সংস্করণ।
এস. গুপ্ত। 'লক্ষ্মীতন্ত্র', লাইডেন, ১৯৭২।
এইচ এম. এলিয়ট এ্যান্ড জে. ডাওসন। 'হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইটস ওন হিস্টরিয়ানস', খণ্ড চার-পাঁচ।
রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পা)। 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৮।
—(সম্পা), 'হিস্ট্রি এ্যান্ড কালচার অব দ্য ইন্ডিয়ান পিপল', খণ্ড ছয়।
জে. সি. ওমান। 'দ্য মিস্টিকস, সেন্টস এ্যান্ড এসেটিকস অব ইন্ডিয়া', লন্ডন, ১৯১৩।
ই. এ পেইন। 'দ্য শাক্তস, কলিকাতা, ১৯৩৩।
জে. এন. সরকার (সম্পাদিত)। হিস্ট্রি অব বেঙ্গল', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৮, দ্বিতীয় খণ্ড।
ডি সি সরকার। 'দ্য শাক্ত পীঠস', কলিকাতা, ১৯৪৮।
এম. আর তরফদার। 'হোসেন শাহী বেঙ্গল', ঢাকা, ১৯৬৫।
এইচ এইচ উইলসন। 'স্কেচ অব দ্য রিলিজিয়াস সেক্টস অব দ্য হিন্দুস', লন্ডন, ১৮৪৬ (পুনর্মুদ্রণ)।

উপেন্দ্রকুমার দাস। 'শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা', বিশ্বভারতী, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বাঙ্গলার ইতিহাস', কলিকাতা, ১৯১৭, দ্বিতীয় ভাগ।
আশুতোষ ভট্টাচার্য। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় সং, কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। 'ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস', কলিকাতা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ।
নীহাররঞ্জন রায়। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', কলিকাতা, ১৯৪৯।
রমেশচন্দ্র মজুমদার। 'বাংলাদেশের ইতিহাস', ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ।
— 'মধ্যযুগে বাংলার সংস্কৃতি', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬।
ক্ষিতিমোহন সেন। 'বাংলার সাধনা', বিশ্বভারতী, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।
শশিভূষণ দাশগুপ্ত। 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য', কলিকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।
সুকুমার সেন। 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী', বিশ্বভারতী, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

বাংলার সমাজে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান

আহমদ শরীফ

১

ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে প্রথম ইসলামের শাস্ত্রীয় সংস্কৃতি নিয়ে এলেন কাসিমপুত্র সেনানায়ক মুহম্মদ (৭১১ খ্রী)। এর প্রভাবেই ঘটল দাক্ষিণাত্যের যুগান্তর।[১]

নতুন যুগে শঙ্কর (৭৮৮—৮২০ খ্রী) ইসলামের প্রভাবেই ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে আবিষ্কার করেন বিমূর্ত একক ব্রহ্মকে। আর শঙ্করের বেদান্তভাষ্যের প্রভাবে উদ্ভূত হয় দাক্ষিণাত্যের নয়-দশ শতকে ভাস্করের ভেদাভেদবাদ, বারো শতকে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বারো-তেরো শতকে নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, তেরো শতকে মধ্বের বা মাধবের দ্বৈতবাদ, ষোলো শতকে বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এবং চৈতন্যের অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ। শাস্ত্রীয় চিন্তাজগতে এ বিপ্লবীদের সবাই ছিলেন ব্রাহ্মণ। এঁরা মূলত তাত্ত্বিক দার্শনিক। ইসলামী একেশ্বরবাদের অভিঘাতেই এঁদের চেতনায় এ আলোড়ন, চিন্তার এ উৎকর্ষ এবং মননের এ বিকাশ।

পরে আলপ্তিগীনের দৌহিত্র এবং সবুক্তিগীন-পুত্র মাহমুদ (৯৯৮ খ্রী থেকে সুলতান) ১০০১ সন থেকে বারবার অভিযান চালিয়ে ১০০৬ সানের মধ্যেই মুলতান অবধি অগ্রসর হন, এর পরে মুইজউদ্দীন মুহম্মদ ঘোরী ১১৯০ সন থেকে রাজত্ব শুরু করেন আর ক্রীতদাস কুতুবউদ্দিন আইবক দিল্লীর তখতে বসেন ১২০৬ সনে। এবারকার তুর্কীদের ছিল মিশর ইরাক-ইরান ও মধ্য-এশিয়ার সঞ্চিত ঐতিহ্য ও সমন্বিত সংস্কৃতি। এ সময়ে শাস্ত্রীয় ইসলামের চেয়ে সুফীবাদ নামে মরমীবাদই মুসলিম সমাজে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কোরআন-হাদিস নির্দেশিত কর্ম-আচরণে নয়, চিত্তলোকে ঐশ-প্রেমের উন্মেষ-

১. (ক) তারাচাঁদ, 'ইনফ্লুয়েন্স অফ ইসলাম অন ইন্ডিয়ান কালচার', পৃ. ১১১-২০।
(খ) 'বাংলার নবজাগৃতি', প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১২১ ২৪।

বিকাশ মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্যের, কৃপার ও মুক্তির সহজপন্থার নামই হচ্ছে সুফীবাদ। যদিও এ-ও গুরু বা পীরকেন্দ্রী সাধনপন্থা বলে পীর-ভেদে পন্থা ও সিদ্ধিচেতনা বা লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন।[২]

এঁদের প্রভাবে বৈষম্য-জর্জরিত উত্তর-ভারতে কেবল ভাববিপ্লব নয়—সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটল শোষিত বঞ্চিত-অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণের, নিম্ন-বর্গের ও নিম্নবিত্তের ব্রাহ্মণ্য সমাজে এবং নির্জিত ও বিলোপোন্মুখ বৌদ্ধ সমাজে। এ দেব-দ্বিজ-বেদদ্রোহীরা বাহ্যত বিবাগী-বিরাগী মরমী বটে, কিন্তু স্বরূপে ব্রাহ্মণ্য শোষণ-পীড়ন ও শাসনদ্রোহী স্বাধিকার, স্বসম্মান ও স্বাতন্ত্র্য অর্জনের প্রয়াসী। তাই উত্তর-ভারতের দ্রোহীরা সবাই নিম্নবর্ণের ভক্তিবাদী সন্ত। এঁরা ছিলেন মুদী, মুচি, মালি, সুতার, কুমার, নাপিত ও মেথর বৃত্তির লোক। কবীর ছিলেন তাঁতী, রবিদাস মুচি, সেন নাপিত, তুকারাম শূদ্র, ধর্মদাস মুদী, বর্ণহিন্দু হলেও নামদেব ছিলেন দর্জির এবং নানক ছিলেন রঙরেজের সন্তান। দাদু ধুনকর, সুন্দর দাস বেণে, বিমান চাষী, তিরুবল্লভ পারিয়া আর রামানন্দ, একনাথ, রজবও ছিলেন না মানীঘরের সন্তান।[৩] ধনে-মনে-মানে কাঙাল বলে এ-দ্রোহীরা ঐহিক জীবনবাদী হতে পারে নি—হয়েছে বৈরাগ্যবাদী।

কাজেই ইসলামী সামাজিক সাম্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই এ দ্রোহের সূচনা আর সন্তমতের এবং সম্প্রদায়ের উদ্ভব। এঁরা কেবল সাধারণ তুর্কীর মধ্যে নয়, দিল্লির শাহী মহলেও দেখেছেন, বাজারে ক্রীতদাস, স্বগুণে হচ্ছে প্রভুর জামাতা সেনাপতি, অমাত্য এবং সুলতান। ব্যক্তিজীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার এমন অনন্ত সম্ভাবনা জন্মসূত্রে সর্বপ্রকার অধিকারবঞ্চিত নির্দিষ্ট পেশায় নিবদ্ধ আত্মবিকাশের সম্ভাবনা-রিক্ত নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নিম্নবিত্তের দেশী মানুষকে বিচলিত করে। আর্থিক, নৈতিক ও সামাজিক জীবনের যোগ্যতা অনুসারে আত্মবিকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই তাদের ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সমাজদ্রোহী করেছিল। এরা হলো মরমী এবং ভক্তি ও সততাই হলো ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সহজ ও ঋজু পথ। আগে এদের পারত্রিক মুক্তির উপায় ছিল 'দেব-দ্বিজে' ভক্তি, এখন থেকে মুক্তির ও মোক্ষের পন্থা হলো 'ঈশ্বরানুগ'।

অতএব আরব বিজয়ে দক্ষিণ-ভারতে এবং তুর্কী বিজয়ে উত্তর-ভারতে যুগান্তর ঘটে অর্থাৎ পুরোনো যুগের অবসান এবং নতুন যুগের উন্মেষ সূচিত

২. আহমদ শরীফ, 'বাংলার সুফী সাহিত্য'. প্রথম সংস্করণ।
৩ হিতেন্দ্র মিত্র, 'টেগোর উইদআউট ইলিউশনস', পৃ. ৫।

হয়। সে-যুগে কেবল জয়ে-পরাজয়ে শাসক-শাসিত সম্পর্ক গড়ে উঠলেই মাত্র চিন্তা-চেতনার, মন-মননের, মানসিক ও ব্যবহারিক আচার-সংস্কৃতির লেন-দেন হতো। বন্দরে পণ্য-বিনিময়ের মাধ্যমে দেশী-বিদেশীর তেমন পরিচয় ঘটত না, আজো হাটুরে পরিচয় চোখে-চোখেই থাকে সীমিত—অন্তরস্পর্শী হয় না। এ কারণেই ইংরেজের সঙ্গেই কেবল শাসক-শাসিত রূপে আমাদের পরিচয় নিবিড় হয়, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বাণিজ্যে বা পণ্য-বিনিময়ে তা কখনো সম্ভব হয় নি কারুর সঙ্গে।

আরব-তুর্কীর অনুপ্রবেশোত্তর কালকে আমরা একালে (অর্থাৎ আধুনিক কালের সঙ্গে পার্থক্য নির্দেশক) 'মধ্যযুগ' বলে অভিহিত করি বটে, কিন্তু তাৎপর্যে এ য়ুরোপীয় সংজ্ঞায় য়ুরোপের ইতিহাসের 'মধ্যযুগ' নয়—বরং, এক অর্থে রেনেসাঁস যুগ। কেন-না, আরব-তুর্কী ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের সংস্পর্শে, অভিঘাতে যে ভাব-তরঙ্গ উত্থিত হয়, মননে-চিন্তনে যে তত্ত্বের ও তথ্যের প্রভাব পড়ে, জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে আত্মোন্নয়নের, আত্মবিস্তারের যে অশেষ সম্ভাবনার ও আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটে, অবজ্ঞেয়, তুচ্ছ বৃত্তি-নিবন্ধ প্রাজন্মক্রমিক দারিদ্র-ক্লিষ্ট আবর্তিত জীবনে, তাতে দ্রোহী সন্তদের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্য সমাজ ছেড়ে এরা ভক্তিবাদী স্বাধীন স্বতন্ত্র সমাজ বা স্থানিক সম্প্রদায় গঠন করে মুক্তির স্বাদ ও স্বস্তির সুখ পেতে থাকে। যদিও হাতিয়ানের পরিবর্তনে উৎপাদন-পদ্ধতির যান্ত্রিক উৎকর্ষ ও বিস্তার না ঘটায় য়ুরোপের শিল্প-বিপ্লবের মতো কিছু তাদের পেশার বা আর্থিক জীবনের কোনো পরিবর্তন ঘটায় নি।

১৯৪৭-পূর্ব ভারতবর্ষ চিরকালই ছিল বিদেশী-বিজিত দেশ। চিরকালই ভারতে নতুন চিন্তা-চেতনার ও সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে পরাজয়ের গ্লানি থেকেই, বিদেশী বিজাতি বিধর্মী বিভাষীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দ্বন্দ্বে-মিলনে, বিরাগে-অনুরাগে। ভারতবাসীর চিন্তা-চেতনায় উত্থিত মানুষের উদ্যম নয়, ক্ষয়িষ্ণু সমাজের আত্মরক্ষার সচেতন-অচেতন প্রয়াসই ছিল ক্রিয়াশীল। এ হচ্ছে নিস্তরঙ্গ জীবনে আকস্মিক অভিঘাতে বিপন্ন ত্রস্ত মানুষের আর্ত চিৎকারে জাগা ও বাঁচার প্রয়াস। সন্তধর্মে ও মতে তাই ইহজাগতিক উদ্যম-উদ্যোগ নেই—নেই জিগীষা, আছে কেবল নিরন্ন নিরুপদ্রব জীবন-প্রত্যাশা। দক্ষিণেও শঙ্কর থেকে বল্লভ অবধি সবাই ভক্তিবাদী-মায়াবাদী, বিরাগী-বিবাগী। এ জীবনদৃষ্টি স্বস্থ ও সুস্থ ঐহিক জীবন-চেতনা বিরোধী, কেননা এতে বৈচিত্র্যে বহুধা বিকশিতব্য জীবন-জীবিকা ও ভোগবাঞ্ছা নেই, তাই প্রয়াসও নেই। এ বৈরাগ্যভিত্তিক ভক্তিবাদে আকাশচারিতা আছে, মর্ত্যপ্রীতি নেই। এ নিরীহতা তাই গভীর তাৎপর্যে সমাজ-সংস্কৃতি-বিকাশের, শিক্ষা-বিস্তারের ও সম্পদ-সভ্যতা বৃদ্ধির পরিপন্থী।

বাংলাদেশে তুর্কী বিজয়ের পূর্বেই শংকরের মায়া-জ্ঞানবাদ এবং দাক্ষিণাত্যের ভক্তিবাদ বাংলায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। গিরি-পুরী-ভারতী-আনন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন গুরুবাদী সন্ন্যাসীর বিচরণও ছিল অবিচল। দরবেশেরও আগমন শুরু হয়ে গিয়েছিল। অতএব দরিদ্র বাঙালীর আকাশচারিতায় ও দৈবশক্তি নির্ভরতায় যুক্ত হয়েছিল বৈর্যাগ্যপ্রবণতাও। তাই ষোলো শতকের ঊষালগ্নে দক্ষিণের ব্রহ্মতত্ত্ব ও উত্তরের ভক্তিবাদ ও সুফীমত প্রভাবিত সন্ত চৈতন্যের আবির্ভাব সম্ভব ও স্বাভাবিক হয়েছিল। ভক্তিকে সুফী প্রভাবে প্রেমে উন্নয়ন চৈতন্যদেবের বিশেষ অবদান।

২

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর (১২০১-০৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে) বঙ্গ বিজয়ের পূর্বেই লক্ষ্মণসেনের আমলে দেওতলায় শেখ জালাল-উদ্দীন-তাবরেজী (১২০০-০২ খ্রী) বাস করেন। এখানে লক্ষ্মণসেনের দালান ও বাইশহ্জারী মসজিদ রয়েছে, হলায়ুধ মিশ্র রচিত 'সেকশুভোদয়া'র বর্ণিত পীরমাহাত্ম্য জ্ঞাপক কাহিনী, লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, উমাপতিধরের রচিত শ্লোকে বখতিয়ার খলজীর স্তুতি প্রভৃতির সাক্ষ্যে ও প্রমাণে বোঝা যায় তুর্কী ও সুফীমত সম্বন্ধে নুদিয়া-লক্ষ্মণাবতী নগর একেবারে অজ্ঞ ছিল না।[৪]

আরব-ইরাক-ইরান ও মধ্য-এশিয়া থেকে আগত ইসলাম প্রচারকরা ভারতের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সুফী দরবেশ-রূপে আত্ম-পরিচয় দিয়ে ভারতের বৌদ্ধ, হিন্দু যোগী-তান্ত্রিকদের মতোই অলৌকিক শক্তি তথা আত্মিক-আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য প্রদর্শন করে ভিক্ষু-সন্ন্যাসীর মতো বৈরাগ্য-বাদী হয়ে এদেশে ইসলাম প্রচারে নিরত হন। এ নতুন মত প্রচারকদের একেশ্বরবাদ, সামাজিক সাম্যবাদ, তথা নির্বিশেষ ব্যক্তিমানুষের স্বাধিকার ও সমাধিকারতত্ত্ব মুগ্ধ করল জনগণকে এবং এঁরা শাসক গোষ্ঠীভুক্ত নতুন ও বিদেশাগত বলেই এঁদের তুলনায় যোগী, তান্ত্রিক, শ্রমণ-শ্রাবক-ভিক্ষু-জিন-সন্ন্যাসী প্রভৃতির আসমানী শক্তি ম্লান ও স্বল্প বলে প্রতিভাত হলো জনগণের চোখে। তাই দেশের দেব-দ্বিজ-বেদবাদী ব্রাহ্মণ্য সমাজে তাদেরই সেবার, শ্রমের এবং ভোগ-উপভোগের সামগ্রীর যোগানদার নিম্নবর্ণের নিম্নবৃত্তির এবং নিম্ন-

৪ আহমদ শরীফ, 'বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য' (সেকশুভোদয়া), প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১০৩-১৩।

বর্গের স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য-অথজ্ঞেয়-পীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত-চিরনিঃস্ব-অজ্ঞ-অসহায় এবং ভোগ-উপভোগের সুখে ও সম্পদে চিরবঞ্চিত জনগণ আকৃষ্ট হলো ওইসব ইসলাম-প্রচারক দরবেশদের প্রতি প্রাজন্মক্রমিক লাঞ্ছনা-মুক্তির আশ্বাসে এবং এবং যোগ্যতানুসারে বৃত্তি বা জীবিকা গ্রহণে আত্মোন্নয়নের প্রত্যাশায়।[৫]

কোরআন হাদিসের ইসলামে পীর বা গুরুবাদ নেই। বৌদ্ধ-খ্রীস্ট দর্শনের এবং ব্রাহ্মণ্য উপনিষদ-প্রভাবে সুফী তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে মিশরে-ইরাকে-ইরানে ও মধ্য-এশিয়ায়। ইহুদী খ্রীস্টান এবং অদ্বৈতবাদী হানিফ গোত্রের প্রভাবে একেশ্বর-বাদ ও মানবিক সাম্যবাদ অজ্ঞাত ছিল না মিশরে-আরবে-ইরানে-ইরাকে। তাই বাণীর ও নীতিনিয়মের আপেক্ষিক উৎকর্ষে আকৃষ্ট গণমানুষেরা মদিনা থেকে খোরাসান এবং মধ্য-এশিয়া থেকে আফগানিস্থান অবধি এবং বহু শতক ধরে ইরানী-গ্রীক-শক-হূণ শাসিত ও প্রভাবিত মুলতান অবধি উত্তর-পশ্চিম ভারতেও গণধর্ম হিসাবে সহজেই ইসলাম গৃহীত হয়েছিল। এরপরে ব্রাহ্মণ্য ভারতে উচ্চবর্ণের, উচ্চবিদ্যার ও উচ্চবিত্তের ব্রাহ্মণ্য সমাজে ইসলামের অনুপ্রবেশ সহজ হয় নি, এমনকি ক্বচিৎ সম্ভব হয়েছে। স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য বর্ণে, বর্গে ও বৃত্তিতে বিভক্ত ও প্রায় দাস-প্রভু সম্পর্কে বিন্যস্ত সমাজে উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের লোকের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ও অবস্থানে বিপর্যয় ঘটার আশংকায় কায়েমী স্বার্থেই বর্ণহিন্দুর পক্ষে জন্মগতভাবেই মানবসাম্যে ও সম্মানে আস্থাশীল ইসলাম পসন্দ ও বরণ করা সম্ভব ছিল না। ব্যবহারিক জীবনে সুবিধে-ভোগী এবং মানসিক জীবনে রক্ষণশীল সংকীর্ণচিত্ত উচ্চবর্ণের গণসেবিত সমাজকে তাই ব্রাহ্মমতও তেমন আকৃষ্ট করে নি পরবর্তীকালেও। ফলে ইসলাম ছিল পূর্ব-পাঞ্জাব থেকে চট্টগ্রাম অবধি সর্বত্র সাধারণভাবে বর্ণহিন্দু-ত্রাস সমাজব্যবস্থা। প্রজন্মক্রমে হাজার হাজার বছর ধরে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধে-মান-মর্যাদা ছেড়ে দাস-সেবক ছোটলোকের সঙ্গে একাকার হওয়ার বিভীষিকা তাদের পেয়ে বসেছিল। একে এড়িয়ে চলাই ছিল কায়েমী স্বার্থের অনুকূল ও কল্যাণকর। বহিরাগত সুফী-পীর দরবেশ প্রচারকরা ছিলেন লোকচক্ষে সিদ্ধ সাধক আসমানী বা অলৌকিক শক্তিধর পুরুষ। এ ত্রিকালদ্রষ্টাদের সুপারিশে আল্লাহ পাপী-তাপী-রুগ্ণ দুস্থের দুঃখমোচন করেন, পূরণ করেন সর্বপ্রকার আশা-আকাঙ্ক্ষা, পরবর্তীকালের খ্রীস্টান মিশনারীদের মতোই

৫. (ক) মুহম্মদ এনামুল হক, 'হিস্ট্রি অফ সুফিজম ইন বেঙ্গল', এশিয়াটিক সোসাইটি (বাংলাদেশ), ১৯৭৫, প্রথম সংস্করণ; (খ) মুহম্মদ এনামুল হক, 'বঙ্গে সুফি প্রভাব', ১৯৩৫, প্রথম সংস্করণ; (গ) মুহম্মদ এনামুল হক, 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম', ১৯৪৯, প্রথম সংস্করণ।

তাঁদেরও ছিল প্রীতি-কৃপা-করুণা-দান-দয়া-দাক্ষিণ্য; ছিল সেবাব্রত, ধৈর্য, অধ্যবসায়, ছিল খানকা-হুজরা (আখড়া আশ্রম) সরাই, লঙ্গরখানা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা। এর উপর ঝাড়-ফুক-তাবিজ-দোয়া তো ছিলই। শহুরে লোকেরা চিরকালই সুশিক্ষিত সতর্ক স্বল্পাবেগ হিসেবী মানুষ। তাই শহরে দরবেশদের প্রভাব ছিল স্বল্প। গাঁয়ে-গঞ্জে নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নিম্নবৃত্তির অর্থ-সম্পদরিক্ত মানুষই অবজ্ঞামুক্তির, সম্মানের ও স্বাধীনভাবে বৃত্তি নির্বাচনে অর্থ-সম্পদ অর্জনের আশায় ও আশ্বাসে ক্রমে ক্রমে ইসলাম বরণ করতে থাকে। পীর-দরবেশ মাহাত্ম্যকথাও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আমাদের বাংলায় প্রথম পীরমাহাত্ম্যকাব্য হচ্ছে তেরো শতকের উষাকালে হলায়ুধ মিশ্র রচিত 'সেক (শেখ) শুভোদয়া'।

৩

চৌদ্দো শতকের আগেই বিভিন্ন পীরবাদী সুফী সম্প্রদায়ের দরবেশ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। পাণ্ডুয়ার শেখ আলাউল হকের সাগরেদ ছিলেন সৈশদ আশরাফ জাহাঁগীর। সিমনানীর জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর কাছে লিখিত তাঁর পত্র[৬] থেকে জানা যায়:

'আল্লাহকে ধন্যবাদ। কী সমৃদ্ধ দেশ এই বাংলা, যেখানে বিভিন্ন সাধু ও সন্তরা গৃহনির্মাণ করে বাস করেন। দেবগাঁওতে হজরত শেখ সাহাবুদ্দীন সুহরওয়ারদির সহচররা চিরকালের মতো বিশ্রাম লাভ করেছেন। মহিসুনেও সুহরওয়ারদি সম্প্রদায়ের বহু সন্তরা চিরবিশ্রাম লাভ করছেন, আর বহু সাধু সমাধিস্থ আছেন দেওতলায়। নারকোটিতে সেখ আহমেদ দামিস্কির সহচরদের সমাধি পাওয়া গেছে ও কাদরখানি সম্প্রদায়ের বারোজনের মধ্যে অন্যতম হজরৎ সেখ সরফুদ্দিন তাওয়ামার প্রধান শিষ্য হজরৎ সেখ সরফুদ্দীন মানেরী সোনারগাঁওতে সমাধিস্থ আছেন। এছাড়াও জানা যায় যে হজরৎ বদর আলম এবং বদর আলম জহিদিও বাংলায় বাস করতেন। ফলে ধরে নেওয়া যায় বাংলার প্রায় কোনো শহর ও গ্রাম ছিল না সেখানে সাধুরা এসে বাস করেননি। সুহারওয়ারদি সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সাধুরাই মারা গেছেন কিন্তু যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের সংখ্যাও খুব কম নয়।'

এতে বোঝা যায় যে চৌদ্দো শতকের মধ্যেই বাংলাদেশে সুফী প্রভাব, গভীরতা ও বিস্তৃতি লাভ করে।

৬. 'বেঙ্গল পাস্ট এ্যাণ্ড প্রেজেন্ট', ১৯৪৮, খণ্ড ৫৭, নং ১৩০, পৃ. ৩৫-৩৬।

কিন্তু যে কয়জন প্রাচীন সুফীর কাহিনী এবং খানকা ও দরগাহের খবর আমরা জানি, তাঁদের আগমন ও অবস্থিতির কাল সম্বন্ধে বিদ্বানেরা একমত নন।[৭] যেমন বাবা আদম শহীদ। বিক্রমপুরস্থিত রামপালের এই আদম শহীদ বিক্রমপুরের এক সেন রাজা বল্লালের সমসাময়িক।[৮] আনন্দভট্ট রচিত 'বল্লালচরিতম্' সম্ভবত এঁরই জীবনচরিত—লক্ষ্মণসেনের পিতা প্রখ্যাত বল্লালসেনের নয়। বল্লালচরিতোক্ত 'বায়াদুম্বা' (*Bayadumba*) সম্ভবত বাবা আদমের নামবিকৃতি।[৯] নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে বল্লালসেন চৌদ্দ শতকের শেষার্ধের লোক।[১০] কাজেই বাবা আদমও ঐ সময়ের।

চট্টগ্রামের পীর বদরুদ্দীন বদর-ই-আলম, বর্ধমানের কালনার বদর সাহিব, দিনাজপুরের হেমতাবাদের বদরউদ্দীন বদর-ই আলম, বর্ধমানের কালনার বদর সাহিব, দিনাজপুরের হেমতাবাদের বদরউদ্দীন এবং বদর মোকানখ্যাত বদর শাহ্ বা বদর আউলিয়া আর মাঝিমাল্লার পাঁচপীরের অন্যতম পীর বদর সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি।[১১] চট্টগ্রামে এঁর অবস্থিতিকাল কারো মতে ১৩৪০ আর কারো ধারণায় ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দ।

শেখ জালালউদ্দীন তাবরেজীর নাম 'সেকশুভোদয়া'র সঙ্গে জড়িত। তিনিই হয়তো 'অমৃতকুণ্ড' অনুবাদ করেছিলেন আরবীতে। কেউ কেউ একে জাল গ্রন্থ বলে বিবেচনা করেন। এই গ্রন্থের লেখক হলায়ুধ মিশ্র রাজা লক্ষ্মণসেনের সচিব ছিলেন। তিনি যদি ১২১০-১২ খ্রীস্টাব্দের পরে বেঁচে থাকেন, তাহলে 'সেকশুভোদয়া' তাঁর রচনা হওয়া সম্ভব। তবে স্বীকার করতে হবে যে, ভাষার বিকৃতি ও প্রক্ষিপ্ত তথ্যে গ্রন্থটি বিদ্বানদের বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে। ইতিহাস-বিরল সে যুগে গ্রন্থকার হিসাবে হলায়ুধ মিশ্রের ও শাসকরূপে লক্ষ্মণসেনের নাম জড়িয়ে আর্যা প্রভৃতির প্রাচীন রূপ রক্ষা করে ষোলো-সতেরো শতকে জাল গ্রন্থ রচিত হয়েছে : অনুমান করতে অনেকখানি কল্পনার প্রয়োজন। 'সেকশুভোদয়া' সূত্রে কারো কারো বিশ্বাস শেখ

৭. 'জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল', খণ্ড ৪৭, পৃ. ১২।
৮ 'জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল', পৃ. ৩৬-৩৭।
৯. আবদুল করিম, 'সোসাল হিস্ট্রি অফ দ্য মুসলিমস ইন বেঙ্গল ডাউন টু ১৫৩৮ এ. ডি', পৃ. ৮৭।
১০. 'জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল', ১৮৯৬, পৃ. ৩৬-৩৭।
১১ (ক) 'বঙ্গে সুফী প্রভাব', পৃ. ১৩২-৩৩ ; (খ) 'ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস', "চট্টগ্রাম", ১৯০৮, পৃ. ৫৬ ; "দিনাজপুর", ১৯১২, পৃ. ২০ ; (গ) 'মুসলমান বাংলা সাহিত্য', পৃ. ২৩ ; (ঘ) 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' ; (ঙ) মক্তুল হোসেন, 'লায়লা মজনু' ; (চ) এম. এস. খান, "বদুন্দর মোকাম" ('জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান', ১৯৬২)।

জালালউদ্দীন তাবরেজী লক্ষ্মণ সেনের আমলে লখনৌতিতে তথা বাংলায় বাস করতেন। 'অমৃতকুণ্ড' তাঁরই আগ্রহে অনূদিত হয়। তাঁরই মাহাত্ম্য-মুগ্ধ হলায়ুধ মিশ্র তাঁরই কৃতিকথা বর্ণনা করেছেন 'সেকশুভোদয়া'য় (শেখের শুভ উদয়)। আবদুর রহমান চিশতির মতে জালালউদ্দীন তাবরেজীর পুরো নাম ছিল আবদুল কাসেম মখদুম শেখ জালাল তাবরেজী।[১২] তিনি শেখ শিহাবুদ্দীন সোহরওয়াদীর সাগরেদ ছিলেন। তিনি কুতুবদ্দীন বখতিয়ার কাকী, বাহাউদ্দীন জাকারিয়া, নিযামুদ্দীন মুগরা ও দিল্লীর শামসুদ্দীন ইলতুৎমিসের (১২১০-৩৬) সমসাময়িক। জন্মস্থান তাবরীজ থেকে দিল্লী এলে তাঁকে সুলতান ইলতুৎমিস অভ্যর্থনা করেন।[১৩] এ তথ্যে আস্থা রাখলে স্বীকার করতে হবে জালালউদ্দীন তাবরেজী লক্ষ্মণসেনের আমলে বাংলায় আসেন নি। কেউ কেউ আবার শেখ জালালউদ্দীন তাবরেজী ও সিলেটের জালালউদ্দীন কুনিয়াঈকে অভিন্ন মনে করেন।[১৪] শেখ জালালউদ্দীন বহুল আলোচিত সুফী। ময়মনসিংহ জেলার মদনপুরে শাহ সুলতান রুমী নামে এক সুফীর দরগাহ আছে। ইনি ৪৪৫ হিঃ বা ১০৫৩-৫৪ সনে ওখানে বিদ্যমান ছিলেন বলে পরবর্তীকালের দলিলসূত্রে দাবি করা হয়।[১৫] এক কোচ রাজা তাঁর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে তাঁকে মদনপুর গ্রাম দান করেন বলে ময়মনসিংহ গেজেটিয়ার-এ উল্লেখ আছে।[১৬] কিন্তু আরো প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পরে উক্ত জেলায় কোচ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৭] অতএব উক্ত কোচ রাজা কোনো কোচ জমিদার হবেন, কিংবা সুলতান রুমী চৌদ্দো শতকের লোক।

পাবনা জেলার শাহজাদপুরে রয়েছে মখদুম শাহ, দৌলা শহীদের দরগাহ।[১৮] ইনি জালালউদ্দীন বোখারীর সমসাময়িক ছিলেন। অতএব

১২. 'মিরাত-অল-আসরার' (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি নং ১৬। এ আর ১৪৩, পৃ ১৯)।
১৩. 'আকবর-অল আখিয়ার', পৃ. ৪৪-৪৫।
১৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থাদির অতিরিক্ত :
(ক) খুরশীদ-জাহান নামা-ইলাহি বক্স ('জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' ১৮৯৫)। (খ) জে এ সোভান, 'সুফিজম এ্যান্ড ইটস সেন্টস' ইত্যাদি, পৃ ৩৩১। (গ) মীর্জা মুহম্মদ আখতার দেহলাভি 'তাজকিরাত-ই আউলিয়া-ই হিন্দ', পৃ. ৫৬। (ঘ) বঙ্গে সুফী প্রভাব', পৃ. ৯৬। (ঙ) আমীর খসরু, 'আফদালুল ফাওয়াদ', পৃ. ৪৭। (চ) সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (১৩৩৮-১৫৩৪)'।
১৫. 'বঙ্গে সুফী প্রভাব', ১৯৩৫, পৃ ১৩৮।
১৬ 'ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার', "মৈমনসিংহ", ১৯১৭, পৃ. ১৫২।
১৭. ই. গেট, 'হিস্ট্রি অফ আসাম', ১৯২৬, পৃ. ৪৬।
১৮. 'ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার', "পাবনা", ১৯২৩, পৃ. ১২১-২৬।

ইনি বারো-তেরো শতকের লোক। বর্ধমানের মঙ্গলকোট গাঁয়ে মখদুম শাহ মাহমুদ গজনবী ওরফে শাহরাহী পীরের দরগাহ্ রয়েছে। ইনি স্থানীয় রাজা বিক্রমকেশরীর সাথে লড়েছিলেন বলে কিংবদন্তী আছে।[১৯]

বগুড়ার মহাস্থানগড়ের শাহ সুলতান মাহি-আসোয়ারের স্বীকৃতি আওরঙজীবের সনদসূত্রেও (১০৯৬ হিঃ ; ১৬৮৫-৮৬) মিলে।[২০] তাঁর সম্বন্ধে লোকশ্রুতি এই যে, তিনি মুসলিম-বিদ্বেষী রাজা বলরাম ও পরশুরামকে হত্যা করেন। পরশুরামের ভগ্নী শিলাদেবী করতোয়া নদীর যেখানে ডুবে মরেছিলেন তা এখন শিলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত। ইনি সম্ভবত চৌদ্দো শতকের লোক।[২১] মনে হয় মাহি-আসোয়ার (মৎস্যাকৃতি নৌকার আরোহী) খ্যাতির লোকেরা চৌদ্দো শতকের পরের লোক নন। কেন-না পনেরো শতকে আরব-ভারতের স্থলপথ জনপ্রিয় হয়। আর ষোলো শতকে পর্তুগীজরা জলপথ নিয়ন্ত্রণ করত।

সিলেটের শাহ জালালউদ্দীন কুনিয়াঈ চৌদ্দো শতকের দ্বিতীয় পাদে বাংলাদেশে আসেন। ইবন বতুতা (১৩৩৮ সনে) সিলেট তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[২২] ইনি রাজা গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

মখদুম-উল-মুলক শেখ শরফুদ্দীন ইয়াহীয়া ও তাঁর ওস্তাদ শরফুদ্দীন আবু তওয়ামাহ সোনারগাঁয়ে (১২১০-৩৬, বা ১২৭০-৭১ কিংবা ১২৮২-৮৭ খ্রীস্টাব্দে) এসেছিলেন।[২৩] ইনি এবং 'মক্তুল হোসেন'-এ মুহম্মদ খান-বর্ণিত শেখ শরফুদ্দীন অভিন্ন ব্যক্তি কিনা বলবার উপায় নেই।

শেখ বদিউদ্দীন শাহ মাদার সিরিয়া থেকে এসেছিলেন। এঁর পিতার নাম আবু ইসহাক শামী। ইনি মুসা নবীর ভাই হারুনের বংশধর। ইনিও সম্ভবত 'শূন্যপুরাণো'ক্ত "নিরঞ্জনের রুষ্মা"র দম মাদার। এবং মাদারীপুরও সম্ভবত তাঁর নাম বহন করছে।[২৪] চট্টগ্রামের মাদার বাড়ী মাদার শাহ এবং

১৯. জে. এ. সোভান, 'সুফিজম এ্যান্ড ইটস সেন্টস', পৃ. ২৩৬।
২০ (ক ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার', 'বগুড়া", ১৯১০, পৃ. ১৫৪-৫৫ ; খ) 'জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল', ১৮৭৮, পৃ. ৯২-৯৩।
২১. 'বঙ্গে সুফী প্রভাব', পৃ. ১৪০-৪১।
২২. এইচ. এ আর. গিব, 'ইবন বতুতা', লন্ডন, ১৯২৯।
২৩. (ক) এম ঈশাক, 'হাদিস লিটারেচার ইন ইন্ডিয়া', পৃ. ৫৩-৫৪ ; (খ) 'ইসলামিক কালচার', জানুয়ারি ১৯৫৩, খণ্ড ২৭, নং ১, পৃ. ১০, টীকা ৯ ; (গ) আবদুল করিম, 'সোসাল হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল', পৃ. ৬৭-৭২।
২৪. আবদুর রহমান চিশতি, 'মিরাত-ই মাদারী', হিজরত ১০৬৪ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পুঁথি নং ২১৭)। (দ্রষ্টব্য : করিম, 'সোসাল হিস্ট্রি'তে উদ্ধৃত, পৃ. ১১৩)।

দরগাহ সংলগ্ন পুকুরের মাছের মাদারী নাম, শাহ মাদারের স্মরণার্থে বাঁশ তোলার বার্ষিক উৎসব প্রভৃতি মাদারিয়া সম্প্রদায়ের সুফীর বহুল প্রভাবের পরিচায়ক বলে ডক্টর এনামুল হক মনে করেন।[২৫]

মখদুম জাহানিয়া জাহানগস্ত ওরফে জালালউদ্দীন সুরকপুশ নামে এক দরবেশ বাংলায় এসেছিলেন। জাহানগস্তের মৃত্যু হয় ১৩৮৩ খ্রীস্টাব্দে এবং উছে তাঁর সমাধি আছে।

শেখ আখি সিরাজউদ্দীন উসমান নিযামুদ্দীন আউলিয়ার খলীফা ছিলেন। ইনি পাণ্ডুয়ার শেখ আলাউল হকের পীর।[২৬] ইনি চৌদ্দো-পনেরো শতকের দরবেশ। তাঁর প্রভাবেই মুখ্যত বাংলাদেশে চিশতিয়া তারিকার প্রসার হয়।[২৭] পীরের নামানুসারে বিভিন্ন চিশতিয়া পীরের শিষ্যরা বিভিন্ন নামে পরিচিত হতেন। আলাউল হকের শিষ্যরা 'আলাহ', তাঁর পুত্র নূর কুতুব-ই-আলমের সাগরেদরা 'নূরী', এবং আলাউলের খলাফা শেখ হোসেন ধুক্কারপোশ-এর সম্প্রদায়ের সুফীরা 'হোসেনী' নামে পরিচিত ছিল।[২৮] শেখ আলাউল হক ইসলামের উন্মেষযুগের মুসলিম সেনাপতি খালিদ-বিন-ওলীদের বংশধর। সেজন্যে তাঁর শিষ্যরা খালিদিয়া নামেও অভিহিত হতেন। আলাউল হকেরই পুত্র ছিলেন নূর কুতুব-ই-আলম।[২৯] গণেশ-যদুর আমলে গৌড়ের রাজনীতিতে আলাউল হকের পরিবার স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।[৩০] নূর কুতুব-ই-আলমের পুত্র শেখ আনোয়ার গণেশ কর্তৃক সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত ও পরে নিহত হন। নূর-কুতুব-ই-আলমের ভ্রাতুষ্পুত্র শেখ জাহিদও সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত হয়েছিলেন। জালালউদ্দীন মোহম্মদ শাহ ওরফে যদু শেখ জাহিদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন।

শাহ আনোয়ার কুলি হালবী, ইসমাইল গাজী, মোল্লা আতা শাহ জালাল দাখিনী (মৃত্যু : ১৪৭৬ খ্রী), শাহ মোয়াজ্জম দানেশমন্দ ওরফে মৌলানা শাহ দৌলা (রাজশাহী : বাঘা), শাহ আলী বাগদাদী (মীরপুর, ঢাকা), শেখ

২৫. 'বঙ্গে সুফী প্রভাব', পৃ. ১১২ ১৩।
২৬ (ক) আবিদ আলী, 'মেমোয়ার্স অফ গৌর এ্যান্ড পাণ্ডুয়া', কলিকাতা ১৯২৯.
(খ) জে. এ সোভান, 'সুফীজম এ্যান্ড ইটস সেন্টস', ১৯৩৮, পৃ. ২৩৬-৩৭।
২৭. এস হাসান আসকারী. 'বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট', ১৯৪৮, পৃ. ৩৬, টীকা ১৩।
২৮ করিম. 'সোসাল হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল', পৃ. ৭২।
২৯. আবদুস সালাম. 'রিয়াজ-উস সালাতিন', পৃ. ১১৫-১৬।
৩০. 'ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার', "হুগলী", পৃ. ২৯৭, ৩০২-৩০৩।

ফরিদউদ্দীন শাহ, লঙ্গর শাহ নিয়ামতুল্লাহ, শাহ লঙ্কাপতি প্রভৃতি দরবেশের নাম উল্লেখ্য।[৩১]

জালালুদ্দীন তাবরেজী (মৃত্যু : ১২২৫ খ্রী), মখদুম জাহানিয়া (১৩০৭-৮৩) ও শাহ জালাল কুনিয়াঙ্গ (মৃত্যু : ১৩৪৬) সোহরওয়াদীয়া মতবাদী ছিলেন। শেখ ফরিদউদ্দীন বাখরগঞ্জ (১১৭৬-১২৬৯), আখি সিরাজুদ্দীন (মৃত্যু : ১৩৫৭), আলাউল হক (মৃত্যু : ১৩৯৮), শেখ নাসিরউদ্দীন মানিকপুরী, মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাংগীর সিমনানী, শেখ নূর কুতুব-ই-আলম (মৃত্যু : ১৪১৬), শেখ জাহিদ প্রমুখ চিশতিয়া সম্প্রদায়ের সুফী ছিলেন। শাহ সফীউদ্দীন (মৃত্যু : ১২৯০-৯৫ ?) কলন্দরিয়া সুফী ছিলেন। শাহ আল্লাহ মদারিয়া এবং শেখ হামিদ দানিশমন্দ নকশবন্দিয়া সুফী ছিলেন। ষোলো শতক অবধি চট্টগ্রামের সুফী শাহ সুলতান বলখী (বায়জিদ ?) শেখ ফরিদ, পীর বদর আলম, কাতাল পীর, শাহ মসন্দর বা মোহসেন আউলিয়া, শাহপীর, শাহচাঁদ প্রমুখ এবং কবি মুহম্মদ খানের মাতৃকুলের পীর শরফউদ্দীন থেকে সদরজাহা আবদুল ওয়াহাব ওরফে শাহ ভিখারী অবধি অনেক পীর প্রখ্যাত।

আবার শাহ জালালউদ্দীন কুনিয়াঙ্গ, আলাউল হক, নূর কুতুব-ই-আলম, আশরাফ জাহাংগীর সিমনানী, ইসমাইল গাজী, জাফর আলী খাঁ, খান জাহান খান প্রমুখ সুফীরা রাজনীতি ও সরকারী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। আর্তের সেবা, কাঙাল ভোজন, রোগীর চিকিৎসা ও কেরামতি প্রভৃতি দ্বারাই সুফীরা গণমন জয় করেন।[৩২]

দরবেশদের প্রচারে ও প্রচারণায় যে গাঁয়ের লোক সাগ্রহে ইসলাম বরণে এগিয়ে এসেছিল ভাবার তেমন কোনো কারণ নেই। প্রজন্মক্রমে আশৈশব প্রাপ্ত শাস্ত্রীয় বিশ্বাস সমেত যে কোনো দৈবিক-ভৌতিক-রাশিক-অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার পরিহার করা কোনো ক্ষতিভীরু ও প্রাপ্তিলোভী মানুষের পক্ষে সহজে সম্ভব হয় না। নাস্তিক তাই দুনিয়াতে চিরকালই দুর্লভ। ইংরেজ আমলের সাক্ষ্যে বলা চলে, নিতান্ত বাঁচার তাগিদে নিঃস্ব নিরন্ন নিরুপায় মানুষ শাসক-

৩১ (ক) জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল', ১৮৭৪, পৃ. ২১৫ ; (খ) 'রিসালত আল শুদা' ; (গ) মমতাজুর রহমান তরফদার, 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা', ১৩৬৭ সন।

৩২. 'জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল', ১৮৭২, পৃ. ১০৬-৭ ; ১৮৭৩, পৃ. ২৯০ ; 'আখবর-অল আখিয়ার', পৃ. ১৭৩ ; 'জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল', ১৯০৪, নং ২, পৃ. ১০৮ ; 'বঙ্গে সুফী প্রভাব', পৃ. ১৪০-৪৪ ; আবদুস সালাম, রিয়াজ-উস সালাতিন', পৃ. ১১৫-৭০ ; 'বঙ্গে সুফী প্রভাব', পৃ. ৯০-১১৯ দ্রষ্টব্য।

গোষ্ঠীর জ্ঞাতি দরবেশের কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য দোয়ায় বাঁচার নতুন উপায় প্রাপ্তির প্রত্যাশায় নতুন ধর্ম বরণ করেছে। কাজেই ইসলামের প্রসার দ্রুত হয় নি। বাংলার হিন্দু বৌদ্ধজ মুসলিমদের অধিকাংশই স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ক্ষুদ্র ও অবজ্ঞেয় বৃত্তিজীবী। যেমন জুলহা (তাঁতী বৌদ্ধ নাথযোগী), নিকারী (মাছ বিক্রেতা, কৈবর্ত (জেলে), মুলুঙ্গি (লবণ উৎপাদক), বেদে, কাগজী (কাগজ নির্মাতা), কাহার পালকি-বাহক), কসাই, মুজারী, বারুই (বরোজ-চাষী), তেলী, বাউল (বৌদ্ধ বজ্রসহজযানী) প্রভৃতি বহু ও বিবিধ প্রাজন্মক্রমিক বৃত্তিজীবীর অস্তিত্বই এর প্রমাণ।

৪

প্রমাণে-অনুমানে বোঝা যায়, তেরো শতকে গাঁয়ে-গঞ্জে ইসলাম প্রচার শুরু হলেও চোখে পড়ার মতো মুসলিম গাঁয়ে গাঁয়ে দুর্লভ ছিল, কয়েক পরিবার একসঙ্গে রাজি না হলে একক পরিবারের পক্ষে নবধর্মে দীক্ষিত হওয়া বৈষয়িক-সামাজিক কারণেই অর্থাৎ হাটে মাঠে ক্ষুব্ধ বিরূপ পাড়ার লোকের সহযোগিতাশূন্য হয়ে স্বাতন্ত্র্যে বাঁচা ছিল অসম্ভব। আমরা যদি অনুমান করি যে, তেরো শতকে শতকরা একজন, চৌদ্দো শতকে তিনজন, পনেরো শতকে ছয়জন, ষোলো শতকে বারোজন, সতেরো শতকে পনেরোজন, আঠারো শতকে বাইশজন, তাহলে উনিশ শতকের শেষ পাদের শুরুতে (১৮৭১ সনে) উভয় বঙ্গে শতকরা বত্রিশজন মুসলিম পাওয়া সম্ভব।[৩৩]

এদের বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত জ্ঞাতিদেরও কোনো লেখাপড়ার অধিকার ও ঐতিহ্য ছিল না। সুনির্দিষ্ট বৃত্তিজীবীতে বিভক্ত ও বিন্যস্ত সমাজে পেশান্তরের সুযোগ-সুবিধেও ছিল বিরল, তাই বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলিম সমাজে বৃত্তি ও অর্থ-সম্পদগত দুস্থতার দুরবস্থার এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানগত পরিবর্তন ছিল দুর্লক্ষ্য। যদিও মুসলিম সমাজেও মসজিদে অচ্ছুত ছিল না কেউ, তবু স্থানভেদে বৈবাহিক সম্বন্ধে আজলাফ-আতরাফ-আশরাফ ভেদ ছিল প্রায় দুস্তর। অবশ্য বিদ্যায় ও বিত্তে তথা কাঞ্চনকৌলীন্যে ও প্রতাপে-প্রভাবে সেদিনও আশরাফ হওয়ার পথে বাধা ছিল সামান্য। ঐতিহ্য বা রেওয়াজ ছিল না বলে, বিশেষত একালের মতো শিক্ষিতলোকের জন্যে লক্ষ লক্ষ চাকরি ছিল না বলে প্রাজন্মক্রমিক নিম্নস্তরের পেশাজীবী পরিবারে কেউ সন্তানকে লেখাপড়া

৩৩. জাফরুল ইসলাম ও রেমন্ড এল. জেনসেন. "ইন্ডিয়ান মুসলিম এ্যান্ড পাব্লিক সার্ভিস, ১৮৭১-১৯১৫", ('জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান', জুন ১৯৬৪, খণ্ড ৯, নং ১. পৃ. ৪৯।

শেখানোর গরজ বোধ করত না। তবু সাক্ষরতার প্রতি সামাজিক মর্যাদাগত আকর্ষণ ছিল বলে, কেনা-বেচা, জমি-জমা সম্পর্কিত হিসেব নিকেশের প্রয়োজন বোধে এবং কোরআন পড়ার ও নামাজ-রোজা সম্বন্ধীয় আবশ্যিক নীতি নিয়ম-রীতি-পদ্ধতি জানার-জানানোর গরজ-চেতনাবশে কেউ কেউ সন্তানকে বিদ্যালয়ে মক্তবে পাঠশালায় পাঠাত। এমন লোক ছিল হয়তো হাজারে একজন। এরাই মোল্লা, মুয়াজ্জিন, খোন্দকার, আখন্দ, আকুঞ্জি, উকিল, মোক্তার, মুনশী-মৌলবী আমিন প্রভৃতি এবং কিছু লোক দফতরের আদালতের নায়েব, গোমস্তা, সরকার, পাটোয়ারী-মৃধা-বন্দুকশি, সিপাহি হতো। এদের প্রাপ্য সবচেয়ে বড় চাকরি ছিল কাজীর ও ফৌজদারের পদ। বরং মোঙ্গল গোত্রীয় রাজ্যে—আরাকানে ত্রিপুরায় চট্টগ্রামে ও কুমিল্লার দেশজ মুসলিমদের অনেকেই বড়ো পদে—শাসনকর্তা, সেনানী ও মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। বাংলার গৌড়ে, ঢাকায়, মুর্শিদাবাদে সুদীর্ঘ সাড়ে ছয়শো বছরের তুর্কী-মুঘল শাসনে কোনো দেশজ মুসলিম শাসক-সেনানী-উজির পদ পায় নি। ব্রিটিশ আমলে যেমন দেশী খ্রীস্টানের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর কোনো সামাজিক-সাংস্কৃতিক যোগ ছিল না, এমনকি গির্জাও ছিল না অভিন্ন, তুর্কী-মুঘল আমলেও তেমনি দেশজ মুসলিমদের সঙ্গে সামাজিক সাংস্কৃতিক, শাস্ত্রিক ও বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল না বিদেশাগত ও উত্তর-ভারতীয় উত্তমম্মন্য শাসকগোষ্ঠীর। এমনকি পলাশীর ও বাকসারের যুদ্ধের পরে বাংলাস্থ অভিজাত বিদেশীরা উত্তর-ভারতে চলে যায়, ক্বচিৎ কেউ নানা সুবিধে-অসুবিধের কারণে থেকে যায়, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তেমন কয়গণ্য কিছু উর্দুভাষী এককালের বিত্তবান এবং আজো খান্দানী বা আভিজাত্যগর্বী পরিবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, আর রয়েছে গৌড়ে, মুর্শিদাবাদে, ঢাকায়, চট্টগ্রামে, হুগলী-হাওড়া-কলকাতা শহরে, উত্তর-ভারত থেকে তুর্কী-মুঘল আমলে নানা প্রয়োজনে আসা লোকগুলোই স্থায়ী বাসিন্দারূপে। এদের এখন অবজ্ঞায় উচ্চারিত নাম 'কুট্টি'।

৫

কলকাতার, মুর্শিদাবাদের এবং অন্যত্র নিবসিত উর্দুভাষী শিক্ষিত অভিজাত মুসলিমরাই নিজেদের বাংলার মুসলিম বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, প্রমাণ দেওয়ান খান বাহাদুর ফজলে রব্বী-র গ্রন্থ[৩৪] এবং নওয়াব আবদুল

৩৪. খোন্দকার ফজলে রব্বী, 'অরিজিন অফ দ্য মুসলমানস অফ বেঙ্গল', ১৮৯৫।

লতিফের[৩৫] লিখিত উক্তি। লতিফ বাংলাভাষী দেশজ মুসলিমদের 'ছোটোলোক' মুসলিম বলেই জানতেন।

বাঙালী মুসলমান বলতে বাংলাভাষী দেশজ ও বিদেশাগত শাসকগোষ্ঠীভুক্ত উর্দুভাষী—এ দু শ্রেণীর মুসলিমে পার্থক্যচেতনা নিয়ে একাল অবধি ইংরেজ, হিন্দু ও মুসলিম বিদ্বানেরা মুসলিমদের আর্থিক, শৈক্ষিক, রাজনীতিক, বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক বিষয় ও সমস্যা আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করেন নি বলেই তাঁদের বহু গবেষণা ও সিদ্ধান্ত একালে বিভ্রান্তিই বাড়িয়েছে, তথ্যের সত্য আবিষ্কৃত হয় নি। যেমন ইংরেজ আমলে উর্দুভাষী অভিজাতরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে গোড়া থেকেই আগ্রহী ছিল। এদের অনুরোধেই মুর্শিদাবাদে ১৮২৪ সনে ইংরেজি প্রশাসনের বাহন হওয়ার আগেই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়াহাবী আন্দোলনের কেন্দ্র বিহারে পাটনায় অভিজাতরা কখনো ইংরেজি বিদ্যা বিরোধী ছিল না। বাংলায় দেশজ মুসলিমদের শিক্ষার কোনো ঐতিহ্য বা রেওয়াজ ছিল না বলে, ঘরের কাছে স্কুলও ছিল না বলে দরিদ্র অজ্ঞ নিরক্ষর পিতা পুত্রকে অপরিচিতের অনাত্মীয়ের শহরে পাঠাবার কথা ভাবতেও পারে নি। তাই ব্রিটিশ সরকারের চেষ্টা সত্ত্বেও (কমিশন রিপোর্টগুলোয় নানা কারণ ও উপায় বিশ্লেষিত হওয়া সত্ত্বেও) উনিশ শতকে স্কুলে কলেজে (মহসিন কলেজেও) মুসলিম ছাত্র জোটে নি, এমনকি ১৭৮০ সনে অভিজাত উর্দুভাষীর দাবিক্রমে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায়ও বাংলাভাষী দেশজ মুসলিম ছাত্র ও শিক্ষক ছিল দুর্লভ। ডবলিউ. ডবলিউ. হান্টার[৩৬] কথিত 'Hundred and fifty years ago, it was impossible for a Muslim to be poor etc.'-ও এই মুঘল প্রশাসক গোষ্ঠীভুক্ত উর্দুভাষী ও ফারসী মুনশী মুসলিমকেই বোঝায়।

ওয়াহাবীরা গোড়ায় ছিল ব্রিটিশ মিত্র, তীতুমীরের সংগ্রামের কাল থেকেই ওয়াহাবীরা ব্রিটিশ-বিদ্বেষী হয় এবং ১৮৩৮ সনেই ইংরেজি প্রাশাসনিক ভাষা হিসেবে আইনসিদ্ধ হয়, আর স্যার সৈয়দ আহমদের প্রেরণায় ও প্রবর্তনায় ১৮৬০ সনের দিকে বাংলার ও ভারতের মুসলিমদের ব্রিটিশ প্রীতি জাগে, কাজেই 'ইংরেজি' শিক্ষা এড়ানোর ও বর্জনের অবকাশই ঘটে নি কারুর, যদিও ফরায়েজী-ওয়াহাবীদের কেউ কেউ গাঁয়ে গঞ্জে কিছুকাল ইংরেজের শিক্ষা-সংস্কৃতি সহযোগিতা বর্জনের বৃথা আহ্বান জানিয়েছিল অজ্ঞ-অনক্ষর শিক্ষায়

৩৫. এনামুল হক (সম্পাদিত), 'নবাব বাহাদুর আবদুল লতিফ', ঢাকা, ১৯৬৮।
৩৬. 'দ্য ইন্ডিয়ান মুসলমানস – আর দে বাউন্ড ইন কনসেন্স টু রেবেল এগেনস্ট দ্য কুইন ?' ১৮৭১।

অনীহ চাষী মজুর ও বৃত্তিজীবীদের প্রতি। সামগ্রিকভাবে এর কোনো গুরুত্ব ছিলই না। আর ১৮৭০ সনের আগেই ওয়াহাবী-বিচার অনুষ্ঠানকালেই ওয়াহাবীদের এবং ফরায়েজীদেরও ব্রিটিশ-বিদ্বেষ অবসিত হয়।

অতএব তুর্কী-মুঘল আমল ছিল—গোটা পৃথিবীর সর্বত্র যেমন—এখানেও অজ্ঞতার অনক্ষরতার ও অশিক্ষার অন্ধকার কিন্তু স্বাভাবিক যুগ। সেকালে সাক্ষর শিক্ষিতলোক লাখেও এক ছিল না, কেন-না একালের মতো শিক্ষা জীবিকাক্ষেত্রে আবশ্যিক বা অপরিহার্য ছিল না। তাই ব্যক্তিগত আগ্রহ, জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলই ব্যক্তিকে বিদ্বান করত। শিক্ষার কোনো সামাজিক তাগিদ ছিল না, কিছু বামুন কায়স্থ বৈদ্য জীবিকার প্রয়োজনে বিদ্যার্জন করত, তেমনি করত কিছু মোল্লা, মুয়াজ্জিন, মৌলবী, মুনশী, খোন্দকার শাস্ত্রীয় জীবিকার প্রয়োজনে। এ স্বল্পসংখ্যক মোল্লা, পুরোত, মৌলবী, মুনশী, পণ্ডিতরাই ছিল গাঁয়ে গাঁয়ে ভদ্র শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী।

৬

গাঁয়ে গাঁয়ে দেশজ মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, সামাজিক সাম্য ও স্বাধীনতা পেয়ে কেউ কেউ বিদ্যা এবং পেশা পরিবর্তন করে বিত্তও অর্জন করে সচ্ছল ভদ্র শিক্ষিত গৃহস্থও হয়েছিল গাঁয়ে গাঁয়ে। কিন্তু বামুন কায়স্থ বৈদ্য বিদ্যা- ও বিত্ত-বানরাই জমিদার, মহাজন, দোকানদার, আড়তদার, ও স্থানীয় প্রশাসক হিসাবে ছিল প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পন্ন গ্রাম-সর্দার। ঊনজন অজ্ঞ-অনক্ষর চাষী মজুর ও ক্ষুদ্র বৃত্তিজীবী মুসলিমরা ছিল আর্থিক-শৈক্ষিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক ও প্রাশাসনিক ক্ষেত্রে বর্ণ-হিন্দুর শাসিত-পরিচালিত জন তুর্কী-মুঘল আমল থেকে ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা প্রাপ্তিকাল অবধি। এদের সম্বন্ধেই Robert Orme বলেছেন যে, 'The Moors of Indostan may be divided into two kinds of people differing in every respect. Under the first are reckoned the descendants of conquerors. The second rank of Moors comprehends all the descendants of converted Gentoos—a miserable race as None but the most miserables of the Gentoos castes are capable of changing their religion.'[৩৭] নিম্নবর্ণের হিন্দুরা হাড়ি, ডোম, মুচি, মেথর, মালী, চাঁড়াল, বাগদী, নাপিত, ধোপারূপেও ছিল মুসলিমদের প্রাত্যহিক সেবায় ও

৩৭. জে. পি. গুহ (সম্পাদিত), 'হিস্টরিকাল ফ্রাগমেন্টস অফ দ্য মুঘল এম্পায়ার', দিল্লী, ১৯৭৮, পৃ. ২৭১।

সহযোগিতায় নিয়োজিত। কশবায়, ইকতায়, ইকলিমে, চাকলায় হয়তো তুর্কী-মুঘল প্রশাসক থাকত, কিন্তু গাঁয়ে-গঞ্জে এরা নিশ্চয় দুর্লক্ষ্য ছিল ইংরেজদের মতোই। এ পারস্পরিক নির্ভরতার জন্যই পরস্পরের শাস্ত্রিক বিশ্বাস সংস্কারের প্রতি অশ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলিমের সাম্প্রদায়িক ঘৃণা-বিদ্বেষ কখনো কোথাও সক্রিয় হতে পারে নি।

গাঁয়ে গঞ্জে যদিও শিক্ষিত বিত্তবানদের মধ্যে শ্রেণীস্বার্থে দ্বন্দ্ব ছিল—'ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে' এবং উনিশ বিশ শতকের আগে শহরেও। কাজেই সাধারণভাবে গত সাড়ে সাতশো বছর ধরে গাঁয়ে হাটে মাঠে অর্থে বিত্তে শিক্ষায় প্রশাসনে পঞ্চায়েতে অধিজন বর্ণ-হিন্দুরই ছিল নেতৃত্ব ও প্রাধান্য। অতএব ইংরেজ আমলেই দেশজ মুসলিমরা সরকারি চাকরি অর্থ সম্পদ ও শিক্ষার সুযোগ হারিয়ে আকস্মিকভাবে দরিদ্র ও অশিক্ষিত হয়ে পড়ে বলে যে বিশ্বাস চালু রয়েছে তার মধ্যে কোন তথ্য বা সত্য নেই। আর এও সত্য নয় যে, বহু বহু দেশজ মুসলিমের আয়মা, মদদেমাস বা ওয়াকফ সম্পত্তি ছিল, যা ছিল এবং যাদের ছিল তারা মোটামুটি মামলা মোকদ্দমা করেও শেষ নিষ্পত্তিকাল ১৮৪৬ সন অবধি ভোগ দখল করেছে। ১৮৩৮ সনেও কাজী কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন মুসলমান এবং ১৮৬০ সন থেকে মুনশী উকিলের পেশা মন্দা ও বিলুপ্ত হতে থাকে ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু উকিলের উপস্থিতির ফলেই। কাজেই শাসকগোষ্ঠীর মুসলিমরা আঠারো শতকের শেষ পাদে সামরিক পদ এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে (১৮৩২ সনের পর থেকে থেকে ডেপুটি মুন্সেফ পদ সৃষ্টির সময় থেকে) নানা বেসামরিক ও প্রাশাসনিক পদ হারায়। এদের অনেকেই উত্তর-ভারতে চলে যায়, আর যে-সব বিত্তবান সুবিধার বা অসুবিধার কারণে রয়ে যায়, তারাও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিত্তশালী, সম্মানিত অভিজাত উর্দুভাষী শিক্ষিত রূপেই দেশজ মুসলিমের নেতৃত্ব দিয়েছে ইংরেজ আমল থেকে পাকিস্তান যুগ অবধি। এতে কিন্তু দেশজ অনক্ষর পেশাজীবী মুসলিম আর্থিকভাবে মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি, কিছু উকিল, কাজী, আমিন, নকলনবিশ অবশ্য ব্যতিক্রম।

ব্রিটিশ আমলে প্রাশাসনিক পরিবর্তনের ফলে দেশজ মুসলিম জীবনে পৃথক কোনো বিপর্যয় ঘটে নি, যা ঘটেছে তা হচ্ছে, গ্রামীণ পণ্য-বিনিময় ভিত্তিক অর্থনীতি আকস্মিকভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুঁজির ও পণ্যের খপ্পরে পড়ে এবং শিল্প-কারখানায় নির্মিত বিভিন্ন পণ্যের প্রতিযোগিতায় আমাদের হস্তনির্মিত কুটিরশিল্প বিলুপ্ত হলো। বেকারত্বের শিকার হলো গণমানব, দারিদ্র ও নিঃস্বতা গ্রাস করল জনজীবন, কাঁচা টাকা-নির্ভর হলো জীবনযাত্রা। পাদটীকার পুঁজি না থাকলেও কাণ্ডজ্ঞাননির্ভর যৌক্তিক ও তাথ্যিক সাক্ষ্য-

প্রমাণে নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, দেশজ মুসলিমদের কেউ কখনো বখতিয়ার খলজির কাল থেকে মীরজাফরের কাল অবধি দরবারে উজির বা সেনানীরূপে কোনো পদ পায় নি—যোগ্যতার অভাবেই। আজও তুর্কী-মুঘল আমলের প্রাশাসনিক পদবীধারী সব হিন্দুই দেশজ মুসলিম নয়—ক্বচিৎ কেউ কাজী খোন্দকার আমিন, পাটোয়ারী মজুমদার ফৌজদার মাত্র। দেশজ মুসলিমদের কেউ রাজনীতি ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দিতে পারে নি উচ্চবিত্তের, আভিজাত্যের ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে বা হীনম্মন্যতার ফলে। তাই ক্লাইভ-হেসটিংসের আমল থেকেই মুর্শিদাবাদে কলকাতায় ও অন্যত্র নিবসিত জমিদার উর্দুভাষীরাই অজ্ঞ-অনক্ষর বা সাক্ষর স্বল্পশিক্ষিত ও বিদ্বান দেশজ মুসলিমের হয়ে তাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন নাজিমউদ্দীন-সোহরওয়ার্দী-মুহম্মদ আলী অবধি (উল্লেখ্য যে বিবাহ-সূত্রে এ. কে. ফজলুল হক-ও ছিলেন ঘরোয়া জীবনে উর্দুভাষী, অন্য অনেক উর্দুভাষী রাজনীতিক সুবিধের জন্যে মৌখিক বাংলাও শিখেছিলেন বিশ-শতকের প্রথমার্ধে)। দেশজ মুসলিমদের সঙ্গে ভাষিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক কোনো সম্বন্ধ সম্পর্ক ছিল না এসব উর্দুভাষী নেতাদের। কেবল স্বধর্ম বলেই এদের উপর ওদের স্ব-ঘোষিত অবাধ নেতৃত্বে ছিল মৌরসী অধিকার। ফলে দেশজ মুসলিমদের জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন-প্রত্যাশা, সমস্যা-সম্বল সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না বলেই মুসলমানের পক্ষে শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারকে পরামর্শদানের কিংবা সরকারের কাছে মুসলিমদের হয়ে নানা দাবি জানানোর ক্ষেত্রে বারবার অজ্ঞতার ও বিভ্রান্তির কুফলই মিলেছে আঠারো-উনিশ শতকে।

৭

গাঁয়ে গাঁয়ে দেশজ মুসলিমের সংখ্যা শাস্ত্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংহতি ও স্বাতন্ত্র্য চেতনা জাগানোর মতো বৃদ্ধি পেল সম্ভবত পনেরো শতকের শেষ পাদ থেকে। ষোলো শতকে তাই আমরা সুফী দরবেশের কাছে দীক্ষিত মুসলিমদের কোরআন-হাদিস অনুগ ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণের বাস্তবে রূপায়ণ প্রয়াস প্রত্যক্ষ করি তাদের শাস্ত্রীয় তত্ত্ব এবং নিয়ম-নীতি ও রীতি পদ্ধতি বিষয়ক রচনায়। এখন থেকেই পাথুরে প্রমাণ মিলছে মাদ্রাসায় শিক্ষিত দেশজ শাস্ত্রীয় ও শাস্ত্রবিদের, আলিম মৌলবী পীরের। দেশজ বৌদ্ধ হিন্দু যোগ-তন্ত্র প্রভাবিত সুফীবাদের সঙ্গে শরীয়ত-সম্মত ইসলামের এবং স্থানীয় লৌকিক বিশ্বাস-আচার-সংস্কারের অসঙ্গত অসমঞ্জস মিশ্রণে-সমন্বয়ে এক

লৌকিক ইসলামই ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের পূর্বাবধি বাংলাদেশে প্রজন্মক্রমে চালু ছিল।[৩৮]

কোরআন-হাদিস অনুগ বিশুদ্ধ ইসলাম বিশ্বাসে ও আচরণে মানা সম্ভবও ছিল না দুটো কারণে। প্রথমত, শাস্ত্র ছিল আরবী ভাষায় লিখিত, বিদেশীর বিভাষা আয়ত্ত করা বিদ্যালয় বিরল সে যুগে ক্বচিৎ কারুর পক্ষে সম্ভব ছিল, আলিম মৌলবী আজও সর্বত্র শতশত মেলে না, দ্বিতীয়ত, স্থানিক কালিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক যে পরিবেশে মানুষ আশৈশব লালিত হয়, তার প্রভাব এড়াতে পারে না। শাস্ত্রীয় গোত্রীয় ও স্থানীয় ঐতিহ্যের আচারের, সংস্কারের মিশ্র ও সমন্বিত প্রভাবেই মানুষের মন-মনন-আচার-আচরণ নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে বাঙালীর ধর্ম সাধারণভাবে বিশুদ্ধ 'ইসলাম' নয়, —মুসলমান ধর্ম যাতে রয়েছে যুগপৎ শরীয়ত ও মারফত, কোরআন-হাদিসের পাশে পীর দরবেশ-দরগাহ, মন্ত্র, মাদুলী, তাবিজ, দোয়া, ঝাড়-ফুক-তুক-তাক।

৮

এমন যুগ দীর্ঘকাল ধরে ছিল যখন মানুষের ঐহিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণও মুখ্যত শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত ছিল, তাই তাদের শিল্প-সাহিত্য, তত্ত্ব-দর্শন ও নীতি-বোধ ছিল শাস্ত্রের অনুগত। তাই বাঙালী হিন্দুর ও মুসলমানের সাহিত্যের বিষয়বস্তুও ছিল পৃথক। শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর শিল্প-সাহিত্য-দর্শন ও নীতিশাস্ত্র ছিল সংস্কৃতে লিখিত। এগুলো শিক্ষিত লোকেরই, ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থেরই পড়ার ও অনুশীলনের বিষয়। অজ্ঞ-অনক্ষর জনগণেরও সাহিত্য-শিল্প-নীতি-দর্শনের ও নাচ-গান-বাদ্যের চর্চা ছিল—একালের পরিভাষায় তার নাম 'ফোকলোর'। এর সাহিত্য শাখার নাম 'লোকসাহিত্য'—ব্যক্তিবিশেষের সাময়িক আবেশে অনুভবে রচিত এবং অলিখিত ও ভণিতাহীন বলে আর মুখে মুখে বিকৃত বিবর্তিত পল্লবিত ও পরিমার্জিত বলে লোকসাহিত্যকে 'গণরচনা' বলে অভিহিত করা হয়। স্থানিক বুলিতে রচিত, স্থানের সীমায় নিবদ্ধ শ্রুতি-স্মৃতি রূপে মুখে মুখে চালু এ সাহিত্যে ক্বচিৎ কখনো ভাবগত ঋদ্ধি ও আলঙ্কারিক চমক থাকলেও মাপে মানে মাত্রা রুচির সংস্কৃতির শৈল্পিক উৎকর্ষ

৩৮. (ক) এনামুল হক, 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম', প্রথম সং, ঢাকা, ১৯৫২। (খ) আহমদ শরীফ, ''আঠার শতকের চট্টগ্রামে মুসলিমদের দেশজ আচার সংস্কার'' ('মুহম্মদ এনামুল স্মারক গ্রন্থ', এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ, ১৯৮৫, পৃ. ২০-৩৪)। (গ) আবদুল হক চৌধুরী, 'চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮।

নেই বলে, এ সাহিত্য-শিল্প লোকের তথা প্রাকৃতজনের সাহিত্য বলেই এর নাম 'লোকসাহিত্য'—মানুষে আর হরিজনে যে পার্থক্য, সাহিত্যে-শিল্পে ও লোকসাহিত্যে-শিল্পে আর লোরে সে পার্থক্য।

শিক্ষিত হিন্দুরা সংস্কৃতে রচিত সাহিত্যে শাস্ত্র-দর্শন-নীতিশাস্ত্র পড়ত বলেই জনগণকে লৌকিক দেবতা-উপদেবতার এবং কিছু সার্বজনীন নীতিকথা পড়িয়ে শোনানোর লক্ষ্যে প্রথমে মৌখিক কথাবার্তার জন্য ধামালী কাহিনী রূপে, পরে লিখিত পাঁচালী রূপে রচনা করেন। সাহিত্য রচনার গরজবোধ করেন নি তাঁরা আঠারো শতক অবধি। এ ধামালী পাঁচালী রচনারও ঐতিহাসিক ও প্রাতিবেশিক কারণ ছিল। বৌদ্ধ বিলুপ্তির কালে নির্জিত বৌদ্ধরা বাহ্যত ব্রাহ্মণ্য সমাজাশ্রয়ী হয়ে তাদের শাস্ত্রীয় বিশ্বাস সংস্কার চালু রাখার চেষ্টায় ছিল, শূন্যবাদী ধর্মঠাকুর পূজারী, নাথপন্থী, সহজপন্থী এবং যোগ-তান্ত্রিক সাধনপন্থী ও সাধারণ হিন্দু-মুসলিম বাউলরা এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধই।[৩৯] তারা, আদিনাথ-চন্দ্রনাথ, বৎসলা, যক্ষ, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতাও হিন্দুদেবতা রূপে পূজিত হতে থাকেন।[৪০]

৯

আদি ও আদিম সমাজে প্রজন্মক্রমে আশৈশবলব্ধ ও লালিত বিশ্বাস-সংস্কারের যেন মৃত্যু নেই। জ্ঞান-বুদ্ধি সভ্যতা সংস্কৃতির বিকাশের ফলে শীতকালীন ঔষধির মতো আপাতলুপ্ত হলেও চিত্তলোকের গভীরে কোথাও এর জড় থেকে যায়, তা-ই ইহজাগতিক লাভ-ক্ষতির ক্ষেত্রে আত্মপ্রত্যয়রিক্ত দুর্বল-চিত্ত মানুষের অবলম্বন হয়। দৃঢ়মূল সে বিশ্বাস সংস্কার জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তিকে ছাপিয়ে জনচিত্ত প্রভাবিত ও পরিচালিত করে। মানুষ তখন প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনালব্ধ সিদ্ধান্তে এবং নীতি-নিয়ম-আদর্শে স্থির থাকতে পারে না। এ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ কিংবা সহজাত প্রকৃতিই। একটা তুচ্ছ উপমায় হয়তো এর প্রকৃতি বোঝানো যায়। আমরা সব সাক্ষর ব্যক্তিই মুদ্রিত আদর্শ লিপি দেখে হরফ শিখি, কিন্তু আজ অবধি আমরা কেউ তা নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণের কথা ভাবি নি, তথা কেউ নিষ্ঠ অনুকৃতির গুরুত্ব দিই নি, অজ্ঞাতেই স্ব স্ব লেখায় বর্ণ নির্মাণে হয়েছি স্বেচ্ছাচারী। জীবনের ক্ষেত্রেও

৩৯ আহমদ শরীফ, 'বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য', ১৯৮৩, প্রথম সং; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১-১৩৯।

৪০. তদেব।

মানুষ কখনো আক্ষরিক অর্থে শাস্ত্রের অনুগত হয়ে জীবন যাপন করে না, করতে পারে না, বিপন্ন বা প্রলুব্ধ হলেই আপাত প্রেয় পন্থা বরণ করে।

আমাদের অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ভোটচীন কিংবা আলপাইনীয় আর্যগোষ্ঠীর লোকেরাও বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র সামাজিকভাবে প্রকাশ্য জীবনে অঙ্গীকার করলেও তাদের মানসিক জীবনে প্রজন্মক্রমে শ্রুতিস্মৃতি রূপে প্রাপ্ত আশৈশব লালিত বিশ্বাস-সংস্কার কখনো পরিহার করতে পারে নি। বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনদের শাসনের অবসানে বিদেশী-বিধর্মী-বিভাবী তুর্কী শাসনে স্ব স্ব ধর্মীয় মত-পথ, নিজেদের মধ্যে প্রকাশ্যে প্রচারের ও আচার-আচরণের স্বাধীনতা পেয়ে চিরলালিত লৌকিক দেবতা-উপদেবতার মাহাত্ম্য উচ্চারণে, পূজা প্রচলনে এবং পার্বণিক অনুষ্ঠানে উৎসাহী হয়ে ওঠে তেরো শতক থেকেই। প্রথমে অলিখিত ধামালীরূপে তেরো-চৌদ্দো শতকে কথকতায় এবং পরে লিখিত পাঁচালী মাধ্যমে পনেরো-আঠারো শতক অবধি দেশের সর্বত্র লৌকিক দেবতা-অপদেবতার প্রভাব ও প্রসার ঘটে লোকসমাজে। এঁরা পশ্চিমবঙ্গে নানা উপনামের চণ্ডী, শূন্য, ধর্মঠাকুর, বাসুলী, যক্ষ, ষষ্ঠী, শীতলা-ওলা, ক্ষেত্রপাল, এবং পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে পদ্মা বা মনসা এবং শিব-কালী-দুর্গা-লক্ষ্মী সরস্বতী, বসুমতী, জগদ্ধাত্রী রূপে সর্বত্র পূজিত হতে থাকেন, এঁদের মধ্যে চণ্ডী, শিব, কালী, মনসা, ধর্মঠাকুর, ষষ্ঠী, শীতলার মাহাত্ম্যকথা পূর্ণাঙ্গ পাঁচালীরূপে রচিত হয়েছে বিভিন্ন শতকে। চৈতন্য-চরিতকার বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবতে' এ সময়কার মানুষের ধর্মজীবনের চিত্র বিধৃত রয়েছে : 'ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে / মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে / দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোনজন / পুত্তলি করএ কেহ দিয়া বহুধন / বাসুলী পূজএ কেহ নানা উপচারে / মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে।'

এমনি করে যখন ব্রাহ্মণ্য সমাজের দেব-দ্বিজ-বেদ মাহাত্ম্য অবহেলিত এবং শ্রুতি স্মৃতি গীতা পুরাণ গণজীবনলগ্নতা হারাচ্ছিল, তখন ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থরা স্বধর্মের আচারিক বিলুপ্তি এবং স্ব স্ব শ্রেণীর সামাজিক অবস্থার ও অবস্থানের তথা সমাজ-সর্দারের ও নিয়ন্ত্রকের মর্যাদার বিপর্যয় আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে তাদেরই উচ্চারিত পাঁতি—

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।

—উপেক্ষা করে কিন্তু সামাজিক নিন্দা-লাঞ্ছনা এড়ানো লক্ষ্যে বিধর্মী রাজশক্তির অনুমতির, নির্দেশের ও আগ্রহের দোহাই দিয়ে ব্রাহ্মণ্য রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবত বাংলায় পাঁচালী আকারে প্রচার করতে থাকেন ব্রাহ্মণ

কৃত্তিবাস, কবিচন্দ্র মিশ্র ও কায়স্থ মালাধর বসু, কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রমুখ পনেরো শতকের কবিগণ এবং এ সময়েই ধর্মান্তরে হিন্দু সমাজের ভাঙন রোধকল্পে শাস্ত্রে ও সমাজে আনুগত্য দৃঢ় রাখার জন্যে স্মার্ত ও নৈয়ায়িকরা স্মৃতি-ন্যায়ের নতুন টীকাভাষ্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রয়োজনমতো শাস্ত্রের, আচারের ও সমাজের নীতি নিয়মের গ্রন্থি কোথাও শিথিল কোথাও দৃঢ় করে ইসলামের অভিঘাত ঠেকানোর মতো যুগোপযোগী করার চেষ্টা হলো। এ সব করেও হয়তো ইসলামের প্রসার রোধ করা যেত না। চৈতন্যদেব উত্তর-ভারতের সন্ত মতের আদলে বাংলায় সুফীমত-প্রভাবিত প্রেম-বাদ প্রচার করতে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র পরিহার করলেন বটে (হেন মহাঠাকুরাণীভাব যার মনে উপজয় / বেদধর্ম তেজি সে কৃষ্ণকে ভজয়।) কিন্তু পরিণামে ব্রাহ্মণ্য তথা হিন্দু সমাজ অটুট রইল। যেমনটি উনিশ শতকে রামমোহনের ব্রাহ্মমত খ্রীস্টান ধর্মের প্রসার রোধ করেছিল, রামকৃষ্ণের নির্বর্ণ সেবাধর্ম ব্রাহ্মমতের প্রসার ঠেকিয়েছিল, ষোলো শতকে চৈতন্যদেবের অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদও তেমনি বাংলায় ইসলামের বিস্তার চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

১০

চর্যাপদের ভাষা বাংলা নয়, অর্বাচীন শৌরসেনী অবহট্‌ঠ।[৪১] লিখিত বাংলা রচনার শুরু তুর্কী আমলে, নতুন যুগে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনরাজত্বের অবসানে। অবশ্য ছড়া-গান, গল্প, গাথার আকারে বাংলায় অলিখিত রচনার উদ্ভব যে বাংলা বুলির স্বরূপে স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্তির মুহূর্ত থেকেই তার জন্যে সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন হয় না, কাণ্ডজ্ঞানই যথেষ্ট। নিম্নবর্ণের ও নিম্নবর্গের আর নিরক্ষর জনগণের বিশ্বাস সংস্কারজাত লৌকিক ভূত-প্রেত দেবতা দানবের ইতিবৃত্তান্ত ও শক্তি মাহাত্ম্য কথা বা স্তুতি নিন্দা বিষয়ক রচনা দিয়েই সাহিত্যের শুরু; চণ্ডী, শিব মনসা, রাধাকৃষ্ণ, ধর্মঠাকুর প্রভৃতির বৃত্তান্ত দিয়েই রচিত হয় পাঁচালী। তারপর ব্রাহ্মণ্য অবতার কাহিনী রাম ও কৃষ্ণ কথা, রামায়ণ ও মহাভারত-ভাগবত যুক্ত হয়। লক্ষণীয় যে হিন্দু রচিত এ সাহিত্যের ভাব ও ভাষায় ইসলামের প্রভাব প্রকট।

যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় রয়েছে কয়েকটি আরবী ফারসী শব্দ এবং

৪১ 'বাংলা সাহিত্যর ইতিহাস', ১৯৮৭, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, প্রথম খণ্ড (বাংলা সাহিত্যের সূচনা, চর্যাগীতি, পৃ. ৪০২-৪১)।

লীলা বা রস বিন্যাসে রয়েছে সুফী সাধনতত্ত্বের প্রভাব।[৪২] চন্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগর ও পদ্মাপুরাণের চাঁদ সদাগর নারীদেবতাবিদ্বেষী ও একক (অদ্বৈত) পুরুষদেবতাপূজক। বিপন্ন দুর্বলচিত্ত ধনপতি চন্ডীপূজায় সহজেই রাজি হয়েছে বটে, কিন্তু চাঁদ নতি স্বীকার করেছে এক অনন্য অসামান্য বালিকার কৃচ্ছ্রসাধনার ও সিদ্ধির কাছে—মনসার কাছে নয়। এ একান্তই ইসলামের একেশ্বরবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল।[৪৩] আর হরগৌরী, রামসীতা ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানে বা পদে তো সুফীদের গজল-দিওয়ানের ও ভণিতার প্রভাব ও অস্বীকার করা যাবে না।[৪৪]

১৫৭৫ সনের যুদ্ধে বাংলা নামত মুঘল অধিকারে গেল বটে, কিন্তু দ্রোহী সামন্ত ভুঁইয়ারা ১৬১৭ সন অবধি গোটা বাংলার সর্বব্যাপী মুঘল শাসন ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, ফলে অশাসনে দুঃশাসনে, দ্রোহে ও নৈরাজ্যে দেশের মানুষ জানে-মালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিপর্যস্ত হয় আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন। আর মুঘল সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত ঋদ্ধ বন্দর অঞ্চল বাংলার অর্থ চলে যায় দিল্লীতে এবং এ সময় থেকে বাংলার বাণিজ্যে শুরু হয় য়ুরোপীয় বেনেদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব। অনক্ষর, অর্থে-সম্পদে নিঃস্ব বিপন্ন গণমানব মসজিদে-মন্দিরে আস্থা হারিয়ে বাঁচার গরজে নতুন এক দেবতার শরণ নেয়। জীবন-জীবিকার অভয়-আশ্রয় রূপে পীর-নারায়ণ সত্যের ও তাঁর অনুগত দেবদেবীর আশ্রিত হলো বিপন্ন হিন্দু মুসলিম : 'হিন্দুর দেবতা হল মুসলমানের পীর / দুইকুলে সেবা লয় হইয়া জাহির।'

পীর নারায়ণ সত্যের চেলা দেবতা হচ্ছে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায় / বড় খাঁ গাজী, কুমীর দেবতা কালুরায় / কালুগাজী, বনদেবী / বনবিবি, ওলাদেবী / ওলাবিবি প্রভৃতি অনেক। এ পীর নারায়ণ 'সত্য'-আশ্রয়ী হিন্দু-মুসলিমের মানসিক, আচারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক মিলন হয়েছিল দক্ষিণ-ও পশ্চিমবঙ্গে। আর নামে হিন্দু বা মুসলিম হলেওঅভিন্ন ছিল আধ্যাত্মিকভাবে ও জীবনযাত্রায় বিভিন্ন গুরুবাদী বাউলরাও।[৪৫]

৪২. (ক) মুহম্মদ এনামুল হক, 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব. মনীষা মঞ্জুষা', প্রথম সং, পৃ. ৪৮-৫৪। (খ) 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', ১৯৫৫, প্রথম সং. পৃ. ৫০-৫১।

৪৩. আহমদ শরীফ, 'বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য', প্রথম খণ্ড।

৪৪. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগ), ঢাকা।

৪৫. 'বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য', দ্বিতীয় খণ্ড, আপোষমুখী সাহিত্য : পীর পাঁচালী ও সহজিয়া বাউল মত ও সাহিত্য, দ্রষ্টব্য পৃ. ৩৮৪-৪১৬।

৭৭

লিখিত সাহিত্য তো শিক্ষিত লোকের সৃষ্ট ও পাঠ্য। সে যুগে শিক্ষা ছিল সংস্কৃত শিক্ষা। স্থানীয় ভাষা ছিল জমি পরিমাপের, টাকা কড়ি হিসাবের প্রয়োজনীয় ভাষামাত্র। হিন্দুদের সাহিত্য সৃষ্টি ও পাঠ ছিল সংস্কৃত ভাষায় নিবন্ধ। তুর্কী শাসকরা প্রথমে দরবারী ফরমান অনুবাদসহ আরবীতে এবং পরে ফারসীতে প্রচার করতেন। কাজেই হিন্দুরাও ফারসী শিখছিল ব্রিটিশ আমলের ইংরেজির মতোই। শিক্ষিত দেশী ও বিদেশী প্রশাসক মুসলিমরা সাহিত্যচর্চা করত ফারসীতে। বাংলায় হিন্দুরা লিখত পড়ত ও শুনত দেবপাঁচালী, গাইত অবশ্য বাংলা গীত, কেউ কেউ দরবারী প্রভাবে ফারসী ও (উর্দু, হিন্দি—) হিন্দুস্তানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও। কিন্তু তুর্কী-মুঘল শাসিত দেশজ মুসলিমরা ছিল শিক্ষার ঐতিহ্য ও আগ্রহহীন অজ্ঞ-অনক্ষর তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র পেশাজীবী প্রায়-অসচ্ছল মানুষ। এদের থেকে যারা সে কালে পাঠশালায় বাংলা মাধ্যমে ভাষা ও গণিত শিখেছে বৈষয়িক জীবনে অতি প্রয়োজনীয় বোধে আর যারা মক্তবে-দরাসে আরবী হরফে কোরআন পাঠ ও রোজা-নামাজ প্রভৃতির আবশ্যিক নিয়ম-রীতি-পদ্ধতি শিখেছে, তাদের কেউ কেউ মাদ্রাসায় শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ কালে দরবারী ভাষা ফারসীও শিখত। বস্তুত মাদ্রাসায় কোরআন হাদিস পড়ানো হতো কেতাবের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পার্শ্বোক্ত ফারসী টীকাভাষ্যের সাহায্যে, অনেক পরে উনিশ শতক থেকে কেতাবের পাঠের পার্শ্বোক্ত টীকা-ভাষ্য-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উর্দুভাষাতেও চলত। কিন্তু ১৯২৫/৩০ সন অবধি ওই সব মাদ্রাসায় বাংলা হরফেরও প্রবেশাধিকার ছিল না। সে জন্যে মাদ্রাসায় শিক্ষিত বাঙালী আলিম-মৌলবীদের বাংলা বর্ণপরিচয়ও থাকত না বিশ শতকের প্রথমপাদ অবধি। এঁদের মাতৃভাষা তথা মুখের ভাষা প্রজন্মক্রমে অবশ্যই ছিল স্থানীয় বুলি। এদের কেউ কেউ (যেমন মৌলানা আকরম খান প্রমুখ) বাংলায় স্বশিক্ষিত হতেন ব্যক্তিগত আগ্রহে ও চেষ্টায়, কেউ কেউ বাংলায় সই করতেও শিখতেন।

এমনি অবস্থায় তুর্কী-মুঘল শাসিত আঠারো শতকপূর্ব বাংলায় বাংলা ভাষায় মুসলিম-রচিত সাহিত্য ছিল বিরলতায় দুর্লক্ষ্য ও দুর্লভ।

প্রায় নয়শ বছর ধরে বিভাষী মঙ্গোলগোত্রীয় আরাকানরাজ শাসন করেছেন বাংলার প্রান্তিক অঞ্চল চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরারাজ শাসন করেছেন কুমিল্লা নোয়াখালী। এ সব অঞ্চল ক্বচিৎ কখনো স্বল্পকালের জন্যে ক্ষণ-বিজয়ী গৌড় সুলতানের অধীনে থাকত মধ্যযুগে। ১৬৬৬ সনেই কেবল শঙ্খ বা সঙ্গুনদ অবধি উত্তর চট্টগ্রাম এবং ১৭৫৬ সনে দক্ষিণ চট্টগ্রাম

মুঘল শাসনে আসে। যুগীদিয়া-রাজ ও ত্রিপুরারাজ যথাক্রমে নোয়াখালী-কুমিল্লা তুর্কী-মুঘলের করদ রাজা হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে শাসন করেছেন। বাংলার এ প্রত্যন্তভাগ বা ব্রিটিশ আমলের চট্টগ্রাম বিভাগও ছিল দেশজ মুসলিম অধ্যুষিত বটে, তবে বৃহৎ বঙ্গ ও ভারতবিচ্ছিন্ন এ সব রাষ্ট্রের অধিবাসীরা মঙ্গোলগোত্রীয় বৌদ্ধ রাজার ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে লালিত বলে এবং সুপ্রাচীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (চট্টগ্রাম) বন্দর প্রভাবিত বলে স্থায়ীভাবে বর্ণে ও বর্গে বিন্যস্ত ভারতীয় সমাজের মতো অমানবিক আধিগ্রস্ত ছিল না, তারা মানুষের মহিমা ও মর্যাদা স্বীকার করত : 'নর সে পরমদেব মন্ত্র তন্ত্র জ্ঞান / নর সে পরমদেব নর সে ঈশ্বর' (কাজী দৌলত : সতীময়ন-লোর চন্দ্রাণী কাব্য), বাংলার তথা ভারতের সমাজ সংস্কৃতি শাসন বহির্ভূত ও বিচ্ছিন্ন হিন্দু মুসলিমরা তাই এ অঞ্চলে স্ব স্ব ভাষা শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও পরম্পরা সংরক্ষণের জন্যেই বিভাষী বৌদ্ধ মোঙ্গল রাজত্বে নিজেরাই শাস্ত্র ও সমাজ রক্ষণে নীতি-শাস্ত্রে ঐতিহ্য ও সাহিত্য সৃষ্টির, পুষ্টি ও নিত্য অনুশীলনের উদ্যোগ-আয়োজন করেছে।[৪৬]

১২

মুসলিম-রচিত সাহিত্যও মুখ্যত অনুবাদ। যথার্থ সাহিত্য শিল্পরস পরিবেশনই ছিল এঁদের প্রণয়োপাখ্যান-অনুবাদের একমাত্র প্রেরণা। এঁরা প্রথমে উত্তর-ভারতে প্রচল জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রেম-প্রতীক উপাখ্যান এবং পরে ফারসী প্রভাব প্রবল হলে ফারসী সুফীতত্ত্ব-প্রতীক প্রণয়োপাখ্যান নিছক ইহজাগতিক শারীর প্রেম কাহিনী হিসেবে পরিবেশন করেছেন। বাঙালী কবিদের অনুবাদ বলতে কোথাও কায়িক (লিটারেল) কোথাও ছায়িক (স্বাধীন অনুসৃতি) ও কোথাও ভাবিক (কেবল ভাবাবলম্বন) বুঝতে হবে। কাজেই বাংলা ভাষায় বিশুদ্ধ সাহিত্য চর্চার প্রবর্তক হচ্ছে দেশী মুসলিমরা। পনেরো শতকের দেশজ-মুসলিম বংশধর শাহ মুহম্মদ মগীর রচিত 'ইউসুফ জোলেখা' (গিয়াসুদ্দীন আজম শাহর রাজত্বকালে ১৩৮৯-১৪১০ সনের মধ্যে রচিত রাজ-প্রশস্তি অনুসারে) প্রথম উপাখ্যান। ষোলো শতকে রচিত হয় মুহম্মদ কবিরের 'মধুমালতী' (১৫৮৩ সনে শুরু এবং এবং ১৫৮৮ সনে সমাপ্ত), শাহ বরিদ খান রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' (১৫৫০ সনের মধ্যে রচিত,দ্বিজশ্রীধরের 'বিদ্যাসুন্দর'১৫৩২-

৪৬. (ক) তদেব। (খ) দ্রষ্টব্য : আহমদ শরীফ, 'সৈয়দ সুলতান : তাঁর যুগ ও গ্রন্থাবলী'। পর্ব ১২-এর জন্য 'বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য', দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৩৩ সনে রচিত), দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত 'লায়লী-মজনু' (১৫৩৬-৫৩ সনে রচিত), সতেরো শতকে আরাকানরাজ্যের রাজধানী রোসাঙ্গ শহরে রচিত হয় কাজী দৌলতের 'সতী ময়না-লোর চন্দ্রাণী' উপাখ্যান (১৬৩৮ সনে অসমাপ্ত রেখে কবির মৃত্যু), মাগন ঠাকুর রচিত উপাখ্যান 'চন্দ্রাবতী' (১৬৫৮ সনের পূর্বে রচিত) এবং আলাওল রচিত পদ্মাবতী, সয়ফুল মুলক-বদিউজ্জামাল, আনন্দ বর্মা-রতন কলিকা (কাজী দৌলত রচিত লোর-চন্দ্রাণীর পরিসমাপ্তি অংশ), 'সপ্তপয়বার', 'সিকান্দরনামা' প্রভৃতি ১৬৫১ থেকে ১৬৭৩ সনের মধ্যে রচিত। রোসাঙ্গ শহরের অন্য এক কবির নাম মরদন, তাঁর উপাখ্যান 'নাসিবনামা' ১৬২২-৩৮ সনের মধ্যে শ্রীসুধর্মা রাজার আমলে রচিত। রোসাঙ্গে রচিত আর এক কাব্যের নাম 'রেজওয়ান শাহ'। রচয়িতা শমসের আলি, সতেরো কিংবা উনিশ শতকের।

সতেরো শতকের সয়ফুল মুলক-বদিউজ্জামাল, লালমোতি-সয়ফুল মুলক প্রভৃতি অনুবাদ-অনুসৃতিমূলক উপাখ্যান রচয়িতা হচ্ছেন দোনাগাজী, আবদুল হাকিম, শরীফ শাহ, গেয়াস খান, মুহম্মদ আকবর, মঙ্গলচাঁদ প্রভৃতি।

আঠারো শতকের রোম্যান্স রচক হলেন মুহম্মদ আলী রজা, পরাগল, মুহম্মদ আলী প্রভৃতি এবং আঠারো শতকে সুশীল মিশ্র, দ্বিজ পশুপতি, গোপীনাথ দাস, বাণীরাম দাস প্রভৃতি মুসলিম প্রভাবে রূপকথাভিত্তিক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেছেন।

প্রণয়োপাখ্যান রচকদের মধ্যে দৌলত উজির বাহরাম খান, কাজী দৌলত, আলউল, দোনাগাজী এবং আবদুল হাকিম মধ্যযুগের প্রথম শ্রেণীর হিন্দু কবিদের তুল্য। আর আঠারো শতকের শেষার্ধে পলাশী-উত্তরকালে ১৭৬০ সনের পরে হাওড়া-হুগলী-কলকাতা বন্দর এলাকার অধিবাসী বাংলা-হিন্দুস্তানী মিশ্র বুলিভাষী ফকির গরীবুল্লাহ ইউসুফ-জোলেখা সোনাভান, হোসেন মঙ্গল (জঙ্গনামা), মদনকামদেব কিস্‌সা (সত্যপীর মাহাত্ম্য কথা) আর আমীর হামজার দিগ্বিজয় কাহিনীর অংশবিশেষ রচনা করেন। আর সৈয়দ হামজা (জন্ম: ১৭৩৩, মৃত্যু: ১৮০৪ সনের পরে) রচনা করেন মধুমালতী (১৭৮৮ সনে), আমীর হামজা (১৭৯৪ সনে), জৈগুন বিবির কেচ্ছা (১৭৯৭ সনে)। বাংলা ও হিন্দুস্তানী (উর্দু-হিন্দি) মিশ্র ভাষায় ও শৈলীতে রচিত বলে এগুলোকে দোভাষী পুথি বা দোভাষী সাহিত্য বলা হয়।

মুসলিমরা বিচিত্র বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। জঙ্গনামা নামে বিভিন্ন যুদ্ধকাব্য রচনা করেন ষোলো থেকে আঠারো শতক অবধি সৈয়দ সুলতান, জায়েন উদ্দীন, আবদুল নবী, গেয়াস খান, শেখ ফরজুল্লাহ নসরুল্লাহ, খোন্দকার, দৌলত উজীর বাহরাম খান, মুহম্মদ খান, হায়াত মাহমুদ, হামিদ প্রভৃতি। এ সব যুদ্ধ-

কাব্যের মধ্যে মুহম্মদ খানের কারবালা বিষয়ক 'মকতুল হোসেন' (১৬৪৬ সনে রচিত) কাব্য কবিত্বে ও কাব্যগুণে প্রথম শ্রেণীর রচনা। কলেবরে বিরাট হচ্ছে আবদুল নবী (১৬৮৫ সনে) রচিত 'আমীর হামজা' কাব্য। উক্ত কবি মুহম্মদ খান রচিত একমাত্র রূপক কাব্য 'সত্যকলি বিবাদ সম্বাদ বা যুগ সম্বাদ' (১৬৩৫ সনে রচিত) নামের সত্য ও মিথ্যার, ন্যায় ও অন্যায়ের দ্বন্দ্ব বিষয়ক নীতি-শাস্ত্রীয় গ্রন্থটি কবিত্বে, তত্ত্বে, তথ্যে এবং কাহিনীগত সৌন্দর্যে সত্যই উঁচু মানের, মাপের ও মাত্রার অনন্য কাব্য।

ষোলো শতক থেকেই ধর্মসাহিত্য রচিত হচ্ছিল জনগণকে বাংলা ভাষায় ধর্মকথা জানানোর লক্ষ্যে। ষোলো শতকের শেখ পরাণ, নেয়াজ, সতেরো শতকের মুত্তালিব আশরাফ, আলাউল, মুজাম্মিল, আবদুল হাকিম, আঠারো শতকের সৈয়দ নরুদ্দীন, নসরুল্লাহ খোন্দকার, আবদুল করিম খোন্দকার প্রভৃতি উল্লেখ্য। মুত্তালিবের 'কিফায়তুল মুসল্লিন', আলাউলের 'তোহফা' এবং নসরুল্লাহর 'শরীয়তনামা' তথ্যে, তত্ত্বে ও বিন্যাসগুণে শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্নোত্তরে জগৎ, জীবন, শাস্ত্র, নীতি, সাধারণ জ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে লোকশিক্ষা দান লক্ষ্যে এক ধরনের গ্রন্থ রচিত হয়েছে সতেরো শতক থেকেই। রচকদের মধ্যে সতেরো শতকের আকিল, আঠারো শতকের শেখ সাদী, আলিরজা, এতিম আলম, সৈয়দ নুরুদ্দীন, সেরবাজ চৌধুরী প্রমুখ এক্ষেত্রে স্মরণীয়। এর নাম রেখেছি 'সাওয়াল সাহিত্য'।

মুসলিমরা চৈতন্যচরিতের আদলে চরিত বা জীবনী-সাহিত্যও রচনা করেছিলেন। ষোলো শতকে সৈয়দ সুলতান আদম-সৃষ্টি থেকে হজরত মুহম্মদ অবধি বিপুলকায় 'নবীবংশ' (১৫৮৪-৮৬) এবং সতেরো শতকে শেখ চাঁদ প্রায় দুই হাজার পৃষ্ঠার বিশাল কলেবরের 'রসুল চরিত' রচনা করেছিলেন। শেখ মনোহর নামের এক কবি আঠারো শতকের ফেনী অঞ্চলের বিদ্রোহী শাসক শমশের গাজীর কৃতি-কীর্তির ইতিবৃত্ত রচনা করেছিলেন, আঠারো শতকের প্রান্ত পর্বে।

সত্যপীর পাঁচালী রচনা করেছিলেন হুগলীর ফকির গরীবুল্লাহ এবং রঙপুরের তাহির মাহমুদ আঠারো শতকে। উল্লেখ্য যে সত্যনারায়ণ মাহাত্ম্য-কথা রচনা করেছিলেন শতাধিক হিন্দু কবি দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হচ্ছে চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলিমরা সঙ্গীতশাস্ত্রের চর্চা করতেন। বাংলা ভাষায় 'রাগ-তালনামা' নামের সঙ্গীতশাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করে তাঁরা তাঁদের সেক্যুলার জীবনদৃষ্টির ও সংস্কৃতিমানতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন চিরকালের ইতিহাসে। অনেক রচয়িতার মধ্যে ফাজিল নাসির মুহম্মদের 'রাগমালা' (১৭২৭ সনে রচিত) এবং আলিরজা (১৭৫৯-১৮৩৭)-র

'ধ্যানমালা' শ্রেষ্ঠ। এসব সঙ্গীতগ্রন্থে উদ্ধৃত গান বা রাধা-কৃষ্ণ পদগুলোই 'মুসলিম কবির পদসাহিত্য ও চট্টগ্রামের হিন্দু কবি রচিত পদাবলী সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য এসব হিন্দু কবি রচিত রাধা-কৃষ্ণ পদগুলোও বৈষ্ণবতত্ত্বগর্ভ পদ নয়।

সর্বশেষে বাংলা ভাষায় রচিত বাঙালী সুফীপন্থীদের রচিত সুফীতত্ত্ব-গ্রন্থের উল্লেখ করছি। সুফীতত্ত্বের অবলম্বন হয়েছে বৌদ্ধ ও হিন্দু যোগ এবং আংশিকভাবে তন্ত্র। এগুলো একাধারে সুফী-চর্যা, সাধন-পদ্ধতি, তত্ত্ব ও দার্শনিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। সুফী মতও গুরুবাদী বা পীরনির্ভর সিদ্ধি-পন্থা। ষোলো শতকের কবি শেখ ফয়জুল্লাহর 'গোরক্ষবিজয়', সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞানপ্রদীপ', অজ্ঞাত কবির রচিত 'যোগকলন্দর', সতেরো শতকের শেখ চাঁদ রচিত 'হরগৌরীসম্বাদ' ও 'তালিবনামা', হাজী মুহম্মদের 'নুরতনামা', মীর মুহম্মদ শফীর 'নুরনামা', কাজী শেখ মনসুর রচিত 'সির্নামা বা শ্রী', আলীরজা রচিত 'আগম ও জ্ঞানসাগর', শেখ জাহিদের রচিত 'আদ্য পরিচয়' প্রভৃতি। এদের মধ্যে তথ্যে, তত্ত্বে, উৎকর্ষের দার্শনিকতায় গোরক্ষবিজয়, জ্ঞানপ্রদীপ, নুরতনামা, হরগৌরী সম্বাদ, জ্ঞানসাগর ও যোগকলন্দর শ্রেষ্ঠ।

শেখ ফয়জুল্লাহ 'গাজী বিজয়' নামে সেনানী-দরবেশ ইসমাইল গাজীর বৃত্তান্ত রচনা করে বাংলায় পীরপাঁচালী রচনার রেওয়াজ চালু করেন, পীর-সত্যপীরাদি অনেক কাল্পনিক ও বাস্তব পীর-চরিত্র গ্রন্থ বাংলায় রচিত হয়েছে।

মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের মধ্যে আবদুল হাকিম ও শেখ মনোহর এবং হয়তো সৈয়দ নুরুদ্দীনও নোয়াখালী জিলার, শেখচাঁদ, মুহম্মদ আকবর, শেখ সাদী ও সেরবাজ চৌধুরী কুমিল্লা জিলার এবং হামিদ সম্ভবত সিলেটের আর তাহির মাহমুদ ও হায়াত মাহমুদ রঙপুরের, অন্য সবাই চট্টগ্রামের।

যুগান্তর সম্ভব হয় নতুন চেতনার উন্মেষে। নতুন চেতনার উন্মেষে বিপরীত কিংবা উন্নতমানের চেতনার অভিঘাতই সম্ভব। আমাদের দেশে সাড়ে সাতশোর্ধ বছর আগে তা সম্ভব হয় তুর্কী বিজয়ের দরুন। শাসক-শাসিতের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের অবশ্যম্ভাবী উপজাত হচ্ছে পরস্পর ধর্ম, মনন ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সে পরিচয় সম্ভব হয়েছে পরস্পরের ভাষা জানাজানির ফলে। নইলে শুধু চাক্ষুষ দেখাসাক্ষাতে কেউ কারো প্রভাবে পড়ে না, তার প্রমাণ তিনশ বছর ধরে য়ুরোপীয় বেনেরা ভারতে যাতায়াত করেছিল কিন্তু তবু প্রতীচী আমাদের কাছে অজ্ঞাতই ছিল। ব্রিটিশ শাসকদের

সঙ্গে ভাষার মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপ তার মন-মননের ঐশ্বর্যের দ্বার অবারিত করল আমাদের কাছে। আমাদের জীবনেও যেন অমারজনীতে সূর্যোদয় ঘটল। আমাদের জীবনে ও মননে আকস্মিকভাবে ঘটল কালান্তর। তুর্কীর ধর্ম, মনন ও সংস্কৃতির ভাবে যে নতুন চিন্তা-চেতনার লাবণ্য এদেশে দেখা গেল, তাও ইংরেজ প্রভাবের মতোই ছিল ব্যাপক ও গভীর। ভক্তিবাদ সন্তধর্ম প্রেমবাদ তারই প্রসূন। তাতে বিজ্ঞানবুদ্ধি ছিল না বটে, কিন্তু উচ্চমার্গের তাত্ত্বিক চেতনা ছিল। তাতেওছিল নতুন জ্ঞানের আলো—তার অবশ্য ঔজ্জ্বল্য ছিল না তেমন, তবে মানবতার ও সংবেদনশীলতার স্নিগ্ধতা ছিল। সেদিনও নির্জিত নিপীড়িত নির্বিত্ত নিম্নবর্ণের মানুষের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও দ্রোহের সাহস জেগেছিল, সেদিনও শঙ্করীয় রামমোহনী-কায়দায় ধর্মতত্ত্বে নতুন ব্যাখ্যা মিলেছিল—সমাজতত্ত্বে ফাঁকির ফাঁক ধরা পড়েছিল। জন্মসূত্রে নয়, সামর্থ্য ও আত্মপ্রত্যয় সূত্রেই যে জীবন নিয়ন্ত্রিত, সম্ভব হয়েছিল সে উপলব্ধিও। ফলে মানুষের জীবনে জীবিকায় উন্মুক্ত হলো সম্ভাবনার অসীম দিগন্ত। শাস্ত্রের জন্যে যে জীবন নয়, জীবনের জন্যেই শাস্ত্র—তাও বোধগত হয়েছিল। আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের সাফল্য সম্ভাবনার দিগন্ত যে অশেষ, তা দেব-দ্বিজ-বেদ-জুজুর মিথ্যা ভয়-মুক্ত মানুষের কাছে আর অজানা রইল না। তুর্কী প্রভাবে দেশী মানুষের চিন্তা-চেতনায় যে বিপ্লব এল তারই প্রসূন সন্তধর্ম, ভক্তধর্ম ও প্রেমধর্ম সেদিন ভারতে জীবন-জীজ্ঞাসায় ও জগৎ-ভাবনায় যুগান্তর ঘটিয়েছিল। ধর্মান্তরে, কর্মান্তরে, চিন্তা-চেতনার রূপান্তরে সাহিত্যে-শিল্পে-ভাস্কর্যে-স্থাপত্যে-সঙ্গীতে-শাস্ত্রে-সমরে-পোশাকে-প্রশাসনে সর্বাত্মক পরিবর্তন এসেছিল, যেমনটি ঘটেছিল পরবর্তীকালের ইংরেজ আমলে। এ মানসমুক্তি স্বাতন্ত্র্যগর্বী অভিজাত উচ্চবিত্তের মধ্যে যত না ঘটেছিল, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি এসেছিল নিম্নবর্ণের ও -বিত্তের লোকের মধ্যে। এই গণমানবই এ-সময় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করতে উন্মুখ ও উদ্যোগী হয়। তাই আমাদের সাহিত্যে-ভাস্কর্যে-সঙ্গীতে গেঁয়ো গণমানবের প্রভাবই দেখতে পাই। এ সাহিত্যে দৃষ্টি ও সৃষ্টি, নতুন হওয়া সত্ত্বেও ভাব-ভাষা-বিষয়-রূপ-রস-রীতির আদর্শ সবটাই স্থূল, অপরিস্রুত, আবর্তিত ও নিম্ন-মানের হওয়ার মূলে রয়েছে স্বল্পশিক্ষিত ও স্বল্পবিত্ত গেঁয়ো মানুষের পরিচর্যা।

আঠারো শতক অবধি বাংলা সাহিত্যে এই চিন্তা-চেতনার উন্মেষ-বিকাশ ও পরিণতি লক্ষণীয়। বিষয়গত আবর্তন-অনুস্তন সত্ত্বেও মন-মানসের প্রসার ঐ সাহিত্যে দুর্লক্ষ্য ছিল না। ফারসী ভাষা সাহিত্যের প্রভাবও এক্ষেত্রে মর্তব্য। এমনি করেই ঘটে প্রাচীন যুগের মধ্যযুগের উত্তরণ—প্রাচীনতার

সময়োপযোগী কালিক রূপান্তর। যদিও এ সাহিত্যে দরবারী জৌলুস ছিল দুর্লভ।

ইংরেজ প্রভাবে পরিবর্তন এসেছিল কেবল শহুরে মানুষের মননে ও আচরণে। কিন্তু মুঘল প্রভাবে গাঁয়ে-গঞ্জে-নগরে সর্বত্র সমভাবেই গড়ে উঠেছিল ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র আর সমাজের ভিত। এবং পরিণামে শাস্ত্র আর সমাজও ফাটলে ভাঙনে হীনবল ও হৃতগৌরব হয়েছিল। তখনো অবশ্য বসনে ভূষণে, আচারে আচরণে বাহ্য প্রভাবটা ব্রিটিশ আমলের মতোই গাঁয়ের চেয়ে শহরে বন্দরে শিক্ষিত সমাজেই ছিল প্রকট।

মধ্যযুগে বাংলার ভাষা ও সাহিত্য

সত্যবতী গিরি

ক

কথামুখ

ইতিহাসে যে সময়ের পরিধিকে মধ্যযুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, বাংলা ভাষা উদ্ভবের আদি যুগ ও পরবর্তী মধ্যযুগের দুটি উপস্তর-ই সেই কালপরিধির অন্তর্ভুক্ত। খ্রীস্টীয় ১০ম-১২শ শতাব্দীকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিযুগ বলা হয়। এই সময়কার বাংলা ভাষায় রচিত একমাত্র সাহিত্য-নিদর্শন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যাপদ। সংস্কৃত ভাষায় লেখা জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যটির ভাষা-শরীর যেন এই সময়ে প্রস্ফুট বাংলা ভাষার পূর্বরূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। খ্রীস্টীয় ১০ম শতাব্দী থেকে ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের কোনো বাংলা রচনা পাওয়া যায় না। খ্রীস্টীয় ১৪শ থেকে ১৮শ এই চার শতাব্দী হলো বাংলা ভাষা বিকাশের মধ্যযুগ। এই সময়ের মধ্যে চণ্ডী-মঙ্গল-মনসামঙ্গল কাব্যগুলি, এবং ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন প্রভৃতি বিচিত্র কাব্যধারা রচিত হয়েছে। এছাড়াও আছে কয়েকজন কবির রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ। ভাগবত অনুসরণে রচিত হয়েছে বেশ কিছু কৃষ্ণলীলাকাব্য। বৈষ্ণব পদাবলী রচনায়ও দেখা দিয়েছে অপূর্ব সমারোহ; রচিত হয়েছে চৈতন্যজীবনী। অন্যদিকে এই কালপরিধির মধ্যেই আরাকান চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি দৌলত কাজী, আলাওল ও অন্যান্য কবিদের প্রণয়কাব্যগুলিও রচিত হয়েছে।

মধ্যযুগের শেষ স্তরে আমরা পাই ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, রামেশ্বরের শিবায়ন, কালিকামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর কাব্য, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি বহু কাহিনীর ধারা। এই স্তরে পদাবলী এবং জীবনীকাব্যও রচিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যই একালের উজ্জ্বলতম সংযোজন। এছাড়া এই সময়ে রচিত হয়েছে ঐতিহাসিক কাব্য মহারাষ্ট্র পুরাণ, রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত, টপ্পা, তর্জা, কবিগান, পূর্ববঙ্গগীতিকা, বাউল সঙ্গীত, সত্যপীরের পাঁচালী প্রভৃতি বিপুল সাহিত্যসম্ভার।

প্রশ্ন

প্রসঙ্গ : ভাষা

আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে উদ্ভব হয়েছিল বাংলা ভাষা। প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাংলার অধিবাসীদের আকৃতি-প্রকৃতি কেমন ছিল, আজকে তা যথাযথভাবে নির্ণয় করার উপায় নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীরা কোল বা অস্ট্রিক জাতীয় ভাষায় কথা বলতেন এবং কিছুটা দ্রাবিড় জাতীয় ভাষায়ও কথা বলতেন। বাংলাদেশের ভৌগোলিক নামকরণে আজও সেই অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষার নিদর্শন আমরা পাই। অনার্য ভোট-ব্রহ্মভাষা 'দিস্তান্' থেকেই 'তিস্তা' বা 'ত্রিস্রোতা', কোল ভাষার 'কবদাক্' থেকে 'কপোতাক্ষ', 'দামুদাক্' থেকে 'দামোদর' প্রভৃতি শব্দের উদ্ভব বলে ভাষাতাত্ত্বিকগণ মনে করেন।

আজকে আমরা যে-বাংলা ভাষায় কথা বলছি সেই ভাষার উৎস কিন্তু খ্রীস্টপূর্ব দেড়-দুহাজার বছর আগেকার বৈদিক সংস্কৃত ভাষা। সারা ভারতবর্ষে যে আর্যপ্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, বাংলাদেশও সেই প্রভাব থেকে বাদ যায় নি। খ্রীস্টপূর্ব ৩০০ থেকে খ্রীস্টীয় ৫০০ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ পরিপূর্ণভাবে আর্যপ্রভাবের আওতায় আসে। আর আর্যভাষা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলাদেশেও গৃহীত হয়। সংস্কৃত ভাষা থেকেই সৃষ্টি হয় কথ্য প্রাকৃত ভাষা এবং সেই কথ্য প্রাকৃত ভাষা থেকেই হিন্দী, বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের উদ্ভব। একসময়ের প্রচলিত বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষাগুলি হলো শৌরসেনী, মাহারাষ্ট্রী ও মাগধী। এর মধ্যে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে মাগধী প্রাকৃতের ধারা মাগধী অপভ্রংশ থেকে। এখন বাংলাদেশ নামে একটি পৃথক রাষ্ট্রেরই জন্ম হয়েছে এবং আগেকার বঙ্গদেশের একাংশ ভারত ভূ-খণ্ডের একটি রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ নামে অস্তিত্ব রক্ষা করছে। কিন্তু প্রাচীনকালের বাংলাদেশের পরিধি এবং নাম সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত ছিল না। রাঢ়, সুহ্ম, গৌড়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল ইত্যাদি নামেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলকে বোঝানো হতো। বিহার, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রতিবেশী রাজ্যের কিছু কিছু অংশ বৃহত্তর বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর ফলে বাংলা ভাষার যে প্রথম নিদর্শন চর্যাপদের ভাষা আমরা পাই, তার মধ্যে অসমীয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষার বৈশিষ্ট্যও মিশে আছে। এই কারণেই ওড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি ভাষাভাষী লোকেরাও চর্যাপদের ভাষাকে তাঁদের নিজেদের ভাষা বলে দাবি করেছেন। কিন্তু আধুনিক নানা গবেষণায় চর্যাপদের ভাষা নিঃসংশয়ভাবেই বাংলা ভাষা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

চর্যাপদের ভাষাই বাংলা ভাষার আদিযুগের নিদর্শন। আর মধ্যযুগের বাংলা ভাষাকে আমরা দুটি উপস্তরে বিভক্ত করতে অভ্যস্ত—আদিমধ্য ও অন্ত্যমধ্য। আদিমধ্য বাংলা ভাষার কালপরিধি মোটামুটি ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষার কাল-পরিধি ১৬০১ থেকে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত।

বর্তমানে যে বাংলা লিপি ব্যবহৃত হয়—সেই লিপির উদ্ভব হয়েছিল ব্রাহ্মীলিপি থেকে। ৭ম শতকে ব্রাহ্মীলিপি তিনটি রূপ পেয়েছিল—'শারদা', 'নাগর' ও 'কুটিল'। এই 'কুটিল' রূপ থেকেই বাংলা অক্ষরের জন্ম হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার নামপদে তিনটি লিঙ্গ ছিল—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। বাংলাভাষায় ক্লীবলিঙ্গের ব্যবহার কমে গিয়ে নতুন স্ত্রীলিঙ্গের সৃষ্টি হয়। পদান্তের '-ইঅ' পরিণত হয় 'ই'-কার বা 'ঈ'-কার-এ এবং এর ফলেই নতুন স্ত্রীলিঙ্গের পদ গঠিত হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় এই বৈশিষ্ট্যটি প্রচলিত ছিল, কিন্তু আধুনিক বাংলায় নেই। আধুনিক বাংলার মতো প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় শব্দরূপে একবচন ও বহুবচনের ভেদ ছিল না। আর বিভক্তির দিক থেকে বিচার করলে, প্রাচীন বাংলায় কারক ছয়টি—কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। এছাড়া সম্বন্ধ পদও আছে। কিন্তু আধুনিক বাংলায় কারক চারটিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাংলা ভাষায় ধাতু বেশির ভাগই এসেছে সংস্কৃত থেকে। বাংলা ক্রিয়াপদের কালকে দুভাগে ভাগ করা যায়—মৌলিক ও কৃদন্ত। মৌলিক কাল দুটি—অতীত ও ভবিষ্যৎ। প্রাচীন বাংলায় যৌগিক ক্রিয়া থাকলেও যৌগিক কাল নেই। তবে মধ্য বাংলায় কিছু কিছু যৌগিক কাল পাওয়া গেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় 'বাস্' ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়ার বিশিষ্ট ব্যবহার ছিল।

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকেও আমরা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি—মৌলিক ও আগন্তুক। মৌলিক শব্দ ভারতীয় আর্যভাষা থেকে গৃহীত। আগন্তুক শব্দ অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা থেকে নেওয়া। আগন্তুক শব্দগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়—দেশী শব্দ ও বিদেশী শব্দ। দেশী শব্দের উৎস অস্ট্রিক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা এবং বিদেশী শব্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরবি-ফার্সি। মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় আরবি-ফার্সি শব্দের প্রভাবই লক্ষণীয়। আধুনিক বাংলা ভাষায় অবশ্য ইংরেজি শব্দের প্রভাবই বেশি। এইভাবেই বহতা নদীর মতো ভাষা বয়ে চলেছে আদিযুগ থেকে মধ্যযুগ এবং মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পার হয়ে অনাগত ভবিষ্যতের

দিকে। আর এই বহতা ভাষার প্রবাহের ওপর ভর করেই ভেসে চলেছে সাহিত্যের তরণী।

গ

প্রসঙ্গ : সাহিত্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে, এই সাহিত্য মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাসেরও মূল্যবান দলিল। গোষ্ঠীচেতনার আওতায় থেকে ধর্মনির্ভর একটি সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্ফুরণ আর বিকাশ সেদিনকার সাহিত্যে কোনোমতেই ঘটা সম্ভব ছিল না। তাই সামগ্রিকভাবে একটি বিশেষ সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির চিত্রণই আমরা এই সাহিত্যে লক্ষ্য করি।

মধ্যযুগের বহু কবির সাল-তারিখ এখনও অজ্ঞাত। কবিরা কাব্যের শেষের দিকে সাংকেতিকভাবে তাঁদের রচনার তারিখ জানাতেন। অনেক সময় কাব্যের গোড়ার দিকেও এই পরিচয় থাকত। কিন্তু আদি অন্তের দুটি পাতাই অনেক সময় বাংলাদেশের আর্দ্র জলবায়ুর জন্য জীর্ণ হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, অথবা কীট-দষ্টও হয়েছে। তাই কালনির্ণয় সমস্যা মধ্যযুগের সাহিত্যালোচনার একটা বড় সমস্যা। তবে ভাষাবৈশিষ্ট্য ও আনুষঙ্গিক নানা প্রমাণ থেকে পুরোনো বাংলা সাহিত্যের কালনির্ণয়ের চেষ্টা হয়ে আসছে।

১

আনুমানিক ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রীস্টাব্দ আমরা বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ বলে থাকি। এই সময়কার গ্রামবাংলা ছিল সামন্তশাসিত। প্রধানত ভূম্যধি-কারীদের শাসনই এই সময় প্রচলিত ছিল। এই কালপরিধিতেই সংস্কৃত-প্রাকৃতের শৃঙ্খল ভেঙে উদ্ভব হলো বাংলা ভাষার। বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যাপদের ভাষাই প্রথম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে এর পুঁথি আবিষ্কার করেন এবং বৌদ্ধগান ও দোহা নাম দিয়ে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে তা প্রকাশ করেন। আনুমানিক তেরো-চৌদ্দো শতাব্দীতে মুনিদত্ত নামক এক ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষাতেই এর টীকা রচনা করেছিলেন। সেই টীকাতেই এর নাম ছিল 'আশ্চর্য-চর্যা'। চর্যাপদগুলি যখন রচিত হয়, তখন বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালরাজাদের শাসন চলছিল। বিহারে ও উত্তরবঙ্গে বহু প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিহার ছিল। সেই বিহারগুলিতে বৌদ্ধ আচার্য ও ভিক্ষুরা এবং শত শত ছাত্র বৌদ্ধ-শাস্ত্রের চর্চা করতেন। রাজকোষ থেকে এঁদের ব্যয়নির্বাহের অর্থ আসত।

ধনী নাগরিকেরাও অর্থ দান করতেন। ফলে বিহারগুলির সঞ্চিত ধনরত্নের পরিমাণ ছিল প্রচুর। এই কারণেই বখ্‌তিয়ার খিলজি বিহার প্রদেশের নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিহার লুঠ করে উত্তরবঙ্গে ঢুকলে সোমপুর, ওদন্তপুর, জগদ্দল প্রভৃতি বিহারের সাধক-পন্ডিতেরা তাঁদের পুঁথিপত্র নিয়ে নেপালে চলে যান। তাই হয়তো চর্যাগীতির পুঁথি নেপালে পাওয়া গেছে।

চর্যাগীতির আপাত অর্থটিই এর সব নয়। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের ধর্মতত্ত্ব ও গূঢ় ধর্মীয় সাধনাই এই শব্দগুলির আড়ালে লুকিয়ে আছে। এই রহস্যময়তার জন্যই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষার আর এক নাম দিয়েছেন 'সন্ধ্যা' ভাষা বা 'সন্ধানী' ভাষা। আবার কেউ কেউ এর ভাষাকে সন্ধ্যার আলো-আঁধারিযুক্ত রহস্যময় ভাষাও বলেছেন।

আমাদের কাছে চর্যাগীতির ভেতরের গূঢ় ধর্মীয় তাৎপর্যের চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছে এর বাইরের বিষয়। এই পদগুলিতে বাংলাদেশের সাধারণ নিম্নবর্ণের মানুষের জীবনচিত্র বড় বাস্তবভাবে ফুটে উঠেছে। হাঁড়িতে ভাত নেই, অথচ বাড়িতে আসে নিত্য অতিথি—অতিথিবৎসলা দরিদ্র গৃহিণীর এই বিপন্নতা ফুটে ওঠে 'হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী'র মতো পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে। প্রাণধর্মের উচ্ছল প্রকাশে শবর-শবরী, নৃত্যপরায়ণা ডোম নারী, অর্ধরাত্রে জাগ্রত বধূ, তাঁতী, ধুনুরী প্রভৃতি বিভিন্ন মানুষের ছবি যেমন এখানে ফুটে উঠেছে, তেমনি ফুটে উঠেছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিকদের মৃগয়া, দাবাখেলা, বিবাহ ও বাণিজ্যের ছবি। কিন্তু তবুও এ-সমস্ত কিছুর চেয়ে কবিদের পক্ষপাত স্পষ্টতই প্রকাশিত হয়েছে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের জন্য। পাল আমলে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত তীব্র বৈষম্যে উচ্চবর্ণের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা লোকায়ত বৌদ্ধধর্মের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। শবরীপাদ, ডোম্বীপাদ, কুক্কুরীপাদ প্রভৃতি নামের কবিরা এদের কথাই তাঁদের কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। কখনো কখনো ব্রাহ্মণদের প্রতি কবিদের ঘৃণাও স্পষ্টভাষায় প্রকাশিত—'নগর বাহিরিরে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।/ ছোই ছোই জাহ সো বাহ্ম নাড়িআ।' এইভাবে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শনের মধ্যেই আমরা বর্ণাশ্রম-বিভক্ত হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে সমকালীন সমাজমনের তীব্র বিদ্রোহের প্রকাশ লক্ষ্য করি।

১১শ-১২শ শতাব্দীতে পাল রাজাদের পর সেন রাজারা বাংলার সিংহাসন দখল করলেন। লক্ষ্মণসেন এবং বল্লালসেনের আমলে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আধিপত্য। ফলে বিকাশোন্মুখ বাংলা সাহিত্যের গতি আবার অবরুদ্ধ হলো। কিন্তু এরই মাঝখানে জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য রচিত হলো সর্বভারতীয় একটি লৌকিক-পৌরাণিক কাহিনীর লোকপ্রিয় নায়ক-নায়িকাকে গ্রহণ করে।

২

এরপর তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলাদেশের ইতিহাস লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই বখতিয়ার খিলজি ১৩শ শতাব্দীর প্রথম দিকে, ১২০৩ খ্রীস্টাব্দে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করে সেখানে ইসলামী শাসন চালু করলেন। কিন্তু তারপরও দীর্ঘকাল ধরে চলেছে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা। পঞ্চাশ-ষাট বছর কেটে যাওয়ার পর এই অবস্থায় কিছুটা স্থিতি আসে। হিন্দু-মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে ওঠে একটা সমঝোতার ভাব। হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি-সংশ্লেষে পারস্পরিক সহনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় একালের বাংলা সাহিত্য থেকে। সম্পর্কের এই উন্নতিতে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে সুফীধর্মের। ১৩শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যে সুফী সাধকেরা এদেশে আসেন, তাঁদের প্রভাব ১৪শ শতাব্দীতে রীতিমতো ছড়িয়ে পড়ে। এর কারণ, ইসলামধর্মের সাম্যবাদী নীতির সঙ্গে সুফী সাধনার আরও বৈশিষ্ট্য ছিল—অনুষ্ঠানবিহীন নামকীর্তন, অনুষ্ঠানবিহীন ভক্তিই হলো এই ধর্মের মূল কথা। সুফী সাধনার এই বৈশিষ্ট্য ভেদবাদী হিন্দুধর্মের অত্যাচারে অতিষ্ঠ নিম্নবর্ণের মানুষকে ইসলামধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করে থাকবে। কেবলমাত্র শাসক শক্তির জবরদস্তি নয়, বরং দেখা যায় মধ্যযুগে হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান শাসনকর্তারাও কাব্যরচনায় কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তবে মনে হয় প্রথম দিকে কবিরা পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিশেষ কিছু রচনা করতে পারেন নি। মধ্যযুগের অধিকাংশ কাব্যই রচিত হয়েছে শাসক বা সামন্তশক্তির আনুকূল্যে। কিন্তু আদিমধ্য যুগের একমাত্র সাহিত্য নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কোনো রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত নয়।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্য ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৯০৯ সালে তিনি এই পুঁথি বিষ্ণুপুরের এক গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র-বংশীয় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে উদ্ধার করেন। সম্পাদক কাব্যের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নাম রাখলেও পুঁথির ভেতরের একটি চিরকুটে 'কৃষ্ণসন্দর্ভ' পাওয়া গেছে। কিন্তু কাব্যটি এখনো 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামেই পরিচিত।

বাংলা সাহিত্যে একাধিক চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ একটি গুরুতর সমস্যা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যে কোথাও 'দীন চণ্ডীদাস' বা 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতা নেই। সর্বত্রই বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতা। প্রধান চরিত্র তিনটি—রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই। সখীকে সম্বোধন করে কোনো পদ নেই। এই সমস্ত নানা তথ্য থেকে মনে হয় এটি চৈতন্য-পূর্বযুগেরই এক কবি চণ্ডীদাসের রচনা। আয়ানের বিবাহিতা পত্নী

রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমকাহিনীই এর উপজীব্য। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের কাঠামো অনুসরণ করে এটি রচিত। এর মধ্যে নাটগীতির বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা পাই মধ্যযুগীয় গ্রামবাংলার সমাজ-পরিবেশ। রাধা-কৃষ্ণ সম্ভবত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্র-পাত্রী। মধ্যযুগীয় পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় বোধ নিয়ে এরা জীবন্ত মানুষ। জোর করে আধ্যাত্মিকতা চাপানো হয়েছে বটে, কিন্তু দেবভাব এই চরিত্রগুলোর মধ্যে নেই। এই কাব্যে লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কারের আর ব্যবহারিক জীবনের কিছু রীতিনীতি লক্ষ্য করা যায়। কুমোরের পণী, তেলি-তেলিনী, তিথি-নক্ষত্র, মেয়েদের বাজারের বেচা-কেনা, তাদের প্রতিদিনের ঘরকন্নার খুঁটিনাটি, কুট্টিনীদের পরকীয়া প্রেমে দূতীয়ালি, সমাজ-নেতাদের লাম্পট্য ও স্বৈরাচার—এইসব নিয়ে সমকালের হিন্দুসমাজের ছবি এখানে ফুটে উঠেছে। কাব্যের নায়িকা রাধা গোটা মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে সবচেয়ে জীবন্ত, সবচেয়ে বাস্তব নারীচরিত্র। কৃষ্ণের প্রতি তার তীব্র বিরাগ, উপেক্ষা আর ঘৃণা এবং সেই স্তর থেকে ধীরে ধীরে শরীর ও মনের পরিপূর্ণ জাগরণে কৃষ্ণপ্রেমিকা হয়ে ওঠার বর্ণনায় কবি আশ্চর্য মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

৩

১৫শ শতকের আর এক কবি হলেন মিথিলার সামন্তরাজা শিবসিংহের সভাকবি বিদ্যাপতি। মিথিলার মধুবনী পরগনার বিসফী গ্রামে কবির জন্ম। মিথিলা এবং বাংলা পাশাপাশি রাজ্য বলেই এবং দুই রাজ্যের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ বলেই বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী এদেশে জনপ্রিয় হয়েছে। বিদ্যাপতি হয়ে উঠেছেন বাংলার কবি। কিন্তু রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ ছাড়াও বিদ্যাপতি শিব-বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। অন্যান্য নানা বিষয়েও তাঁর গ্রন্থ আছে। আর সমকালীন ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ আমরা পাই তাঁর 'কীর্তিলতা'য়। তাঁর যুগে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের স্বরূপ তিনি তুলে ধরেছেন এইভাবে—

'হিন্দু তুরুকে মিলল বাস।/ একক ধম্মে অওকো উপহাস।/ কতহুঁ মিলিমিশ কতহুঁ ছেদ'। (বঙ্গানুবাদ—হিন্দু আর তুর্ক বাস করতে লাগল। একের ধর্মকে অন্যে উপহাস করে। কেউ কেউ মিলেমিশে থাকে, আবার কেউ কেউ বিবাদ করে।)

চৈতন্যপূর্ব আর-এক পদাবলীকার হলেন চন্ডীদাস। তিনি বাঙালীর

মর্মলোকের কবি, বাংলা কবিভাষার নির্মাতা। নিতান্ত সহজ, সরল অনাড়ম্বর ভাষায় তিনি বাঙালী জীবনেরই চারপাশের পরিবেশকে তাঁর কাব্যের বিষয় করে রাধার বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এছাড়া চৈতন্যপূর্ব যুগেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্য দুটি ধারা সমৃদ্ধিলাভ করে: (১) অনুবাদ-সাহিত্যের ধারা, (২) মঙ্গলকাব্যের ধারা। অনুবাদ-সাহিত্যের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় কৃত্তিবাসী রামায়ণের কথা। কৃত্তিবাসের কাল নিয়েও সমস্যা আছে। তাঁর আনুমানিক সময় স্থির করা হয়েছে ১৪৫০ থেকে ১৫০০ খ্রীস্টাব্দ। কৃত্তিবাসী রামায়ণের বহু পুঁথিতে তাঁর পূর্বপুরুষদের বিবরণ দেওয়া আছে। বাল্মীকি রামায়ণের রাম নরচন্দ্রমা কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে তিনি বৈষ্ণবীয় ভাবে অভিষিক্ত ভক্তবৎসল দেবতা। সীতাও মহাকাব্যের বীর নায়িকা নন, নিতান্তই বঙ্গবধূ। এছাড়াও বাল্মীকি রামায়ণে অনুপস্থিত নানা বিচিত্র ঘটনা এবং প্রসঙ্গ এই কৃত্তিবাসী রামায়ণকে একান্তভাবে বাঙালীর নিজস্ব সাহিত্য করে তুলেছে। কৃত্তিবাসের প্রাপ্ত পুঁথিগুলিতে পরবর্তী কালের প্রক্ষেপও যথেষ্ট আছে।

এই রামায়ণ-মহাকাব্যের উত্তরকালীন অনুবাদকদের মধ্যে ১৬শ শতাব্দীর অদ্ভুত আচার্য, ১৭শ শতাব্দীর বংশীদাস কন্যা চন্দ্রাবতী, কবিচন্দ্র এবং ১৮শ শতাব্দীর জগদ্‌রাম প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। এঁদের কাব্যও বাঙালীয়ানার গণ্ডীতে বাঁধা। তবে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী তুলসীদাসের রামচরিত-মানসের মতোই যুগাতিক্রমী জনপ্রিয়তায় ধন্য।

চৈতন্যপূর্ব কাল থেকেই আমরা লক্ষ্য করি মহাভারতের কিছু অংশ অনুবাদ করেছিলেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী। গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর নির্দেশে পরমেশ্বর মহাভারতের অশ্বমেধপর্বের অনুবাদ করেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁ-ও শ্রীকর নন্দীকে অশ্বমেধপর্ব অনুবাদ করবার জন্য নির্দেশ দেন। এইভাবে পাঠান শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠ-পোষকতায় মহাভারত অনুবাদের সূচনাই প্রমাণ করে মুসলমান শাসকদের সম্পর্কে হিন্দুধর্ম বিদ্বেষের যে সরলীকৃত সূত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা অযৌক্তিক। সম্ভবত বহিরাগত মুসলমান শাসকরা এদেশের যে জনগোষ্ঠীকে শাসন করছিল, সেই জনগোষ্ঠীরই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে কর্ষণের মধ্য দিয়ে তাদের আস্থা অর্জনের জন্য শাসকশ্রেণী প্রয়াসী হয়েছে।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ভাগবতের অনুবাদ। এই অনুবাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি বলেছেন—'ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া / লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া।' আরও বলেছেন—'ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে / লৌকিক করিয়া কহি লৌকিক মতে।' অনুবাদ-সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে

কবির সচেতনতা এখানে লক্ষণীয়। বৃহত্তর গণমানসকে সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আস্বাদনে সক্ষম করে তোলার জন্য এঁরা সচেষ্ট। সংস্কৃতভাষাশ্রয়ী সাহিত্যরসকে বাংলা ভাষার আধারে প্রবাহিত করার জন্য সেদিন অনুবাদকদের সুস্পষ্ট ধর্মীয় বিধিনিষেধকেও অমান্য করতে হয়েছিল। বলা চলে, গণসংস্কৃতির দাবির পক্ষে এঁরা ছিলেন সেদিনের বিদ্রোহী-বিজয়ী।

ইসলামী সংস্কৃতির ঐতিহ্যও একইভাবে 'ইউসুফ-জোলায়খা' জাতীয় বাংলা অনুবাদ-কাব্যকে আশ্রয় করে সেই সময় থেকেই রূপায়িত হতে থাকে। মোটকথা, হিন্দু বা মুসলমান হিসেবে নয়—নির্বিশেষ বাঙালী তাদের সাংস্কৃতিক চেতনার মাধ্যম হিসেবে সেদিন বাংলা ভাষাকেই গ্রহণ করে অখণ্ড সংস্কৃতিরূপে গড়ে তুলছিল।

ম ঙ্গ ল কা ব্য—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি ঐশ্বর্যময় শাখা হলো মঙ্গলকাব্য। সম্ভবত মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলি প্রথমে ব্রতকথা ও ছড়ার আকারেই প্রচলিত ছিল, পরে পাঁচালী রীতিতে গায়কদের মুখে মুখে গাওয়া হতো। তারপর এগুলি লিখিত রূপ পায়। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো—দেবতারা নিজেদের পূজা প্রচারের জন্য মানুষের সাহায্য নিচ্ছে, কোনো কোনো সময় নানাভাবে মানুষের ওপর অত্যাচার করেও পূজা আদায় করছে। লিখিত আকারে মঙ্গলকাব্যের যে-রূপ আমরা পাই, তার কাহিনীকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: দেববন্দনা, দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। প্রায় সব মঙ্গলকাব্যেই কাহিনীর কাঠামো এক ধরনের। মঙ্গলকাব্যের এই দেবতারা দেশীয় প্রাক্-আর্য অস্ট্রিক গোষ্ঠীর। বাংলার এই আদিম জনসম্প্রদায় সাপ, পর্বত, এমনকি বিভিন্ন রোগের দেবতাও কল্পনা করেছে এবং তাদের পূজা করেছে। প্রকৃতির সমস্ত প্রতিকূলতা সম্পর্কে তাদের আতঙ্ক এই দেবতাদেরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। পরবর্তীকালে এই দেবতারাই আর্য সংস্কৃতিতে গৃহীত হয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের এই সমস্ত দেবতা হলেন মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, শীতলা, শিব, ষষ্ঠী ইত্যাদি। চৈতন্যপূর্ব যুগে রচিত কয়েকটি মনসামঙ্গলের পুঁথি আমরা পেয়েছি। এছাড়া মাণিক দত্তের চণ্ডী-মঙ্গলও এই সময়েরই কাব্য।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যগুলির সর্বাধিক গুরুত্ব স্বীকৃত হয় সমকালীন বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় ধরা আছে বলে। দেবখণ্ডে হরপার্বতীর দাম্পত্যজীবন বর্ণনায় প্রায় সব কবিই সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরন্ন বাঙালীর 'শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি'কে ফুটিয়ে তুলেছেন। মনসা-

মঙ্গলে চাঁদ সদাগর ও বেহুলার কাহিনীতে আছে মধ্যযুগীয় বাংলার বহির্বাণিজ্যের বিবরণ এবং সমাজে বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তির কথা। চণ্ডীমঙ্গলের দুটি কাহিনী, কালকেতু-ফুল্লরা উপাখ্যান ও ধনপতি উপাখ্যানে শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজের চমৎকার রূপটি কবিরা ফুটিয়ে তুলেছেন। কালকেতু ব্যাধ নিম্নবর্ণের দরিদ্র। অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়, আর বণিক ধনপতি পিতৃপুরুষের অর্জিত বিত্তের ওপর বসে 'নগরিয়া শিশু'-দের নিয়ে পায়রা উড়িয়ে বেড়ায়। এই মঙ্গলকাব্যগুলোতেই মধ্যযুগীয় সমাজে নারীর অবস্থানের প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায়। এছাড়াও মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে আমরা পেয়ে যাই সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য, নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের চরম ঘৃণা, সপত্নীপ্রথার ভয়াবহতা আর সমাজের বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের জীবনের ছবি। মধ্যযুগে দুটি পৃথক সম্প্রদায়—হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থান, তাদের বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা এবং সম্প্রীতির অন্তরঙ্গ বর্ণনাও পাওয়া যায় এই মঙ্গলকাব্যগুলিতে।

চৈতন্যপূর্ব যুগে যে দুটি মনসামঙ্গল কাব্য আমরা পেয়েছি, সেগুলির কবিদের নাম হলো বিপ্রদাস এবং বিজয়গুপ্ত। বিপ্রদাস পশ্চিমবঙ্গের এবং বিজয়গুপ্ত পূর্ববঙ্গের কবি।

মনসামঙ্গলকাব্যের কাহিনী করুণ রসের জন্যেই বাঙালীমন জয় করেছে। কাব্যের কাহিনী হলো, শিবের কন্যা মনসা পদ্মবনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর একটি নাম পদ্মা। পদ্মাকে শিব গৃহে নিয়ে এলে শিবের পত্নী চণ্ডী তার একটি চোখ কানা করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। বিবাহের পর স্বামীও তাকে পরিত্যাগ করে। দেবসভায় তার স্থান হলেও মর্ত্যমানবের কাছ থেকে সে পুজো আদায় করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সমাজের অগ্রগণ্য বিখ্যাত ধনী চাঁদ সদাগরকে দিয়ে সে তার পুজো পেতে চায়। শৈব চাঁদ সদাগর মনসার পুজো করতে রাজি না হলে মনসা একে একে তার ছয় পুত্রকে সর্পাঘাতে হত্যা করে। চাঁদ তাঁর সপ্তডিঙা মধুকর সাজিয়ে বাণিজ্যে বেরোলে মনসার ষড়যন্ত্রে ডিঙা ডুবে যায়। চাঁদের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র লক্ষীন্দরও মনসার সাপের কামড়ে বাসর-ঘরেই মারা যায়। কিন্তু তার পত্নী বেহুলা স্বর্গপুরীতে গিয়ে লক্ষীন্দরের জীবন এবং সেই সঙ্গে ছয় ভাশুরের জীবন, শ্বশুরের ডুবে যাওয়া সপ্তডিঙা মধুকর উদ্ধার করে আনে। বেহুলার অনুরোধে চাঁদ সদাগর শেষ পর্যন্ত মনসার পুজো করতে রাজি হন। মনসামঙ্গলের এই কাহিনীর মধ্যে সমকালের অব্যবহিত পূর্বে সমাজ যে বণিকদের প্রতিপত্তি প্রসারিত ছিল, তারই স্মৃতি-নির্ভর কল্পনার বিস্তার লক্ষ্য করা যায়।

৪

মধ্যযুগের বাংলাদেশে একটি বিশিষ্ট ঘটনা হলো শ্রীচৈতন্যের জন্ম। ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দের ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমায় নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর সন্তান নিমাই বা গৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি খুব দুরন্ত ছিলেন, অথচ এদিকে বিদ্যাচর্চায় ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। ষোলো বছর বয়সে তিনি স্বনির্বাচিত দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা লক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু লক্ষ্মীদেবী সাপের কামড়ে মারা গেলে তাঁর বিবাহ হয় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে। একুশ-বাইশ বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর গয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়ে তিনি কৃষ্ণপ্রেমিক মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং তারপর দেশে ফিরে এলে তাঁর স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে। তিনি কৃষ্ণপ্রেমের আবেগে উন্মত্ত হয়ে রাত্রিদিন কীর্তনগানে বিভোর হয়ে পড়েন। ব্রাহ্মণদের এত দিনের কায়েমী স্বার্থকে ভেঙে দিয়ে তিনি বলেন, হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হতে পারে। এইভাবে হিন্দুধর্মের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকে ভেঙেচুরে মনুষ্যত্বের এক নতুন মহিমা তিনি প্রচার করেন। ব্রাহ্মণদের চক্রান্তে নবদ্বীপের কাজী তাঁদের কীর্তনে বাধা দিলে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর বিপুল ভক্ত-গোষ্ঠীর সঙ্গে কীর্তন করতে করতে কাজীর বাসগৃহে যান। এর ফলে কাজী কীর্তনের উপর বিধি-নিষেধ তুলে নেন।

১৫১০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসগ্রহণের পর দাক্ষিণাত্য ও তারপর বৃন্দাবন ভ্রমণ করেন। এবং অবশেষে জীবনের শেষ আঠারো বছর জননী শচীদেবীর নির্দেশে নীলাচলে কাটান। এইসময় কৃষ্ণপ্রেমের আবেগে উন্মত্ত হয়ে মাঝে মাঝে তিনি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। একদিকে ভক্তির এই আবেগ আর অন্যদিকে সন্ন্যাসের দৃঢ় সংযত জীবনাচরণের আদর্শ স্থাপন করে তিনি ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, হিন্দু-মুসলমান, উচ্চ-নীচ সবাইকে নিজের কাছে টানতে পেরেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের এই অনুষ্ঠানবিহীন প্রেমধর্মের সঙ্গে সুফীসাধনার কিছুটা সাদৃশ্য আছে। সাম্যভিত্তিক প্রেমধর্ম নতুন সামাজিক মূল্যবোধেরও সৃষ্টি করল।

বাংলা সাহিত্যেও সৃষ্টি হলো এক নতুন ধারা চৈতন্যজীবনীসাহিত্য। বৈষ্ণব পদাবলীতে ব্যাপক বিপুল পরিবর্তন দেখা দিল। কীর্তনগান খুবই প্রচার লাভ করল। এছাড়া মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যেও শ্রীচৈতন্যের প্রভাব নানাভাবে পড়তে থাকল। তাঁরই প্রভাবে রূপ-সনাতন-জীব প্রমুখ গোস্বামীরা দর্শন ভক্তি ও অলংকার শাস্ত্র রচনা করলেন। গড়ে উঠল গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তি দর্শন।

চৈতন্যজীবনীকাব্য। মধ্যযুগে দেবতাদের নিয়ে ও পুরাণকথা নিয়ে রচিত কাব্যের মাঝখানে চৈতন্যজীবনীগুলি একজন ঐতিহাসিক পুরুষের জীবনকথা নিয়ে রচিত সাহিত্য হিসেবে ব্যতিক্রম। অবশ্য শ্রীচৈতন্যকে ঠিক বাস্তব মানুষ হিসেবে নয়, ঈশ্বরের অবতার হিসেবেই দেখানো হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের জীবনীকাব্যের মধ্যে প্রধান হলো বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ও লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'। এছাড়া গোবিন্দদাসের কড়চা, চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' নামক দুটি চৈতন্যজীবনী বিষয়ক কাব্যও পাওয়া গেছে। গোবিন্দদাসের কড়চা জাল বলে মনে হলেও সাম্প্রতিক গবেষণায় এটিকে অন্যতম প্রামাণ্য চৈতন্যজীবনী বলা হয়েছে। এছাড়া চৈতন্যদেবের মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পরে কয়েকটি সংস্কৃত চৈতন্যজীবনীও রচিত হয়েছিল।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' আনুমানিক ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়। চৈতন্যভাগবত তিনটি খণ্ডে বিভক্ত –

(১) আদি, (২) মধ্য ও (৩) অন্ত্যখণ্ড। আদিখণ্ডে বৃন্দাবন দাস সমকালীন নবদ্বীপের যে সমাজ-পরিবেশ বর্ণনা করেছেন, তা ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান – 'নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।/ একো গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।।/ ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।/ সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সহে মহাদক্ষ।।/ সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধরে।/ বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে।।/ নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।/ নবদ্বীপে পড়ি লোক বিদ্যা রস পায়।।/ …রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।/ ব্যর্থে কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে।।'

এছাড়াও চৈতন্যজীবনীকাব্য লেখেন গায়ক কবি লোচনদাস। ইনি আনুমানিক ১৫৬০ খ্রীস্টাব্দে কাব্যরচনা করেন। এঁর কাব্যে গৌরনাগরী ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। অর্থাৎ কৃষ্ণ যেমন গৌরধামে পরম প্রেমিকপ্রবর, চৈতন্যকেও তিনি সেইভাবে কল্পনা করেন। লোচনদাসের পর আনুমানিক ১৫৬০ থেকে ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' রচিত হয়। এঁর গ্রন্থ থেকে শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর একটি বাস্তব কারণ পাওয়া যায়। আষাঢ় মাসের রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্য ভাবাবেশে নৃত্য করছিলেন। সেই সময় পায়ে ইঁটের আঘাত লাগে। তারই ফলে জ্বরগ্রস্ত হয়ে তিনি মারা যান। কিন্তু তাঁর কাব্যে অন্যান্য যে-সমস্ত তথ্যগুলি পাওয়া যায়, ঐতিহাসিকেরা সেগুলি সমর্থন করেন না।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কে চৈতন্যজীবনীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলা

যায়। চৈতন্যদেবের শেষ জীবনের বর্ণনা এই গ্রন্থেই বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের মূল কথাও এই মহাগ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গ্রন্থটি রচনায় উল্লেখযোগ্য কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নিতান্ত বৃদ্ধবয়সে বৃন্দাবনের বৈষ্ণবদের অনুরোধে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের কয়েক বছর পর তিনি গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের রাগভক্তি রূপ-সনাতন-জীব গোস্বামী রচিত রাধাকৃষ্ণলীলার নূতন ব্যাখ্যাসমন্বিত কাব্য এবং শাস্ত্র ও অলঙ্কার বিষয়ক আলোচনাও এখানে পাওয়া যায়। কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ সম্পর্কে অনবদ্য ভাষায় তিনি এখানে বলেছেন—'অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম : যেন জাম্বুনাদ হেম / হেন প্রেমা নৃলোকে না হয়।/ যদি হয় তার যোগ : না হয় তার বিয়োগ / বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়।। / এই প্রেমা আস্বাদন : তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ / জীভ জ্বলে না যায় ত্যজন। / হেন প্রেমা যার মনে : তার বিক্রম সেই জানে / বিষামৃতে একত্র মিলন ॥'

এছাড়া পরবর্তীকালে এই সমস্ত চৈতন্যজীবনীর প্রভাবে অন্যান্য বৈষ্ণব সাধকদের জীবনীও রচিত হতে শুরু করে।

বৈ ষ্ণ ব প দা ব লী সা হি ত্য—চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে ; সংযোজিত হয় নূতন ধারা। এর আগে বৈষ্ণব-পদাবলীতে কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এখন বাৎসল্য এবং সখ্যরসের পদ রচিত হতে লাগল। এছাড়া গৌরাঙ্গের বাল্যবয়সের এবং পরবর্তী জীবনের নানা ঘটনাকে অবলম্বন করেও পদ রচিত হতে লাগল। এই নবমানবতাবাদের উদ্ভব মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পরিধিকে বিস্তৃত করে দিল। চৈতন্যদেবের সমসাময়িককালে পদ রচনা করলেন মুকুন্দ-মাধব-বাসু ঘোষ নামে তিন ভ্রাতা, বংশীবদন, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি। এছাড়াও পরবর্তী-কালে নিত্যানন্দের শিষ্য বলরাম দাস পদ রচনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের কাজ নিত্যা-নন্দই গ্রহণ করেন। বলরাম দাস তাঁর বাৎসল্য রসের পদগুলির জন্যই বিখ্যাত। এছাড়াও ষোড়শ শতাব্দীর আর একজন বিখ্যাত কবি হলেন জ্ঞানদাস। রোমান্টিক ভাবমাধুর্যের জন্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইনি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

জ্ঞানদাস তাঁর গুরু নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে খেতুরীর বৈষ্ণব মহোৎসবে যোগ দেন। ১৮৮০ থেকে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে খেতুরীতে নরোত্তম ঠাকুর এই মহোৎসব করেন। বৈষ্ণবপ্রধান শ্রীনিবাস আচার্য এবং এক হাজারেরও বেশি বৈষ্ণব সাধকেরা ঐতে যোগ দেন। এই সম্মেলন একটি ঐতিহাসিক

ঘটনা। কারণ এর ফলে একটি নতুন কীর্তনরীতি প্রবর্তিত হয়। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব ও প্রসার লোকসাধারণে আরও বৃদ্ধি পায়।

এই খেতুরীর মহোৎসবে আর একজন কবি যোগ দেন: গোবিন্দদাস। গোবিন্দদাস ১৬শ শতাব্দীর শেষ এবং ১৭শ শতাব্দীর প্রথম দিকের কবি। এঁর পদে মঞ্জরীভাবের উপাসনা পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। মঞ্জরীভাবে উপাসনার অর্থ হলো দাসীভাবে ভাবিত হয়ে রাধাকৃষ্ণলীলার বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁদের সেবা করা। এই সেবাময় উপাসনা মধ্যযুগীয় মুসলমান শাসনাধীন বাংলা দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাপন পদ্ধতিরই সাহিত্যবিম্ব। রাধাকৃষ্ণকেও সেই কারণে চৈতন্যপরবর্তী সাহিত্যে অধিকাংশ সময়েই বহু দাস-দাসীসেবিত সামন্ত প্রভুরই আদলে গড়ে তোলা হয়েছে।

ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা এবং অলংকার ব্যবহারে কৃতিত্বের জন্য তিনি নিজেকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে অভিহিত করেছেন। দীক্ষিত বৈষ্ণব গোবিন্দদাস তাঁর দীক্ষাগুরু শ্রীনিবাস আচার্যের নির্দেশক্রমে সমস্ত বৈষ্ণব দর্শন ও রসশাস্ত্র, বিশেষভাবে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' পাঠ করে কাব্য রচনা করেন। রাধাকৃষ্ণলীলার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে অভিসার পর্যায়েই তিনি বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিমিরাভিসারিকা রাধার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন—'নীল অলকাকুল: অলিকে হিলোলত/নীল তিমিরে চল গোই।/ নীল নলিনী গনু: শ্যামর সায়রে / লখই না পারই কোই।।' এছাড়া গৌর-চন্দ্রিকা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে কবির কৃতিত্ব অবিসংবাদী।

পরবর্তীকালে গোবিন্দদাসের পুত্র দিব্যসিংহ, পৌত্র ঘনশ্যাম দাস, রাধা-মোহন ঠাকুর ও আরও অনেকে পদ রচনা করেছেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের প্রভাব বাঙালী জীবনে সার্বিকভাবে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল, সেই উদ্দী-পনার আবেগ স্তিমিত হওয়ায় এঁদের পদ কৃত্রিম ও প্রাণহীন হয়ে এসেছে।

মুসলমান কবিরাও বেশ কিছু বৈষ্ণব পদ রচনা করেন। এই সমস্ত মুসল-মানদের অনেকেই ছিলেন ধর্মান্তরিত হিন্দু। তাঁদেরভেতরকার হিন্দু সংস্কারের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের উদার প্রেমধর্মের প্রভাব যুক্ত হয়েই হয়তো তাঁদের বৈষ্ণব পদ রচনায় প্রাণিত করেছিল। এমনকি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদও এঁরা রচনা করেন। আকবর, লালন ফকির, লাল মামুদ প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

৫

চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালেই চণ্ডীমঙ্গলের বিশিষ্ট কবিরা কাব্য রচনা করেন। মনসার মতো চণ্ডীও 'অনার্য'-গোষ্ঠীর দেবী। অবশ্য বৈদিক সাহিত্যেও এঁর আদিরূপ পাওয়া যায়। বৈদিক দেবী অরণ্যানী কালক্রমে এই

দেবীরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং পরবর্তীকালে ইনি আবার হয়ে দাঁড়িয়েছেন মহিষমর্দিনী দুর্গারই আর এক রূপ। চণ্ডীমঙ্গলের দুটি কাহিনীতে দেবীকে আমরা দুভাবে দেখতে পাই ; তিনি পশুকুলের রক্ষয়িত্রী, অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, অনার্য ব্যাধ-পূজিতা আর অন্যদিকে তিনি ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির দেবতা গজলক্ষ্মীরই আর এক রূপ। প্রথম কাহিনী আখেটিক খণ্ডে দেখা যায় চণ্ডীর পূজা প্রচারের জন্য তাঁরই ষড়যন্ত্রে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে মর্তে্য কালকেতু ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করে। তার স্ত্রী ছায়া জন্মায় ফুল্লরা নামে। ব্যাধ কালকেতুর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বনের পশুরা চণ্ডীর কাছে আবেদন জানালে চণ্ডী স্বর্ণগোধিকারূপে কালকেতুর পথে পড়ে থাকেন। কোনো শিকার না পেয়ে স্বর্ণগোধিকারূপিনী দেবীকেই কালকেতু ধনুকের গুণে বেঁধে নিয়ে আসে। দেবী স্বমূর্তি ধারণ করে কালকেতুকে প্রচুর অর্থ দেন। চণ্ডীর পূজা করার পর কালকেতু তাঁর কৃপায় জঙ্গল কেটে গুজরাট নগরের পত্তন করে। প্রতিবেশী কলিঙ্গরাজ তার রাজ্য আক্রমণ করলেও শেষ পর্যন্ত চণ্ডীর দয়ায় কালকেতু রাজ্য ফিরে পায়। এইভাবে দেবীর পূজা ও মহিমা প্রচারিত হওয়ার পর কালকেতু আবার সস্ত্রীক স্বর্গে ফিরে যায়।

বণিক খণ্ডের কাহিনীতে ইন্দ্রের পুত্র মণিকর্ণ ও তার স্ত্রী চন্দ্রলেখা শাপগ্রস্ত হয়ে জন্মাল ধনপতি ও লহনা নামে। অন্যদিকে স্বর্গের নর্তকী রত্নমালা এবং গায়ক মালাধর খুল্লনা ও শ্রীমন্ত নামে মাতা-পুত্ররূপে মর্তে্য জন্মাল। ধনপতি শৈব এবং নারীদেবতা-বিদ্বেষী। খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হয়ে সে দ্বিতীয়বার তাকে বিবাহ করে। কিন্তু তারপরই সে রাজার আদেশে বাণিজ্যে চলে গেলে সপত্নী লহনা তার উপর নিদারুণ অত্যাচার করে। তার সমস্ত আভরণ-বস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে ছাগল চরানোর জন্য বনে পাঠায়। একদিন দেবী চণ্ডী একটি ছাগলকে লুকিয়ে রেখে খুল্লনাকে দিয়ে সুকৌশলে নিজের পুজো করিয়ে নেন। এরপর ধনপতি ফিরে এলে খুল্লনা এই অবস্থা থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু নানা কঠিন পরীক্ষা দেওয়ার পর তবে তাকে সমাজে গ্রহণ করা হয়। এরপর ধনপতি দ্বিতীয়বার বাণিজ্য যাত্রা করলে খুল্লনা স্বামীর কল্যাণের জন্য ঘট পেতে চণ্ডীপুজা করে। ধনপতি চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করে বাণিজ্যে বেরিয়ে যায়। এর ফলে শেষ পর্যন্ত চণ্ডীর ক্রোধে তাকে সিংহলে কারারুদ্ধ হতে হলো। ইতিমধ্যে খুল্লনার পুত্র জন্মাল ; তার নাম রাখা হলো শ্রীমন্ত বা শ্রীপতি। বড় হয়ে পিতার সন্ধানে সিংহলে গিয়ে সে-ও চণ্ডীর মায়ায় কারারুদ্ধ হলো এবং অবশেষে দেবী চণ্ডীর কাছে আকুল আবেদন জানিয়ে তাঁরই দয়ায় সে নিজে মুক্ত হলো, পিতাকে মুক্ত করল এবং সিংহল রাজকন্যা সুশীলাকে বিবাহ করে দেশে ফিরে এল এবং তারপর স্বর্গে ফিরে গেল।

চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ১৬শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনদৃষ্টির গভীরতায়, সমকালীন সমাজজীবনের বাস্তব উপস্থাপনায় তিনি মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। সমকালীন ভূমিব্যবস্থা, জাতি-বর্ণ বিন্যাস, হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক, নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবনসংগ্রামের কঠোরতা, সামাজিক স্তরবিন্যাস ইত্যাদি তাঁর কাব্যের আখেটিক খণ্ডে লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু মুসলমানের সহাবস্থানের এবং পারস্পরিক সম্প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তন প্রসঙ্গে। মুসলমান সম্পর্কে কবি বলেছেন—'বড়ই দানীষবন্দ : কারেহ না করে মন্দ/প্রাণ গেলে রোজা নাহী ছাড়ি/ধরয়ে কম্বুজ-বেশ : শিরে নাহী রাখে কেশ/বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ী।' অন্যদিকে মূর্খ, ভণ্ড ব্রাহ্মণকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন।

বণিক খণ্ডের কাহিনী-মনসামঙ্গলের কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত। এই খণ্ডে সাধারণভাবে উচ্চবিত্তশ্রেণীর বিলাসমন্থর জীবনযাত্রা, সপত্নীপ্রথা এবং সমাজে নারীনির্যাতনের যে নিদর্শন সাধারণভাবে আছে, মুকুন্দরামের লেখনীতে তা আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মুকুন্দরামের কাব্য মধ্যযুগের বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলিল। এছাড়া চৈতন্যদেবের প্রভাবের জন্যই মুকুন্দরামের শক্তিমহিমা-প্রচারমূলক কাব্যে বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করে যায়।

চণ্ডীমঙ্গলের আর এক বিশিষ্ট কবি হলেন দ্বিজ মাধব। এছাড়াও দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গল, দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীমঙ্গল, রামানন্দ যতির কাব্য ও অকিঞ্চনের চণ্ডীমঙ্গলের নাম করা যায়।

এই চণ্ডীমঙ্গলেরই ধারায় ১৮শ শতাব্দীতে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন কবি ভারতচন্দ্র। চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডী একাধারে অনার্য ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের দেবী। কিন্তু ভারতচন্দ্রের অন্নদা কৃষ্ণচন্দ্রের কুলদেবতা এবং নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচারে উৎপীড়িত ১৮শ শতাব্দীর অসংখ্য নিরন্ন মানুষের দেবী। পূর্ববর্তী যুগে দেবতার প্রতি যে ভয়, ভক্তি এবং সম্ভ্রম ছিল, ১৮শ শতাব্দীতে ইংরেজদের বাণিজ্য বিস্তারে নতুন উপসামন্তবাদের উদ্ভবে সেই ভয় এবং ভক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে দেবতার প্রতি ব্যঙ্গপরায়ণ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। তাই ভারতচন্দ্রের কাব্যে শিব, ব্যাস, গঙ্গা প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্রকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে আর দরিদ্র খেয়ার মাঝি দেবতার কাছে ঐশ্বর্য অথবা সাম্রাজ্য চায় নি, বলেছে—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'

ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন ১৭৫০ থেকে ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। এতে মোট পাঁচটি কাহিনী পাওয়া যায়—(১) হরপার্বতীর দাম্পত্য

জীবনের দারিদ্র্য ও কলহ এবং শিবের ভিক্ষা, (২) ব্যাসদেবের কাহিনী, (৩) দরিদ্র হরিহোড়ের প্রতি দেবীর দয়া, (৪) ভবানন্দ মজুমদারকে দেবীর রাজত্বদান প্রসঙ্গে মানসিংহ-প্রতাপাদিত্যের ঐতিহাসিক কাহিনী এবং (৫) বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে আলংকারিতার কথাই বেশি করে বলা হয়। মন্ডন-কলানৈপুণ্যে তিনি অসাধারণ—এটা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাঁর সমাজমনস্কতার পরিচয়ও কাব্যের প্রথম খন্ডে অন্তত ভালোভাবেই পাওয়া যায়। কবি হিসেবে তিনি এত জনপ্রিয় ছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত তাঁর প্রভাব বাংলা সাহিত্যে পুরো মাত্রায় বজায় ছিল।

চৈতন্যপরবর্তী যুগেও বেশ কিছু বিশিষ্ট কবি মনসামঙ্গলকাব্য রচনা করে-ছিলেন। যেমন—সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কেতকদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্য। কেতকদাসের কাব্যেও তাঁর আত্মজীবনী পাওয়া যায়। এছাড়াও বিষ্ণুপাল, উত্তর-পূর্ববঙ্গের বংশীদাস (বা বংশীবদন) চক্রবর্তী সপ্তদশ শতাব্দীতে কাব্যরচনা করেন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গে রচিত হয় জগজীবন ঘোষাল ও জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের মনসামঙ্গল কাব্য।

মঙ্গলকাব্যের অন্যতম প্রধান শাখা হলো ধর্মমঙ্গল। ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্ট। সম্ভবত তিনি ১৫শ শতাব্দীর লোক ছিলেম। এছাড়াও এই কাব্যধারায় কাব্যরচনা করেছেন রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী, সহদেব চক্রবর্তী ও রামদাস আদক প্রমুখ কবি। চন্ডীমঙ্গল এবং মনসামঙ্গল কাব্যধারা যেমন বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে প্রচারিত, ধর্মমঙ্গল তেমন নয়। রাঢ় অঞ্চলেই এর উদ্ভব এবং এখানেই এর প্রচারও সীমিত। এই দেবতাকে বুদ্ধ, যম, সূর্য, বিষ্ণু, বরুণ প্রভৃতি নানারূপে কল্পনা করা হয়েছে। কেবলমাত্র ডোম জাতির লোকেরাই এই দেবতার পৌরোহিত্য করতে পারেন। অথচ ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন উচ্চবর্ণের কবিরাই। এর কাহিনীতে ইতিহাসের ক্ষীণ স্পর্শ পাওয়া যায়। গৌড়ের সম্রাট ধর্মপালের পুত্রের সঙ্গে অজয় নদের দক্ষিণ তীরবর্তী একটি পার্বত্যগড়ের অধিপতি ইছাই ঘোষের যুদ্ধের বিবরণই এর মূলে আছে বলে মনে হয়। এই কাব্যের নায়ক লাউসেন গৌড়ের সামন্তরাজা কর্ণসেনের পুত্র। তার রাজধানী ময়নানগর এখন মেদিনীপুর জেলার (মতান্তরে বাঁকুড়া জেলার) অন্তর্গত। এই কাব্যের কাহিনীতে যুদ্ধ ও বীরত্বের চিত্র এবং সেইসঙ্গে নারীদের বীরত্বের চিত্রও পাওয়া যায়। অন্ত্যজ ডোম সমাজের বীরত্বই একসময় বাংলাদেশের সামন্ত রাজাদের আধিপত্যকে অক্ষুন্ন রেখেছিল। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যপ্রচারের মাধ্যমে সেই কাহিনী পাওয়া যায়। এই কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি ১৮শ শতাব্দীর ঘনরাম চক্রবর্তী। ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর সামাজিক

জীবনের ছবি ঘনরামের কাব্যেও পাওয়া যায়। তবে তা মুকুন্দরামের মতো ব্যাপ্ত ও জীবন্ত নয়। এই কাব্যের কাহিনীর বৈচিত্র্য ও নারীর বীরত্বের কাহিনী এটিকে মহাকাব্যের ব্যাপ্তি দান করেছে।

মঙ্গলকাব্যের আর একটি অর্বাচীন অথচ উল্লেখযোগ্য শাখা হলো শিবায়ন বা শিবমঙ্গলকাব্য। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেবতা শিবের দুটি রূপ লক্ষ্য করা যায়—লৌকিক এবং পৌরাণিক। পৌরাণিক শিবকাহিনীর পরিচয়ও এখানে পাওয়া যায়। অন্যদিকে এই শিবায়ন কাব্যেই দেখা যাচ্ছে, শিব চিরকাল ধরে শোষণের শিকার নির্জিত বাঙালী কৃষকের প্রতিনিধি। শিবায়ন কাব্যধারার কবিদের মধ্যে আছেন রামকৃষ্ণ রায়, কবিকিঙ্কর শঙ্কর চক্রবর্তী, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, দ্বিজ কালিদাস, দ্বিজ মণিরাম, লক্ষ্মণ বা বিনয় লক্ষ্মণ প্রভৃতি।

এঁদের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিমান কবি হলেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য। ১৮শ শতাব্দীর কবি রামেশ্বর লৌকিক শিবকথার সার্থক রূপকার। তাঁর কাব্যের নাম শিবায়ন। ঘাটালের যদুপুর গ্রাম থেকে বর্ধমানের সামন্ত শোভাসিংহের ভাই হেমৎসিংহ কবিকে উৎখাত করেন। কবি আশ্রয় নেন মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের কাছে এবং তাঁরই রাজত্বকালে কাব্যটি রচিত হয়। ১৮শ শতাব্দীতে কৃষকদের প্রকৃত অবস্থা কী ছিল তারই বাস্তব বিবরণ এই কাব্যে পাওয়া যায়। শিব ভূমিহীন নিঃসম্বল চাষী। তাঁকে কুবেরের কাছ থেকে ধান ধার করতে হয় আর ইন্দ্রের কাছ থেকে জমি নিয়ে চাষ করতে হয়। কিন্তু এইভাবে চাষ করেও চাষীর কপালে নিজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কারণ, 'গরীবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা। বাব কর্যা সকল বেচিয়া লয় রাজা ॥' সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষক কীভাবে শোষিত হতো, তারই বাস্তব বিবরণ এখানে ধরা রয়েছে।

এই প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি ছাড়াও কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, কপিলামঙ্গল প্রভৃতি বিভিন্ন অপ্রধান মঙ্গলকাব্যও মধ্যযুগে রচিত হয়েছে।

৬

১৭শ শতাব্দীতে কবি সঞ্জয় মহাভারত অনুবাদ করেন। তবে এই শতাব্দীর কবি কাশীরাম দাসের মহাভারত অনুবাদই সর্বাধিক পরিচিত ও জনপ্রিয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতো কাশীদাসী মহাভারতও নিছক মহাকাব্যের অনুবাদ না হয়ে বাঙালীর জাতীয় জীবনের কাব্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু কাশীরাম দাস

তাঁর মহাভারত নিজে পুরোপুরি অনুবাদ করেন নি। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামই এর বেশিরভাগ অংশ অনুবাদ করেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে কাশীদাসী মহাভারত ছাপা হয়েছিল। তাতে আরও বহু অনুবাদকের রচনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

কোচবিহার রাজসভাতেও এই সময় বাংলা মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ হয়। এখানকার সবচেয়ে খ্যাতনামা অনুবাদক হলেন অনিরুদ্ধ। এছাড়াও কৃষ্ণানন্দ বসু, রামনারায়ণ দত্ত, দ্বিজ হরিদাস প্রভৃতি কবিরা মহাভারতের টুকরো টুকরো অংশের অনুবাদ করেন।

চৈতন্যপরবর্তী যুগে বেশ কিছু ভাগবতের অনুবাদ পাওয়া যায়। তবে সব সময় এই ভাগবত অনুবাদ বিশুদ্ধ ছিল না। ভাগবতের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছিল লোকায়ত রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতির কাহিনী। সেই কারণে এগুলিকে আমরা কৃষ্ণলীলা কাব্য বলে চিহ্নিত করতে পারি। ১৬শ শতাব্দীতে বেশ কিছু কৃষ্ণলীলা কাব্য রচিত হয়েছে। এর মধ্যে রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' ভাগবতের বিশুদ্ধ অনুবাদ। এছাড়া মাধবাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' ও দুখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' উল্লেখযোগ্য। ১৭শ শতাব্দীতে সনাতন বিদ্যাবাগীশ ভাগবত অনুবাদ করেন। এছাড়াও 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' রচনা করেন শ্রীকৃষ্ণকিংকর। এই সময় 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচনা করেন কবি কৃষ্ণদাস। কবি শেখর রচনা করেন 'গোপালবিজয়', পরশুরাম চক্রবর্তীর কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য হলো 'কৃষ্ণমঙ্গল', পরশুরাম রায় রচনা করেন 'মাধবসংগীত', ভবানন্দ রচনা করেন 'হরিবংশ'। এছাড়া আরও অজস্র কবি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য রচনা করেন। ভবানন্দের 'হরিবংশ'-এ ভাগবতকে নয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লোকায়ত কাহিনীধারাকেই অনুসরণ করা হয়েছে। চৈতন্যপরবর্তী এই বিপুল কৃষ্ণলীলা কাব্যের সৃষ্টি হয়েছে চৈতন্যদেবেরই প্রভাবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

১৮শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদ যেমন রচিত হয়েছে তেমনি বেশ কিছু পদাবলী সংকলন গ্রন্থও পাওয়া যায়, যেমন—'পদামৃতসমুদ্র', 'পদকল্পতরু', 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' ইত্যাদি।

৭

চট্টগ্রামের পূর্বে আরাকান রাজ্যের রাজধানী ছিল রোসাঙ্গ। এই অঞ্চলে বাংলার সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, পর্তুগীজ প্রভৃতি বিভিন্ন মানুষের মিলনক্ষেত্র ছিল এই স্থান। এবং এর সংস্কৃতিতে ইসলামী

ও হিন্দু ভাবধারার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। এই মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাবে এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল ধর্মনিরপেক্ষ রোমান্টিক প্রণয়-উপাখ্যানের ধারা। রোসাঙ্গের রাজা শ্রীসুধর্মার রাজত্বকালে এই ধারার দুই বিশিষ্ট কবি দৌলত কাজী ও আলাওলের প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। আনুমানিক ১৬০৫—১০ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রাম অঞ্চলে দৌলত কাজীর জন্ম হয়। শ্রীসুধর্মার মন্ত্রী আশরফখানের নির্দেশে তিনি গ্রামীণ হিন্দী ভাষায় প্রচলিত লোরচন্দ্রাণী বা সতীময়নার কাহিনী অবলম্বন করে কাব্যরচনা করেন। কিন্তু কাব্যটি শেষ করার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই অসমাপ্ত কাহিনীর মধ্যেই দৌলত কাজীর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পৃষ্ঠপোষক আশরফ খান-এর প্রশস্তি করে তিনি বলেছেন—'পরদেশী স্বদেশী নাহিক আত্মপর।/ দিঘি সরোবর দিলা অতি বহুতর।।/ সৈয়দ শেখ আর মোগল পাঠান।/ স্বদেশী-বিদেশী বহুতর হিন্দুয়ান।।/ শ্রীযুত আশরফ খান পন্ডিত প্রধান।/ ষোলোকলা পূর্ণ যেন চন্দ্রিকা সমান।।/ নীতিবিদ্যা কাব্য-শাস্ত্র নানা রসময়।/ পঠিতে শুনিতে নিত্য আনন্দ হৃদয়।।' এই প্রশস্তি থেকেই আশরফের উদার অসাম্প্রদায়িক মনের পরিচয় ধরা পড়ে। লোর-চন্দ্রাণীর কাহিনীটি ত্রিভুজ প্রেমের। রাজা লোর চন্দ্রাণীর রূপের কথা শুনে পত্নী ময়নাকে রাজ্যে রেখে চন্দ্রাণীর পিতৃরাজ্যে যান। সেখান থেকে চন্দ্রাণীকে নিয়ে তিনি পালিয়ে আসেন। চন্দ্রাণীর নপুংসক বীর বামন স্বামী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলে লোরের সঙ্গে যুদ্ধ হয় এবং বামন মারা যায়। এদিকে লোরের রাণী ময়নাকে ছাতনকুমার নামে এক ব্যক্তি প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এরপর লোর চন্দ্রাণীসহ তার নিজের রাজ্যে ফিরে এসে দুই রাণীকে নিয়ে সুখে রাজত্ব করেন।

দৌলত কাজীর 'সতীময়না'র অবশিষ্ট অংশটি রচনা করেন আলাওল। তাঁর পিতা ছিলেন ফরিদপুর জেলার ফতেহাবাদ পরগণার প্রশাসকের অমাত্য। পিতার সঙ্গে নৌকোয় যাওয়ার সময় পর্তুগীজ দস্যুরা তাঁর পিতাকে হত্যা করে তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি পালিয়ে এসে আরকান রাজার অশ্বারোহী সেনাদলে যোগ দেন। তাঁর আশ্রয়দাতা ও কাব্যরচনায় উৎসাহদাতা হলেন রোসাঙ্গ রাজ্যের মাগন ঠাকুর। 'লোর চন্দ্রাণী' শেষ করার পর তিনি সুফীসাধক মহম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবৎ' কাব্যের অনুবাদ করেন 'পদ্মাবতী' নাম দিয়ে। আলাওল জায়সীর মতো মরমী কবিচেতনার অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু তিনি তাঁর কাব্যে সমকালীন হিন্দু-মুসলমানের নানা রীতিনীতি এবং অভিজাত সামন্তজীবনের নানা প্রসঙ্গের বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন। কাব্যের সমাপ্তি অংশে তিনি যে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে অসাম্প্রদায়িক জীবনচেতনায় আস্থাশীল আলাওলের পরিচয় পাওয়া যায়। 'পদ্মাবতী'র কাহিনী চিতোররাজ

রত্নসেন ও আলাউদ্দিনের কাহিনী। পদ্মাবতীর পোষা শুকপাখির মুখ থেকে তার রূপের কথা শুনে রত্নসেন রানী নাগমতীকে ফেলে পদ্মাবতীকে পাওয়ার জন্য তার পিতৃরাজ্য সিংহলে যাত্রা করেন। নানা বাধা-বিঘ্ন উত্তীর্ণ হয়ে পদ্মাবতীকে নিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে তাকে পাওয়ার জন্য কৌশলে রত্নসেনকে বন্দী করেন; রত্নসেনের বীর সেনানী গোরা-বাদল তাঁকে মুক্ত করে আনেন। আলাউদ্দিন দীর্ঘকাল চিতোর অবরোধ না করতে পেরেও ফিরে যান। এদিকে রত্নসেনের অনুপস্থিতিতে নাগমতীকে প্রলুব্ধ করেছিল রাজা দেবপাল। তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে রত্নসেন আহত হয়ে ফিরে আসেন এবং কিছুদিনের মধ্যে মারা যান। রানী নাগমতী ও পদ্মাবতী অনুমৃতা হন। রত্নসেনের দুই পুত্রকে অভয় দিয়ে আলাউদ্দিন তাদের পিতৃরাজ্যেই অধিষ্ঠিত করেন।

'পদ্মাবতী' ছাড়াও আলাওল 'সরফুলমুলুক বদিউজ্জমাল', 'সপ্তপয়কর' ইত্যাদি রোমান্টিক প্রণয় কাহিনী রচনা করেন। এই সময় মর্দন বা মর্দান নামে রোসাঙ্গেরই আর এক কবি 'নুরুদ্দিন বাখান' একটি কাব্য রচনা করেন।

আরাকান-রোসাঙ্গের বাইরে আরও কিছু কবি আগে থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ রোমান্টিক প্রণয়মূলক আখ্যানকে অবলম্বন করে তাঁদের কাব্য রচনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট কবি হলেন 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জমাল'-রচয়িতা দোনা গাজী চৌধুরী। এছাড়া আরও কয়েকজন কবি হলেন আবদুল হাকিম, নওয়াজিস খান, মঙ্গলচাঁদ, সৈয়দ মহম্মদ আকবর, মহম্মদ মুকিম, শেখ সাদী প্রভৃতি। রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান ছাড়াও কিছু কিছু ইসলামী শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ যে হয়েছিল তার নিদর্শনও পাওয়া যায়। আশরাফ-এর 'কিফায়তুল মুসলেমিন', মুজাম্মিলের 'নীতিশাস্ত্রবার্তা', কাজী বদিউদ্দিনের 'সিফৎ-ই-ইমান' প্রভৃতি রচনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

৮

১৮শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে সৃষ্টি হয়েছিল শাক্ত পদাবলী। ১৮শ শতাব্দী বাংলা দেশের সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসে যুগসন্ধির লগ্ন। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ঔরংজীবের মৃত্যুর পর মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান, রাজপুত ও শিখদের বিদ্রোহ প্রভৃতির ফলে মোগল সাম্রাজ্যের পতন হয়। এই অরাজক অবস্থায় বণিক ইংরাজরা তাদের স্বার্থসিদ্ধি করতে গিয়ে পুরনো জমিদারদের এবং দেশের সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। সাধারণ মানুষদের উপর জমিদারের শোষণও অত্যন্ত বেড়ে যায়।

এই অবস্থায় বৈষ্ণবভক্তি ভাবুকতার প্লাবন ধীরে ধীরে মন্দবেগ হয়; তার পরিবর্তে শক্তি উপাসনার বিস্তার ঘটে। একদিকে রচিত হয় দুর্গামঙ্গল, কালিকামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য। সেইসঙ্গে শক্তিদেবতা কালিকার কাছে আশ্রয় ও শরণাগতির আকুল প্রার্থনা রূপ পেল শাক্ত পদাবলীতে। দেবীকে পরম শক্তিময়ী ভেবেই তাঁর কাছে যেন আশ্বাস পেতে চায় সাধারণ মানুষ।

মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহপ্রথা ও সপত্নীপ্রথার পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে। ১৮শ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশে এক কুলীনবধূর আক্ষেপ পরবর্তীকালে রচিত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকেরই আগমনী যেন। তেমনি বৃদ্ধ বরের সঙ্গে বালিকা কন্যার বিবাহের নিদারুণ ঘটনায় রক্তাক্ত জননীহৃদয়ের ছবিও হরপার্বতীর বিবাহ ঘটনায় বিম্বিত হবার সুযোগ ছিল। যুগের অনুকূল পরিবেশের এই সুযোগ নিয়ে গড়ে উঠেছে শাক্ত পদাবলীর আগমনী-বিজয়ার গান।

শাক্তপদাবলীর শক্তিমান কবিরা হলেন রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নরচন্দ্র প্রভৃতি। এঁদের পদ রচনার সময় মোটামুটিভাবে ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়সীমাতে ইংরেজ বণিকদের স্বার্থপর লোভের ফলেই দেশের পুরনো জমিদারেরা তাঁদের স্বাধীন অধিকার থেকে বিচ্যুত হন। গড়ে ওঠে ইংরেজের রাজস্বসংগ্রহকারী, ইংরেজের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কে লিপ্ত হৃদয়হীন ব্যবসায়ী শ্রেণী। এই নতুন উচ্চবিত্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরনো জমিদারদের মতো কোনো মূল্যবোধ ছিল না। যে কোনো প্রকারে সাধারণ মানুষকে পীড়ন করে কর আদায় করাই ছিল এদের লক্ষ্য। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে পর্যুদস্ত মানুষের উপর এদের অত্যাচার যুক্ত হয়ে জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতে সেই নিরুপায় সমাজমনের শরণাগতি একান্ত আন্তরিকতায় রূপ পেয়েছে।

রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন ১৭২০ খ্রীস্টাব্দে, হালিশহরে। তাঁর আগমনী বিজয়া এবং ভক্তের আকুতি প্রভৃতি সমস্ত পর্যায়ের পদই মর্মগ্রাহী। আগমনী-বিজয়ার কন্যাবিরহাতুরা জননী মেনকার বেদনাকে কবি ১৮শ শতাব্দীতে কৌলীন্য প্রথার চাপে জর্জরিত মাতৃহৃদয়ের সাধারণ বেদনা করে তুলতে পেরেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে জননী যশোদার পুত্রবিচ্ছেদ কিন্তু এমনভাবে নিষ্ঠুর সমাজশাসনের বিপরীতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে নি। অন্যদিকে জীবন সম্পর্কে কবির উপলব্ধি জননীর প্রতি সন্তানের আকুতি ও অভিযোগের ভঙ্গিতে উচ্চারিত—'ও মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে / কথায় করে ছলো, / মিঠার লোভে তেতো মুখে সারাদিনটা গেল।'

রামপ্রসাদের পরই এই পর্যায়ের বিশেষ শক্তিমান কবি হলেন কমলাকান্ত। তাঁর পদে জননী ও সন্তানের আন্তরিক সম্পর্ক এবং ভক্তির নিবিড় মাধুর্য একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে। সুপ্রযুক্ত অলংকারের ব্যবহার তাঁর কাব্যের সৌন্দর্য বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর একটি বিখ্যাত পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি হলো— 'মজিল মনভ্রমরা শ্যামাপদনীলকমলে।' কমলাকান্ত আনুমানিক ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানের কালনায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্ধমানের মহারাজা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

১৮শ শতাব্দীর এই জনপ্রিয় শাক্ত পদাবলীর ধারা আসলে পূর্ববর্তী মঙ্গল-কাব্য ধারার হরপার্বতী কাহিনীরই পরিবর্তিত লিরিক রূপ। এইসময় বাংলাদেশের সমাজজীবনে যে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছিল, সাহিত্যক্ষেত্রে সেই পরিবর্তন আঙ্গিক ও আবেদনের মাত্রাকেও পরিবর্তিত করেছে।

এই পরিবর্তনের সূত্রেই একালের গড়ে ওঠা কবির লড়াই, বিদ্যাসুন্দরের গান অশ্লীল খেউড় ও তর্জা হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠা অমার্জিত বাবুসম্প্রদায়ের রস-পিপাসা চরিতার্থ করেছে। আর অন্যদিকে গড়ে উঠেছে সুরুচিপূর্ণ সাহিত্য। বিভিন্ন কবির শাক্তপদাবলীতে, কৃষ্ণযাত্রায়, সরস পাঁচালীতে এবং বাউলগানে ঘটেছে সেই মার্জিত রুচির প্রকাশ।

৯

মধ্যযুগের লোকায়ত সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন হলো বাউল গীতি। তুর্কী আক্রমণের পর বাংলাদেশে কেবলমাত্র মুসলমান শাসকগোষ্ঠীরই আগমন ঘটে নি, সেই সঙ্গে এসেছে সুফী-আউল-বাউল সম্প্রদায়ের লোক। এরা একতারা বা গুপীযন্ত্র নিয়ে গান শোনাত ও ভিক্ষে নিত। আর এদের এই গানে কোনো বিশেষ ধর্ম সম্পর্কে গোঁড়ামি ছিল না। এদের মত হলো—মনের মধ্যেই মনের মানুষ আছেন, সাধনার দ্বারা তাঁকে সেখান থেকে খুঁজে নিতে হয়।

'বাউল' শব্দটি সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দ থেকে এসেছে। হিন্দীতে শব্দটি হলো 'বাউরা'। এর অর্থ 'বায়ুরোগগ্রস্ত' বা 'উন্মাদ'। অন্যদিকে সুফীরা সাধু ফকির ধার্মিক মানুষকে বলেন 'আউলিয়া'। এই 'আউলিয়া' শব্দটি থেকে উদ্ভূত 'আউল' শব্দটি 'বাউল' শব্দটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। এই বাউলরা মানুষে মানুষে জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে হিন্দু মুসল-মান খ্রীস্টানের ভেদ মিথ্যে।

এই বাউলদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন লালন ফকির। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের জমিদারিতে থাকার সময় বাউল সাধক লালন ফকিরের

লেখা গানের একটি খাতা সংগ্রহ করেন। এই গানগুলির মধ্যে অসাম্প্রদায়িক সার্বজনীন মানবপ্রীতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা কবিকে মুগ্ধ করেছিল, প্রভাবিতও করেছিল। এই ধরনের একটি সুপরিচিত গান হলো—'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়।/ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম পাখীর পায়।' লালন ফকিরের গানে জাতি ধর্ম ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বারবার শোনা গেছে—'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে। / লালন কয় জেতের কিরূপ দেখলেম না এ জগতে।।' গগন হরকরার একটি গানও রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় ছিল—'আমি কোথায় পাবো তারে। / আমার মনের মানুষ যেরে।। / হারিয়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে। / দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।।' এখনও পর্যন্ত বাংলায় বাউল গান জনপ্রিয় হয়ে আছে, এবং বিভিন্ন জায়গায় আউল বাউলের সমাবেশও হয়ে থাকে। যেমন—কেন্দুলীতে পৌষ সংক্রান্তির জয়দেব মেলায়, কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় এবং শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায়।

মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির সহাবস্থানের ছবি যেমন আমরা পাই, তেমনি হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক সংশ্লেষের পরিচয়ও পাওয়া যায় সত্যনারায়ণ-পাঁচালীর ধারায়। এই সত্য-নারায়ণের রূপ কল্পিত হয়েছে এইভাবে—'অর্ধেক মাথায় কালা: একভাগে চূড়া টানা / বনমালা ছিলিমিলি তাতে।/ ধবল অর্ধেক কায়: অর্ধনীল মেঘ প্রায় / কোরান পুরাণ দুই হাতে।।' সত্যনারায়ণের পাঁচালী বহু কবি রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন ভারতচন্দ্র, শঙ্কর আচার্য, শেখ ফয়জুল্লাহ্, তারিফ্ মাহ্মুদ, ফকির গরীব উল্লাহ্, ভৈরব ঘটক, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর চক্রবর্তী, আরিফ্ প্রভৃতি। আরিফের সত্যপীর পাঁচালীর নাম 'লালমোনের কিস্সা'।

১৮শ শতাব্দীতে একদিকে যেমন ধর্মভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংশ্লেষ চলছিল এবং তার প্রতিফলন ঘটছিল সাহিত্যে. অন্যদিকে মানুষ তেমনি ক্রমশ ইহমুখী হয়ে উঠছিল যুগের প্রভাবে এবং এরই ফলে রচিত হয়েছিল 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' বা 'ভাস্কর পরাভবে'র মতো কাব্য। এই ১৮শ শতাব্দীতেই আমরা দেখেছি ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের কাঠামোতেই ইতিহাসের কাহিনীকে স্থাপন করেছেন। এই কাব্যেও সেই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা করা যায়। সমকালীন বর্গী অত্যাচারের জীবন্ত ছবি এই কাব্যে এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে, মনে হয়, কবি হয়তো বর্গীদের নারীধর্ষণ, হত্যা এবং অগ্নিদগ্ধ ঘর বাড়ি গ্রাম নগর নিজের চোখেই দেখেছেন—'তবে মাঠে লুটিয়া বর্গী সাঁধাএ। বড় বড় ঘরে আইস্যা আগুন বাগাএ।। / কাহুকে বাঁধে বর্গী দিরা পিঠ মোড়া। / চিৎ কইর‍্যা মারে লাথি পায়ে জুতা চড়া।। /...গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া যত। তামা-

পিতল লৈয়া কাসারি পলাএ কত ॥ / ভাল মানুষের স্ত্রীলোক যত হাঁটে নাই পথে। / বর্গীর পলানে পটারি লইল মাথে ॥' গঙ্গারাম মধ্যযুগীয় দেবনির্ভর সাহিত্যের প্রভাবকে পুরোপুরি বাদ দিতে পারেন নি এ কথা ঠিক, কিন্তু তাঁর কাব্য মধ্যযুগের গতানুগতিক কাব্য হয় নি। বরং 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'-কে আমরা দেশের সমকালীন রাজনীতির আংশিক ইতিহাস, অমানবিক অত্যাচারের বীভৎস চিত্র, তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ এবং মূল্যবান দলিল বলে গ্রহণ করতে পারি।

১৮শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সমকালীন অবক্ষয়ের পটভূমিতে মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার বেশকে বজায় রেখে একটি সাহিত্যধারা গড়ে উঠেছিল যার নাম দেওয়া হয়েছে দোভাষী সাহিত্য। এই দোভাষী সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্রণ বেশ ভালোভাবে লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও গড়ে উঠেছিল বন্দর-নগরে কবিগান, তর্জা, টপ্পা প্রভৃতি মানুষের তাৎক্ষণিক আমোদের স্থূল উপকরণ। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'কিন্তু ইংরাজের নতুন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি এবং সেই হঠাৎ রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যের রস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল? তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিকসম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।'

এই কবিগান, টপ্পা, তর্জার বিষয়ও ছিল ধর্ম এবং শাস্ত্রসম্পৃক্ত : কিন্তু আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র এগুলির মধ্যে ছিল না।

এইভাবেই ধীরে ধীরে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ধর্মনির্ভর রাষ্ট্র ও সমাজের আওতায় গড়ে ওঠা সাহিত্য ইংরেজ বণিকের বিষয়-নির্ভর সভ্যতার পটভূমিতে আধ্যাত্মিকতাকে অবজ্ঞা করে আধুনিক যুগে পা রাখে। তার সঙ্গে পাশ্চাত্যশিক্ষা যুক্ত হয়ে বাংলা সাহিত্যে নিত্যনতুন উপসর্গ ফুটে উঠতে থাকে। নগর ও নগরমুখীন মানুষই হয়ে উঠতে থাকে বাংলা সাহিত্যের একমাত্র ধারক ও বাহক। মধ্যযুগের অবসানেই শেষ হয়ে যায় গ্রাম-নগরের মিলিত সমগ্র বাঙালীর সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস।

তথ্যনির্দেশ

১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। 'হাজার বছরের পুরাণ বৌদ্ধগান ও দোহা', ১৯১৬।
২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত)। 'শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ', কলিকাতা।
৩. পীযুষকান্তি মহাপাত্র (সম্পাদিত)। 'ঘনরামের ধর্মমঙ্গল', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২।
৪. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। 'কালিকামঙ্গল', কলিকাতা, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।
৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত)। 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৪৩।
৬. অমরেন্দ্রনাথ রায়। 'শাক্তপদাবলী', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৭. দীনেশচন্দ্র সেন। 'মৈমনসিংহ গীতিকা', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৮. রসরঞ্জন সেনগুপ্ত। 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী', ১৩২২ (অন্য সংস্করণ : যাদবেশ্বর তর্করত্ন, ১৯১৪)।
৯. বিমানবিহারী মজুমদার। 'চণ্ডীদাসের পদাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
১০. সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত)। 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', ভারবি।
১১. রজনীকান্ত চক্রবর্তী। 'অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ', ১৯১৩।
১২. চিত্রা দেব (সম্পাদিত)। 'বিষ্ণুপরী রামায়ণ', কলিকাতা।
১৩. কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জগদ্‌রামের রামায়ণ'।
১৪. নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত)। 'বিনয়পণ্ডিতের মহাভারত', ১৩১২।
১৫. দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পাদিত)। 'শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধ পর্ব', ১৩১২।
১৬. সুকুমার সেন (সম্পাদিত)। 'বিপ্রদাসের মনসাবিজয়', কলিকাতা, ১৯৫৩।
১৭. প্যারীমোহন দাসগুপ্ত (সম্পাদিত)। 'বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ', কলিকাতা, ১৯৩০।
১৮. বৃন্দাবন দাস। 'চৈতন্যভাগবত', বসুমতী সংস্করণ।
১৯. সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত)। 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্য-চরিতামৃত', কলিকাতা।
২০. নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথ (সম্পাদিত)। 'জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল,' ১৯৫২।
২১. লোচনদাস। 'চৈতন্যমঙ্গল', বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ সংস্করণ।
২২. দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পাদিত)। 'গোবিন্দদাসের কড়চা', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৬।
২৩. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত)। 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ সংস্করণ।
২৪. সতীশচন্দ্র রায়। 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
২৫. সুকুমার সেন (সম্পাদিত)। 'মুকুন্দ চক্রবর্তী : চণ্ডীমঙ্গল', সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৭৫।
২৬. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত)। 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২।
২৭. অনিলবরণ গাঙ্গুলী। 'রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল', ১৯৬৯।
২৮. অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পাদিত)। 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল'।
২৯. সুকুমার সেন (সম্পাদিত)। 'বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল', এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা।
৩০. দ্বারকনাথ চক্রবর্তী ও রামনাথ চক্রবর্তী (সম্পাদিত)। 'বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ', ১৩১৮।

৩১. আশুতোষ দাস ও সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত)। 'জগজ্জীবন ঘোষাল বিরচিত মনসামঙ্গল', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০।
৩২. অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পাদিত)। 'ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল'।
৩৩. অক্ষয়কুমার কয়াল (সম্পাদিত)। 'রূপরামের ধর্মমঙ্গল'।
৩৪. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত)। 'রামদাস আদক রচিত অনাদিমঙ্গল', ১৯৩৮।
৩৫. রামকৃষ্ণ রায়। 'শিবায়ন', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
৩৬. পঞ্চানন চক্রবর্তী (সম্পাদিত)। 'রামেশ্বর রচনাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৭১।
৩৭. কাশীরাম দাস। 'মহাভারত', দেব সাহিত্য কুটীর সংস্করণ।
৩৮. বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (সম্পাদিত)। 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', ১৯১০।
৩৯. মাধবাচার্য্য। 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল', বঙ্গবাসী, দ্বিতীয় সং, ১৩০৩।
৪০. ঈশানচন্দ্র বসু (সম্পাদিত)। 'দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল', বঙ্গবাসী, দ্বিতীয় সং, ১৩১৭।
৪১. সনাতন বিদ্যাবাগীশ (অনূদিত)। 'ভাগবত', বিশ্বভারতী।
৪২. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (সম্পাদিত)। 'শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের শ্রীকৃষ্ণবিলাস', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
৪৩. তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত)। 'কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণমঙ্গল', ১৯২৬।
৪৪. দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত)। 'কবিশেখরের গোপালবিজয়', বিশ্বভারতী।
৪৫. নলিনীনাথ দাশগুপ্ত (সম্পাদিত)। 'পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭।
৪৬. অমিতাভ চৌধুরী (সম্পাদিত)। 'পরশুরাম রায়ের মাধবসঙ্গীত', বিশ্বভারতী, ১৯৬৪।
৪৭. সতীশচন্দ্র রায় (সম্পাদিত)। 'ভবানন্দের হরিবংশ', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২।
৪৮. নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী। 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', বৃন্দাবন।
৪৯. মযহারুল ইসলাম ও মুহম্মদ আবদুল হাফিজ (সম্পাদিত)। 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী'।
৫০ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত)। 'আলাওল বিরচিত পদ্মাবতী', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫।
৫১. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত)। 'সয়ফুলমুলক্ বদিউজ্জামাল, দোনাগাজী', ১৯৭৫।
৫২. হরিপদ চক্রবর্তী (সম্পাদিত)। 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী', ১৯৬২।
৫৩. 'সাহিত্য প্রকাশিকা' (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড), বিশ্বভারতী।
৫৪. সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী। 'দ্য অরিজিন এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অফ দা বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ', কলিকাতা, ১৯৮৫।
৫৫. সুকুমার সেন। 'ভাষার ইতিবৃত্ত', কলিকাতা।
৫৬. সুকুমার সেন। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ ও অপরার্ধ), কলিকাতা।
৫৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড) কলিকাতা।
৫৮. আহমদ শরীফ। 'বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য' ঢাকা।
৫৯. আহমদ শরীফ। 'বাংলা সূফীসাহিত্য', ঢাকা, ১৯৬৯।

মধ্যযুগের বাংলার চিত্রকলা

রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়

'পট পড়িয়া বলে কেহ নগরে নগর।'[১] এই যে ভ্রাম্যমাণ শিল্পীদের বর্ণনা করেছেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, তাঁদের উত্তরাধিকারীরা কিন্তু এখনও বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুরের গ্রামে গান গেয়ে পট দেখিয়ে বেড়ান। দেবদেবী বিষয়ক পটের পাশাপাশি তাঁরা আধুনিক ঘটনাকে বিষয় করে একই আঙ্গিকে ছবি আঁকেন। যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেকার কোনো পটচিত্রের নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নি, তবু সাহিত্যের সাক্ষ্যে অনুমেয় যে বাংলা চিত্রকলার একটি বহমান ধারা এই শিল্পরীতিতে বর্তমান। এর পাশেই লক্ষণীয় মার্গী শিল্প-ধারার কিছু বিচ্ছিন্ন সূত্র।

এই বিচ্ছিন্নতার মূলে কারণ নিহিত আছে উৎপাদনের সামাজিক ব্যবস্থায়। শাসকশ্রেণী যে সামাজিক উদ্বৃত্ত নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় তার কিছুটা ব্যয় হয় শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায়। তাদের আনুকূল্যে যে-শিল্প গড়ে ওঠে তা স্বাভাবিকভাবেই বহন করে তাদের মতাদর্শ। এইভাবে শাসকশ্রেণীর অনুমোদনের ফলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায়ে এক-একটি শিল্পরীতি প্রাধান্য পায় ও সেই সময়কার মার্গী শিল্প বলে অভিহিত হয়।

অবশ্যই অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও শিল্পের অগ্রগতি একটি সরলরেখায় যুক্ত নয়। প্রতিটি শিল্পধারার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় আঙ্গিকের বিশ্লেষণে, যেমন চিত্রকলার ক্ষেত্রে রং, রেখা ও চিত্রভূমির বিভাজন প্রকাশ করে শিল্পীর সৃজনশীলতা যা শুধুমাত্র পৃষ্ঠপোষকের চাহিদা বা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না। অথচ এটাও ঠিক যে একটি শিল্পধারার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষকের শ্রেণী-সম্পর্ক, মতাদর্শগত লেনদেন ও মূল উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে সেই শিল্প উৎপাদনের যোগাযোগের আলোচনাও খুবই প্রয়োজনীয়। ফলে আলোচ্য শিল্পধারার আঙ্গিকের বিবর্তনকে সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলেই কিন্তু আমরা সেই শিল্পের আলোচনার একটি ঐতিহাসিক কাঠামো রচনা করতে পারি।

১. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী', কলিকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৮।

সাধারণত উচ্চকোটির শিল্পধারা ও সাধারণের শিল্পের পার্থক্য আঙ্গিকের মাধ্যমে সূচিত হয়, দুটি শ্রেণীর যে মতাদর্শগত বিরোধ তা প্রতিফলিত হয় শিল্পরীতিতে। অবশ্য এই সহজ সিদ্ধান্ত তখনই সম্ভব যখন নিম্নবর্গের শিল্পধারা উচ্চবর্গের শিল্পধারা থেকে স্পষ্টতই পৃথক। মাঝে মাঝে কিন্তু উচ্চকোটির শিল্প-আঙ্গিকের প্রাধান্যর ফলে নিম্নবর্গীয় শিল্প-আঙ্গিক এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে, তাকে আর নিজস্ব পরিচয়বহ চিত্ররীতির দ্বারা চিহ্নিত করা যায় না। আবার রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের সময় অনেক ক্ষেত্রেই বিজেতারা বর্জন করে পরাজিত জাতির শিল্প। তখন নির্বাসিত শিল্পীরা তাদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন নিজস্ব শিল্প-আঙ্গিককে আশ্রয় করে। এক্ষেত্রে শিল্প-আঙ্গিকই হয়ে দাঁড়ায় মতাদর্শগত লড়াই-এর একটি ক্ষেত্র।

সুলতানী শাসনের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন দরবারী শিল্প বাংলাদেশে গড়ে ওঠে। মধ্য-এশিয়া থেকে আগত শাসকগোষ্ঠী তাঁদের নিজস্ব শিল্প বলে চিহ্নিত করেন পারসিক চিত্রকলাকে। এর সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের কিছু মিশ্রণ ঘটলেও তা সীমিত থাকে অল্পসংখ্যক অভিজাতদের মধ্যে। অন্য দিকে দেশজ শিল্পধারা ধর্মীয় তাগিদে হিন্দু অভিজাত ও সাধারণের মধ্যে মতাদর্শগত সেতু রচনা করে, ফলে দরবারের বাইরে এক গতিশীল শিল্প-আঙ্গিক সৃষ্টি হয় যার মূল তাৎপর্য নির্ভর করে তার ধারাবাহিকতায়।

১

ঐতিহাসিকদের মতে গুপ্তযুগের মার্গী সংস্কৃতির সর্বভারতীয় প্রভাব সপ্তম শতাব্দীর শেষ থেকেই কমে যায়। একই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কিছু আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য।[২] এই যে রূপান্তর এর মধ্যেই ঐতিহাসিকরা লক্ষ্য করেন মধ্যযুগের সূচনা।

বাংলাদেশের মার্গী চিত্রকলার প্রাচীনতম নিদর্শন হলো পুঁথিচিত্র। হয়তো কোনো সময়ে এই অঞ্চলে ভিত্তিচিত্র-সংবলিত মন্দির বা বিহার ছিল কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের অভাবে সে-সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। অন্যদিকে পালরাজাদের আমলের বিহারগুলি থেকে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের বেশ কিছু চিত্রিত পুঁথি পাওয়া গেছে। এগুলি থেকে শুধুমাত্র চিত্র-আঙ্গিকের বিবর্তন নয়,

২. নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', আদিপর্ব', কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৮৫-৮৬।

পুঁথিচিত্র উৎপাদনের সামাজিক ব্যবস্থারও ধারণা করা যায়। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচয়িতা লামা তারনাথের লেখা থেকে জানা যায় যে, ধীমান ও বীতপাল নামে দুই বরেন্দ্রবাসী শিল্পী ছিলেন যাঁরা ভাস্কর্যে, ধাতুমূর্তি গড়নে ও চিত্রকর্মে বিশেষ নিপুণতার পরিচয় দেন। এঁদের প্রবর্তিত শিল্পরীতি ধর্মপাল ও দেবপালের রাজ্যকালেই (আনুমানিক নবম শতকের আরম্ভে) পূর্ব-ভারতীয় শিল্পরীতি নামে মগধ ও তার পূর্বাঞ্চলে স্বীকৃত হয়। তারনাথের গ্রন্থে তথ্য ও কিংবদন্তীর এক সহজ মিশ্রণ ঘটায়, তা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। তা সত্ত্বেও লক্ষণীয় যে পালরাজাদের আমল থেকে পুঁথিচিত্র ও মন্দিরবিহারের ভাস্কর্যের মধ্যেও একটি বিশেষ শিল্পরীতিকে সনাক্ত করা যায়, যা পরে পালরাজাদের রাজ্যসীমানার বাইরে নেপালেও ছড়িয়ে পড়ে।[৩]

এইসব পুঁথির অধিকাংশই ছিল বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনুলিপি। বেশির ভাগেই পালরাজাদের নাম ও তারিখ পাওয়া যায়, যদিও কিছু পুঁথিতে সমসাময়িক অন্যদেশের রাজাদের নাম ও রাজ্যকালও পাওয়া গেছে। দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত ও চিত্রিত প্রায় চারশ পুঁথি ঐতিহাসিকরা লক্ষ্য করেছেন যার ভিত্তিতে তাঁরা অন্যান্য বহু চিত্রিত পুঁথিকে পূর্বভারতীয় চিত্ররীতির অন্তর্ভুক্ত বলে সনাক্ত করেন। খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতকের পরে রচিত তিনটি পুঁথি লক্ষ্য করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, মুসলমান আগমনের পরেও এই পূর্বভারতীর পুঁথিচিত্র রীতির চল ছিল।[৪]

পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কিছু বৌদ্ধ বিহার সমৃদ্ধিলাভ করে, যেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা পুণ্যলাভের আশায় এসে ভীড় করতেন। নালন্দা, বিক্রমশীলা ইত্যাদিতে প্রাপ্ত পুঁথিগুলি থেকে জানা যায় যে, গ্রন্থের অনুলিপি প্রস্তুতি একটি পুণ্যকর্ম বলে গণ্য হতো। ধর্মীয় নির্দেশ ছিল ধূপ দীপ পুষ্পমাল্য সহকারে গ্রন্থের অনুলিপিকে অর্চনা করা। বিহারগুলিতে ভিক্ষুদের অনুশীলনের একটি বিষয় ছিল বৌদ্ধ বজ্রযানী তান্ত্রিক দেবদেবীদের ছবি আঁকা (ফা হিয়েন এই ধরনের ছবি আঁকা অভ্যাস করেন তাম্রলিপ্তির বিহারে)।[৫] এছাড়া বিহারের বাইরে থেকেও চিত্রকরদের নিযুক্ত করা হতো বিহারে এসে পুঁথি চিত্রণের জন্য।

একাদশ থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত অধিকাংশ পুঁথিই তালপাতায়

৩. সরসীকুমার সরস্বতী, 'পালযুগের চিত্রকলা', কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ২৭।
৪. ঐ, পৃ. ৩৩-৩৬।
৫. নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ৮০২।

লেখা হতো। প্রায় সকল ছবিই ছিল মহাযান, বজ্রযান-ধর্মমত সম্মত দেবদেবীর প্রতিকৃতি। এছাড়া শৈব ধর্ম সম্পর্কিত বা অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ক পুঁথিগুলিতে বর্ণিত দেবদেবীর মূর্তিই উৎকীর্ণ থাকত। লক্ষণীয় যে, চিত্রগুলিতে চিত্রকররা ভাস্কর্যের বিন্যাস অনুসরণ করেছেন। মূল প্রতিমাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পার্শ্ব প্রতিমাগুলির চেয়ে আয়তনে বড় এবং প্রভামণ্ডলের পটে হয় দাঁড়িয়ে নয় বসা অবস্থায় চিত্রিত। যেখানে একক মূর্তি সেখানেও ছবির নকশা অনুচিত্রের দ্বিমাত্রিক ধারা ছাড়িয়ে ভাস্কর্যের মণ্ডনময় বৈশিষ্ট্য প্রতিকৃতি-চিত্রগুলিতে বর্তমান। যেখানে কাহিনীকে ফুটিয়ে তোলাই ছবির মূল লক্ষ্য সেখানে চিত্রভূমিকে অজন্তার ভিত্তিচিত্রের আদলে ভাগ করা হয়েছে। এইভাবে বাঙালী চিত্রকররা পুঁথির স্বল্পপরিসর পাতাতেও নিজেদের পূর্ব-অভ্যাস বজায় রাখেন।

পুঁথিচিত্রগুলিতে যে সব রঙ ব্যবহার করা হয় তা হলো—হরিতালের হলুদ, খড়ি মাটির সাদা, গাঢ়নীল, প্রদীপের শীষের কালো, সিঁদুরে লাল এবং সবুজ। প্রয়োজনমতো ভিন্ন রঙের পাশাপাশি অবস্থান যেমন আছে, তেমনি আছে একই রঙের গাঢ়তার তারতম্য। এছাড়া আছে সর্বোচ্চ স্তরে সাদা ও সর্বনিম্নে কালো রং যাতে আলোর আভাসে বস্তুর দ্রব্যগুণ পরিস্ফুট হয়।[৬]

এই মণ্ডনধর্মী চিত্রগুলির পাশাপাশি কিন্তু আর-এক ধরনের ছবি লক্ষ্য করা যায়, যেখানে রেখার প্রাধান্য ও তরল সমতল রঙের ব্যবহারে ছবিগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্বিমাত্রিক ভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে এই দুই রীতিরই নির্দেশ মেলে : বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে চিত্ররচনার সূত্রগুলিতে চিত্রের মণ্ডনধর্মীয় গুণকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বর্তনা ও তীক্ষ্ণ কোণযুক্ত রেখা-বহুল ভাবকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে বিভক্তক। প্রয়োগের পর শ্রীনীহাররঞ্জন রায় এই দুই রীতির ছবির সংজ্ঞাগত ভাগ করেছেন : ক্ল্যাসিকাল ও মধ্যযুগীয়।[৭]

প্রথম মহীপালের আমলে রচিত (৯৮৬ খ্রী) একটি চিত্রিত পুঁথিতেও এই দুই ধরনের চিত্ররীতিই বর্তমান। নেপালে প্রাপ্ত একটি 'ভ্রুকুটি তারা'র পুঁথিতেও এই ভিন্ন রীতির প্রতিঘাত লক্ষণীয়। যেখানে সুডোল মণ্ডনময় কিছু মূর্তির পাশেই উৎকীর্ণ রয়েছে তীক্ষ্ণ রেখাবহুল পদ্ধতিতে অঙ্কিত মূর্তি। এই দ্বিতীয় ধারার চিত্রগুলিকে কেউ নাম করেছেন অপভ্রংশ,[৮] কেউ আখ্যা

৬. জয়ন্ত চক্রবর্তী, 'ইন্ডিজিনাস ট্রাডিশন অব পেন্টিংস ইন বেঙ্গল', অপ্রকাশিত রচনা।
৭. ঐ।
৮. দেবপ্রসাদ ঘোষ, "ইস্টার্ন স্কুল অব মিডিয়েভাল ইন্ডিয়ান পেন্টিং", 'ছবি', গোল্ডেন জুবিলী ভল্যুম, নং ১, পৃ. ৯১।

দিয়েছেন মধ্যযুগীয়। যদিও অনেক সময় একই চিত্রে দুটি রীতিরই সহাবস্থান ঘটে, তবু পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশের চিত্রকলার ভঙ্গুর রেখা ও তীক্ষ্ণ কোণযুক্ত নক্‌শার প্রাধান্যই বিশেষভাবে লক্ষণীয়।[৯] যেমন আরায় প্রাপ্ত মৈথিলী বাংলা ভাষায় লেখা কালচক্রতন্ত্রর একটি পুঁথির চিত্রগুলিতে ও একই ভাষায় লেখা আনুমানিক ১৪৫৫-তে রচিত কর্ণাজবৃাহর একটি চিত্রিত পুথিতে। এখানে ছবির নক্‌শা মূলত দ্বিমাত্রিক হওয়ায় মনুষ্যদেহের প্রাকৃতিক আদল ও অন্যান্য বস্তুর দ্রব্যগুণ ফুটে ওঠে নি। পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর চিত্রেও, যেমন বিষ্ণুপুরে প্রাপ্ত একটি বিষ্ণুপুরাণের চিত্রিত পুঁথিতে ফুটে উঠেছে ভঙ্গুর রেখার বেষ্টনীতে একটি আলঙ্কারিক নক্‌শা। যেহেতু পশ্চিম-ভারতীয় পুঁথি-চিত্রে (বিশেষত জৈন গ্রন্থচিত্রগুলিতে) 'বিভক্তকে'র ভাবই প্রাধান্য পায়, তাই দ্বাদশ শতকের পরবর্তী কালের পূর্বভারতীয় পুঁথিচিত্রগুলিকেও তুলনামূলক পর্যালোচনায় শিল্প-ঐতিহাসিকরা মধ্যযুগীয় বলে চিহ্নিত করেছেন।

২

তালপাতার বদলে কাগজের ব্যবহার সূচিত করে বাংলার চিত্রকলার দ্বিতীয় পর্যায়। যদিও ঐতিহাসিকদের মতে কাগজের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় খ্রী ছয় শতক থেকেই, তবুও জানা যায় যে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত অধিকাংশ পুঁথিই লেখা হতো তালপাতায়। ১৪৯৯-এ রচিত একটি চিত্রিত বিষ্ণুপুরাণের পুথিতে দেখা যায় যে, কাগজের পাতাকে কেটে নেওয়া হয়েছে তালপাতার মাপে। এ থেকে ধারণা হয় যে, কাগজের চল বাড়লেও দেশীয় শিল্পীরা তার ব্যবহার করেছেন নিজেদের অভ্যস্ত প্রথায়।

চতুর্দশ শতকের মধ্যেই কাগজের চল এত বেড়ে যায় যে তা সাধারণের দৈনন্দিন ব্যবহারে গণ্য হয়। জানা যায় যে, দিল্লীর বাজারে ময়রা লিখিত কাগজের ঠোঙায় মুড়ে মিষ্টি বিক্রয় করছে।[১০] এছাড়া মুকুন্দরাম লেখেন যে গ্রামীণ মুসলমানদের মধ্যেও একটি বৃত্তিভোগী দল গড়ে উঠেছে যাদের নাম কাগচী, কারণ তারা কাগজ তৈরি করে—'কাগজ কুটিয়া নাম ধরায় কাগচী।'[১১]

ত্রয়োদশ শতক থেকেই সুলতানী শাসনের প্রতিষ্ঠার ফলে এক নতুন

৯. সরসীকুমার সরস্বতী, পৃ. ১৩৩-১৩৫।
১০. ইরফান হাবিব, "নন এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন এ্যান্ড আরবান ইকোনমি", কেম্ব্রিজ ইকোনমিক হিস্ট্রি', ভল্যুম ১, কেম্ব্রিজ, ১৯৮১, পৃ. ৮২।
১১. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, পৃ. ৬৮।

সাংস্কৃতিক নিয়মের চল সারা দেশেই লক্ষ্য করা যায়। মধ্য এশিয়া থেকে আগত এই নতুন শাসকগোষ্ঠী নিজেদের প্রয়োজনমতো নিয়ে আসেন পোশাক, অস্ত্র, আতর ও তার সঙ্গে পারসিক চিত্রকলার নিদর্শন। যদিও ইসলাম ধর্মে জীবন্ত প্রাণীর প্রতিকৃতি আঁকা ছিল বর্জনীয় অপরাধ, তবু চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে সমগ্র মধ্য-এশিয়ায় চিত্রকলার চর্চা লক্ষ্য করা যায় যার অন্যতম বিষয় ছিল মানুষের প্রতিকৃতি-চিত্র। পঞ্চদশ শতকে ইরানে যে উন্নত চিত্ররীতি গড়ে তার প্রধান প্রবক্তা বেহজাদের শিল্পকর্ম হয়ে দাঁড়ায় সমগ্র ইসলামীর শিল্পের আদর্শ।

প্রায় একই সময়ে ভারতবর্ষে সুলতানী কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একাধিক প্রায়-স্বাধীন সুলতানী রাজ্য গড়ে ওঠে। এদের রাজধানীগুলি হয়ে ওঠে মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্র। মণ্ডু জৌনপুর ও গৌড়ে এসে ভিড় করেন মধ্য-এশিয়ার বহু বিদ্বান ও শিল্পী। চৈনিক পরিব্রাজক মা হুয়ান লিখেছেন যে, এই সময় গৌড়ে বেশ কিছু দক্ষ শিল্পী কাজ করতেন।[১২] দুঃখের বিষয়, অন্যান্য তথ্যের অভাবে আজও তাঁরা অজ্ঞাত রয়ে গেছেন। যদিও নুসরৎ শাহের আমলে চিত্রিত 'সরফনামা'র পুঁথিতে উৎকীর্ণ আছে শিল্পীর ও পৃষ্ঠপোষকের নাম, তবুও সুলতানী আমলের শিল্পচর্চার বিশদ বিবরণ পাওয়া কঠিন।

সুলতানী চিত্ররীতির দুটি বিশিষ্ট উদাহরণ হলো মালওয়াতে প্রাপ্ত একটি পাকপ্রণালী—'নিমৎনামা'র চিত্রিত সংস্করণ ও সুলতান নাসিরউদ্দীন শাহ্ খলজীর জন্য তৈরি সাদির 'বুস্তান'-এর একটি চিত্রিত পুঁথি। এই দুটি পুঁথি-চিত্রে প্রাদেশিক পারসিক প্রভাবের ছাপ স্পষ্ট। এছাড়া মালওয়ারএকজন বিজ্ঞানীর লেখা 'অজেব-অস-সানাই' ও একজন মালওয়াবাসী মুসলমান সাহিত্যিকের লেখা শব্দকোষ 'মিফতা-উল-ফজলা'র চিত্রিত পুঁথি প্রমাণ করে যে, পারসিক চিত্ররীতিতে দক্ষ শিল্পীরা মালওয়ার দরবারেই এই চিত্রিত পুঁথিগুলির রচনা কারন।[১৩]

সুলতানী চিত্ররীতির সবচেয়ে বড় নিদর্শন হলো বাংলার সুলতান নুসরৎ শাহের জন্য গৌড়ে রচিত একটি 'সরফনামা'র চিত্রিত পুঁথি। তার প্রথম পৃষ্ঠায় নীল ও সোনালি রঙের নক্স লিপিতে উৎকীর্ণ আছে লিপিকারের নাম। আরবী ভাষায় তারপর লেখা হয়েছে সুলতানের প্রশস্তি : 'সুলতানের আদেশে লেখা

১২. এম. আর. তরফদার, 'হুসেন শাহী বেঙ্গল (১৪৯৪-১৫০৮) এ সোশিয়ো-পোলিটিকাল স্টাডি', ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ২৫৪-২৫৮।
১৩. জে. পি. লস্টী, 'দ্য আর্ট অব দ্য বুক ইন ইণ্ডিয়া', লণ্ডন, ১৯৮২, পৃ. ৪১-৪২।

হয়েছে এই গ্রন্থ, সেই সুলতান যিনি সর্বগুণের আধার, বহু উপাধি দ্বারা ভূষিত, যাঁর সৌভাগ্য বিতরণ করা হয় তাদের মধ্যে যারা তাঁর বাধ্য। সুলতানের সুলতান, পৃথিবী ও ধর্মের রক্ষক আবুল মুজাফর নুসরৎ শাহ্, সুলতান হুসেন শাহ্র পুত্র। ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য চিরকালের জন্য রক্ষা করুন। তাঁর বংশধররা চির আয়ুষ্মান্ হোক। এই প্রার্থনা লিপিবদ্ধ করছে মুহম্মদের পুত্র আহমদ যাঁর নাম হামিদ খান, সুলতানের দুর্বলতম বান্দা।' তারিখ হিজরা ৯৩৮ অর্থাৎ ১৫৩১-৩২। তারিখযুক্ত ও লিপি-কারের স্বাক্ষরবহ এই পুঁথিটি বাংলার সুলতানী চিত্রকলার সবচেয়ে নির্ভর-যোগ্য নিদর্শন।[১৪]

বাংলায় সুলতানী সংস্কৃতির সবচেয়ে সমৃদ্ধ অধ্যায় হলো হুসেন শাহী আমল। ১৪৯৩-য় তাঁর প্রভু হাবসী সুলতানের পতন ঘটিয়ে তিনি গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। একই সঙ্গে অরাজকতা দূর করে হিন্দু অভিজাতদের ডেকে এনে পূর্বতন মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সহাবস্থানের ব্যবস্থা করে তিনি তাঁর শাসন-ব্যবস্থাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করেন। শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে ফিরে আসে সাহিত্য ও শিল্প চর্চার প্রসার। হুসেন শাহ্র রাজত্বকালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে।[১৫] পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাঁকে ঘিরে যে কিংবদন্তী গড়ে ওঠে তাতে কখনও অনাথ বালক চাঁদপাড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের রাখাল, কখনও বা গৌড়ের অমাত্য সুবুদ্ধি রায়ের চাকর হিসাবে পরিচিত হুসেন শাহের আরব্য উত্তরাধিকার সম্পর্কে নানা প্রশ্ন আজও ঐতিহাসিকদের ব্যাপৃত রাখে। আঞ্চলিক সাহিত্যে তাঁর পরিচয় কিন্তু শিল্পরসিক ও সাহিত্যের বোদ্ধা হিসাবে—'শ্রীযুত হসন জগতভূষণ / সেও এহি রস জানে।' তাঁর পুত্র নুসরৎ খানের খ্যাতিও একই কারণে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সমকালীন 'মহাভারতে'র বাংলা পাঁচালীকার কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁকে স্মরণ করে লেখন—'নসরত খান / রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান।'[১৬] এই সময় গৌড় হয়ে উঠেছিল একদিকে ইসলামীর সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র, অন্যদিকে আঞ্চলিক সংস্কৃতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের উদ্যমে। শোনা যায় জৌনপুরের সার্কি সুলতান পঞ্চদশ শতকের শেষে সিকন্দর লোদির হাত থেকে

১৪. রবার্ট স্কেলটন, 'দ্য ইস্কন্দর নামা অব নুসরৎ শাহ ইন্ডিয়ান পেন্টিং', পি. ডি. কলনাগি এ্যান্ড কোং, লন্ডন, ১৯৭৮।

১৫. সুশীলা মণ্ডল, 'বঙ্গদেশের ইতিহাস', মধ্যযুগ: প্রথম পর্ব, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ২৮৯-৯০। বিপ্রদাস, 'মনসামঙ্গল', থেকে উদ্ধৃতি, পৃ. ২৯০।

১৬. ঐ, পৃ. ২৯১।

বাঁচবার জন্য গৌড়ে এসে আশ্রয় নেন, তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন বহু কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি। এইভাবে আদান-প্রদানের ফলে যে মিশ্র শিল্পরীতি গড়ে ওঠে ঐতিহাসিকরা এরই নামকরণ করেন—সুলতানী শিল্পরীতি। নুসরৎ শাহের 'সরফনামা'র চিত্রিত খণ্ডটি এই মিশ্র শিল্পরীতির একটি বড় নিদর্শন।

কবি নিজামি রচিত 'সিকন্দরনামা' হলো গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডারের বিজয়-গাথা। 'সরফনামা' তারই প্রথম খণ্ড। নক্স লিপির ব্যবহার ও প্রচুর পরিমাণে নীল ও সোনালি রঙের প্রয়োগ চিহ্নিত করে চিত্রিত পুঁথিটির পারসিক উৎস। পঞ্চদশ শতকে পারসিক চিত্রকলার ক্ল্যাসিকাল যুগ শুরু হয় যখন মূলত পারসিক কাব্যকে বিষয় করে শিল্পীরা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে রূপকথার কল্পলোক। যেহেতু আখ্যানের আভ্যন্তরীণ রূপকেই পুঁথিচিত্রগুলির দ্বারা দর্শকের সামনে উপস্থিত করাই ছিল শিল্পীদের প্রধান উদ্দেশ্য, তাই পারসিক চিত্রে নীল আকাশ, সোনালি আলো ও ফুলের বাগানে চিরসুন্দর যুবক ও যুবতী সবই আলঙ্কারিক নকশায় আবদ্ধ। এখানে বাস্তব ঘটনার কোনো আভাস নেই। আঙ্গিকের গতি দৃশ্যগ্রাহ্য অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন, স্থির এবং এর ফলেই কৃত্রিম।

নুসরৎ শাহের জন্য নির্মিত 'সরফনামা'র চিত্রিত খণ্ডটিতে কয়েকটি ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। এই চিত্রগুলিতে শিল্পীর উদ্ভাবনী ক্ষমতা উৎকীর্ণ মানুষের শারীরিক আদলে, স্থাপত্যের চিত্রণে, দৃশ্যগ্রাহ্য জগতের আভাস খোঁজে। লাল ইঁটের ব্যবহারে, ত্রিকোণ ছাদের বাঁকানো কার্নিসে, জীবজন্তু, বিশেষ করে ঘোড়ার চেহারায় ফুটে ওঠে ভারতীয় লক্ষণ। ঐতিহাসিকরা এই ছবিগুলিতে পারসিক চিত্রকলার একটি প্রাদেশিক রূপ লক্ষ্য করেন। তাঁদের কয়েকজনের মতে বাংলাদেশের নবাবদের ইচ্ছা অনুসারে, বাইরে থেকে শিল্পীদের আনিয়েই হোক, আর লাইব্রেরিতে রক্ষিত পারসিক চিত্রকলার নিদর্শনগুলি অনুধাবন করেই হোক, সুলতানের দরবারী শিল্পীরা বাংলাদেশে এক প্রাদেশিক চিত্ররীতি সৃষ্টি করেন যা মুঘল যুগ পর্যন্ত টিঁকে ছিল।[১৭] এই সিদ্ধান্ত কিন্তু পর্যাপ্ত উদাহরণের অভাবে কয়েকটি সমস্যার উদ্রেক করে। যেমন, অধুনা রাজ্য প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালার 'ফযহা নামা জামালি' ও ঢাকা মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি চিত্রিত পুঁথিতে পারসিক প্রভাব স্পষ্ট হলেও পারসিক প্রভাবে গঠিত সুলতানী চিত্রকলার উদাহরণ এতই বিক্ষিপ্ত যে তাকে

১৭. রবার্ট স্কেলটন, "মুর্শিদাবাদ পেন্টিং", মার্গ, ভল্যুম ১০, বম্বে, ১৯৫৬, পৃ. ১০-২১।

একটি স্পষ্ট আঞ্চলিক শিল্পশৈলী হিসাবে দাখিল করা শক্ত। এছাড়া সুলতানী আমলে চিত্র উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। অনুমান করা যায় যে, পারসিক দরবারী প্রথা অনুযায়ী অভিজাতরা নিজেদের গৃহ-সংলগ্ন চিত্র-কারখানায় ছবি প্রস্তুত করাতেন। পরে হয় গ্রন্থের মাঝে নয় আলাদা এলবামে এগুলি বাঁধাই করে রেখে দেওয়া হতো লাইব্রেরিতে। জানা যায় সুলতান নুসরৎ শাহের নিজস্ব লাইব্রেরি অবস্থিত ছিল ফৈজাবাদে। হয়তো সেখানে আরও চিত্রিত পুঁথি সংরক্ষিত ছিল যার হদিশ মেলে না। পশ্চিম-ভারতীয় জৈন পুঁথিচিত্রে পারসিক নীল রঙের ব্যবহার ও বিদেশী রাজার প্রতিকৃতিতে পারসিক আদল প্রমাণ করে যে, পশ্চিম-ভারতে এই শিল্প-রীতি প্রাক্-সুলতানী শিল্পকলার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাব কেন পূর্ব-ভারতীয় পুঁথিচিত্রণের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি তা জানতে গেলে আমাদের বাংলাদেশের চিত্র উৎপাদনের বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে। চিত্রকলা মূলত অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষণে গড়ে ওঠে। যে-অভিজাতরা সুলতানদের সঙ্গে মধ্য-এশিয়া থেকে এসেছিলেন তাঁদের উৎসাহেই অন্যান্য বিলাসদ্রব্যর মতোই চিত্র-নিদর্শন এসে পৌঁছায় ভারতবর্ষে। কিন্তু যে রাজস্বর উপর নির্ভর করে তাদের চাহিদা পূরণ হতো, সেই রাজস্ব কিন্তু আদায় করতে সুলতানী শাসকগোষ্ঠীকে নির্ভর করতে হতো হিন্দু জমিদারদের উপর। আবহমান কাল থেকে এইসব রাজা রাণা ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হিন্দু জমিদাররা ভূমিরাজস্ব ও তার বণ্টনের উপর নিজেদের স্বত্ব খাটিয়েছে। তার প্রক্রিয়া ছিল এক-এক জায়গায় এক-এক রকম; ধর্ম, বংশগত সংস্কার ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত নির্ধারিত করেছে এই হিন্দু ভূস্বামীদের অধিকার। এদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে শিল্প গড়ে ওঠে তাতে মুসলমান-পূর্ব যুগের শিল্পের প্রভাব খুব স্পষ্ট।

৩

পঞ্চদশ শতক থেকেই লুপ্ত দেশজ শিল্পধারা আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে হিন্দু পুঁথির পাটাচিত্রগুলিতে। বিষ্ণুপুরে প্রাপ্ত বিষ্ণুপুরাণের পাটা-চিত্রে দশা-বতারের যে মূর্তি উৎকীর্ণ আছে তার সঙ্গে তুলনীয় আরায় প্রাপ্ত 'করণ্ডব্যূহ' পুঁথির পাটা ও মেদিনীপুরের একটি গোষ্ঠলীলার পুঁথির চিত্রিত পাটা। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ শিল্প-ঐতিহাসিকদের বিচারে এই পাটাচিত্রগুলিকে প্রকাশ পায় মধ্যযুগীয় শিল্পের লক্ষণ। উল্লেখযোগ্য যে, এইসব চিত্রিত পাটার অঙ্কন পদ্ধতি (যা ওয়াশ নামে পরিচিত) তা শ্রীতারাপদ সাঁতরা প্রমুখ শিল্প-ঐতিহাসিকরা এখনও খুঁজে পান আধুনিক কালে গ্রামাঞ্চলের কিছু রথের

অলঙ্করণে। সমতল রঙের ব্যবহার ও দ্বিমাত্রিক নক্শাপ্রধান এই আলঙ্কারিক আঙ্গিক পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশের পুঁথিচিত্রে যে ধারাবাহিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে; তার মূল সূত্রটি নিহিত ছিল পুঁথিগুলির বিষয়বস্তুতে।[১৮]

ষোড়শ শতক থেকেই শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম সারা বাংলাকে ছেয়ে ফেলে। প্রতিষ্ঠানিকভাবে বৈষ্ণব সাধুদের আখড়ার পুঁথির অনুলিপি ও অর্চনা শুরু হয়। এই সব আশ্রমের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্থানীয় ভূস্বামী ও বণিক সম্প্রদায়। লক্ষণীয় যে পাটাচিত্রে ভক্ত বৈষ্ণবের রূপে অনেক সময় এইসব পৃষ্ঠপোষকদের প্রতিকৃতি-চিত্র উৎকীর্ণ থাকত। একদিকে যেমন সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষ, ডোম ও চণ্ডাল আশ্রয় পায় এই নতুন ধর্মের ছত্রচ্ছায়ায়, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উচ্চকোটির পৃষ্ঠপোষকরাও নিজেদের স্বার্থে একে গ্রহণ করে। শ্রীচৈতন্য গণ্য হন বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে। পুরীর রাজা ও বিষ্ণুপুরের সামন্ত প্রভু বীর হাম্বির চিহ্নিত হন বৈষ্ণবভক্ত হিসাবে। রাম ও কৃষ্ণ লীলায় মতোই শ্রীচৈতন্য লীলা বাঙালী শিল্পীর চিত্রের বিষয় হয়ে ওঠে। ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, একই অঙ্গে রাম ও শ্রীকৃষ্ণর চিহ্ন বহন করে নতুন রূপকল্পের মাধ্যমে দেবতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন শুধুমাত্র চিত্রকলায় নয়, ভাস্কর্যেরও মাধ্যমে।

এই সময় মূলত বিষ্ণুপুরে মল্ল রাজাদের উৎসাহে বহু মন্দির নির্মাণ করা হয়। পোড়া ইঁটের দ্বারা নির্মিত মন্দিরের মাধ্যমে যেমন আঞ্চলিক একটি স্থাপত্য রীতি গড়ে ওঠে, তেমনি কিন্তু তার অলঙ্করণের সময় ভাস্কর্যেরও প্রকাশ পায় একটি বিশেষ রীতি। শুধুমাত্র মনুষ্যমূর্তি নয়, তাদের পরিহিত পোশাক, ব্যবহৃত যানবাহন ও অস্ত্র, শিল্পরীতির এই বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করে তোলে। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে এই ভাস্কর্য ও চিত্ররীতি যেহেতু হিন্দু মূর্তিগুলির কিছু নতুন রূপকল্প গড়ে তোলায় ব্যাপৃত থাকে, ফলে চিত্রকলায় ও ভাস্কর্যে একটি সমতা আসে, যাকে বাংলার মধ্যযুগের শিল্প বলে সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে নবদ্বীপ, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া বৈষ্ণব পুথির অনুলিপি ও অলংকরণের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সব অঞ্চলগুলি থেকে সংগৃহীত পাটা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (বিষ্ণুপুর), গুরুসদয় দত্ত সংগ্রহশাখা (ঠাকুরপুকুর), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম, নবদ্বীপ পাবলিক লাইব্রেরি ও বহু ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার স্থান

১৮. তারাপদ সাঁতরা, "চিত্রিত পুথির পাটা", 'পট', নবপর্যায়, বর্ষ ১, সংখ্যা ৩।

পেয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন-তারিখ না উৎকীর্ণ থাকায় শুধুমাত্র আঙ্গিকের বিচারেই এদের কালক্রম নির্ধারণ করা হয়। আঙ্গিকের ধারাবাহিকতা আজও বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসগুলিতে ও কিছু কিছু ভিত্তিচিত্র, যেমন বহুড়র জমিদার বাড়ির দেওয়ালচিত্রে বর্তমান। এ থেকে অনুমান করা হয় যে, স্থানীয় সূত্রধর ও চিত্রকররা, যাঁরা আজও পট আঁকেন বা মন্দিরের অলঙ্করণ করেন, তাঁরাই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই চিত্ররীতিকে টিকিয়ে রেখেছিলেন।

এই সমস্ত পাটাচিত্রর মূল উপাদান হলো—কাঠের জমিতে খনিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে তৈরি করা রঙের ব্যবহার। হলুদ, লাল, সবুজ ও নীল রং বেলের আঠার সঙ্গে মিশিয়ে গাঢ় করা হয়। তারপর এই রঙ কাঠের পাটার গায়ে আটকে থাকে বহুদিন। এখনও এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন জড়ান পটের চিত্রকররা।[১৯]

লক্ষণীয় যে পাটা-চিত্রের আঙ্গিকে মোটামুটি দুটি ধারাই খুব স্পষ্ট। প্রথমটি হচ্ছে রাজস্থানী শৈলী, বিশেষ করে মেবার ও মালওয়া ঘরানার অন্তর্গত দ্বিতীয়টি অবশ্য ওড়িশার পুঁথিচিত্র রীতিকে স্মরণ করায়। বিষ্ণুপুরের সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহে এই দুটি ছাড়াও মিশ্র কয়েকটি রীতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথম শ্রেণীর পাটা-চিত্রে উজ্জ্বল এক রঙের প্রেক্ষাপটে সনপত্রগুচ্ছ দিয়ে সজ্জিত বৃক্ষ, স্পষ্ট রেখায় উৎকীর্ণ মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্তি, সর্বোপরি চিত্রভূমির সরল জ্যামিতিক বিভাজন সূচিত করে লোকচিত্রের আভাস। এই একই ধরনের সরল নক্শা ও উজ্জল রং মেবার ও মালওয়ার চিত্রাবলীতেও বর্তমান, এখানেও স্পষ্টতই লোকশিল্প প্রভাবিত করেছিল দরবারী রুচিকে। এছাড়াও বাংলার প্রথম শ্রেণীর পাটাচিত্রে, মেয়েদের পরিচ্ছদ, বিশেষ করে খাটো চোলি, বর্ণাঢ্য ঘাগরা ও স্বচ্ছ ওড়না রাজস্থানী চিত্রর কথা মনে করিয়ে দেয়। বহু ক্ষেত্রে নরনারীর মুখের ডোল ও ভঙ্গিও রাজস্থানী চিত্রের অনুরূপ। এথেকে ঐতিহাসিকদের এই ধারণা হয়েছে যে মুঘল শাসনকর্তা হিসাবে মানসিংহ যখন বাংলাদেশে আসেন তখন তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন রাজস্থানী কিছু শিল্পী। এছাড়া স্থানীয় গোষ্ঠী, যেমন জগৎ শেঠদের পরিবার, ও কিছু ভূস্বামীগণ দাবি করেন যে, তাঁদের পূর্বপুরুষরা রাজস্থান থেকে আসেন। মেদিনীপুর জেলার বীনপুর থানার রামগড় গ্রামের ভূস্বামীরা জানান যে তাঁদের পূর্বপুরুষরা গুজরাট থেকে এসে বৈষ্ণব সাধক প্রভু শ্যামানন্দর কাছে দীক্ষা নেন। তাদের উৎসাহে যে-চিত্ররীতি গড়ে ওঠে তাতে স্বাভাবিকভাবেই গুজরাটী/রাজস্থানী প্রভাব ধরা পড়ে।

১৯. ঐ।

প্রতিটি ক্ষেত্রে এই ধরনের স্পষ্ট কারণ দাখিল না করতে পারলেও অনুমান করা যায় যে, বৃন্দাবন থেকে বৈষ্ণব চিত্ররীতি বিষয়ের উপযোগিতার রাজস্থানী ও বাংলার চিত্রকলার উপর আঙ্গিকের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। এই প্রভাব যে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বর্তমান ছিল, তার প্রমাণ মেলে আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি চিত্রের উপর উৎকীর্ণ লিপিতে, মুর্শিদাবাদের শিল্পী এখানে নিজের আদি পুরুষের বাস লিখেছেন 'সাং জয়পুর'।

পাটাচিত্রের দ্বিতীয় ধরনের ওড়িশার পুঁথিচিত্রের প্রভাব অনস্বীকার্য। এই ছবিতে মানুষের মূর্তিগুলি স্ফীত ও ভারী ধাঁচের। প্রকৃতি চিত্রণ সংক্ষিপ্ত, এমনকি কয়েকটি সরলরেখার মাধ্যমে গাছ বা ফুল-পাতাকে একটি আলঙ্কারিক নকশার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্তিতেও বাস্তবতার আভাস কম। ভঙ্গুর রেখার ব্যবহারে শিল্পীরা সাধারণত ভাব প্রকাশেই ব্যস্ত, তাই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গর সংকীর্তনের উল্লাস মূলত রেখার সাবলীল টানেই মূর্ত হয়ে ওঠে।

বিষয়গুলি এক থাকলেও মাঝে মাঝে শিল্পীরা নিজস্ব রীতির দ্বারা চিত্রে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। নবদ্বীপ পাবলিক লাইব্রেরিতে রক্ষিত পাটা-চিত্রগুলি থেকে এই ধারণা স্পষ্ট হয়। ১১ নং স্কন্দপুরাণের পাটাচিত্রে নৃত্যরত রাখালদের হাতে-ধরা লাঠির ওঠা-পড়ার ভঙ্গিতে একটি সাবলীল গতি লক্ষণীয় যা তাদের লম্বা গড়ন ও পায়ের স্পন্দনেও প্রকাশ পায়। এখানে আলো-ছায়ার খেলার মাধ্যমে নয়, শুধুমাত্র রেখার টানেই ছবিতে নৃত্যের ছন্দ মূর্ত হয়ে ওঠে। এই লাইব্রেরিরই সংগ্রহে রক্ষিত একটি রাস পঞ্চাধ্যায়ের পুঁথির পাটায় আবার মেয়েদের রাজস্থানী পোশাক ও ছবির সরল জ্যামিতিক নকশা কয়েকটি বিশেষ রাজস্থানী শৈলীর কথা মনে করায়।

এইসব পাটাচিত্রগুলিকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে কয়েকটি বিশেষ 'মোটিফ'ই বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, গোপীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা ও শ্রীচৈতন্যর জীবনের বিশেষ কয়েকটি ঘটনা, যেমন তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ, সংকীর্তন, পুরীর রাজা ও বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বিরের সঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্যর সাক্ষাৎ এই ঘটনা চিত্রণেই পাটা-শিল্পীরা আবদ্ধ থাকেন। ব্রাহ্মণ্য দেবতার মাহাত্ম্য বিষয়ক পুঁথির পাটায় থাকে তাঁদের মূর্তিচিত্র। বিষয় বৈচিত্র্য না থাকায় পাটা-চিত্রগুলিতে একই রূপকল্পর পুনরাবৃত্তি ঘটে কিন্তু এর মধ্যেই নিহিত থাকে ধারাবাহিকতার সূত্র।

লক্ষণীয় যে, এই সময় বাংলাদেশে পৌরাণিক ধর্মমত ছাড়াও লৌকিক দেবতাদের পুজার চল বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সাধারণ মানুষ একদিকে তান্ত্রিকদের বাহ্যিক অনুষ্ঠানের ভয়াবহ রূপ, অন্যদিকে মুসলমান ধর্মের অনুপ্রবেশে ভীত

হয়ে বিভিন্ন লৌকিক দেবতার আরাধনায় সান্তনা খোঁজে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে ধর্মের এই শ্বাসরোধকারী অবস্থা থেকে বাঙালীরা কিছুদিনের জন্য মুক্তি পায় ও তার প্রকাশ ঘটে জীবনের প্রতিটি সৃজনশীল প্রকাশ-মাধ্যমে। সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য—সবই হয়ে দাঁড়ায় এই নতুন ধর্মের প্রভাবে অর্থবহ। বিষ্ণুপুরে প্রচলিত মদনমোহনের কিংবদন্তীগুলি প্রমাণ করে যে, মদনমোহনই হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বিষ্ণুপুরের আসল রাজা : মল্লরাজ ছিলেন শুধুমাত্র তাঁর প্রতিভূ। কিন্তু এই যুক্তিতেই বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা ও পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্রদেবের বংশধররা চেষ্টা করেন মুঘল রাজশক্তি ও তার সঙ্গে মুঘল দরবারী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশকে রোধ করতে।

৪

১৫৭৫ সালে মুনিম খাঁ, তুকারয়ের যুদ্ধে দাউদ করানীকে পরাজিত করেন। এইভাবে বাংলাদেশে মুঘলদের প্রথম পদার্পণ ঘটে। কিন্তু একদিকে ওড়িশা থেকে দাউদের ক্রমান্বয় আক্রমণ, অন্যদিকে বারো ভুঁইয়াদের প্রতিরোধ বাংলাদেশে মুঘলদের শাসনব্যবস্থাকে কায়েম করতে বাধা দেয়। ১৫৯৪ সালে মানসিংহের আগমনের ফলে বাংলায় মুঘল শাসনের শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয় ও তার সঙ্গে আসে শান্তি ও এক বৃহত্তর সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের সম্ভাবনা। বাংলা দেশে পাঁচ হাজার মুঘল সৈন্য জায়গীর লাভ করে, ও ১৬০৮ সাল নাগাদ বহু বাঙালী ভূস্বামী মুঘল বশ্যতা মেনে নেয়।[২০] এই বশ্যতা স্বীকারের একটি আনুষ্ঠানিক রূপ হলো দরবারে নজরানা পাঠানো ও মুঘল দরবার থেকে 'খেলাৎ' পাওয়া। এইভাবে হিন্দু ভূস্বামীরা মেনে নিতেন মুঘল দরবারী সংস্কৃতির প্রাধান্য। আপাতদৃষ্টিতে ষোড়শ শতকের বাংলা দেশের শিল্পে মুঘল দরবারী চিত্রকলার প্রভাব স্পষ্ট না হলেও লক্ষণীয় যে, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কিছু চিত্রকলায় তার প্রাদেশিক রূপ ধরা পড়ে। অবশ্য অষ্টাদশ শতকের আগে বাংলাদেশে মুঘল দরবারী শিল্পের প্রতিষ্ঠা কোনোভাবেই সম্ভব হয় নি, যদিও তার সঠিক কারণ নির্ধারণ করা কঠিন।

১৫৮০-র পর আকবরের নিমন্ত্রণে মুঘল রাজসভায় আসেন খ্রীস্টান পাদ্রীরা, তাঁরা সঙ্গে করে আনেন কিছু খ্রীস্টান ধর্মীয় চিত্র।[২১] বিস্মিত

২০. তপন রায়চৌধুরী, 'বেঙ্গল আন্ডার আকবর এ্যান্ড জাহাঙ্গীর', দিল্লী, ১৯৬৯, পৃ. ৫০।
২১. ফাদার পিয়ের ডু জারিফ (অনুবাদ : সি. এইচ. পেইন), 'আকবর এ্যান্ড দ্য জেসুইটস্', দিল্লী, ১৯৭৯।

আকবর এই চিত্রগুলিতে খুঁজে পান দৃশ্যগ্রাহ্য অভিজ্ঞতার এক নতুন প্রকাশ। তাঁর ইচ্ছায় মুঘল দরবারী শিল্পীরা শুরু করেন ইওরোপীয় চিত্রকলার অনুশীলন। ইওরোপীয় বণিকরা সহজলভ্য উপঢৌকন হিসাবে আনেন আরো অনেক চিত্র—যুদ্ধের দৃশ্য, নগ্ন নারীমূর্তি ও রাজাদের প্রতিকৃতি। সাগ্রহে তা মুঘল অভিজাতরা গ্রহণ করেন ও মুঘল শিল্পীরা এইগুলি থেকে সৃষ্টি করেন নতুন রূপকল্প। অবশ্য আঙ্গিকের পরীক্ষাই ছিল মুঘল শিল্পীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়। যেভাবে আলো-ছায়ার খেলায়, দৃশ্য জগতের ভ্রম সৃষ্টি করা হয় ইওরোপীয় ছবিতে সেটাই ছিল মুঘল শিল্পীদের কাছে প্রয়োজনীয় শিক্ষা। আর ছিল প্রতিকৃতি-রচনার মূল কৌশলগুলি আয়ত্ত করার চেষ্টা।

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি, বিশেষ করে জাহাঙ্গীরের উৎসাহে মুঘল শিল্পীর ইওরোপীয় চিত্রকলার মূল করণীয় দিকগুলি আয়ত্ত করেন, যদিও তার প্রয়োগ করা হয় নিজেদের প্রথাগত নিয়মে। আরও কঠিন উপায়ে জল রঙের মাধ্যমে মুঘল শিল্পীরা ফুটিয়ে তোলেন চিত্রিত বস্তুর দ্রব্যগুণ যা ইওরোপীয় শিল্পীরা করতেন তেলরঙের মাধ্যমে বৃহৎ ক্যানভাসে। প্রতিকৃতি-চিত্রের ক্ষেত্রেও অণুচিত্রের স্বল্পপরিসর জমির বাধা স্বীকার করেও, শুধুমাত্র মডেলের শারীরিক লক্ষণ নয়—তার ভাবও ফুটিয়ে তোলেন মুঘল শিল্পীরা। সংস্কৃতির বিস্তারের সময়, মুঘল রাজাদের এই প্রতিকৃতি-চিত্রগুলি বহন করে নিয়ে যায় মুঘল সম্রাটদের মতাদর্শ। শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই মুঘল শিল্প-আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে। বাংলাদেশে এই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। এর কারণ মুঘল সম্রাটরা বাংলাদেশকে গণ্য করতেন সাম্রাজ্যের সেই সব দুর্গম অংশের মতো, যেখান থেকে কর ও নজরানা পেলেই তাঁরা খুশি। এইভাবে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশ ছিল মুঘল-দের খাদ্য-ভাণ্ডার, যেখান থেকে খাবার আসত যুদ্ধরত সৈন্যদের জন্য, আর আসত বহুমূল্য বস্ত্র অভিজাতদের বিলাসিতা চরিতার্থ করার জন্য।[২২] ফলে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, এমনকি মুঘল শাসকশ্রেণীর মতাদর্শগত প্রভাব বিস্তারের কোনো বিশেষ প্রচেষ্টা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঘটে নি।

মুঘল দরবারী চিত্রকলার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে মুর্শিদাবাদে, মুর্শিদকুলি খাঁর সভায়। অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্য যখন ভেঙে পড়ছে তখন কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। এর মধ্যে অবধ, হায়দ্রাবাদ ও বাংলায় মুঘল

২২. তপন রায়চৌধুরী, পৃ. ৫০-৫২।

শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামোটি বজায় থাকে। দরবারের আদব-কায়দা ও মুঘল সাংস্কৃতিক কিছু নিয়মও এই রাজ্যগুলিতে সংরক্ষিত হয়।

১৭১৩ সালে মুর্শিদকুলি খাঁ একাধারে দেওয়ান ও সুবাদারের দুটি পদই গ্রহণ করেন। তাঁর নিজের শাসনকে কায়েম করার জন্য তিনি ঢাকা থেকে রাজধানী সরিয়ে আনেন মুর্শিদাবাদে। পুরনো মনসবদারদের তিনি ওড়িশায় পাঠিয়ে দেন ও রাজস্ব আদায়ের জন্য অনেকাংশেই নির্ভর করেন হিন্দু জমিদারদের উপর। দিল্লীতে নজরানা ও কর পাঠিয়েও যে উদ্‌বৃত্ত থাকত তা বন্টন করা হতো নবাবের অনুচরদের মধ্যে। ক্রমশ মুর্শিদাবাদ হয়ে ওঠে একটি ক্ষুদে দিল্লী। অভিজাতদের ভাষায় লক্ষ্য করা যায় দিল্লীর টান। বাংলাদেশের দরবারী সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে মুর্শিদাবাদ প্রতিষ্ঠা পায়।

মুর্শিদকুলি খাঁ সপ্তাহে দুদিন করে দরবার বসিয়ে বিচারকার্য চালাতেন। সেখানে পুরোমাত্রার বজায় থাকত মুঘল আদব-কায়দা। মনসবদারদের আদেশ করা হয় তাঁরা যেন পুরো দরবারী পোশাকে নবাবের সামনে আসেন, ও অন্যান্যদের জানানো হয় তাঁরা যেন সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী দরবারে স্থান করে নেন। পূর্ব-ভারতীয় বাণিজ্যের একটি বড়ো কেন্দ্র হিসাবে মুর্শিদাবাদের সমৃদ্ধি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। জৈন কবি নিহালের কাব্যে আছে, নানা পোশাকের, নানা বর্ণের মানুষের এখানে সমাগম হয়। ফলে স্বাভাবিক কারণেই এই শহরে এসে ভীড় করেন বহু দক্ষ কারিগর, বিদ্বান ও গুণী ব্যক্তিরা।[২৩]

বাংলার নবাবরা ছিলেন শিল্পের বড়ো পৃষ্ঠপোষক। মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে বিরাট মসজিদ ও প্রাসাদ নির্মাণ হয়। সেখানে ডেকে আনা হয় বিদ্বান ধার্মিক ব্যক্তিদের। শুধু কোরান পড়ার জন্যই নিযুক্ত করা হয় আড়াই হাজার মানুষ। রবি-উল-আউলের উৎসবে ভাগীরথীর তীরে আলোয় জ্বলে উঠত কোরানের বাণী। সেই চিরাগ জ্বালাবার জন্যই ছিল এক লাখ ভৃত্য। মুর্শিদকুলি খাঁর প্রতিকৃতি-চিত্রে দেখা যায়: প্রাসাদের বারান্দায় বসে আছেন নবাব, তাঁর স্থির মূর্তির পটভূমিকা রচনা করছে হাজার আলোয় উজ্জ্বল আকাশ, তারই আলোকিত প্রতিবিম্ব পড়ছে নদীর জলে। সমগ্র চিত্রে শুধু শিল্পীর দৃশ্য-গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা নয়, একটি প্রতীকী অনুষঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে যার দ্বারা মুর্শিদ-কুলির মর্যাদা দর্শকের মনে সম্ভ্রম জাগায়।[২৪]

মুর্শিদকুলির পরের নবাব সুজাউদ্দীন ছিলেন খুব শৌখিন ব্যক্তি। তিনি

২৩. গুলাম হুসেন সালিম, 'রিয়াজ-উস-সালাতিন', দিল্লী, পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ২৫৪-২৭৩।
২৪. স্টুয়ার্ট ক্যেরুলটন, পৃ. ১০-২১।

পুরনো প্রাসাদ ভেঙে নতুন প্রসাদ গড়েন, নতুন বাগান বসান। এখনও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, সেই বাগানে পরীরা নেমে আসত রাত্রে। এই সুন্দর নগরীতে আকৃষ্ট হয়ে আসতে লাগলেন কবি ও শিল্পীরা, নবাবের দরবারই হলো তাঁদের সবচেয়ে বড় আশ্রয়। আলিবর্দীর সভায় আসেন সেকালের বিখ্যাত পারসিক কবি শেখ মুহাম্মদ হুসেন ও হাজি বদরুদ্দীন। সমসাময়িক সাক্ষ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই নবাবদের মতাদর্শ। ইন্দো-পারসিক মিশ্র সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে নিজেদের ভাবমূর্তি তাঁরা তুলে ধরেন প্রজাদের সামনে।

এর জন্য কোনো সচেতন প্রচেষ্টা ছিল না। নবাবরা শুধু অনুকরণ করতেন মুঘল বাদশাহদের। তাঁদের মতে এটাই ছিল অবশ্যকরণীয়। শিল্পের পৃষ্ঠপোষকের আদর্শও তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন মুঘল বাদশাহর কাছ থেকে। এখানে বিলাসিতার দ্রব্য আহরণ করার সঙ্গে যোগ হয়েছিল জাঁকজমকের মারফৎ ক্ষমতার প্রদর্শনের ইচ্ছা। এছাড়া শিল্পীর পৃষ্ঠপোষণের মাধ্যমে ক্ষমতার যে বৈধকরণ হতো সে সম্পর্কেও নবাবরা অবহিত ছিলেন। এর ফলে মুর্শিদকুলি থেকে হুমায়ুন খাঁ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি নবাবের গৃহ-সংলগ্ন কারখানায় আশ্রয় পেতেন শিল্পীরা।

মুঘল চিত্র-ঐতিহ্য অনুযায়ী নবাবদের দৈনন্দিন জীবনকে ছবিতে ফুটিয়ে তোলাই ছিল শিল্পীর কাজ। যেহেতু ইসলাম ধর্মে চিত্রকলায় জীবন্ত কোনো প্রাণীর প্রতিকৃতি রচনা ছিল পাপ, তাই ধর্মীয় কোনো বিষয়কে শিল্পের আধার করা যায় নি। শুধু আলংকারিক নকশা ও ক্যালিগ্রাফি ছিল মুসলমান শিল্পীর কাজ। তাই মুঘল শিল্পীরা আকবরের আগ্রহে মুঘল বংশের ইতিহাস ও বাদশাহর জীবনকে করে তুলেছিলেন শিল্পের মূল আধার। প্রতিকৃতি-চিত্রগুলি ছিল রাজকীয় জীবনযাত্রার যে আখ্যান তার কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত। এইভাবে বাদশাহদের প্রতিকৃতি-চিত্রে দেখা যায় প্রতিদিনের কয়েকটি ঘটনা : তাঁরা শিকারে যাচ্ছেন, যুদ্ধ করছেন, বিরাট শোভাযাত্রার সম্মুখে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। এই দৃশ্যাবলী শেষ হয় দরবারে। দরবারে আসীন সম্রাট হলেন যে কোনো চিত্রের প্রধান মূর্তি। ত্রিতলে বিভক্ত চিত্রভূমির সবচেয়ে উপরে দর্শকের দৃষ্টির কেন্দ্রে বসে থাকেন সম্রাট। তার নিচের সারিবদ্ধ মানুষ, ছবিতে জায়গা পায় নিজেদের সামাজিক মর্যাদা অনুসারে।

মুর্শিদাবাদের দরবারী চিত্রকলায় দরবারে আসীন নবাবের চিত্র প্রায় নেই। আলিবর্দীর শিকার যাত্রার চিত্রে, উত্থিত হাতে বল্লম ধরা নবাব যে অসীম শক্তির অধিকারী তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দর্শক এই চিত্রেই খুঁজে পায় যুদ্ধের নেতা হিসাবে আলিবর্দীর বীরত্বের পরিচয়। এটা লক্ষণীয় যে, মুর্শিদাবাদের অধিকাংশ প্রতিকৃতি-চিত্রেই কিন্তু নবাবদের দেখা যায় অন্তরঙ্গ মুহূর্তে, প্রাসাদের

বারান্দায় আসীন, সামনে অল্পসংখ্যক পরিজন ও অনুচর। নবাব হয় ধূমপান-রত নয় আলাপে মগ্ন।

অবশ্য মুঘল দরবারী চিত্রর ধারা যে মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা আত্মস্থ করে-ছিলেন তার প্রমাণ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লে রক্ষিত নল-দময়ন্তীর চিত্রিত পুঁথি। এই পুঁথিটি লিখিত হয় নক্স লিপিতে। এবং এর উপর মুর্শিদাবাদ ঘরানার চিত্রগুলি এক-একটি পৃষ্ঠায় সংযোজিত হয়। অনুমান করা হয় যে, এক সময়ে এই পুঁথিটি মুঘল দরবারেই ছিল, পরে মুর্শিদাবাদে আসে ও সেখানে অলঙ্কৃত হয়। এই চিত্রগুলিতে একাধিক যুদ্ধের দৃশ্য আছে। সেখানে চিত্রভূমির বিভাজন, পার্সপেক্টিভের ব্যবহার, আলো-ছায়ার খেলার দৃশ্য জগতের ভ্রম সৃষ্টি করে। অপরদিকে অন্তঃপুর ও দরবারের দৃশ্যে মুঘল রীতি অনুযায়ী একটি ত্রিতল ভাগ সমগ্র ছবিকে বিশেষ নকশার মধ্যে বেঁধে ফেলে। উপর থেকে দেখার যে রীতি (সাধারণ দৃশ্যগ্রাহ্য অভিজ্ঞতাকে বর্জন করে) এখানে তা পুরো মাত্রায় বর্তমান। এখানে দরবারের দৃশ্যে দর্শকের দৃষ্টি প্রথমেই সিংহাসনে উপবিষ্ট ব্যক্তির উপর পড়বে, পরে ছবির মূল ভাগগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠলে বোধগম্য হবে কাহিনী চিত্রর অন্য কয়েকটি দিক। এখানে কাহিনীর চেয়ে একটি বিশেষ চিত্ররীতিই শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করেছে।

এই মুঘল চিত্ররীতির প্রকাশ ঘটেছে আরো একটি চিত্রিত পুঁথিতে। 'দস্তুর-ই-হিম্মত' নামে চিত্রিত পুঁথিটি এখন রক্ষিত আছে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে।[২৫] আওরঙ্গজেবের এক সেনাপতি হিম্মত খান-মির-ইশার জন্য রচিত এই কাব্য রচনা করেন মুহম্মদ মুরাদ। এই কাব্যের নায়ক কামরূপ, আবধের রাজপুত্র তাঁর স্বপ্নে-দেখা এক নায়িকার প্রেমে পড়েন। বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে কামরূপ সেই কন্যা কামলতাকে খুঁজে পান সিংহলে। সিংহলের রাজকন্যাও তাঁকে স্বপ্নে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এবার সেই নায়ককে তিনি বরণ করেন স্বয়ম্বর সভায়। এই চিত্রিত পুঁথির আঙ্গিক মূলত মুঘল রীতিকে অনুসরণ করে, এবং এখানে শিল্পী নিজের দৃশ্যগ্রাহ্য অভিজ্ঞতাকেই স্থান দেন চিত্রের রচনায়। নায়কের ভূমিকায় দেখা যায় যুবক নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে। সিরাজের সৌন্দর্য ও প্রেমকাহিনী তার জীবদ্দশাতেই প্রচলিত ছিল। শিল্পী এখানে তাকে নায়কের স্থানে বসিয়ে শুধু যে চিত্রে সমকালীন ইতিহাসের ছাপ রেখেছেন তাই নয়, নবাবের প্রতিকৃতি-চিত্রেও এনেছেন এক বিশেষ তাৎপর্য।

মুর্শিদাবাদ ঘরানার আরও কয়েকটি প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্রেও নায়ক হিসাবে

২৫. ঐ।

উপস্থিত করা হয়েছে সিরাজকে। যে রাজকীয় মর্যাদা নবাবকে ক্ষমতার কেন্দ্র বসিয়েছিল তার চিত্ররূপ হলো দরবারে আসীন রাজা। প্রেমিকের ভূমিকায় সেই চরিত্রেরই একটি বিস্তার ঘটে, দর্শকের মনে সে হয়ে ওঠে রূপ-কথার চরিত্র, এইভাবে বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণে যে ব্যক্তি প্রতিকৃতি-চিত্রের মাধ্যমে একটি পরিচিত চেহারায় সামনে এসে দাঁড়ায়, তাকে দর্শক আর সর্ব-সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা করে দেখে। তাই এই সব দরবারী চিত্র বিশেষ অনুষঙ্গের ফলে কখনোই বাস্তব মূর্তিকে রূপায়িত করে না। তাদের ছবির মডেল যতই পরিচিত হোক না কেন, হয়ে দাঁড়ায় একটি কল্পলোকের নায়ক।

মুর্শিদাবাদ দরবারী চিত্রর অন্তর্গত কয়েকটি রাগমালা পাওয়া যায়; তা এখন রক্ষিত আছে একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায়। বিভিন্ন রাগের ধ্যান হিসাবে চিত্রিত এই ছবিগুলিতে রূপকের মাধ্যমে বিশেষ সময় ও অনুভূতির সমাবেশ ঘটানোর প্রচেষ্টা হয়। রাজস্থানী চিত্রকলায় এই ছবিগুলি রাগমালা ও নায়ক-নায়িকাভেদ নামে পরিচিত। ভক্তিধর্মের প্রসারের ফলে, অধিকাংশ রাগমালা-চিত্রেই শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রেমলীলাকে রূপক হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এর ফলে মেঘরাগ হয়ে ওঠে নৃত্যরত শ্রীকৃষ্ণ, হিন্দোলে রাধা ও কৃষ্ণ দোলনায় দোলেন, বসন্তে রাধা ও কৃষ্ণর মিলন ঘটে কুঞ্জবনে। নায়ক-নায়িকার চিত্রগুলিতেও রাধা ও কৃষ্ণই মূল নায়িকা ও নায়ক হিসাবে চিত্রিত হন। এখানে লক্ষণীয় যে, কিছু চিত্রে যেমন নবাবকেই স্থান করে দেওয়া হয়েছে মূল নায়ক হিসাবে, এখানে তেমনি সমস্ত ছবির লৌকিক অনুষঙ্গ মুছে গেছে। রাধা-কৃষ্ণর প্রেমলীলার বর্ণনার চিত্রগুলি হয়ে উঠেছে ভক্তিধর্মের প্রকাশ।

রবার্ট স্কেলটন প্রমুখ শিল্পের-ঐতিহাসিকদের মতে এই শেষোক্ত চিত্রগুলিতে হিন্দু জমিদারদের রুচির প্রকাশই প্রাধান্য পায়।[২৬] এখানে মনে রাখতে হবে যে অষ্টাদশ শতকের হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির এমন এক মিশ্রণ ঘটে যে, হিন্দু জমিদারদের বহু বাহ্যিক আচার-ব্যবহারে পোশাকে মুসলমান দরবারের ছাপ পড়ে। অন্যদিকে নবাবরা গ্রহণ করেন হিন্দু অভিজাতদের সাহিত্য ও শিল্প। আকবরের দরবারে সংস্কৃত মহাকাব্য অনুবাদ ও অলংকরণের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হয় তা চলতে থাকে প্রাদেশিক মুঘল কেন্দ্রগুলিতেও। লখনউ ও হায়দ্রাবাদ থেকে যেসব শিল্পীরা মুর্শিদাবাদে এসে আশ্রয় নেন তাঁরা সবাই সহজে অভিজাতদের প্রতিকৃতি রচনা করেন প্রতিটি বাস্তব ঘটনার দিকে নজর রেখে। আবার একই সঙ্গে হিন্দু কাব্য ও রাগমালা-নায়িকাভেদের চিত্রে অভিজাতদের বাস্তব চেহারায়

২৬. ঐ।

আরোপ করেন নায়কোচিত গুণ। এর ফলে চিত্রে সৃষ্টি হয় এক অলৌকিক আবহাওয়া।

মিরকাশিমের একটি প্রতিকৃতি-চিত্রের পিছনে উৎকীর্ণ করা আছে কয়েকটি শব্দ: মুসাবির-ই-মজলিস্ মিরকাশিম খান, অর্থাৎ মিরকাশিম খানের সভাশ্রিত শিল্পী। এই লিপিটি যে সামাজিক সম্পর্ককে সূচিত করে তার অবসান ঘটে নবাবদের পরাজয়ের পরে। পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশ উপনিবেশ-বাদের যে প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা তা স্পষ্ট রূপ নেয় বক্সারের যুদ্ধের পর। যে নতুন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে পুরনো সামাজিক সম্পর্কগুলি ভেঙে পড়ে; সেই সঙ্গে ভেঙে পড়ে তার উপর নির্ভরশীল কিছু শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা। মুর্শিদাবাদের দরবারী শিল্পীরা কলকাতার বাজারে এসে ভীড় করেন, সাহেব-দের দরজায় দরজায় ছবি কাঁধে ফিরি করে বেড়ান। এবং ক্যামেরা আবিষ্কারের পর যখন এই দেশের স্মৃতিরক্ষার জন্য সস্তা স্মারকচিহ্ন হিসাবেও মুর্শিদাবাদের দরবারী শিল্পীর কাজের আর কোনো দাম থাকে না তখন তাঁরা মিলিয়ে যান বাংলাদেশের আরো বহু কারিগরের মত বিস্মৃতির অন্ধকারে।

উপনিবেশী শক্তির প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক রুচি বদলের যোগসূত্রগুলির বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মধ্যযুগের বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত একটি সাংস্কৃতিক সমন্বয় সম্ভব হয়েছিল যা লোকশিল্পকে ও দরবারী সংস্কৃতিকে একটি বিশেষ সূত্রে গেঁথে ফেলে। শিল্পের আঙ্গিকের পার্থক্য সত্ত্বেও বিষয়ের ও আখ্যানের কারণে দরবারী উচ্চকোটির শিল্পধারা মিশে যায় লোকশিল্পের আঙ্গিকে। এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখনই যখন ঔপনিবেশিকদের বিজাতীয় মাপকাঠিতে এই সমগ্র শিল্পসম্ভারই পর্যবসিত হয় নিম্নমানের পণ্যদ্রব্যে।

বাঙ্গালীর ধর্মীয় স্থাপত্য চর্চা (পঞ্চদশ-সপ্তদশ শতক)

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

পঞ্চদশ শতকে বাংলার ধর্মীয় স্থাপত্যে কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পরিবর্তনটা প্রথমে আরম্ভ হইয়াছিল মুসলমান-গণের ধর্মীয় স্থাপত্যে। পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার স্বাধীন সুলতান-গণের পৃষ্ঠপোষকতায় যে ধর্মীয় স্থাপত্য চর্চার সূত্রপাত হইয়াছিল তাহার সহিত পূর্ববর্তীকালের মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যের পার্থক্য আসন ও বহিরঙ্গের স্থাপত্যরূপ উভয়েই সমানভাবে পরিস্ফুট। ইতিপূর্বে বাংলার মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্য সম্পর্কে যাঁহারা আলোচনা-গবেষণা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এই পরিবর্তনের ধারা ও তাৎপর্য বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তবে ইঁহারা প্রধানত বলিতেছেন আকৃতির কথা : আসনের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনটা ঘটিয়াছিল সেটা তাঁহাদের দৃষ্টি বিশেষ আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

পঞ্চদশ শতকে বাংলার ধর্মীয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, প্রায় দুই শতাধিক বৎসর পর গাঙ্গেয় বাংলায় নূতন করিয়া মন্দির চর্চার সূত্রপাত। আজ পর্যন্ত যতটা জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় ত্রয়োদশ শতকের পরে গাঙ্গেয় বাংলায় মন্দির চর্চায় যেন একটা ছেদ পড়িয়া গিয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে পঞ্চদশ শতকে, বাংলার গাঙ্গেয় সমভূমিতে আবার মন্দির চর্চার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। মূলগত ভাব, সৌধের আসন ও গঠন পরিকল্পনা এবং রূপরচনার প্রশ্নে পঞ্চদশ শতক হইতে নির্মিত মন্দিরগুলি পূর্ববর্তী মন্দির গঠনের ধারা হইতে বহুলাংশে পৃথক। কিন্তু পঞ্চদশ শতকে বাংলার মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যে যে পরিবর্তিত ধারার সূত্রপাত হইয়াছিল তাহার সহিত এই নূতন মন্দির চর্চার ধারা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সূত্রে আবদ্ধ। উভয় ধারাই আবার বাংলার সর্বজনব্যবহৃত অতি সাধারণ চালা কুটীরের বৈশিষ্ট্য নিয়া সৃষ্ট।

তাই শুধু পরিবর্তন নয়, বিভিন্ন স্থাপত্য ধারার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রশ্নটিও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। ভঙ্গুর উপাদানে নির্মিত কুটীরের অনুকরণে স্থায়ী উপাদানে ধর্মীয় স্থাপত্যের চর্চা শুরু হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের পূর্বে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়েরই

সমন্নত ধর্মীয় স্থাপত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য ছিল। মুসলমানরা তো পশ্চিম এশিয়ার ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া বাংলায় ধর্মীয় স্থাপত্যের চর্চাও করিয়াছিলেন। হজরত পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা বা জাম-ই-মসজিদই তাহার প্রমাণ।[১] তত্রাচ পঞ্চদশ শতক হইতে বাংলায় তাঁহাদের ধর্মীয় স্থাপত্য আসনে ও বহিরঙ্গের আকৃতিতে অতি সাধারণ, বাঁশ, মাটি ও খড় দিয়া নির্মিত চালা কুটীরের বৈশিষ্ট্য লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। লক্ষণীয়, এই ঘটনাটি ঘটিল প্রত্যক্ষভাবে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায়।

ত্রয়োদশ শতক হইতে গাঙ্গেয় বাংলায় মন্দির চর্চা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, ইহা সম্ভব। কিন্তু বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যন্ত ভাগে, পুরুলিয়ায় এবং বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম অংশে ও বর্ধমান জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশে সুপ্রাচীন শিখর রীতির চর্চা অব্যাহত ছিল। গাঙ্গেয় বাংলাতেও শিখর রীতির কথা জানা ছিল বলিয়াই মনে হয়। পঞ্চদশ শতকে যখন নূতন করিয়া মন্দির চর্চা শুরু হইল তখনও কিন্তু নব উদ্ভাবিত রীতিগুলির পাশাপাশি শিখর মন্দির নির্মিত হইয়াছে। তবে প্রাচীন ঐতিহ্য অপেক্ষা নূতন রীতিগুলির প্রতি আকর্ষণটাই বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল, মনে হয়। শিখর রীতি হইতে নব উদ্ভাবিত রীতিগুলি অনেক বেশী জনপ্রিয়। লক্ষণীয়, এই নূতন রীতিগুলি বাংলার লৌকিক চালা কুটীরের প্রত্যক্ষ অনুকরণে অথবা তাহার কতকগুলি প্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়া পরিকল্পিত। আসন ও বহিরঙ্গের আকৃতি উভয় ক্ষেত্রেই এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। বস্তুতঃ, এই রীতিগুলির পরিকল্পনা লৌকিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। চালা কুটীরের সঙ্গে পঞ্চদশ শতক হইতে নির্মিত মন্দিরগুলির এই সম্পর্কই পঞ্চদশ শতকে উদ্ভাবিত মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যের পরিবর্তিত ধারার সহিত ইহাদের নৈকট্যের অন্যতম প্রধান কারণ।

এতক্ষণ যে কথাগুলি বলিলাম আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এগুলি একই সঙ্গে কৌতূহল ও বিস্ময়ের উদ্রেক করিতে পারে। ব্যবহারিক দিক দিয়া দেখিলে মুসলমানগণের মসজিদ ও হিন্দুদের মন্দিরের মধ্যে পার্থক্য বিপুল। মুসলমানগণের উপাসনা অনুষ্ঠিত হয় উপাসকমণ্ডলীর একত্র সমাবেশে। ইহার জন্য প্রয়োজন বিস্তৃতায়তন উপাসনাগার। হিন্দুদের উপাসনা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত

১. সিকন্দর শাহের উদ্যোগে নির্মিত এই মসজিদটি দামাস্কাসের খলিফা আল-ওয়ালিদের (খ্রী ৭০৫-৭১৩) বিখ্যাত মসজিদটির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সাদৃশ্যযুক্ত। আসনের বিন্যাসে ও মধ্যবর্তী প্রাঙ্গণকে ঘিরিয়া নিরবচ্ছিন্ন খিলানের সারিতেই আদিনা মসজিদে দামাস্কাসের প্রাচীন মসজিদটির প্রভাব বিশেষভাবে ধরা পড়িবে (দ্র. আহমদ হাসান দানী, 'মুসলিম আর্কিটেকচার ইন বেঙ্গল', ঢাকা, ১৯৬১, পৃ. ৫৭-৬০)।

অনুষ্ঠান। স্বল্পায়তন একটি কক্ষই ইহার পক্ষে পর্যাপ্ত। বহিরঙ্গের আকৃতির প্রশ্নে স্বাধীন সুলতানগণ মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যে যে রূপটি গ্রহণ করিলেন তাহার পরিকল্পনা শাসিত জনসাধারণের বাসগৃহের বৈশিষ্ট্য। হিন্দুদের নূতন মন্দির রীতির চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল প্রধানতঃ বিত্তবান ও শক্তিশালী ভূম্যধিকারিগণের পৃষ্ঠপোষকতায়। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত মন্দির চর্চার প্রধান পৃষ্ঠপোষক তাঁহারাই।

দেখা যাইতেছে, সমস্ত পর্যায়েই বিরাট পার্থক্য ও বিপুল ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও চালা কুটীর হইতে মুসলমানগণের ধর্মীয় স্থাপত্য ও হিন্দুদের ধর্মীয় স্থাপত্যের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। কোন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং কোন কোন কার্য-কারণের সম্পর্কের ফলে এই ধারাবাহিকতা গড়িয়া ওঠা সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছিল সেইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই পর্যালোচনার সময় সীমা নির্ধারিত হইয়াছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে। বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত মুসলিম স্থাপত্যের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত—হজরত পান্ডুয়ার একলাখী স্মৃতিসৌধ নির্মিত হইয়াছিল সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় পাদে।[২] ঘাটাল সহরের কোন্নগর পল্লীতে অবস্থিত সিংহবাহিনী মন্দির গাঙ্গেয় বাংলায় নব পর্যায়ের প্রাচীনতম নিদর্শন। দেওয়াল সংলগ্ন প্রতিষ্ঠা লিপির সাক্ষ্য অনুসারে মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে। বাংলার আঞ্চলিক মুসলিম স্থাপত্যরীতি ষোড়শ শতকের মধ্যেই পরিপূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী একশত বৎসরের মধ্যে এই স্থাপত্যরীতি বাংলাদেশ হইতে প্রায় মুছিয়া যায়। নবপর্যায়ের মন্দির চর্চার বিকাশ হইয়াছিল অনেক ধীর গতিতে। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নব পর্যায়ের মন্দির চর্চা সবদিক দিয়া পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে বলা যায়। অর্থাৎ পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতক এই দুই শতাব্দীর মধ্যে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের নবতর স্থাপত্যধারার উদ্ভব-বিকাশের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাইবে। বর্তমান আলোচনার সময় সীমা নির্ধারণের কারণ ইহাই।

১৩৫২ খৃষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ বর্তমান অবিভক্ত বাংলার অধিকাংশ ভূমিখণ্ড

২. সৌধটি জালাল-উদ্দীন মুহম্মদ শাহের (১৪১৫-১৪৩৩) সমাধি বলিয়া পরিচিত। জালাল-উদ্দিন নিজেই সমাধি-গৃহটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। জালাল-উদ্দীনের রাজত্বকাল সম্পর্কিত আলোচনার জন্য সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখিত 'বাংলা ইতিহাসের দুশো বছর: স্বাধীন সুলতানের আমল', দ্বিতীয় সং, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৬২ ও ৬৫ দ্রষ্টব্য।

একত্রিত করিয়া অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের সূত্রপাত করিলেন। তাঁহার পর সুলতানগণ প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া এই স্বাধীন রাজ্য ও রাষ্ট্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। বাংলার এই রাজনৈতিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দিক দিয়াই অর্থবহ তাহা নহে; সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অতীত ইতিহাসের একটি সুদীর্ঘ ধারার পরিণতি স্বরূপ। অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ভাগে ধর্মপালের সময় হইতেই বাংলার শক্তিশালী নৃপতিগণ এ দেশের রাজনৈতিক অখণ্ডতার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টা যে সামগ্রিক জীবন ও সংস্কৃতিধারা হইতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষামাত্র ছিল তাহা নহে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতক কি তাহার পূর্ববর্তী সময় হইতে বাংলায় যে আঞ্চলিক চেতনা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল অখণ্ড রাষ্ট্রচেতনা তাহারই যুক্তিসঙ্গত রাজনৈতিক রূপ। সপ্তম শতকে শশাঙ্কের কর্মকীর্তি ও তাঁহার বৃহত্তর গৌড়তন্ত্রের মধ্যে এই রাজনৈতিক অখণ্ডতার একটা আভাস ধরা পড়ে। পরবর্তীকালে পাল ও সেন রাজাদের সময়ে রাজনৈতিক অখণ্ডতা অর্জনের প্রচেষ্টা হইয়াছে বার বার। কিন্তু বিভেদকামী স্থানীয় আত্মকর্তৃত্বের আঘাতে সংহতির প্রয়াস বারবার ব্যাহত, বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে; অখণ্ড রাজ্য ও রাষ্ট্রের পরিকল্পনা কখনই স্থায়ীরূপ লাভ করিতে পারে নাই।[৩] প্রায় সমগ্র বাংলাকে একত্রিত করিয়া স্বাধীন সুলতানগণ যে সংহত রাজ্য ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহা বাংলার সুদীর্ঘকালব্যাপী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সফল পরিণতি। বাঙ্গালীর সূজ্যমান আঞ্চলিক চেতনা এইবার একটা সুসংহত ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় রূপের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিবার ও দৃঢ়ীভূত হইবার সুযোগ লাভ করিল।

স্বাধীন সুলতানগণের এই রাজ্য ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল দিল্লীর অধীনতা পাশ অগ্রাহ্য করিয়া। সম্রাট ফিরোজ শাহ নবজাত রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করিয়া দিবার আপ্রাণ চেষ্টাও করিয়াছিলেন। এই প্রাথমিক বিপত্তি ছাড়াও বাংলা রাষ্ট্রের শত্রুর অভাব ছিল না। বস্তুতঃ স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র তো প্রায় শত্রুভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া উঠিয়াছিল। পশ্চিমে জৌনপুর, দক্ষিণ-পশ্চিমে ওড়িশা এবং উত্তর-পূর্বে কামরূপ—এই সব রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলার সুলতানগণের যুদ্ধবিগ্রহ তো প্রায় লাগিয়াই ছিল।

৩. ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাঙালী জীবনের বিভিন্ন দিকে আঞ্চলিক চেতনার ক্রমবিকাশ এবং বাঙালীর স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তা অর্জনের প্রয়াস ও তাহার পরিণতি সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ-পাওয়া যাইবে নীহাররঞ্জন রায় রচিত 'বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব', কলিকাতা, ১৯৪৯, গ্রন্থে। পৃ. ৪৫৫-৫০০ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও সুলতানগণের ক্ষমতা নিরংকুশ ছিল না। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকর্তৃত্ব তাঁহাদের হাতে ছিল বটে, কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা ও অধিকার স্থানীয় ভূম্যাধিকারিগণের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া গিয়াছিল। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের নীচে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকর্তৃত্ব বিস্তার করিবার মত রাষ্ট্রযন্ত্র সুলতানগণ কখনই গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। ফলতঃ স্থানীয় কর্তৃত্বসম্পন্ন শক্তিশালী ভূম্যাধিকারিগণের উপর তাঁহাদের নির্ভর করিয়া থাকিতেই হইত।[৪] এইসব স্থানীয় ভূম্যাধিকারীগণের ক্ষমতাও কিছু নিরঙ্কুশ ছিল না। ইঁহারা নির্ভর করিতেন নিম্নতর পর্যায়ের ভূম্যাধিকারী, এমন কি গ্রামীণ সংস্থা ও তাহার নেতৃবৃন্দের উপর। সর্বোচ্চ পর্যায়ের কেন্দ্রীয় সুলতানী নেতৃত্ব হইতে নিম্নতম পর্যায়ের গ্রামীণ সংস্থা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরগুলি ছিল পরস্পরের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্ভরশীলতার সূত্রে জড়িত। স্বাধীন সুলতানী আমলের রাজনৈতিক প্রশাসনিক কাঠামোর ভিত্তি ইহাই।

উপরে যে কথাগুলি বলিলাম সেগুলি প্রমাণ করিবার মতো প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক তথ্য যে এখনই উপস্থাপিত করা যাইবে, এমন নয়। তবে তৎকালীন ইতিহাসের রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলির কথা চিন্তা করিলে এই রকম একটা কাঠামোই যেন যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কিছুটা পরবর্তীকালের সাহিত্যকর্মে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাও এই ধরনের কাঠামোরই ইঙ্গিত দিতেছে।[৫]

৪. স্বাধীন সুলতানী আমলের প্রশাসন সম্পর্কিত আলোচনা নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যাইবে: সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ এবং মমতাজুর রহমান তরফদার, 'হোসেন শাহী বেঙ্গল', ঢাকা, ১৯৬৫, তৃতীয় পরিচ্ছেদ। স্বাধীন সুলতানী প্রশাসন সম্পর্কে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন তথ্য বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'চৈতন্য ভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থেও পাওয়া যাইবে। এই তথ্যগুলি স্বাধীন সুলতানী আমলের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে স্থানীয় ভূস্বামিগণের স্থান ও অধিকার কি ছিল সে বিষয়ে আলোকপাত করে। স্থানীয় কর্তৃত্বসম্পন্ন শক্তিশালী ভূস্বামিগণ সম্পর্কে সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁহার উপর্যুক্ত গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন (দ্র. পৃ. ২৮-২৯, ১০৭, ১৬১ ও ৩৬৫)। দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহের আক্রমণ প্রতিরোধ করার সময় বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ইলিয়াস শাহকে (১৩৪২-১৩৫৭) নির্ভর করিতে হইয়াছিল স্বাধীন ভূস্বামিগণের সাহায্যের উপরে (দ্র. সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৮-২৯)। পরবর্তিকালে রাজা গণেশের উত্থানে স্থানীয় ভূস্বামিগণের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রমাণ মিলিবে।

৫. সম্প্রতিকালে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল', রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল', 'মাণিকচন্দ্রের গান', 'কায়স্থকুলকারিকা' 'সিংহবংশাবলী', প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে তথ্য

ক্ষমতা ও অধিকারের এই সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ যে বাংলার জনজীবনের সহিত যোগাযোগ সৃষ্টি করিয়া তাহার নিকটবর্তী হইবার চেষ্টা করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। তাঁহাদের অধিকাংশ তো বিদেশাগত। দেশীয় জনজীবন ও স্থানীয় পর্যায়ের ক্ষমতাধিকারীগণের সহিত যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য ভিন্ন শত্রুভূমি পরিবেষ্টিত রাজ্য, সীমিত ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্র এবং আভ্যন্তরীণ দ্বেষ, কলহ এবং ষড়যন্ত্রে আকীর্ণ সিংহাসন কোনটাই রক্ষা করা বোধ করি সম্ভব ছিল না।

বাঙ্গালীর আঞ্চলিক চেতনা এই সময়ে ক্রমশ সুস্পষ্ট আঞ্চলিক সত্তায় রূপান্তরিত হইতেছিল। রাজনৈতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন বাংলা সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে। ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে প্রায় সম্পূর্ণ কৃষি-নির্ভর অর্থনৈতিক জীবন। সুলতানী আমলে প্রায় সাতশত বৎসর পরে আবার বৈদেশিক বাণিজ্য ও বন্দরের কথা শুনা যাইতেছে বটে,[৬] কিন্তু সে বাণিজ্য ও বন্দরে বাঙ্গালীর আধিকার ও অধিপত্য বিশেষ কিছু ছিল কিনা সন্দেহ।[৭] বহির্বঙ্গের সহিত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এই সময় কমিয়া আসিয়াছে। জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে এই বিচ্ছিন্নতা বাঙ্গালীর জীবনকে সীমিত পরিসরের মধ্যে নিতান্তই অঞ্চলভিত্তিক করিয়া তুলিতেছিল। এই

আহরণ করিয়া রোনাল্ড ইন্ডেন যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর পরিচয় দিতেছেন তাহার ভিত্তি স্থানীয় ভূস্বামী হইতে স্থানীয় মণ্ডল পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (দ্র. 'দ্য হিন্দু চীফডম ইন মিডল বেঙ্গলী লিটারেচার', বেঙ্গলী লিটরেচার এ্যান্ড হিষ্ট্রি (মিমিওগ্রাফ), সম্পাদক ই. সি. ডিমক, জুনিয়ার, এসিয়ান স্টাডীস সেন্টার, মিচিগান ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭, পৃ. ২৩-৪২)। যে গ্রন্থগুলির নাম করা হইল তাহার সবগুলিরই রচনা মুঘল আমলে। কিন্তু যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর পরিচয় ইন্ডেন দিতেছেন তাহা যে সুলতানী আমলেও প্রচলিত ছিল এমন বিশ্বাস করিবার পথে কোন বাধা নাই।

৬. খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের পরেই বোধহয় তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতন শুরু হইয়া গিয়াছে। অষ্টম শতকে তাম্রলিপ্তের কথা শোনা যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা কেহ আর বলিতেছে না। ইহার পরে একবারে চতুর্দশ শতকে আবার বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যবন্দর হিসাবে সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামের নাম শুনিতেছি (দ্র. নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৯৮-৯৯ ও ৪৭২)।

৭. সপ্তগ্রামে ও চট্টগ্রামে আধিপত্য ও বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেন প্রধানতঃ আরব ও পারস্যদেশের বণিকরা, কিয়দংশে হয়ত আফ্রিকা হইতে আগত বণিকগণও (দ্র. নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৯৮ ; তপনকুমার রায়চৌধুরী, 'বেঙ্গল আন্ডার আকবর এ্যান্ড জাহাঙ্গীর', কলিকাতা, ১৯৫৩, পৃ. ১৯৯ ও সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৩৭, ৪০২ ও ৪৯৫)।

পরিবেশে বাঙ্গালীর আঞ্চলিক চেতনা যে ক্রমশ পরিপুষ্ট হইয়া দৃঢ়মূল আঞ্চলিক সত্তায় রূপান্তরিত এবং তাহার অস্তিত্বের সহিত একাত্ম হইয়া উঠিবে ইহাতে আর বিস্ময়ের কি !

বাংলার জনজীবনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের প্রশ্নে বাঙ্গালীর আঞ্চলিক সত্তা স্বাভাবিক কারণেই হইয়া উঠিল স্বাধীন সুলতানগণের প্রধান অবলম্বন। স্বাধীন সুলতানগণ যে বাংলার আঞ্চলিক সংস্কৃতির সক্রিয় পোষকতা করিতেন তাহা এই আঞ্চলিক সত্তার মাধ্যমে জনমনের সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার বাসনায়। যোগাযোগ প্রচেষ্টার আরও একটা দিক আছে। ইহার প্রকাশ হইয়াছিল সংস্কৃতি সমন্বয়ের চেষ্টার মধ্য দিয়া। পশ্চিম এশিয়া হইতে মুসলমানগণ যে সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করিয়া আনিয়াছিলেন রাষ্ট্রের উদ্যোগের ও পোষকতায় তাহার সহিত বাংলার আঞ্চলিক সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রণ শুরু হইয়া গেল। সুলতানী আমলে বাংলায় যে অভূতপূর্ব আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশ হইয়াছিল তাহার ইতিহাস রচনা করিবার সময় ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও প্রয়োজনের কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

সংস্কৃতি সমন্বয়ের প্রচেষ্টা কিন্তু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বাহিরেও চলিতেছিল। রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার ফলে বাংলার মুসলমানগণ ইসলামী ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফলে বাংলার জনজীবন ও সংস্কৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা তাঁহাদের পক্ষে ছিল অত্যাবশ্যক। এই যোগাযোগের সূত্রে বাঙ্গালীর আঞ্চলিক সত্তার প্রভাব তাঁহাদের উপর অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলার মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে যে পরিবর্তন আসিয়াছিল সে সম্ভবতঃ ইহারই ফল। মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির এই আঞ্চলিক পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বোধকরি মমতাজুর রহমান তরফদার বলিয়াছেন, সুলতানী আমলে বাংলার মুসলমান ধর্ম ছিল "A sort of folk Islam having hardly any connection with the dogmas of religion."[৮]

উপরে যে কথাগুলি বলিলাম তাহার অনেকটাই ঘটনা প্রবাহের গতি-প্রকৃতি হইতে অনুমান করিয়া নিয়া বলা। এইবার একটা সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিগ্রাহ্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়া কথাগুলির সারবত্তা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব। এই দৃষ্টান্তটা পঞ্চদশ শতক হইতে স্বাধীন সুলতানী প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় যে মুসলমান ধর্মীয় স্থাপত্যের উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছিল তাহা লইয়া।

স্বাধীন সুলতানদের নিজস্ব উদ্যোগে অথবা উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দের উদ্যোগে গঠিত এই সৌধগুলির নির্মাণকাল পঞ্চদশ শতক ও ষষ্ঠদশ [ষোড়শ]

৮. মমতাজুর রহমান তরফদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৬৪।

শতকের প্রথমার্ধ। স্থাপত্য বা শিল্পোৎকর্ষের প্রশ্নে এই সৌধগুলি যে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ তাহা নহে। তবে অতীতের স্থাপত্যচর্চার ধারা হইতে সরিয়া আসিয়া যে এই সৌধগুলির মাধ্যমে একটা পরিবর্তিত স্বতন্ত্র ধারার সূত্রপাত ও বিকাশ হইয়াছিল ইহাই এই সৌধগুলির গুরুত্বের প্রধান কারণ। হজরত পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত আদিনা বা জাম-ই-মসজিদের (খ্রীঃ ১৩৭৫) সুবিস্তৃত অঙ্গনের চারিপাশ ঘিরিয়া বিন্যস্ত বিপুলায়তন উপাসনা গৃহ।[৯] পার্সি ব্রাউনের মতে এই বিশালায়তন সৌধটি নবগঠিত স্বাধীন সুলতানীর পক্ষে "Symbolic of excessive ambition and self-exaltation"।[১০] এই ধরনের স্থাপত্য পরিকল্পনার দিন চলিয়া গিয়াছিল। সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন সুলতানগণের পৃষ্ঠপোষকতায় যে নূতন ধরনের স্থাপত্যের উদ্ভব হইল তাহাতে প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষারও কোন চিহ্নমাত্র রহিল না। পরিমিত আকারে বিধৃত এই নূতন ধারার স্থাপত্যের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিল বাংলার আঞ্চলিক জনজীবন ও সংস্কৃতির সহিত সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা।

সুলতানগণের এই প্রচেষ্টার পরিচয় সর্বাপেক্ষা বেশী করিয়া চোখে পড়িবে মসজিদগুলির মধ্যে। ভারতবর্ষের অন্যত্র রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যে সমস্ত মসজিদ নির্মিত হইরাছিল সেগুলি সাধারণতঃ মসজিদ পরিকল্পনার প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী বিভিন্ন অংশের সমবায়ে গঠিত বিস্তৃত সংস্থান। পঞ্চদশ শতক হইতে বাংলা রাজকীয় উদ্যোগে যে সমস্ত মসজিদ গঠিত হইতে লাগিল তাদের আকার পরিমিত।[১১] মসজিদ পরিকল্পনা হইতে ঐতিহ্যসম্মত মসজিদ-সংস্থানের

৯. আদিনা মসজিদের বাহিরের মাপ ৫০৭'×২৮৫'। ভিতরে মধ্যবর্তী অঙ্গনটির পরিমাপ ৪০০'×১৫০'। ইহাকে ঘিরিয়া ৮৮টি খিলানের সারি। ইহাই মসজিদটির অভ্যন্তরীণ মুখভাগ প্রাঙ্গণের চারিদিকে সংস্থিত পরস্পর সংযুক্ত আয়তাকার কক্ষগুলির ভিতরের আবরণ। কক্ষগুলির আচ্ছাদন রচিত হইয়াছে ভল্ট ও গম্বুজ দিয়া। ভল্টটি পশ্চিমদিকের কক্ষটির মধ্যবর্তী অংশের (৬৪'×৩৩') আচ্ছাদন। এই অংশটি ছাড়া সারিবদ্ধ স্তম্ভ দিয়া বিভক্ত বাকী সবটাই আচ্ছাদিত হইয়াছিল গম্বুজ দিয়া। গম্বুজের মোট সংখ্যা ৩০৬।

১০. পার্সি ব্রাউন, 'ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার' (ইসলামিক যুগ), বোম্বাই, ১৯৪২, পৃ. ৩৬।

১১. নূতন ধারায় নির্মিত মসজিদগুলির আয়তন সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করিবার জন্য কয়েকটি প্রতিনিধি স্থানীয় মসজিদের পরিমাপ দিতেছি:
তাতীপাড়া মসজিদ (গৌড়), ৯১'×৪৪'; লটন মসজিদ (গৌড়), ৭২'×৫১'; জানজান মিয়ার মসজিদ (সান্দলাপুর, মালদহ), ৫৬'×৪২'; মসজিদবাড়ীর মসজিদ (মসজিদবাড়ী, বরিশাল), ৪২',২"×৩৪',৯"; বাঘার মসজিদ (বাঘা রাজশাহী) ৭৫'৪"×৪২'৩"; মসজিদ আউলিয়া মসজিদ (পাথরাইল, ফরিদপুর), ৮৪'×৪১'৬"। মসজিদগুলির কোনটিরই উচ্চতা ৪০'-এর অধিক নয়।

কতকগুলি অত্যাবশ্যক অংশ যেমন, প্রশস্ত প্রবেশদ্বার সমন্বিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, প্রাচীর সংলগ্ন সারিবদ্ধ কক্ষশ্রেণী, সুউচ্চ মিনার বাদ দিয়া দেওয়া হইল। উপাসনাকক্ষের সম্মুখের দেওয়ালে বিশাল প্রবেশদ্বার ও সারিবদ্ধ খিলানের আবরণের সাক্ষাৎও এই মসজিদগুলিতে পাওয়া যাইবে না। এমন কি প্রক্ষালনের জন্য জলাশয় পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। বাংলার এই মসজিদগুলি শুধুমাত্র একটি উপাসনাকক্ষ লইয়া গঠিত। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত মসজিদের সামনে তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখন্ড লইয়া অনতিবিস্তৃত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ।

মসজিদগুলির আসন আয়তাকার—সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে প্রসারের অপেক্ষা বড়। দেওয়ালগুলি বাংলার চালা ঘরের অনুকরণে নীচু করিয়া গড়া এবং উপরের দিকে ধনুকের আকারে ঈষৎ বাঁকানো। ইহার উপরে চালার বক্ররেখার অনুকরণে গড়া একপ্রস্থ আলিসা। দেওয়ালের মাঝখানে খিলান দেওয়া প্রবেশদ্বার—সম্মুখে তিনটি বা পাঁচটি চূড়া সমন্বিত স্থূলাকার স্তম্ভ। নীচু করিয়া গড়া এই নিম্নাংশের উপর গম্বুজগুলি স্কন্ধবিহীন। গম্বুজের তলদেশ নিম্নাংশের সহিত সরাসরিভাবে যুক্ত।

বাংলার স্বাধীন সুলতানগণের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত মসজিদগুলির যে বর্ণনা দিলাম তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সন্দেহ নাই। তবে ইহাতেই বুঝা যাইবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আধিপত্য বা ইসলামের প্রবল গতিবেগ কিছুরই পরিচয় ইহাতে নাই। বাংলায় এইরূপ অনতিবিস্তৃত, সরল এবং লৌকিক চালা কুটীরের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যধারা উদ্ভবের কারণ সম্পর্কে পার্সি ব্রাউন ও আহমেদ হাসান দানীসহ অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। ব্রাউনের মতে বাংলার ভূ-প্রকৃতি ও দীর্ঘস্থায়ী প্রবল বর্ষার প্রভাবই ইহার কারণ। বৃষ্টি-বহুল বাংলার চারিদিকে ঢাকা উপাসনাকক্ষের প্রবর্তন যে স্বাভাবিক কারণেই করা হইয়াছিল ব্রাউনের এই অভিমত বিনা দ্বিধায় মানিয়া নেওয়া হয়। বৃষ্টি, বন্যা, এবং নরম পলিমাটির উপর নদ-নদীর নিয়ত ভাঙ্গা-গড়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভঙ্গুর উপাদানে নির্মিত ঢালু বাঁকান চালের কুটীর বাংলার স্বাভাবিক স্থাপত্য, তাঁহার এ কথাও পুরাপুরি সত্য, কিন্তু সর্বসাধারণের সদাব্যবহৃত স্থাপত্য-রূপটা কেন যে স্থায়ী উপাদানে রাজকীয় পোষকতায় নির্মিত স্থাপত্যের আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছিল সে কথা ব্রাউন ব্যাখ্যা করিয়া বলেন নাই।[১২] ব্রাউনের সব কথা পুরাপুরি সমর্থন করিয়া নিয়া দানী জলবায়ুর প্রভাবটা আরও একটু ব্যাপকভাবে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার মতে

১২. পার্সি ব্রাউন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৬-৩৭।

স্বাধীন সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় মসজিদ নির্মাণের ঐতিহ্যগত উপাদানগুলি অর্থাৎ সুউচ্চ প্রবেশদ্বার সমন্বিত প্রাচীর, বিস্তৃত অঙ্গন, মিনার, জলাশয় ও খিলানের আবরণ বাদ দিয়া যে শুধুমাত্র এককক্ষবিশিষ্ট উপাসনাগার নির্মাণ করা হইয়াছিল তাহারও কারণ বাংলার বর্ষণ বাহুল্য। তবে বর্ষণ বাহুল্য কেন এবং কিভাবে যে বিস্তৃত সংস্থান রচনা করিবার পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে দানী তাহা বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করেন নাই।[১৩] ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর প্রভাব যে স্থাপত্যের উপর থাকিবে ইহা তো স্বাভাবিক। তাই সে প্রশ্নে ব্রাউন বা দানীর সঙ্গে একমত হইতে বাধা নাই। কিছু [? কিন্তু] বাঁশ, মাটি ও খড়ে তৈরী সর্বসাধারণের ব্যবহৃত চালা কুটীরের বৈশিষ্ট্য রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইট ও পাথরে নির্মিত স্থায়ী ধর্মীয় সৌধে কোন সূত্রে এবং কি কারণে পরম আগ্রহের সহিত গৃহীত হইয়াছিল সে সব কথা ব্রাউন ও দানীর আলোচনায় অনুক্ত থাকিয়া গিয়াছে।

পলিমাটি বহুল বাংলায় স্থায়ী সৌধ নির্মাণের একমাত্র উপাদান ইট। অনেকের ধারণা নির্মাণ-উপকরণ হিসাবে ইটের সীমাবদ্ধতার ফলে ইট দিয়া বিশাল, বিস্তৃত সৌধ নির্মাণ করা দুষ্কর এই কারণে বাংলার সৌধগুলি সংক্ষিপ্তায়তন করিয়া গড়া হইত।[১৪] স্থাপত্যের উপাদান সংক্রান্ত এই যুক্তিগুলির দুর্বলতা সহজেই চোখে পড়ে। মুসলমানগণ পশ্চিম এশিয়া হইতে প্রকৃত খিলান নির্মাণ করিবার কৌশল এবং গাঁথুনিতে চুন সুরকীর মশলা ব্যবহার করিবার প্রথা বাংলায় লইয়া আসিয়াছিলেন। এগুলির সাহায্যে যে ইট দিয়া বিপুল বিস্তার সুউচ্চ সৌধ নির্মিত হইতে পারে তাহার প্রমাণ তো ইরাণের নবম হইতে চতুর্দশ শতকীয় মসজিদগুলিতেই মিলিবে। গুজরাটেও ইট দিয়া বিরাটাকার মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল, বাংলাতেও এইরূপ নির্মাণকার্যের দৃষ্টান্ত আছে। হজরত পাণ্ডুয়ার সুবিশাল আদিনা মসজিদটি তো প্রধানতঃ ইটেই গঠিত। আর মুসলমানগণের আগমনের বহুপূর্বে ইট দিয়া পাহাড়পুর, মহাস্থান ও ময়নামতীতে বিপুলায়তন সৌধ নির্মিত হইয়াছিল।[১৫] বাংলার মত

১৩. আহম্মদ হাসান দানী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২২ ও ৭৬-৮৩।

১৪. অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঁকুড়ার পুরাকীর্তি', কলিকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১৩-১৪।

১৫. প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে পাহাড়পুরে ভারতবর্ষের বৃহত্তম বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৭৭টি কক্ষদ্বারা পরিবেষ্টিত বিহার প্রাঙ্গণটির বাহির পরিমাণ উত্তর-দক্ষিণে ১৯২' এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১১৯'। প্রাঙ্গণটির ঠিক মধ্যে রহিয়াছে সুবিশাল একটি যোগচিহ্নাকৃতি মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ। মন্দিরটির উচ্চতা লক্ষণীয় (দ্র. কাশীনাথ দীক্ষিত, "এক্সক্যাভেশনস অ্যাট পাহাড়পুর, বেঙ্গল", 'মেময়ার অফ দ্য আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া', নং ৩৫, দিল্লী, পৃ. ৩-১৬)। অনুরূপ

প্রবল বর্ষণ-বিধৌত অঞ্চলেও ইটের স্থায়িত্বে সন্দেহ পোষণ করিবার কারণ নাই। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতকে নির্মিত বেশ কয়েকটি ইটের মন্দির তো আজও দাঁড়াইয়া আছে।[১৬]

প্রকৃতপক্ষে বাংলার আঞ্চলিক মুসলমান ধর্মীয় স্থাপত্যে যে রূপরেখার পরিচয় পাইতেছি তাহার উৎস চালা কুটীর ও বৃষ্টিপাতের প্রভাবের মত বিষয়-গুলি ছাড়াইয়া আরও অনেক গভীরে নিহিত। তাহার সন্ধান করিতে হইবে সমসাময়িক বাঙ্গালীর জীবন ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতির মধ্যে। স্বাধীন সুলতানী আমলে বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক কর্মধারা মূলতঃ ও প্রধানতঃ কৃষি-ভিত্তিক। ইহাই বাঙ্গালীকে প্রায় আপন গৃহসীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়া-ছিল। ঐহিক সমৃদ্ধি ও জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ তাহার ছিল নিতান্তই অল্প। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক হইতেই বাঙ্গালীর কর্মের পরিসর সীমিত হইয়া আসিতেছিল। সমুদ্রযাত্রার বন্দর তাম্রলিপ্তের পতন এই সময় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। নূতন কোন বন্দরের কথা আর শোনা যাইতেছে না। এতদ-সত্ত্বেও কিন্তু পাল রাজবংশের শাসনকালের প্রথম দিকে যখন পাহাড়পুর, বিরাট, মহাস্থান ও ময়নামতীতে সুবিশাল মঠ-মন্দির নির্মিত হইতেছিল, তখনও জীবনের ব্যাপ্তির সুযোগ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। তখনও বহির্বাণিজ্যলব্ধ সম্পদ বাংলায় আসিতেছে, পাল রাজগণ উত্তর ভারত জুড়িয়া সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা করিতেছেন। উত্তর ভারতের সহিত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ তখনও সজীব। কিন্তু পরবর্তী পাল রাজাদের আমলে এসব

বিন্যাসের একটি বিহার ময়নামতীতে (কুমিল্লা) আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১১৫টি কক্ষবেষ্টিত বিহার প্রাঙ্গণ ৫৫০' বাহুসমন্বিত চতুষ্কোণাকার ক্ষেত্র। কেন্দ্রীয় মন্দিরটি যোগচিহ্নাকৃতি। বাহুগুলি একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ১৭০' বিস্তৃত। (দ্র এফ. এ খান, 'ময়নামতী', ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি ইন পাকিস্তান, ১৯৬৩, পৃ. ১১০)। মহাস্থানে (বগুড়া) প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কয়েকটি সুউচ্চ স্তরবিভক্ত অধিষ্ঠান সমন্বিত মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মহাস্থানের নিকটবর্তী গোকুল পল্লীর লক্ষীন্দরের মেচ নামক স্তূপে যে অধিষ্ঠানটি পাওয়া গিয়াছে তাহার উচ্চতা অন্ততঃ ৪০' (দ্র. কাশীনাথ দীক্ষিত, "এক্সপ্লোরেশনস ইন বেঙ্গল", 'এনুয়াল রিপোর্ট অফ দ্য আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া', ১৯৩৪-৩৫, দিল্লী, ১৯৩৭, পৃ. ৪৯)।

১৬. বাংলায় দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতকে নির্মিত যে কয়েকটি ইটের মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সেগুলি হইল সাত দেউলিয়া (বর্ধমান) গ্রামের জৈন মন্দির, সোনাত-পালের (বাঁকুড়া) সূর্য্য (?) মন্দির, বোলাড়ার (বাঁকুড়া) সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, পশ্চিম-জটার (২৪ পরগণা) জটেশ্বর মন্দির, পারার (পুরুলিয়া) উদয়চণ্ডী মন্দির এবং দেউলঘাটের (পুরুলিয়া) তিনটি হিন্দু মন্দির।

সুযোগ আর নাই বলিলেই চলে। ধর্মপাল বা দেবপালের মত সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না—পাল রাজ্য ও রাষ্ট্রই ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া পড়িয়াছে। বহির্বাণিজ্যও লুপ্ত হইবার পথে। সামুদ্রিক বাণিজ্য তো নাই-ই, স্থলপথে ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যও কমিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক জীবন এ সময় সম্পূর্ণ কৃষি নির্ভর।[১৭] এই সময়ের মন্দিরগুলিতেও যেন ওই সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ জীবনের প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে। কল্পনার ব্যাপ্তি, মননের গভীরতা ও গঠনের বলিষ্ঠতার পরিচয় এই সময়ের মন্দিরগুলিতে আর পাওয়া যাইবে না। দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকে নির্মিত যে মন্দিরগুলির পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি সবই স্বল্পায়তন, একক দেবগৃহ মাত্র।[১৮] প্রশস্ত প্রাঙ্গণ-বেষ্টিত সুবিস্তৃত সুউচ্চ মন্দির সংস্থাপনের কথা আর ভাবা হইতেছে না। বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ যে অনতিবিস্তৃত এক-কক্ষাবিশিষ্ট একক মসজিদের প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা তো এই ঐতিহ্যানুবর্তী বলিয়াই মনে হয়।

বাঙ্গালীর স্বল্পবিস্তৃত সীমাবদ্ধ জীবনের প্রভাব স্বাধীন সুলতানী আমলের মসজিদগুলির উপর আরও গভীর। বাংলার মাটিতে তৈরী খড়ে ছাওয়া কুটীরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি যেভাবে মসজিদে অঙ্গীভূত করিয়া লইবার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই একথাটা বলিতেছি। মসজিদ-গুলির আসন বিন্যাস ও রূপকল্পনা, উভয় দিকেই এই চালা কুটীরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মিলিবে। প্রথমে আসনের কথাটা বলিয়া নিই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চালা ঘর সাধারণতঃ একটি কক্ষ ও তাহার সম্মুখবর্তী একটি বারান্দা লইয়া গঠিত। কোন কোন ক্ষেত্রে বারান্দাটি কক্ষের এক বা উভয় পার্শ্বেই ঘুরিয়া গিয়া কক্ষটিকে তিন দিক হইতে বেষ্টন করিয়া থাকে। চালা কুটীরের আসন আরও বিস্তৃত হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে বারান্দাটি চারিদিকে সমানভাবে প্রসারিত কতগুলি মসজিদে, যেমন মসজিদ বাড়ীর (বরিশাল জেলা) মসজিদ (১৪৬৫), গৌড়ের (মালদহ) লটন মসজিদ (১৪৭৫), চামকাটী মসজিদ (১৪৭৫), এবং সুরা (দিনাজপুর) গ্রামের মসজিদে (পঞ্চদশ শতকের শেষ অথবা ষষ্ঠদশ [ষোড়শ] শতকের প্রথম) আসনটি সম্মুখে এক বারান্দা বিশিষ্ট চালা

১৭. পাল ও সেন আমলে বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন (দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৯৫-২০০ ও ৫০০)।

১৮. উপরে (১৬ নং দ্র.) যে কয়টি মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছি তাহাদের মধ্যে আসনের বিস্তারের প্রশ্নে পশ্চিমজটার মন্দিরটি বৃহত্তম। ইহার আসন ৩০′ বাহুবিশিষ্ট চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। বোলাড়ার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরটি উচ্চতম। ইহার ভগ্নশীর্ষের উচ্চতা ৬৪′।

কুটীরের অনুকরণে পরিকল্পিত। এ মসজিদগুলিতে উপাসনাকক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে টানা আয়তাকার একটি কক্ষ। মসজিদের আসন পরিকল্পনার মূল কথাই হইল স্বচ্ছ সহজবোধ্য বিন্যাস। ইহার সহিত উপাসনাকক্ষের সম্মুখবর্তী আয়তাকার একটি কক্ষের কোন সামঞ্জস্য নাই। মসজিদ পরিকল্পনায় আর কোথাও উপাসনাকক্ষটিকে পশ্চাদ্‌বর্তী করিয়া রাখিবার জন্য একটি কক্ষ যুক্ত করা হইয়াছে এমনতর ব্যবস্থা দেখা যায় না। বাংলার মসজিদ উপাসনাকক্ষের সম্মুখবর্তী এই ঢাকা কক্ষটি যে আঞ্চলিক কুটীরের বিন্যাস হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কুটীরের সম্মুখে বারান্দাটি থাকে খোলা। এই খোলা বারান্দাটিকে দেওয়াল দিয়া ঘিরিয়া দিয়া কক্ষটির সৃষ্টি করা হইয়াছে। গৌড়ের কদম রসুল সৌধের (১৫৩১) আসনে দেখা যাইবে সম্মুখে ও দুই পাশে টানা বারান্দাযুক্ত কুটীরের অনুকৃতি। এক্ষেত্রেও অবশ্য বারান্দাগুলিকে দেওয়াল দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মসজিদের দেহ গঠনে চালা স্থাপত্যের প্রভাব আরও বেশী। বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে সৌধগুলির নিম্নাংশ তো সম্পূর্ণই চালা ঘরের নিম্নাংশের অনুকরণে গঠিত। কুটীরে মাটির দেওয়ালগুলিকে সাজা তুলিয়া নিয়া প্রায় সমতল বা ঈষৎ বক্রভাবে শেষ করা হয়। দেওয়ালগুলির উপরিভাগ কিছু বাহির হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না, ঢালু চালা হইতে আগাইয়া আসা ছাঁচার আবরণে ঢাকা পড়িয়া যায়। বাহির হইতে বাঁকান ছাঁচার নীচে দেওয়ালের যে অংশটা দেখা যায় স্বভাবতই তাহা নীচু বলিয়া বোধ হয় আর তাহার উপরের দিকটা দেখায় বক্রাকার। দেওয়ালের এই রূপটাই স্বাধীন সুলতানী আমলের মসজিদে অনুসৃত হইয়াছিল। তাই, বাংলার এই মসজিদগুলির দেওয়াল নীচু করিয়া গড়া এবং তাহার উপরিভাগ ধনুকের মত বাঁকান। দেওয়ালের উপরে আলিশাও তাই বাঁকান আকারে গড়া।

মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যের প্রথা অনুসারে মসজিদের ঊর্ধ্বাংশে গম্বুজেরই প্রাধান্য। তবে এক্ষেত্রেও গম্বুজের পরিবর্তে চালার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যাইবে। লটন মসজিদে (১৪৭৫) উপাসনাকক্ষের সম্মুখবর্তী কক্ষটির আচ্ছাদন তিনটি অংশে বিভক্ত। দুইপাশে দুইটি গম্বুজ, মাঝের অংশটিতে আচ্ছাদনের বহিঃরূপ রচিত হইয়াছে চারচালার আকারে। বাগেরহাটের (খুলনা জেলা) ষাট গম্বুজ মসজিদ (১৪৫০) ও গৌড়ের (রাজসাহী জেলা) ছোট সোনা মসজিদের আচ্ছাদন সারিবদ্ধভাবে সাজান অনেকগুলি গম্বুজ ও চারচালার সমবায়ে গঠিত। সংখ্যায় গম্বুজই বেশী। তবে লক্ষ্য করিবার যে দুইটি মসজিদেই মাঝখানের সারিটিতে চারচালা বসান হইয়াছে।

পশ্চিম এশিয়া হইতে মুসলমানগণ একটি পরিণত স্থাপত্যের ঐতিহ্য সঙ্গে

নিয়া বাংলায় আসিয়াছিলেন। বাংলায় তাঁহারা আর্কুয়েট গঠন কৌশল ও পদ্ধতি প্রবর্তন করিলেন। অর্থাৎ বাংলায় প্রকৃত খিলান, ভল্ট ও গম্বুজের প্রবর্তক তাঁহারাই। নবপ্রবর্তিত এই গঠন কৌশলের প্রয়োজনে আসিল গাঁথনীর জন্য চুন-সুরকীর মশলা। ইতিপূর্বে বাংলায় গাঁথনীর মশলা ছিল কাদা। আর্কুয়েট গঠন কৌশল প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে মশলা হিসাবে কাদার ব্যবহার কমিয়া আসিতে লাগিল। মুসলমানগণ তাঁহাদের ধর্মীয় স্থাপত্যে চালা ঘরের আকৃতির অনুকরণ করিলেন আর্কুয়েট গঠন কৌশল অবলম্বন করিয়া।

নবপ্রবর্তিত গঠন কৌশলের প্রয়োগে মুসলমানগণ চালা কুটীরের অনুকৃতি-বিশিষ্ট সৌধ নির্মাণের প্রথা প্রবর্তন করিলেন। আর্কুয়েট গঠন কৌশলের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে জড়িত প্রকৃত খিলান, গম্বুজ ও ভল্ট তাঁহাদের নবউদ্ভাবিত স্থাপত্যরূপের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া গেল। বাহিরের দেওয়ালে প্রবেশ পথের উপরে প্রকৃত খিলান যোগ করিবার ফলে তাহার সহিত আসিয়া পড়িল স্বল্প নিম্নায়ত স্প্যান্ড্রেল। আর একটি পশ্চিম এশীয় স্থাপত্যের উপকরণ বাংলার আঞ্চলিক মুসলিম স্থাপত্যে লক্ষ্য করা যায়। এটি হইল সৌধের কোণে বা পার্শ্বে সংযুক্ত গুরুভার স্থূল স্তম্ভ। ইহারই উপর বসাইয়া দেওয়া হইত পশ্চিম এশীয় আদর্শে গড়া ক্রমহ্রাসায়মান চূড়া। সবটা মিলিয়া বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের মসজিদগুলি হইয়া উঠিয়াছিল বাংলার আঞ্চলিক স্থাপত্যরূপ ও পশ্চিম এশীয় স্থাপত্য কৌশল ও উপকরণের সমন্বয় ক্ষেত্র।

ইট বা পাথরের মত উপাদানে বাঁশ, মাটি ও খড় দিয়া তৈরী চালা ঘরের অনুকৃতি করিতে গিয়া কিছুটা পরির্তন ও পরিশোধন অনিবার্যভাবেই করিতে হইয়াছে। চালার এই পরিবর্তিত ও পরিশোধিত রূপের সহিত যুক্ত হইয়াছে প্রকৃত খিলান, স্প্যান্ড্রেল, কোণ-স্তম্ভ ও গম্বুজের মত পশ্চিম এশীয় স্থাপত্য-উপকরণ। এ সব সত্ত্বেও কিন্তু লৌকিক চালা কুটীরের বৈশিষ্ট্য ও গুণগুলি বাংলার মসজিদে সহজেই ধরা পড়ে। চালা রীতির সহজবোধ্য সরল রূপের রমণীয়তা বাংলার মসজিদের অন্যতম চরিত্রগত লক্ষণ। হইতে পারে, চালার এই রমণীয় ভাবটুকু মুসলমানগণের মনোহরণ করিয়াছিল বলিয়াই চালা কুটীরের আকৃতির অনুকরণ করিয়া তাঁহারা ধর্মীয় স্থাপত্যের রূপ নির্ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের ধর্মীয় স্থাপত্যে যে গুরুত্বের সহিত এবং যেরূপ ব্যাপকভাবে চালা রূপের অনুকৃতি হইয়াছিল তাহা দেখিয়া মনে হয় একেবারে সম্পূর্ণ আঞ্চলিক রূপ সৃষ্টি করাই স্বাধীন সুলতানদের উদ্দেশ্য। আঞ্চলিক জনজীবন ও সংস্কৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ

যোগাযোগ স্থাপন এবং সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টায় এই অতিপরিচিত চালা রূপটি যে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়া উঠিবে ইহা তো সহজেই অনুমেয়।

বাংলার আঞ্চলিক সংস্কৃতির সহিত যোগাযোগ স্থাপন ও সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা স্থাপত্যালংকারের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রতীয়মান। বস্তুতঃ স্থাপত্যালংকারের ক্ষেত্রে এ প্রচেষ্টা আঞ্চলিক মুসলিম স্থাপত্যরূপ উদ্ভূত হইবার অনেক আগেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। এই অগ্রগামী প্রচেষ্টার প্রমাণ মিলিবে ছোট পাণ্ডুয়ার (হুগলী জেলা) বাইশ দরজার বড় মসজিদের মিহরাব অলংকরণে এবং হজরত পাণ্ডুয়ার (মালদহ জেলা) আদিনা মসজিদের মিহরাব ও অন্যান্য গাত্রালংকারে, বিশেষ করিয়া মিহরাবের উপর টিম্পানাম সমূহের অলংকারে। মুসলমানগণ বাংলায় আসিবার অনেক আগেই পশ্চিম এশিয়ার স্থাপত্যালংকারের একটি সুপরিপুষ্ট ধারা গড়িয়া উঠিয়াছিল। অপরদিকে বাংলায় গুপ্ত-পাল-সেন আমলের শিল্প চর্চার ঐতিহ্যও বিরাট। বাংলার মুসলমানগণের স্থাপত্যালংকার রচিত হইয়াছিল এই দুই সূত্র হইতে সংগৃহীত উপাদান লইয়া। কখনও বা উভয় সূত্র হইতে অলংকারবস্তু চয়ন করিয়া পাশাপাশি সাজাইয়া অলংকার রচনা করা হইয়াছে : কখনও বা পাল-সেন আমলের কোন অলঙ্কার, যেমন শিকলে ঝোলান বস্ত্রখণ্ডে সজ্জিত ঘণ্টা, কল্পলতা, পদ্মদল বা চৈত্য গবাক্ষ, পশ্চিম এশীয়, বিশেষ করিয়া পারসিক শিল্পরীতি অনুসারে পরিবর্তিত করিয়া নেওয়া হইয়াছে ; কখনও বা পাল-সেন ও পশ্চিম এশীয় শিল্পের উপাদান একই রেখা প্রবাহের সূত্রে গ্রথিত।

নীচু রিলিফে কাটিয়া বাহির করা আঞ্চলিক মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যের অলঙ্করণ বহুক্ষেত্রেই পশ্চিম এশীয় স্থাপত্যালঙ্কারের মত বিভিন্ন প্রকার সূক্ষ্ম প্যাটার্ণ ও ডিজাইনের সমাহারে রচিত। লতা পাতা ও পুষ্পের সমারোহও পশ্চিম এশীয় স্থাপত্যালঙ্কার হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। রেখা প্রবাহের কুটিল ও বঙ্কিম গতিও পশ্চিম এশীয় প্রভাবেরই ফল। এতদ্সত্ত্বেও কিন্তু বাংলায় আঞ্চলিক মুসলিম স্থাপত্যালঙ্কারের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যটুকু চিনিয়া নিতে বিলম্ব হয় না। পাল-সেন আমলের অলঙ্কারবস্তুর ব্যাপক ব্যবহার ইহার অন্যতম কারণ। দ্বিতীয় কারণটি উদ্ভূত হইয়াছে অলংকরণ বিন্যাসের পরিকল্পনা হইতে। বাংলার আঞ্চলিক মুসলিম স্থাপত্যে বাহিরের দেওয়ালে অলংকরণ বিন্যাসের পরিকল্পনা করিতে হইয়াছে নীচু বাঁকানো দেওয়াল ও বাঁকানো আলিসার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া। দেওয়ালের রেখা প্রবাহের গতি অনুসারে অলংকরণ পরিকল্পনার প্রধান রেখাগুলিও বাহিরের দিকে বাঁকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থাপত্যের মত তাহার অলঙ্কার বিন্যাসের প্রধান গতিপথ নির্ধারিত হইয়াছে বাংলার চালার প্রভাবে। এইভাবে অলঙ্কার হইয়া উঠিয়াছে

স্থাপত্যের পরিপূরক। এই খানেই বাংলার মুসলিম স্থাপত্যালঙ্কারের আঞ্চলিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্য।

২

আগেই বলিয়াছি, ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধ হইতে প্রায় দুইশত বৎসর পরে গাঙ্গেয় বাংলায় মন্দির চর্চা আরম্ভ হয় পঞ্চদশ শতকে। স্বাধীন সুলতানগণের সাংস্কৃতিক সমন্বয় প্রচেষ্টা ও বাঙ্গালীর আঞ্চলিক সত্তা বিকাশের পরিমণ্ডলের মধ্যে গাঙ্গেয় বাংলায় নূতন করিয়া মন্দির চর্চার সূত্রপাত হইল। পঞ্চদশ শতকে গাঙ্গেয় বাংলায় নূতন করিয়া যে মন্দির চর্চার সূত্রপাত হইল তাহার প্রাচীনতম দৃষ্টান্তটি নির্মিত হইয়াছিল ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ আঞ্চলিক মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনটি যে সময় নির্মিত হইয়াছিল তাহার অর্ধ-শতাব্দীরও অধিক কাল পরে। এই সময়ের মধ্যে আঞ্চলিক মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্য পরিণতির পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। মুসলিম আঞ্চলিক ধর্মীয় স্থাপত্যে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছিল তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া পঞ্চদশ শতকের শেষ দিক হইতে গাঙ্গেয় বাংলায় নূতন করিয়া মন্দির চর্চা শুরু হইয়াছিল। মন্দির চর্চার ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা যে কতটা প্রত্যক্ষ ছিল তাহার প্রমাণ প্রাচীনতম দৃষ্টান্তটিতেই পাওয়া যাইবে। সিংহবাহিনী দেবীর উদ্দেশ্যে সমর্পিত এই মন্দিরটির (১৪৮০) নিম্নাংশ মসজিদের নিম্নাংশের মতই বাঁকানো, আর আচ্ছাদনটি রচিত হইয়াছে চার চালার আকারে। এই চালার আকারই তো বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ (১৪৫০) এবং গৌড়ের লটন মসজিদের (১৪৭৫) আচ্ছাদনে বিরাজমান। সিংহবাহিনী মন্দিরটি গঠিত হইয়াছে আকুঁয়েট কৌশল অবলম্বন করিয়া ষাট গম্বুজ মসজিদ ও লটন মসজিদের মত ইহার ভিতরের আচ্ছাদন কোভ ভল্টে তৈরী। ইহার উপরে চার চালার আকার আরোপিত হইয়াছে। মন্দিরটির গাত্রালঙ্কার সামান্য, কিন্তু এই সামান্য অলঙ্করণেও বাংলার আঞ্চলিক মুসলিম স্থাপত্যালঙ্কারের প্রভাব সুস্পষ্ট।

ঊর্ধ্বাংশের আকৃতি অনুসারে নব পর্যায়ের মন্দিরগুলিকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগটি চালা, দ্বিতীয়টি রত্ন, তৃতীয়টির নাম শিখর। চালা মন্দির বাংলার লৌকিক চালা কুটীরের প্রত্যক্ষ অনুকরণে সৃষ্ট। রত্ন মিশ্র রীতির মন্দির। চালার অনুকরণে গঠিত নিম্নাংশের উপর ঐতিহ্যাগত শিখররীতির ঊর্ধ্বাংশ যোগ করিয়া ইহার সৃষ্টি। জন্মসূত্রে এই রীতি দুইটি

বাংলার লৌকিক স্থাপত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বাংলার আঞ্চলিক মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যের উত্তরাধিকার লইয়া এই দুইটি রীতির উদ্ভব হইয়াছিল গাঙ্গেয় বাংলায় মন্দির চর্চার নবপর্যায়ে। ইহাদের বিস্তারও বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বস্তুত পক্ষে চালা ও রত্ন রীতি একান্তভাবে বাংলার নিজস্ব আঞ্চলিক মন্দির রীতি।

তৃতীয় রীতিটি অর্থাৎ শিখর রীতির চর্চা হইয়াছিল সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা অবলম্বন করিয়া। গুপ্তযুগ হইতে যে মন্দিররীতি সমগ্র উত্তর ভারতে প্রায় নিরঙ্কুশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহা এই শিখর রীতি। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম হইতে যখন গাঙ্গেয় বাংলায় মন্দির চর্চা প্রায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল সেই সময় দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে, পুরুলিয়ায় ও বাঁকুড়ার পশ্চিম অংশে মন্দির চর্চার যে ধারাটি অব্যাহত ছিল তাহা এই শিখর রীতিকে অবলম্বন করিয়া। পঞ্চদশ শতক হইতে গাঙ্গেয় বাংলায় যে ধরনের শিখর মন্দির দেখা যায় তাহা অবশ্য প্রাচীন শিখরমন্দিরের পরিবর্তিত ও অতিশয় সরলীকৃত রূপ। শিখর মন্দিরের এই পরিবর্তন ও সরলীকরণ হইয়াছিল বাংলায় এবং এই পরিবর্তিত ও সরলীকৃত শিখর মন্দির বাংলার বাহিরে অজ্ঞাত বলিলেই হয়। তাই, চালা ও রত্ন রীতির মত বাংলায় পরিবর্তিত ও সরলীকৃত শিখর মন্দিরকেও আঞ্চলিক মন্দির বলিতে কোন বাধা নাই।

এই তিনটি রীতি মধ্যে চালাই বাঙ্গালীর মনোহরণ করিয়াছিল; চালা মন্দিরের সংখ্যাই বাংলায় সর্বাধিক। শিখর রীতি পঞ্চদশ শতকে বাংলায় সুপরিজ্ঞাত ছিল বলিয়াই মনে হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার প্রত্যন্তভাগে শিখর রীতির চর্চা অন্তত দশম শতক হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে। নব পর্যায়ের মন্দির চর্চায় শিখর রীতি যে অন্যতম প্রধান রীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিল ইহাতেই বুঝা যাইবে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সম্বলিত শিখর রীতির কথা গাঙ্গেয় বাংলা বিস্মৃত হইয়া যায় নাই। এতদ্‌সত্ত্বেও কিছু লৌকিক কুটীরের প্রত্যক্ষ অনুকরণে গঠিত চালা রীতির জনপ্রিয়তাই দেখিতেছি সর্বাধিক। মনে হয়, বাঙ্গালীর ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক সত্তার প্রভাবই ইহার কারণ। রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন বাংলায় মূলতঃ কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক জীবন বাঙ্গালীকে ক্রমশই আপন গৃহদ্বারের সীমায় আবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছিল। জীবন ও অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ঘটাইবার সুযোগ আর তাহার ছিল না। এই একান্তই সীমাবদ্ধ পরিবেশে মন্দির গঠন করিবার সময় আপন কুটীরের আকৃতিটাই বাঙ্গালীর চিত্তকে আকৃষ্ট করিল সর্বাপেক্ষা বেশী। স্থায়ী উপকরণে নির্মিত মন্দিরও তাই হইয়া উঠিল অস্থায়ী উপকরণে নির্মিত চালা কুটীরের অনুকরণ মাত্র।

আসনে ও আকারে চালা কুটীরের যতগুলি প্রভেদ দেখা যায় তাহার প্রায় সবগুলিই চালা মন্দিরের ক্ষেত্রে অনুকৃত হইয়াছিল। সম্মুখে-পিছনে দীর্ঘতর আয়তাকার একচালা ও দোচালা কুটীরের অনুকরণে দোচালা মন্দিরের পরিকল্পনা এইরূপ একটি দোচালার পিছনে অনুরূপ আর একটি কক্ষ সংযোগ করিয়া গঠিত হয় জোড় বাংলা মন্দিরের আসন। চারচালা মন্দিরের আসন সাধারণতঃ সমচতুষ্কোণ। অনুরূপ চালা কুটীরের আসন প্রায় সর্বত্রই দৃষ্টিগোচর, তবে চালা কুটীরে বাস কক্ষের সম্মুখে যে আয়তাকার বারান্দা সাধারণতঃ দেখা যায় চারচালা মন্দিরের ক্ষেত্রে সেটি বাদ পড়িয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্রতর আটচালা মন্দিরের আসন চারচালা মন্দিরের মতন। তবে, বৃহত্তর আটচালা মন্দিরের আসন সাধারণতঃ দুই আয়তাকার ভাগে বিভক্ত। পিছনের আয়তাকার কক্ষটিতে দেবতার অধিষ্ঠান। সম্মুখের অংশটি দালান নামে পরিচিত, এটি পূজার বা দর্শনার্থীদের অপেক্ষা করিবার স্থান। এই আসন স্পষ্টতঃ সম্মুখে বারান্দা-যুক্ত আয়তাকার চালা কুটীরের আসন দেখিয়া তৈরী। বৃহদাকৃতি আটচালা মন্দিরে বিস্তৃত চালা কুটীরের আসন অনুসৃত হইয়াছে। এই সব আটচালা মন্দিরে পূজা কক্ষের দুইপাশে ও এমন কি পিছনেও আয়তাকার কক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ আসন পরিকল্পনা যে তিনদিকে ও চারদিকে বারান্দাযুক্ত চালা কুটীরের আসনের অনুকরণে করা তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঁশ, মাটি ও খড় দিয়া তৈরী বক্ররেখা সমন্বিত চালা কুটীরের আকৃতি স্থায়ী উপাদানে নির্মাণ করিতে হইলে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে বাংলার আঞ্চলিক মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যে তাহার প্রায় সবগুলিরই সমাধান হইয়া গিয়াছিল। দেওয়ালের উপরিভাগ বাঁকাইয়া দিয়া ও তাহার উপর বাঁকানো কার্নিশ যুক্ত করিয়া মুসলমানদের আঞ্চলিক স্থাপত্যকে যেভাবে চালা কুটীরের সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন করিয়া তোলা হইত, মন্দিরের ক্ষেত্রেও তাহাই করা হইয়াছে। তবে মুসলমানদের আঞ্চলিক স্থাপত্যে বাঁকটা মৃদুভাবে টানা। মন্দিরের ক্ষেত্রে দেওয়ালের উপরি ভাগ অনেকটা বেশী পরিমাণে বাঁকা। ইহারই ফলে চালা মন্দিরের নিম্নাংশের সঙ্গে চালা কুটীরের সাদৃশ্য আঞ্চলিক মসজিদের নিম্নাংশ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর।

চালা মন্দিরের সঙ্গে চালা কুটীরের ঘনিষ্ঠতা অবশ্য আচ্ছাদনের ক্ষেত্রেই সর্বাধিক স্পষ্ট। আঞ্চলিক মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যে আচ্ছাদনের ব্যবহার মাত্র অল্প কয়েকটি সৌধে হইয়াছে, তাহাও আবার খুব সীমিত ভাবে। কিন্তু চালা মন্দিরের সম্পূর্ণ আচ্ছাদনটাই চালা কুটীরের অনুকরণে রচিত। একমাত্র একচালা আচ্ছাদনের কোন অনুকৃতি মন্দিরে করা হয় নাই। দোচালা, চারচালা, আটচালা ও বারোচালা আচ্ছাদনের এই সব কয়টি প্রভেদই চালা মন্দিরে দৃষ্টি-

গোচর। দোচালা বাংলা এবং চারচালা মন্দিরের আচ্ছাদন তো দুই এবং চার চালা বিশিষ্ট দোচালা ও চারচালা আচ্ছাদনের প্রত্যক্ষ অনুকরণ। বাংলা মন্দিরে দোচালা আচ্ছাদনের মত সামনের ও পিছনের দেওয়াল হইতে উঠিয়া আসা দুইটি আয়তাকার চালা পরস্পরের দিকে ঝুঁকিয়া কক্ষটির ঠিক মধ্যস্থলে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া যায়। দুই পাশের দেওয়াল ত্রিকোণাকারে উঠিয়া আসিয়া দুই পাশের ফাঁক দুইটি আবৃত করিয়া দেয়। চারচালা মন্দির সাধারণতঃ সমচতুষ্কোণ। তাই অনুরূপ চারচালা কুটীরের আচ্ছাদনই ইহাতে অনুকৃত হইয়াছে। চারদিকের দেয়াল হইতে উঠিয়া চারটি চালা পরস্পরের দিকে ঝুঁকিয়া উঠিয়া যায়, অবশেষে কক্ষটির ঠিক কেন্দ্রস্থলের উপর একটি বিন্দুতে মিলিয়া যায়।

আটচালা মন্দিরের আচ্ছাদন দুই অংশে বিভক্ত আটচালা কুটীরের অনুকরণে গঠিত। তবে আটচালা মন্দিরের ক্ষেত্রে অনুকরণটা প্রত্যক্ষ নহে। আটচাল কুটীর সাধারণতঃ দ্বিতল। উপরের তলটি একটি সম্পূর্ণ কক্ষ বা একাধিক কক্ষের সমাহার। দ্বিতলের পাদমূল বাহিয়া একপ্রস্থ চালা আচ্ছাদন। এই অসম্পূর্ণ আচ্ছাদনটি অবশ্য বৃষ্টির ছাঁট হইতে দেওয়ালগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য। খানিকটা উঠিবার পর চালাগুলি প্রথম তলের শীর্ষ দেওয়ালে গিয়া শেষ হইয়া যায়। উপরের তলে আচ্ছাদনটি সম্পূর্ণ চারচালা। আটচালা মন্দির এক-তলেই সম্পূর্ণ। তবে ইহার আচ্ছাদনটি দুইটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশটি একটি অসম্পূর্ণ চারচালা দেওয়ালের উপর হইতে কিছুটা উঠিবার পর একটি সমতল ক্ষেত্র রচনা করিয়া শেষ হইয়া যায়। এই সমতল ক্ষেত্রের উপরে থাকে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি চারচালা কক্ষের অনুকৃতি। নিম্নাংশ ও উধর্বাংশ মিলিয়া চালার সংখ্যা দাঁড়ায় আট। উপরের এই চারচালাটির আচ্ছাদন নিম্নাংশের মতন অসম্পূর্ণ রাখিয়া তাহার উপর একটি ক্ষুদ্রাকৃতি চারচালা বসাইয়া বারোচালা আচ্ছাদনের সৃষ্টি।

বাঁকানো দেওয়াল ও কার্নিস বক্ররেখা সমন্বিত চালা আচ্ছাদনের প্রভাবে সৃষ্ট। সৌধের উপরে চালা আচ্ছাদনই ইহার স্বাভাবিক পরিণতি। গম্বুজ দিয়া আচ্ছাদন রচনা করা মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যের বহুকাল সিদ্ধ প্রথা। তাই চালার আকারে আচ্ছাদন বাংলার আঞ্চলিক মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যে বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। যেখানে আছে সেখানেও চালা আকৃতির ব্যবহার সীমিত। স্থায়ী উপাদানে চালা আকৃতি নিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা মুসলমানগণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাংলার আঞ্চলিক মুসলিম স্থাপত্যে এই স্থাপত্যরূপ স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিবার অবকাশ পায় নাই। এই স্থাপত্যরূপ স্বাভাবিক যুক্তিসঙ্গত পরিণতি লাভ করিল চালা মন্দিরে, চালার অনুকরণে গঠিত নিম্নাংশ ও উধর্বাংশের সুসঙ্গত বিন্যাসে।

চালা ও শিখর রীতি সম্মিলিত করিয়া রত্ন মন্দিরের সৃষ্টি। রত্ন মন্দিরের নিম্নাংশটি চালা মন্দিরের অনুরূপ। নীচু বাঁকানো দেওয়ালের উপর কক্ষটিকে আবৃত করিয়া একটি অত্যন্ত নীচু বাঁকান ছাদ গঠন করা হয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ এই নিম্নাংশটির উপরে থাকে এক বা একাধিক ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দিরদেহ লইয়া গঠিত উর্ধ্বাংশ। সাধারণতঃ শিখর রীতিতে গঠিত উর্ধ্বাংশের ক্ষুদ্রায়তন মন্দিরদেহও নিম্নাংশের মত স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইহারই নাম রত্ন। উর্ধ্বাংশের এই বৈশিষ্ট্য হইতে চালা ও শিখর রীতির সম্মিলনে গঠিত মন্দিরগুলি রত্ন মন্দির বলিয়া পরিচিত।

নিম্নাংশের বহিরূপটাই শুধু নহে, রত্ন মন্দিরের আসনও কুটীরের প্রভাবে পরিকল্পিত। চালা কুটীরের বিস্তৃততর আসনগুলি অর্থাৎ সম্মুখে, পাশে ও পিছনে বারান্দাযুক্ত আসনগুলির সর্বাধিক অনুকরণ হইয়াছে রত্ন মন্দিরে। কক্ষের চারিদিকে প্রসারিত বারান্দার কোণে কোণে কক্ষ রচনা করিবার যে প্রথা চালা কুটীরে দেখা যায় তাহাও রত্ন মন্দিরের আসন বিন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্যরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে। বস্তুতঃ আসন ও নিম্নাংশের বহিরূপের প্রশ্নে রত্ন মন্দিরে সম্পূর্ণরূপে চালা কুটীর হইতে উদ্ভূত। কিন্তু ইহার উর্ধ্বাংশটির গঠন ঐতিহ্যাগত শিখর মন্দিরের আকৃতি নিয়া। লৌকিক ঐতিহ্যাগত স্থাপত্যের উপাদান একত্রিত করিয়া মিশ্র স্থাপত্যরূপের ধারণাটা প্রথমে রূপলাভ করিয়াছিল বাংলার আঞ্চলিক মুসলিম স্থাপত্যে। চালা কুটীরের অনুকরণে সৃষ্ট নিম্নাংশের উপর ঐতিহ্যাগত গম্বুজ বসাইয়া মুসলমানগণ যে স্থাপত্যরূপের সৃষ্টি করিয়াছিলেন রত্ন মন্দির তাহারই কিছুটা পরিবর্তিত রূপ। গম্বুজের পরিবর্তে হিন্দুরা ব্যবহার করিলেন ঐতিহ্যাগত শিখর মন্দিরের আকৃতি। মুসলমান ও হিন্দু ধর্মীয় স্থাপত্যে এই ধারাবাহিকতা একটি গম্বুজবিশিষ্ট মুসলিম সৌধের সঙ্গে একটি রত্নবিশিষ্ট মন্দিরের তুলনা করিলে খুব স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িবে।

পশ্চিম এশিয়া হইতে মুসলমানগণ উন্নত স্থাপত্য কৌশল ও পদ্ধতি লইয়া আসিয়াছিলেন এ কথা একটু আগেই বলিয়াছি। পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে যখন আঞ্চলিক মন্দির স্থাপত্যের সন্ধান পাইতেছি তখন মুসলমানগণ কর্তৃক প্রবর্তিত গঠনকৌশল ও পদ্ধতি বাংলায় সুপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। প্রথমাবধিই আঞ্চলিক মন্দিরে খিলান, ভল্ট ও গম্বুজের ব্যাপক ব্যবহার দেখিতেছি। মন্দিরের অভ্যন্তর তো সম্পূর্ণই আর্কুয়েট পদ্ধতিতে গঠিত। দোচালা মন্দিরের অভ্যন্তরে ভল্ট চতুরস্র চারচালা ও ক্ষুদ্রায়তন আটচালার অভ্যন্তরীণ আচ্ছাদন গঠিত হয় গম্বুজ দিয়া। ভিতরটা দেখিলে এই মন্দিরগুলির সহিত চতুরস্র উপাসনাকক্ষ বিশিষ্ট মসজিদেব কোন পার্থক্যই বুঝা যাইবে না। বৃহত্তর

আটচালা ও রত্ন মন্দিরে পূজাকক্ষের অভ্যন্তরীণ আচ্ছাদন সাধারণতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত। কক্ষটির কেন্দ্রস্থলে একটি গম্বুজ আর দুই প্রান্তে দুইটি ভল্ট গম্বুজের দুই পাশে দুইটি খিলান অংশ তিনটিকে পৃথক করিয়া দিতেছে। ত্রিধা বিভক্ত এই আচ্ছাদন বিন্যাস তো তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের অনুকরণ বলিয়াই বোধ হয়। এই সব মসজিদেও কেন্দ্রীয় গম্বুজের দুই পাশে দুইটি খিলান দিয়া তিনটি অংশ পৃথক করা হইয়াছে। পূজা কক্ষের সম্মুখে, পাশে ও পিছনের আয়তাকার কক্ষগুলির অভ্যন্তরীণ আচ্ছাদন সাধারণতঃ ভল্ট দিয়া গঠিত। অভ্যন্তরের এই সব গম্বুজ, খিলান ও ভল্টের উপরেই চালা ও রত্ন আকৃতি আরোপ করা হইয়া থাকে। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যাগত শিখর রীতির মন্দিরেও গর্ভগৃহের আচ্ছাদন রচিত হইয়াছে গম্বুজ বসাইয়া।

বাংলার মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় স্থাপত্যের মধ্যে ধারাবাহিকতার প্রমাণ আঞ্চলিক মন্দিরের অলংকরণেও পাওয়া যাইবে। মন্দির গাত্রে অলংকরণে যে বিন্যাস-পরিকল্পনা ও উপাদানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই আহরিত হইয়াছে আঞ্চলিক মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যের গাত্রালংকার হইতে। প্রবেশদ্বারের দুইপাশে ও উপরে বাঁকানো রেখায় বিভক্ত আয়ত প্যানেলের সারি, প্রবেশদ্বার বেষ্টন করিয়া অলঙ্কৃত বন্ধনী, স্প্যান্ড্রেলের উপর নিরবচ্ছিন্ন অলংকার—মন্দির অলংকরণের এই মূল উপাদান-সমূহ আঞ্চলিক মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যের পরিণত গাত্রালঙ্কারে কোনও না কোন রূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে। তবে আঞ্চলিক স্থাপত্যে এই উপাদান-গুলির ব্যবহার হইয়াছিল সাধারণতঃ বিচ্ছিন্নভাবে। একাধিক প্রকারের উপাদান একত্রিত করিয়া সংহত ও বিস্তৃত অলঙ্করণ রচনা করিবার প্রয়াস একমাত্র কদম রসুল সৌধেই (১৫৩১) হইয়াছিল। কদম রসুল সৌধের গাত্রালংকার দেখিয়া মনে হয় আঞ্চলিক মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যালংকার বিন্যাসের একটা সুনির্দিষ্ট আঞ্চলিক ধারা গড়িয়া উঠিতেছিল। প্রায় সমগ্র দেওয়াল জুড়িয়া বিস্তৃত এই সৌধটির অলংকরণ সজ্জার মধ্যে একটা সংহত ডিজাইন সৃষ্টির প্রচেষ্টাও দৃষ্টি এড়াইবার নয়। অনুরূপ প্রয়াস আরও একটি সৌধের অলংকরণে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এটি সাদুল্লাপুর গ্রামের (মালদহ জেলা) জান জান মিয়ার মসজিদ (১৫৩৫)। এই মসজিদটিতে অবশ্য অলংকরণের উপাদান একটিই, দেওয়ালের উপর আয়তাকার প্যানেল। কিন্তু সমগ্র দেওয়াল জুড়িয়া একটি সংহত ডিজাইন সৃষ্টির প্রচেষ্টা এই সৌধটির মুখভাগে কদম রসুল অপেক্ষা আরও একটু স্পষ্ট।

বিস্তৃত ক্ষেত্রের উপর বহুসংখ্যক অলঙ্কারবস্তু সাজাইয়া একটা সুসংহত ডিজাইন রচনা করিবার ধারণাটা আসিয়াছিল পশ্চিম এশিয়া হইতে। বাংলায়

এ ধারণাটি প্রবর্তিত হইয়াছিল মিহ্‌রাব অলঙ্করণ উপলক্ষ্য করিয়া। তাহার পর আঞ্চলিক মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যে সৌধের বহির্গাত্রে আঞ্চলিক স্থাপত্যরূপের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বিস্তৃত ও সংহত ডিজাইন সৃষ্টির প্রচেষ্টা যে কিছুটা দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল, কদম রসুল সৌধ ও জান জান মিয়ার মসজিদের গাত্রালঙ্কারেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। বাংলার আঞ্চলিক স্থাপত্যালঙ্কারের এই ধারাটি অবশ্য মুসলিম স্থাপত্যের ক্ষেত্রে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ হইতে আঞ্চলিক মুসলিম স্থাপত্যের চর্চা দ্রুত কমিয়া আসিতেছিল। স্বভাবতই স্থাপত্যালঙ্কার নিয়া চর্চার সুযোগ আর বেশী ছিল না। কিন্তু ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় ভাগ হইতে আঞ্চলিক মন্দির স্থাপত্যের চর্চা ক্রমশ প্রসার লাভ করিতেছিল। স্থাপত্যালঙ্কারের যে ধারাটি স্থাপত্যের ক্ষেত্রে মধ্য পথে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল আঞ্চলিক মন্দির স্থাপত্য হইয়া উঠিল তাহার বিকাশ লাভের নূতন ক্ষেত্র।

বাংলার আঞ্চলিক মন্দির স্থাপত্য চর্চার প্রথম দিকে, সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত, গাত্রালঙ্কারে মূর্তির স্থান খুবই অল্প। ষোড়শ শতকীয় মন্দিরে মূর্তির ব্যবহার হইয়াছে অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত নির্মিত মন্দিরেও তাই। এই সমস্ত মন্দিরে অলংকরণের বেশীর ভাগটাই বিমূর্ত মোটিফ, প্যাটার্ন ও ডিজাইন দিয়া রচিত। মোটিফ, প্যাটার্ন ও ডিজাইনের এই আধিক্য বাংলার স্থাপত্যালঙ্কারের একটি প্রাচীন প্রথার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পাল ও সেন আমলের যতগুলি শিখর মন্দির বাংলায় পাওয়া গিয়াছে তাহার সব কয়টিতেই দেখা যায় গাত্রালঙ্কারে মূর্তির ব্যবহার অতিশয় সীমিত। ক্ষেত্রবিশেষে নাই-ই। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার প্রত্যন্ত ভাগে সুপ্রাচীন ধারা অনুসারে যে সব শিখর মন্দির নির্মিত হইতেছিল তাহাতেও মূর্তির ব্যবহার সামান্যই। শুধুমাত্র বিমূর্ত মোটিফ, প্যাটার্ন ও ডিজাইন দিয়া অলংকার রচনা করিবার অনুপ্রেরণা এই সূত্র হইতেও হয়ত আসিয়া থাকিতে পারে। এ সম্ভাবনার কথা স্বীকার করিয়া নিয়াও বলা যায়, বিমূর্ত অলংকার-বস্তুর প্রতি আকর্ষণের কারণ সম্ভবতঃ আঞ্চলিক মুসলিম স্থাপত্যালংকারের দৃষ্টান্ত। আঞ্চলিক মুসলিম স্থাপত্যের সহিত আঞ্চলিক মন্দির চর্চার যে আন্তরিক যোগসূত্রের কথা এতক্ষণ বলিয়া আসিয়াছি সেইটাই এই অনুমানের ভিত্তি।

প্রথম দিকের আঞ্চলিক মন্দিরগুলির গাত্রালংকার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলে এই অনুমানের সপক্ষে আরও যুক্তি পাওয়া যাইবে। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত নির্মিত মন্দিরগুলিতে ব্যবহৃত অলঙ্কারবস্তুর প্রায় সবটুকুই সংগৃহীত হইয়াছিল আঞ্চলিক মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্য হইতে। পঞ্চদশ-ষোড়শ

শতকীয় মুসলিম স্থাপত্যালংকার প্রসঙ্গে যে তিন শ্রেণীর অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছি তার সবগুলিই মন্দির গাত্রের অলংকরণে দৃষ্টিগোচর। বিষয়বস্তু, শৈলী ও প্রয়োগের প্রশ্নে মন্দির অলঙ্করণে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। মিশ্র অলঙ্কারগুলি তো বটেই, পশ্চিম এশীয় ও পাল-সেন অলংকারগুলিও সরাসরিভাবে মন্দিরে গৃহীত হইয়া গিয়াছে। বস্তুত আঞ্চলিক মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্য ও হিন্দু ধর্মীয় স্থাপত্যের অলংকরণে বিষয়বস্তু ও শৈলীগত সাদৃশ্য এতই ঘনিষ্ঠ যে শুধুমাত্র অলংকার দেখিয়া উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা অসম্ভব।

সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে আঞ্চলিক মন্দিরের অলংকরণে একটি প্রাচীনতর ধারার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। পাল-সেন আমলে প্রচলিত স্থাপত্যালংকারের একটি ধারার কথা একটু আগেই বলিয়াছি। অপর একটি ধারার পরিচয় মিলিবে পাহাড়পুর, মহাস্থান ও বিরাটের মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। এই মন্দিরগুলিতে দেখিতেছি দেওয়ালের পাদমূল বাহিয়া মূর্তিখচিত প্যানেলের সারি এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে মন্দিরগাত্রে মূর্তির ব্যবহার বহুল প্রচলিত হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের পাদমূল বাহিয়া টানা প্যানেলের সারি অলংকার বিন্যাসের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গৃহীত হইয়া গিয়াছে। অলঙ্কার বিন্যাসের এই প্রথা অবশ্য বাংলার বাহিরে, বিশেষ করিয়া মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশায় সুপ্রচলিত ছিল। ওড়িশার কথাটা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার মত। প্রয়োগভঙ্গীর প্রশ্ন বাংলার আঞ্চলিক মন্দিরের পাদমূলবাহী প্যানেলের সারি ওড়িশার মন্দিরের অনুরূপভাবে বিন্যস্ত অলংকরণের সহিত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যের বন্ধনে যুক্ত। লক্ষ্য করিবার বিষয়, আঞ্চলিক মন্দির অলংকরণে এই অংশটির প্রথম আবির্ভাব যে মন্দিরটিতে তাহার অবস্থান ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের হরিপুরগড়ে। রসিক রায়ের উদ্দেশ্যে সমর্পিত এই আটচালা মন্দিরটি ওড়িশার ও বাংলার স্থাপত্যের যে কয়টি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে প্রাচীনতম এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রায় একই সঙ্গে সপ্তদশ শতকের মন্দির অলংকরণে আরও কয়েকটি উপাদানের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি নূতন উপাদান যোগও করা হইয়াছিল। এই উপাদানগুলি দেওয়ালের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। দেওয়ালের কোণ হইতেই শুরু করা যাক। সপ্তদশ শতকের পূর্ণ বিকশিত অলংকার বিন্যাসে দেখা যাইবে দেওয়ালের কোণ বাহিয়া নামিয়াছে পাতলা টালির ছড়। ইহার পরে, উপর্যুপরিভাবে সাজান কয়েকটি আনুভূমিক প্যানেলের সারি। দেওয়ালের ধনুকাকৃতি উপরিভাগের দুই ঢালু প্রান্ত এবং পাদমূলবাহী সারির

মধ্যবর্তী স্থানে ইহার অবস্থান। এই সারিটির পরেই মুসলিম স্থাপত্যালঙ্কার হইতে নেওয়া প্রলম্ব প্যানেলের সারি। দুইপাশ হইতে উঠিয়া প্রলম্ব সারিগুলি উপরি ভাগে, কার্ণিশের নীচে, সাজান ধনুকাকৃতি প্যানেলের সারির দুই প্রান্ত স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান। মিলিতভাবে এই প্রলম্ব ও আনুভূমিক সারিগুলি দেওয়ালের মধ্যস্থলকে ঘিরিয়া একটি বন্ধনী রচনা করিতেছে। এই বন্ধনীটির নীচে রহিয়াছে সস্তম্ভ প্রবেশদ্বার ও তাহার অলঙ্কৃত স্প্যান্ড্রেলগুলি বেষ্টন করিয়া কয়েকটি অলঙ্কৃত রেখার সমবায়ে রচিত এক প্রস্থ বন্ধনী।

দ্বিতীয় বন্ধনীটি দ্বারা পরিবেষ্টিত অংশটি অর্থাৎ প্রবেশদ্বারের স্তম্ভসমূহ এবং স্প্যান্ড্রেলগুলিও মন্দিরে বিভিন্ন অলংকারে সজ্জিত করিয়া তোলা হইয়াছে। স্প্যান্ড্রেলে অলঙ্কার পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের মসজিদেও অবশ্য দেখা যায়। তবে স্তম্ভের উপর অলঙ্কার আঞ্চলিক মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যে কখনও করা হয় নাই। মন্দিরে স্তম্ভগুলিকে সাজান হইয়াছে সারিবদ্ধ প্যানেল ও অলঙ্কৃত রেখা দিয়া। স্প্যান্ড্রেলে অলংকার সজ্জার সহিত যোগ করা হইয়াছে সারিবদ্ধ প্যানেলের বন্ধনী। স্প্যান্ড্রেলের টানা অলংকরণের তিন দিক ঘিরিয়া বন্ধনীটির অবস্থান।

এতক্ষণ তো প্রধান উপাদানগুলির কথা বলিলাম। এগুলির ফাঁকে ফাঁকে যেখানে যেটুকু স্থান পাওয়া গিয়াছে তাহার সবটুকুই ছোট ছোট অলঙ্কৃত প্যানেল দিয়া আবৃত। বস্তুতঃ আঞ্চলিক মন্দিরের পূর্ণ বিকাশত বিন্যাস পরিকল্পনায় অনলঙ্কৃত স্থানেরকোন অবকাশ নাই, দেওয়ালের সবটুকু জুড়িয়াই অলংকার সজ্জার বিস্তার।

যে সামগ্রিক ডিজাইনের কথা একটু আগে বলিয়া আসিয়াছি এই সমস্ত আনুভূমিক ও প্রলম্ব ভাবে সাজান ছোট বড় বিভিন্ন অলংকার-বস্তুর একত্র সমাবেশে তাহার রচনা। গতিপথ ও আকার যাহাই হোক না কেন, সবগুলি অলংকারবস্তুই একটি মাত্র ডিজাইনের পরিকল্পনা হইতে উৎসারিত। লক্ষ করিবার বিষয়, এই বিস্তৃত ডিজাইনটির প্রধান রেখা-প্রবাহ স্থাপত্যের রেখা-প্রবাহকে অনুসরণ করিয়া পরিকল্পিত। এই সূত্রেই স্থাপত্য ও তাহার অলংকরণ হইয়া উঠিয়াছে পরস্পরের পরিপূরক। গৌড়ের কদম রসুল সৌধ (১৫৩১) ও সাদুল্লাপুরের (মালদহ জেলা) জান জান মিয়ার মসজিদে আনুভূমিক বক্ররেখায় বিভক্ত প্রলম্ব প্যানেলের সারি ও কদম রসুল সৌধে স্প্যান্ড্রেলের উপরবর্তী বক্ররেখার বিন্যাসে স্থাপত্য ও অলংকারের মধ্যে এমন একটা সম্পর্কের ইঙ্গিত ধরা পড়ে। সপ্তদশ শতকের পূর্ণ বিকশিত মন্দির অলংকরণের বিন্যাস এই প্রচেষ্টারই সাফল্যময় পরিণতি।

খুঁটাইয়া দেখিতে গেলে মন্দির অলংকরণের অধিকাংশ প্যানেলেই

লৌকিক শিল্পের লক্ষণ স্পষ্ট। কিন্তু সবটা একত্রে দেখিতে গেলে যে সুসংবদ্ধ বিস্তৃত ডিজাইনটি চোখে পড়ে তাহা কিন্তু সুপরিণত শিল্পচিন্তার ফল। আগেই বলিয়াছি, বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়িয়া বিভিন্ন উপাদানে সৃষ্ট সামগ্রিক ডিজাইন সৃষ্টির ধারণাটা আসিয়াছে পশ্চিম এশিয়ার পরিণত স্থাপত্যালংকার হইতে। তত্রাচ ইহা বাংলার লৌকিক স্থাপত্যের অনুকরণে সৃষ্ট মন্দিরগাত্রের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া গিয়াছে। এ মিলনটা ঘটিয়াছে স্পষ্টতই সর্বব্যাপী বক্ররেখার প্রভাবে। স্থাপত্যের মূলগত বক্ররেখা অলংকরণেও রেখা প্রবাহের মূল নিয়ন্তা। ইহাই লৌকিক স্থাপত্য-রূপকে সুসংস্কৃত অলংকরণ পরিকল্পনার অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া পরস্পরের পরিপূরক করিয়া তুলিয়াছে।

মুসলমানগণ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ধর্ম ও সংস্কৃতি লইয়া। ভারতীয় সভ্যতা ও নবাগত মুসলমান বিজেতাগণ যে সভ্যতা নিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন ইহাদের পার্থক্য বুঝাইতে গিয়া পার্সি ব্রাউন বলিয়াছেন, 'Nothing could illustrate more graphically the religious and racial diversity, or emphasise more decisively the principle underlying the consciousness of community, than the contrast between their respective places of worship as represented by the mosque on the one hand and the temple on the other.'[১৯] মুসলমানগণ বাহুবলে ভারতবর্ষ জয় করিয়া শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ভারতীয়রা ছিলেন বিজিত, শাসিত জাতি। এই পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণ পার্থক্যের ফলে নবাগত শাসক ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধানটা যে আরও বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাই সম্ভব মনে হয়।

শাসক ও শাসিতের মধ্যে এই বিপুল ব্যবধান সত্ত্বেও বাংলার পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকীয় মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্য ও হিন্দুদের মন্দির স্থাপত্যের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও গভীর। একত্রে দেখিলে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় স্থাপত্যের মধ্য দিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন আঞ্চলিক স্থাপত্য ও শিল্পরীতির বিবর্তনধারা ফুটিয়া উঠিবে। পশ্চিম এশিয়ায় মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যের যে ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকে বাদ দিয়া তো মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যের পরিকল্পনা করা সম্ভব ছিল না। মুসলমানগণের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের পক্ষে এই ঐতিহ্য ছিল অপরিহার্য। অপরপক্ষে, বাংলার আঞ্চলিক জীবন ও সংস্কৃতির সহিত যোগাযোগ ও মিলন-মিশ্রণও ছিল অত্যাবশ্যক।

১৯. পার্সি ব্রাউন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১।

এই প্রয়োজনেই বাংলার আঞ্চলিক ধর্মীয় স্থাপত্যের ঐতিহ্যকে অবলম্বন করিতে হইয়াছিল এবং বাঙ্গালীর ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক সত্তাকে স্বীকৃতি দিয়া বাংলার লৌকিক স্থাপত্যের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত ধর্মীয় স্থাপত্যরীতির প্রচলন করিতে হইয়াছিল। এই মিলন-মিশ্রণে যে রূপের সৃষ্টি হইল তাহার উপরে বাংলার লৌকিক চালা স্থাপত্যের প্রভাবটাই সর্বাধিক। আঞ্চলিক মুসলিম স্থাপত্য ও তাহার অলংকরণে প্রধান রেখাপ্রবাহ নির্ধারিত হইয়াছে চালার বক্ররেখার অনুকরণে। অর্থাৎ বাংলার আঞ্চলিক মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যের মিশ্ররূপের মধ্যে বাঙ্গালীর আঞ্চলিক সত্তার পরিচয়টাই বড় হইয়া ধরা পড়ে।

পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বাংলায় আঞ্চলিক মন্দির স্থাপত্যের যে ধারা গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার মূল অনুপ্রেরণার সূত্র বাঙ্গালীর আঞ্চলিক সত্তা। ইহারই প্রভাবে মন্দিরের রূপকল্পনা হইয়াছিল বাঙ্গালীর লৌকিক স্থাপত্য চালাকে অবলম্বন করিয়া। মূল অনুপ্রেরণার সূত্র এক বলিয়াই বোধ করি বাংলার মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যের স্থাপত্যরূপ ও অলঙ্করণের সৃজ্যমান আঞ্চলিক ধারাটি লইয়া হিন্দুদের মন্দির স্থাপত্য ও অলঙ্করণে রূপকল্পনার সূত্রপাত। কালক্রমে সপ্তদশ শতকের মন্দির চর্চার মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর এই আঞ্চলিক স্থাপত্য ও স্থাপত্যালংকারের ধারা পরিণতি লাভ করিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান সত্ত্বেও বাংলার আঞ্চলিক মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্য ও মন্দির মিলিয়া যে অবিচ্ছিন্ন স্থাপত্য ও শিল্পধারার বিবর্তন সম্ভব হইয়াছিল বাঙ্গালীর প্রবল আঞ্চলিক সত্তার প্রভাবই তাহার কারণ। এই প্রভাবই মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্য ও হিন্দু ধর্মীয় স্থাপত্যের বিন্যাস, রূপ ও ব্যবহারিক পার্থক্য সত্ত্বেও এক পরিচয় সূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছে।

স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলার কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ও শাসন ক্ষমতা মুসলমানগণের অধিকারে ছিল বটে, কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের অধিকারে। আগেই বলিয়াছি, রাজনৈতিক কারণে শাসিত জনগণের সমর্থন ও সহানুভূতি অর্জন ও বাঙ্গালীর আঞ্চলিক সংস্কৃতির সহিত সামঞ্জস্য সাধন ও মিলন-মিশ্রণ স্বাধীন সুলতানগণের পক্ষে ছিল অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর সৃজ্যমান আঞ্চলিক সত্তাই ছিল সুলতানদের প্রধান অবলম্বন। স্বাধীন সুলতানগণের এই নীতি যে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে আঞ্চলিক সত্তা দৃঢ়মূল ও ব্যাপক হইয়া উঠিতে সহায়তা করিয়াছিল ইহাই তো সম্ভব মনে হয়। স্বাধীন সুলতানী আমলে বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে যে ব্যাপক আঞ্চলিক ধর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়াছিল তাহাতেই এ কথার প্রমাণ

মিলিবে।[২০] হিন্দুদের এই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে অনেকে 'হিন্দু পুনরুজ্জীবন' ও 'পৌরাণিক পুনরুজ্জীবন' বলিয়া আখ্যাত করিতে চাহিয়াছেন।[২১] কিন্তু পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে হিন্দুদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মধ্যে বাঙ্গালী আঞ্চলিকতা এতই প্রবল যে ইহাকে 'হিন্দু' বা 'পৌরাণিক পুনরুজ্জীবন' বলিয়া আখ্যাত করিলে ইহার মূল অনুপ্রেরণা ও শক্তির উৎসটাকেই অস্বীকার করা হইবে।

পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে যে আঞ্চলিক মন্দির স্থাপত্যের চর্চা আরম্ভ হইল তাহা হিন্দুদের মধ্যে এই ব্যাপক ও গভীর আঞ্চলিক সংস্কৃতি বিকাশের অঙ্গ। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যাগত শিখর রীতির কথা পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বাঙ্গালীর ভাল করিয়াই জানা ছিল। তথাপি শিখর রীতি বাঙ্গালীর চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই। ঘনিষ্ঠ পরিবেশের অতি পরিচিত চালা রূপটাই আবার নূতন করিয়া তাহার মনোহরণ করিল। চালা ও রত্ন রীতি, বিশেষ করিয়া চালা কুটীরের অনুকরণে সৃষ্ট চালা রীতির মন্দির, যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল ইহাতেই বুঝা যাইবে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে আঞ্চলিক সত্তার প্রভাব কত ব্যাপক ও গভীরতলশায়ী হইয়া উঠিয়াছে।

২০. স্বাধীন সুলতানী আমলে হিন্দুদের ব্যাপক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পরিচয় পাওয়া যাইবে আঞ্চলিক নব্যন্যায় ও স্মৃতির উদ্ভব ও চর্চায়, বাংলাভাষায় মহাকাব্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদে ও স্বাধীন কাব্যজীবনী সাহিত্য রচনায়, শ্রীচৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনে; উপরন্তু শিল্প ও স্থাপত্যের আঞ্চলিক ধারাও তো এই সময়েরই সৃষ্টি। নব্যন্যায় সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্র. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান', দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৪; আঞ্চলিক স্মৃতি সম্পর্কিত আলোচনার জন্য দ্র. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙালী', কলিকাতা, ১৯৬৯ এবং বাণী চক্রবর্তী, 'সমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন', কলিকাতা, ১৯৭০; বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্র. অশোক মজুমদার, 'চৈতন্য: হিজ লাইফ এ্যান্ড ডক্‌ট্রিন', বোম্বাই, ১৯৬৯। সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনার দ্র দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য', কলিকাতা, ১৯৬৭, পৃ. ১১৫-২৫৯।

২১. স্বাধীন সুলতানী আমলে বাঙ্গালীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে 'হিন্দু পুনরুজ্জীবন' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলেন মনোমোহন চক্রবর্তী (দ্র. "বেঙ্গলী টেম্পলস এ্যান্ড দেয়ার জেনেরাল ক্যারেকটারিসটিকস", 'জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল', নিউ সিরিজ, ৫ম খণ্ড, ১৯০৯)। দীনেশচন্দ্র সেন ইহাকে 'পৌরাণিক পুনরুজ্জীবন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (দ্র. 'হিস্ট্রি অফ বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যান্ড লিটারেচার', চতুর্থ পরিচ্ছেদ)। সাম্প্রতিককালে ডেভিড ম্যাকাচ্চন দীনেশচন্দ্র সেনের আখ্যাটিকে যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন (দ্র. 'লেট মিডিয়াভাল টেম্পেলস অফ বেঙ্গল', কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ১)।